মহিলা সাহাবী

তালিবুল হাশেমী

www.bjilibrary.com

মহিলা সাহাবী

তালিবুল হাশেমী
অনুবাদ ঃ আবদুল কাদের

আধুনিক প্রকাশনী
ঢাকা

www.bjilibrary.com

www.bjlibrary.com

প্রকাশনায়
বাংলাদেশ ইসলামিক ইনস্টিটিউট পরিচালিত
আধুনিক প্রকাশনী
২৫, শিরিশদাস লেন
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন ঃ ৭১১৫১৯১, ৯৩৩৯৪৪২
ফ্যাক্স ঃ ৮৮-০২-৭১৭৫১৮৪

আঃ প্রঃ ১৪৭

প্রথম প্রকাশ ঃ জুন ১৯৯০

১০ম প্রকাশ

মহররম	১৪৩৪
অগ্রহায়ণ	১৪১৯
ডিসেম্বর	২০১২

বিনিময় ঃ ২৩৫.০০ টাকা

মুদ্রণে
বাংলাদেশ ইসলামিক ইনস্টিটিউট পরিচালিত
আধুনিক প্রেস
২৫, শিরিশদাস লেন
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

TAZKAR-E-SAHBIAT. by Talibul Hashemy. Published by Adhunik Prokashani, 25, Shirishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100.

Sponsored by Bangladesh Islamic Institute.
25, Shirishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100.

Price : Taka 235.00 Only

www.bjilibrary.com

www.bjilibrary.com

অনুবাদকের কথা

'মহিলা সাহাবী' গ্রন্থটির তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হলো। এই মুহূর্তে আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের দরবারে বিনয়াবনত চিত্তে শুকরিয়া জ্ঞাপন করি। এত অল্প সময়ে দ্বিতীয় সংস্করণ শেষ হয়ে যাওয়াই প্রমাণ করছে যে, পাঠক সমাজের নিকট গ্রন্থটি সমাদৃত হয়েছে। এই গ্রন্থে দু' শতাধিক মহিলা সাহাবীর (রা) জীবনী আলোচিত হয়েছে। বাংলা ভাষায় এত অধিক সংখ্যক মহিলা সাহাবীর জীবনী সম্বলিত গ্রন্থ আর আছে বলে আমাদের জানা নেই। এদিক থেকে বইটি নিসন্দেহে ব্যতিক্রমধর্মী।

কোন জাতি যখন নিজের প্রজ্বল ইতিহাসকে ভুলে গিয়ে অন্যের অন্ধ অনু-করণ শুরু করে তখনই তার পতন অনিবার্য হয়ে দাঁড়ায়। মুসলিম মিল্লাতের অবস্থাও হয়েছে ঠিক তাই। আজকের মুসলমানরা পাশ্চাত্যসহ আরো অন্য জাতির অনুকরণে মেতে উঠেছে। ফলে মুসলিম সমাজেও অশান্তির আগুন দাউ দাউ করে জ্বলছে। অথচ মুসলমানদের প্রজ্বল ইতিহাস ও জীবন্ত আদর্শ রয়েছে। এই আদর্শের মূল ধারক ও বাহক হলেন সাহাবী বৃন্দ (রা)। শেষ নবী ও মানবতার মহান বন্ধু হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফার (সা) যেমন অগণিত পুরুষ সাহাবী (রা) ছিলেন, তেমনি সংখ্যক মহিলা সাহাবীও (রা) ছিলেন। এই সকল মহিলা সাহাবীই (রা) মুসলিম মহিলাদের অনুকরণীয় ব্যক্তিত্ব হওয়া উচিত। তবে, এটাও ঠিক যে, মহিলা সাহাবীদের (রা) সম্পর্কে সার্বিক চর্চা বলতে গেলে খুবই সীমাবদ্ধ। বাংলা ভাষায় এই সম্পর্কিত পুস্তকাদি পূর্বে তেমন ছিল না। বর্তমানে কিছু কিছু পুস্তক পাওয়া যাচ্ছে। এজন্য আশা করা যায় যে, বাঙালী মুসলমান মহিলা সমাজ এখন এ ব্যাপারে বেশী বেশী জানার ও চর্চার সুযোগ পাবেন এবং মহিলা সাহাবী বৃন্দ (রা) ইসলামী সমাজ বিপ্লবে সক্রিয়ভাবে অংশ নিয়েছিলেন তেমনি তাঁরাও একই ধরনের ভূমিকাসহ অগ্রগামী হবেন। কাংখিত ইসলামী সমাজ বিপ্লব কিন্তু মহিলাদের সক্রিয় অংশগ্রহণ ছাড়া সম্ভব নয়।

গ্রন্থটির মূল লেখক মুহতারাম তালেবুল হাশেমী দেড় হাজার বছর পূর্বেকার মহিলা সাহাবীদের (রা) জীবনী সংগ্রহের দুরূহ আংশিক কাজ এই পুস্তক রচনার মাধ্যমে সম্পন্ন করেছেন। এই পুস্তকে ২১৯জন মহিলা সাহাবীর জীবনী স্থান পেয়েছে। তাদের মধ্যে অনেকের জীবনী বিস্তারিতভাবে আলোচিত হয়েছে। আবার অনেকের জীবনী খুব সংক্ষিপ্ত আকারে বিবৃত হয়েছে। যাঁর সম্পর্কে যতটুকুন সঠিক তথ্য তিনি জ্ঞানের মহাসাগর সিঞ্চন করে সংগ্রহ

www.bjilibrary.com

www.bjilibrary.com

করতে পেরেছেন ততটুকুই তিনি পুস্তকটিতে স্থান দিয়েছেন। মহিলা সাহাবীদের (রা) জীবনী আলোচনায় অনেক মাসলা-মাসায়েলও প্রাসঙ্গিক চলে এসেছে। যা পাঠকদের জন্য অতিরিক্ত পাওয়া বৈকি। তাছাড়া লেখকের আলোচনা যেমন সহজ-সরল, তেমনি গভীরতা ও পান্ডিত্যপূর্ণ। তথ্য এবং যুক্তিও বইটির আরেক আকর্ষণ। এই মূল্যবান গ্রন্থ রচনার জন্য আল্লাহ পাক দুনিয়া এবং আখেরাতে তাঁকে যথাযথ সম্মানে ভূষিত করুন।

'আধুনিক প্রকাশনী' কর্তৃপক্ষ গ্রন্থটির তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশে এগিয়ে এসে নিসন্দেহে বাঙালা ভাষা-ভাষীদেরকে ঋণপাশে আবদ্ধ করেছেন। আল্লাহ পাক তাদেরকে এই কর্মের যথার্থ প্রতিদান দিন। গ্রন্থটি প্রকাশের ব্যাপারে যাঁরা সহযোগিতা করেছেন তাঁদের নিকট আমি কৃতজ্ঞ। বিশেষ করে আমার স্ত্রী হাসিনা সিদ্দিকার নিকট আমি ঋণী। তার উৎসাহ আমার জন্য অবশ্যি প্রেরণাদায়ক। সর্বশেষে আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জতের নিকট আমাদের এই প্রয়াস কবুলের জন্য মুনাজাত করি। আমীন !

ঢাকা, ১লা মাঘ, ১৪০৩ সন।
৪ঠা রমযান, ১৪১৭ হিজরী।
১৪ই জানুয়ারী, ১৯৯৭ সাল।

বিনয়াবনত
আবদুল কাদের

www.bjilibrary.com

www.bjilibrary.com

সূচীপত্র

১।	উম্মুল মুমিনিন হযরত খাদিজাতুল কুবরা (রাঃ)	১৭
২।	উম্মুল মুমিনিন হযরত ছাওদা (রাঃ) বিনতে যামা'আ	২৫
৩।	উম্মুল মুমিনিন হযরত আয়েশা সিদ্দিকাহ (রাঃ)	২৯
৪।	উম্মুল মুমিনিন হযরত হাফসাহ বিনতে ওমর (রাঃ)	৪৪
৫।	উম্মুল মুমিনিন হযরত যয়নব (রাঃ) বিনতে খোযায়মা	৪৮
৬।	উম্মুল মুমিনিন হযরত উম্মে সালমাহ (রাঃ)	৫০
৭।	উম্মুল মুমিনিন হযরত যয়নব (রাঃ) বিনতে জাহাস	৫৯
৮।	উম্মুল মুমিনিন হযরত জুয়াইরিয়া (রাঃ) বিনতে হারেছ	৬৫
৯।	উম্মুল মুমিনিন হযরত উম্মে হাবিবা (রাঃ) বিনতে আবু সুফিয়ান (রাঃ)	৬৮
১০।	উম্মুল মুমিনিন হযরত ছুফিয়া (রাঃ) বিনতে হুইয়ি	৭১
১১।	উম্মুল মুমিনিন হযরত মাইমুনা (রাঃ) বিনতে হারিছ	৭৮
১২।	হযরত রায়হানা (রাঃ) বিনতে শামউন	৮১
১৩।	হযরত মারিয়া কিবতিয়া (রাঃ)	৮৩
১৪।	রাসূলের (সাঃ) কন্যা হযরত যয়নব (রাঃ) বিনতে রাসুলুল্লাহ (সাঃ)	৮৫
১৫।	হযরত রোকেয়া (রাঃ) বিনতে রাসুলুল্লাহ (সাঃ)	৯০
১৬।	হযরত উম্মে কুলছুম (রাঃ) বিনতে রাসুলুল্লাহ (সাঃ)	৯৩
১৭।	খাতুনে জান্নাত হযরত ফাতিমাতুজ জোহরা	৯৫
১৮।	হযরত ফাতিমা (রাঃ) বিনতে আসাদ	১১৩
১৯।	হযরত উম্মে আইমান (রাঃ)	১১৮
২০।	হযরত ছুফিয়াহ (রাঃ) বিনতে আব্দুল মুত্তালিব	১২৬
২১।	হযরত সুমাইয়াহ (রাঃ) বিনতে খাবাত	১৩৪
২২।	হযরত উম্মে রুমান (রাঃ)	১৩৭
২৩।	হযরত আসমা (রাঃ) বিনতে আবুবকর সিদ্দিক (রাঃ)	১৪২
২৪।	হযরত ফাতিমা (রাঃ) বিনতে খাত্তাব	১৬৫
২৫।	হযরত আসমা (রাঃ) বিনতে উমায়েস	১৭৬
২৬।	হযরত শাফা (রাঃ) বিনতে আব্দুল্লাহ	১৮৮
২৭।	হযরত উম্মুল ফজল লুবাবাতুল কুবরা (রাঃ)	১৯২
২৮।	হযরত উম্মে শুরাইক দাওসিয়া (রাঃ)	১৯৬
২৯।	হযরত ছাবা (রাঃ) বিনতিল হাজরামি	১৯৮
৩০।	হযরত শিফা (রাঃ) বিনতে আওফ	১৯৯
৩১।	হযরত রামলাহ (রাঃ) বিনতে আবি আওফ সাহমিয়াহ	১৯৯
৩২।	হযরত বিন্নিরাহ (রাঃ) রুমিয়াহ	২০০
৩৩।	হযরত লুবাইনাহ (রাঃ)	২০১
৩৪।	উম্মে উবাইস (রাঃ)	২০২
৩৫।	হযরত হমামাহ (রাঃ)	২০২

www.bjilibrary.com

৩৬।	হযরত নাহদিয়া (রাঃ) এবং তাঁর কন্যা	২০২
৩৭।	হযরত উম্মে মাবাদ খুযায়িয়াহ (রাঃ)	২০৩
৩৮।	হযরত খানছা (রাঃ) বিনতে আমর	২০৭
৩৯।	হযরত উমাইয়া গিফারিয়া (রাঃ)	২১৭
৪০।	হযরত লায়লা (রাঃ) বিনতে আবি হাছমা	২১৭
৪১।	হযরত ফাতিমা (রাঃ) বিনতে সাফওয়ান	২২০
৪২।	হযরত ফাতিমা (রাঃ) বিনতে মুজাল্লালি আমেরিয়াহ	২২০
৪৩।	হযরত আম্মরাহ (রাঃ) বিনতে আস-সাদি	২২১
৪৪।	হযরত যয়নব (রাঃ) বিনতে মাজউন	২২১
৪৫।	হযরত রাইতাহ (রাঃ) বিনতিল হারিছ	২২২
৪৬।	হযরত হাসানাহ (রাঃ)	২২৩
৪৭।	হযরত উমাইনাহ (রাঃ) বিনতে খালফ আল খুযায়িয়াহ	২২৪
৪৮।	হযরত সাহলাহ (রাঃ) বিনতে সুহায়েল (রাঃ) বিন আমর	২২৪
৪৯।	হযরত উম্মে কুলছুম (রাঃ) বিনতে সুহায়েল বিন আমর	২২৭
৫০।	হযরত উম্মে যিয়াদ আশজায়িয়াহ (রাঃ)	২২৮
৫১।	হযরত উম্মে কায়েস (রাঃ) বিনতে মিহসান	২২৮
৫২।	হযরত লায়লা গিফারিয়া (রাঃ)	২২৯
৫৩।	হযরত দাবায়াহ (রাঃ) বিনতে যোবায়ের	২২৯
৫৪।	হযরত উম্মে আইয়ুব আনসারিয়া (রাঃ)	২৩০
৫৫।	হযরত উম্মে সালিত আনসারিয়া (রাঃ)	২৩১
৫৬।	হযরত ফাতিমা (রাঃ) বিনতে কায়েস	২৩১
৫৭।	হযরত উম্মে ফারদাহ (রাঃ)	২৩৭
৫৮।	একজন ভাগ্যবতী সাহাবী (রাঃ)	২৩৮
৫৯।	হযরত তামাদুর (রাঃ) বিনতিল আসবাগ (রাঃ)	২৩৯
৬০।	হযরত যয়নব (রাঃ) বিনতে আবু সালমা (রাঃ)	২৪০
৬১।	হযরত দুররাহ (রাঃ) বিনতে আবি সালমা (রাঃ)	২৪৩
৬২।	হযরত হাবিবা (রাঃ) বিনতে উবায়েদুল্লাহ	২৪৩
৬৩।	হযরত সালমা (রাঃ) রাসূলের (সাঃ) খাদেমাহ	২৪৪
৬৪।	হযরত ফিদদাহ (রাঃ)	২৪৫
৬৫।	হযরত আতিকাহ (রাঃ) বিনতে যায়েদ	২৪৬
৬৬।	হযরত সালমা (রাঃ) বিনতে উমায়েস	২৪৮
৬৭।	হযরত উমামাহ (রাঃ) বিনতে হামযাহ (রাঃ)	২৪৮
৬৮।	হযরত উম্মুল ফজল (রাঃ) বিনতে হামযাহ (রাঃ)	২৫০
৬৯।	হযরত উমরাহ (রাঃ) বিনতে হারিছ	২৫০
৭০।	হযরত ফাতিমা (রাঃ) বিনতে ওয়ালিদ	২৫১
৭১।	হযরত যয়নব (রাঃ) বিনতে হানজালীহ	২৫১
৭২।	হযরত সাহলাহ (রাঃ) বিনতে আছেম কুজায়িয়াহ	২৫২

www.bjilibrary.com

৭৩।	হযরত ছাবিতাহ (রাঃ) বিনতে ইয়াম্মার আনসারিয়াহ	২৫৩
৭৪।	হযরত উম্মে আওস আনসারিয়াহ (রাঃ)	২৫৩
৭৫।	হযরত উম্মে খাল্লাদ (রাঃ) আনসারিয়াহ	২৫৩
৭৬।	হযরত উম্মুল খায়ের (রাঃ) বিনতে সাখার।	২৫৫
৭৭।	হযরত ছাওবিয়াহ (রাঃ)	২৫৭
৭৮।	হযরত সাবিবিয়াহ গামিদিয়াহ (রাঃ)	২৫৮
৭৯।	হযরত কিবতিয়াহ (রাঃ)	২৬০
৮০।	হযরত তামিমাহ (রাঃ) বিনতে ওয়াহাব	২৬১
৮১।	বিনতে আমর (রাঃ) বিনতে ওয়াহাব	২৬১
৮২।	হযরত উম্মে হারমালাহ (রাঃ) বিনতে আবদুল আসওয়াদ	২৬২
৮৩।	হযরত বারাকাহ (রাঃ) বিনতে ইয়াসার	২৬৩
৮৪।	হযরত ফুকাইহা (রাঃ) বিনতে ইয়াসার	২৬৩
৮৫।	হযরত আসমা (রাঃ) বিনতে সালামাহ	২৬৪
৮৬।	হযরত ইয়াকজাহ (রাঃ) বিনতে আলকামাহ	২৬৫
৮৭।	হযরত উম্মে হাবিবাহ (রাঃ) বিনতে জাহাশ	২৬৫
৮৮।	হযরত আরওয়া (রাঃ) বিনতে আবদুল মুত্তালিব	২৬৬
৮৯।	হযরত উম্মে আবদ (রাঃ)	২৬৮
৯০।	হযরত যয়নব (রাঃ) বিনতে আবি মাবিয়া	২৬৯
৯১।	হযরত জামানাহ (রাঃ) বিনতে আবি তালিব	২৭২
৯২।	হযরত উম্মে হানি (রাঃ) বিনতে আবি তালিব	২৭২
৯৩।	হযরত হাওলা (রাঃ)	২৭৫
৯৪।	হযরত উম্মে হাকিম (রাঃ) বিনতে হারিছ	২৭৫
৯৫।	হযরত ছুফিয়াহ (রাঃ) বিনতে রবিয়াহ	২৮১
৯৬।	হযরত তাইয়্যেবাহ (রাঃ) বিনতে ওয়াহাব	২৮২
৯৭।	হযরত উম্মে হাকিম (রাঃ) বিনতে যোবায়ের	২৮২
৯৮।	হযরত হালিমা সাদিয়াহ (রাঃ)	২৮৩
৯৯।	হযরত শিমা (রাঃ) বিনতে হারিছ	২৮৭
১০০।	হযরত হিন্দ (রাঃ) বিনতে উতবাহ	২৮৮
১০১।	হযরত দুররাহ (রাঃ) বিনতে আবি লাহাব	২৯২
১০২।	হযরত উমাইমাহ (রাঃ) উম্মে আবি হুরাইরাহ (রাঃ)	২৯৪
১০৩।	হযরত উমাইয়াহ (রাঃ) বিনতে গানাম	২৯৫
১০৪।	হযরত হিন্দ (রাঃ) বিনতে জাবের	২৯৬
১০৫।	হযরত আতিকাহ (রাঃ) বিনতে আওফ	২৯৬
১০৬।	হযরত সাফওয়ান (রাঃ) বিন মুয়াত্তালের স্ত্রী	২৯৭
১০৭।	হযরত উম্মে মাহজান (রাঃ)	২৯৮
১০৮।	হযরত খাওলাহ (রাঃ) বিনতে হাকিম	২৯৮
১০৯।	হযরত হামনাহ (রাঃ) বিনতে জাহাশ	৩০১

www.bjilibrary.com

১১০। ‘হযরত আরওয়া (রাঃ) বিনতে কুরাইয ৩০২
১১১। হযরত সু'দা (রাঃ) বিনতে কুরাইয ৩০৩
১১২। হযরত হাল্লাহ (রাঃ) বিনতে খুয়ায়েলদ ৩০৪
১১৩। হযরত জাছামাহ (রাঃ) (হানানাহ) মযনিয়াহ ৩০৪
১১৪। হযরত উম্মে কুলছুম (রাঃ) বিনতে উকবাহ ৩০৫
১১৫। হযরত উম্মে খালিদ (রাঃ)
বিনতে খালিদ বিন সাঈদ ৩০৭
১১৬। হযরত উম্মে ওয়ারকাহ (রাঃ) বিনতে
নাওফিল আনসারিয়াহ ৩১০
১১৭। হযরত উম্মে মানি' আনসারিয়াহ ৩১২
১১৮। হযরত উম্মে আম্মারাহ (রাঃ) খাতুনে ওহোদ ৩১২
১১৯। হযরত উম্মে আতিয়্যাহ বিনতে হারিছ ৩২২
১২০। হযরত আসমা (রাঃ) আনসারিয়াহ ৩২৮
১২১। বিনতে মিলহান ৩৩৪
১২২। হযরত খাওলাহ (রাঃ) বিনতে ছা'লাবাহ ৩৩৯
১২৩। হযরত রুব্বায়্যি বিনতে মুয়াব্বিজ (রাঃ) ৩৪৩
১২৪। হযরত উম্মে সুলাইম (রাঃ) ৩৪৮
১২৫। হযরত জামিলাহ (রাঃ) বিনতে সা'দ আনসারিয়াহ ৩৬০
১২৬। হযরত খানসা (রাঃ) বিনতে হাযাম আনসারিয়াহ ৩৬২
১২৭। হযরত উম্মু আলা' আনসারিয়াহ (রাঃ) ৩৬২
১২৮। হযরত আবুল হাছিম মালিকের (রাঃ) স্ত্রী ৩৬৩
১২৯। হযরত আবুল মালিক (রাঃ) বিনতে উবাই ৩৬৪
১৩০। বিনতে বাশির (রাঃ) বিনতে সা'দ ৩৬৫
১৩১। হযরত খাইরাহ (রাঃ) বিনতে আবি হাদরদ আসলামী (রাঃ) ৩৬৬
১৩২। হযরত হাবিবাহ (রাঃ) বিনতে খারিজাহ (রাঃ) আনসারিয়াহ ৩৬৭
১৩৩। হযরত উম্মে বুরদাহ খাওলাহ আনসারিয়াহ ৩৬৮
১৩৪। হযরত খাওলাহ (রাঃ) বিনতে কায়েস ৩৬৮
১৩৫। হযরত আনিসাহ (রাঃ) বিনতে আদি ৩৭০
১৩৬। হযরত ফারিয়াহ (রাঃ) বিনতে আসয়াদ (রাঃ) বিনতে যারারাহ ৩৭১
১৩৭। হযরত উম্মে দাহদাহ (রাঃ) ৩৭২
১৩৮। হযরত রুবায়্যি' (রাঃ) বিনতে নাজার ৩৭৪
১৩৯। হযরত যারিরাহ (রাঃ) ৩৭৬
১৪০। হযরত উম্মে সুমবুলাহ (রাঃ) ৩৭৯
১৪১। হযরত কাইলাহ (রাঃ) ৩৮০
১৪২। হযরত উম্মে ইসহাক (রাঃ) ৩৮০
১৪৩। হযরত উম্মুল মানযার (রাঃ) বিনতে কায়েস ৩৮১
১৪৪। হযরত হাওয়া (রাঃ) বিনতে ইয়াযিদ ৩৮২

www.bjilibrary.com

১৪৫। হযরত খালিদাহ (রাঃ) বিনতে কায়েস ৩৮৩
১৪৬। হযরত কাবশাহ (রাঃ) বিনতে মাহান আনসারিয়াহ ৩৮৪
১৪৭। হযরত উম্মে হিশাম (রাঃ) আনসারিয়াহ ৩৮৫
১৪৮। হযরত আবু হুমায়েদ সায়েদীর (রাঃ) স্ত্রী ৩৮৫
১৪৯। হযরত আযদাতা (রাঃ) বিনতে হারিছ ৩৮৬
১৫০। হযরত উম্মে আবান (রাঃ) ৩৮৭
১৫১। হযরত উম্মে মিসতাহ (রাঃ) ৩৮৮
১৫২। হযরত হিন্দ (রাঃ) বিনতে আমর বিন হারাম আনসারিয়াহ ৩৮৯
১৫৩। হযরত ফাতিমা (রাঃ) বিনতে আমর বিন হারাম আনসারিয়াহ ৩৯১
১৫৪। হযরত হাবতাহ (রাঃ) বিনতে মালিক আনসারিয়াহ ৩৯১
১৫৫। হযরত রুব্বাব (রাঃ) বিনতে কা'ব আনসারিয়াহ ৩৯২
১৫৬। হযরত কুররাতুল আইন (রাঃ) বিনতে উবাদাহ আনসারিয়াহ ৩৯৩
১৫৭। হযরত উকবাহ (রাঃ) বিনতে মুহাম্মাদ আনসারিয়াহ ৩৯৩
১৫৮। হযরত ফারিয়াহ (রাঃ) বিনতে খালিদ আনসারিয়াহ ৩৯৪
১৫৯। হযরত উম্মুত তোফায়েল (রাঃ) আনসারিয়াহ ৩৯৪
১৬০। হযরত সুহাইলাহ (রাঃ) বিনতে মাসউদ আনসারিয়াহ ৩৯৫
১৬১। হযরত মুলাইকাহ (রাঃ) বিনতে মালিক আনসারিয়াহ ৩৯৭
১৬২। হযরত উম্মে সাইফ (রাঃ) আনসারিয়াহ ৩৯৮
১৬৩। হযরত উমরাহ (রাঃ) বিনতে মুসউদ আনসারিয়াহ ৩৯৯
১৬৪। হযরত ফুকাইহাহ (রাঃ) বিনতে উবায়েদ আনসারিয়াহ ৩৯৯
১৬৫। হযরত কাবশাহ (রাঃ) বিনতে রাফে ৪০০
১৬৬। হযরত খালিদাহ (রাঃ) বিনতে হারিছ ৪০১
১৬৭। হযরত হাওয়া (রাঃ) বিনতে ইয়াযিদ (রাঃ) ৪০২
১৬৮। হযরত উমরাতা (রাঃ) বিনতে রাওয়াহাহ ৪০২
১৬৯। হযরত উম্মে রাফিদাহ (রাঃ) ৪০৩
১৭০। জালবিবের (রাঃ) স্ত্রী ৪০৪
১৭১। হযরত সালাফাহ বিনতে বারা' আনসারিয়াহ ৪০৫
১৭২। হযরত আনিসাহ (রাঃ) বিনতে আবি হারিছাহ ৪০৫
১৭৩। হযরত যয়নব (রাঃ) বিনতে আলী (রাঃ) ৪০৬
১৭৪। হযরত সানজারাহ (রাঃ) বিনতে তামিম ৪২১
১৭৫। হযরত আরনাব (রাঃ) আনসারিয়াহ ৪২১
১৭৬। বিবি কুররাতুনা (রাঃ) ৪২১
১৭৭। বিবি সাররাহ (রাঃ) ৪২২
১৭৮। হযরত সাফানাহ (রাঃ) বিনতে হাতেম ৪২৪
১৭৯। হযরত উমামাহ (রাঃ) বিনতে আবিল আছ (রাঃ) ৪২৭
১৮০। হযরত উম্মুল হাছিম (রাঃ) ৪২৮
১৮১। একজন অনুগত সাহাবিয়াহ (রাঃ) ৪২৯

www.bjilibrary.com

১৮২।	হযরত আযযাহ (রাঃ) বিনতে আবু সুফিয়ান (রাঃ)	৪৩০
১৮৩।	হযরত যয়নব (রাঃ) বিনতে আওয়াম	৪৩১
১৮৪।	হযরত আযযাহ (রাঃ) বিনতে খায়েল	৪৩২
১৮৫।	হযরত উমাইমাহ (রাঃ) বিনতে রাকিকাহ	৪৩২
১৮৬।	হযরত আমেনাহ (রাঃ) বিনতে রাকিশ	৪৩৩
১৮৭।	হযরত সালমা (রাঃ) বিনতে খারে বিন উরয়াহ	৪৩৩
১৮৮।	হযরত সাবিয়াহ আসলামিয়াহ (রাঃ)	৪৩৪
১৮৯।	হযরত উম্মে হাছিন (রাঃ)	৪৩৪
১৯০।	হযরত সালামাহ (রাঃ) বিনতে হুর	৪৩৫
১৯১।	হযরত হুসাইরাহ (রাঃ) বিনতে সাফওয়ান	৪৩৫
১৯২।	বিনতে আব্দুল্লাহ (রাঃ) ছাবিত	৪৩৫
১৯৩।	বনু তামিমের একজন সাহাবিয়াহ	৪৩৬
১৯৪।	মরু প্রান্তরের এক সাহাবিয়াহ	৪৩৭
১৯৫।	হযরত কাতিলাহ আবদারিয়াহ (রাঃ) বিনতে নাজার বিন হারিছ	৪৩৮
১৯৬।	আফিরাহ (রাঃ) বিনতে গিফার হিমাইরী	৪৩৯
১৯৭।	নায়াম (রাঃ) বিনতে কানাহ.	৪৩৯
১৯৮।	হযরত মায়াজাহ (রাঃ) গিফারিয়াহ	৪৪০
১৯৯।	হযরত লুবনা (রাঃ) বিনতে সাওয়ার	৪৪০
২০০।	হযরত কায়িযাহ (রাঃ) বিনতে সায়াদ	৪৪০
২০১।	খাছয়াম গোত্রের একজন সাহাবিয়াহ	৪৪১
২০২।	একজন বিদেশী সাহাবিয়াহ	৪৪১
২০৩।	হযরত আফরা (রাঃ) বিনতে উবায়েদ আনসারিয়াহ	৪৪২
২০৪।	হযরত উম্মে সিনান (রাঃ)	৪৪৩
২০৫।	একজন নামহীন সাহাবিয়াহ (রাঃ)	৪৪৪
২০৬।	হযরত মায়াজাহ (রাঃ) বিনতে আব্দুল্লাহ	৪৪৪
২০৭।	হযরত মিসকিয়াহ (রাঃ) ও হযরত উমাইমাহ (রাঃ)	৪৪৫
২০৮।	হযরত সালমা আনসারিয়াহ (রাঃ)	৪৪৬
২০৯।	হযরত সাওদাহ (রাঃ)	৪৪৬
২১০।	হযরত খুজাইমাহ (রাঃ)	৪৪৭
২১১।	বিনতে খাব্বাব (রাঃ) বিন আরাত	৪৪৮
২১২।	(রাঃ) এবং হযরত গাফিলাহ (রাঃ)	৪৪৯
২১৩।	হযরত জাযামাহ (রাঃ) বিনতে জান্দাল	৪৪৯
২১৪।	হযরত ফাতিমা (রাঃ) বিনতে উতবাহ	৪৫০
২১৫।	এক মরুচারী সাহাবিয়াহ (রাঃ)	৪৫০
২১৬।	হযরত উম্মে রা'লাহ (রাঃ) কাশিরিয়াহ	৪৫৩

www.bjilibrary.com

উম্মুল মুমিনিন হযরত খাদিজাতুল কুবরা (রাঃ)

নাম খাদিজা। কুনিয়ত উম্মে হিন্দ। লকব তাহেরাহ। বংশনামা হলোঃ খাদিজা(রাঃ) বিনতে খুয়ায়েলদ বিন আসাদ বিন আব্দুল উজ্জা বিন কুসাই। মাতার নাম ছিল ফাতিমা(রাঃ) বিনতে যায়েদা। তিনি আমের বিন লুব্বীর বংশের সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিলেন।

হযরত খাদিজার (রাঃ) পিতা খুয়ায়েলদ বিন আসাদ একজন সফল ব্যবসায়ী ছিলেন। তিনি শুধু স্বগোত্রেই মহান ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মানুষ ছিলেন না বরং সুন্দর আদান- প্রদান ও বিশ্বস্ততার কারণে সমগ্র কোরেশের মধ্যে জনপ্রিয় ও শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন।

'হাতীর সাল'-এর ১৫ বছর পূর্বে ৫৫৫ খৃষ্টাব্দে হযরত খাদিজা (রাঃ) জন্মগ্রহণ করেন। শৈশবকাল থেকেই তিনি নেক ও শরীফ প্রকৃতির ছিলেন। বয়োপ্রাপ্ত হলে আবু হালাহ হিন্দ বিন নাবাশ তামিমীর সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়। আবু হালাহর ঘরে তাঁর দু'টি পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করেছিল। এক পুত্রের নাম ছিল হালাহ জাহেলী যুগেই সে মৃত্যুবরণ করে। দ্বিতীয় পুত্রের নাম হলো হিন্দ। কতিপয় রাওয়ায়েত অনুযায়ী তিনি সাহাবী হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন।

আবু হালাহর ইন্তেকালের পর হযরত খাদিজার(রাঃ) দ্বিতীয় বিয়ে হয়েছিল আতিক বিন আবেদ মাখজুমীর সঙ্গে। তার ঘরেও একটি মেয়ে জন্ম নিয়েছিল। তার নাম ছিল হিন্দ। কিছুদিন পর আতিক বিন আবেদও মারা যান। এক রাওয়ায়েত অনুযায়ী হযরত খাদিজার তৃতীয় বিয়ে হয়েছিল তাঁর চাচাত ভাই ছাইফী বিন উমাইয়ার সাথে। তার ইন্তেকালের পর জনাব রাসূলে কারিমের (সাঃ) সঙ্গে হযরত খাদিজার (রাঃ) বিয়ে সুসম্পন্ন হয়। কিন্তু অন্যান্য রাওয়ায়েত অনুযায়ী হযরত খাদিজার(রাঃ) তৃতীয় এবং শেষ বিয়ে অনুষ্ঠিত হয় হযরত রাসূলে করিমের(সাঃ) সঙ্গে।

www.bjilibrary.com

প্রিয় নবীর (সাঃ) পানি গ্রহণের পূর্বে হযরত খাদিজাতুল কুবরা(রাঃ) বৈধব্যকালে একাকীত্বে সময় কাটাতেন। কিছু সময় তিনি কাবা শরীফে অতিবাহিত করতেন এবং কিছু সময় সমকালীন সম্ভ্রান্ত মহিলা গণকদের সঙ্গে ব্যয় করতেন। সে সময় তিনি তাদের সঙ্গে তৎকালীন বিপ্লব নিয়ে প্রায়ই আলোচনা করতেন। কোরেশের বড় বড় সরদার তাঁর নিকট বিয়ের পয়গাম প্রেরণ করেছিলেন। কিন্তু তিনি সেইসব প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। কেননা একের পর এক দুঃখে তাঁর মন দুঃখ ভারাক্রান্ত হয়ে ছিল।

এদিকে বার্ধক্যের কারণে তাঁর পিতা নিজের বিরাট বাণিজ্যিক ব্যবস্থাপনা প্রশ্নে দুর্বল হয়ে পড়েছিলেন। কোন পুত্র সন্তান জীবিত ছিলনা। সকল কাজ–কারবার মেধা ও ব্যুৎপত্তি সম্পন্ন কন্যার হাতে সোপর্দ করে তিনি নির্জনত্বে চলে যান। কিছুদিন পর তিনি ইহলোক ত্যাগ করেন। কতিপয় রাওয়ায়েতে আছে যে, হযরত খাদিজাতুল কুবরার (রাঃ) পিতা খুয়ায়েলদ বিন আসাদ ফুজ্জারের যুদ্ধে মারা যান এবং তাঁর চাচা আমর বিন আসাদ তাঁর অভিভাবকত্ব গ্রহণ করেন। যাহোক এটা সন্দেহাতীত ব্যাপার যে, প্রিয় নবীর(সঃ) সঙ্গে তাঁর বিয়ের সময় খুয়ায়েলদ জীবিত ছিলেননা এবং আমর বিন আসাদই হযরত খাদিজার(রাঃ) অভিভাবক ছিলেন।

হযরত খাদিজাতুল কুবরা (রাঃ) সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে ব্যবসা অব্যাহত রাখলেন। সে সময় তাঁর ব্যবসা একদিকে সিরিয়া এবং অন্যদিকে সমগ্র ইয়েমেনে বিস্তৃত ছিল। এই বিরাট ব্যবসা পরিচালনার জন্য তিনি বিপুল সংখ্যক কর্মচারী নিয়োগ করেছিলেন। এদের মধ্যে আরব, ইহুদী ও খৃষ্টান কর্মচারী এবং গোলাম ছিল। সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা এবং বিশ্বস্ততার কারণে তাঁর ব্যবসা ক্রমেই উন্নতির দিকে এগিয়ে চলছিল। এসময় তিনি একজন অসাধারণ যোগ্য, মেধাসম্পন্ন ও বিশ্বস্ত লোকের সন্ধানে ব্যাপৃত ছিলেন, যাতে তিনি নিজের নেতৃত্বে এই সকল কর্মচারীকে বাণিজ্যিক কাফেলার সঙ্গে বাইরে প্রেরণ করতে পারেন।

যুগটি ছিল সেই যুগ যখন প্রিয় নবীর(সাঃ) পবিত্র চরিত্র ও সুন্দর গুণাবলীর কথা প্রতিটি ঘরে আলোচনার বিষয়ে পরিণত হয়েছিল। সে সময় তিনি ছিলেন যুবক এবং সমগ্র জাতির মধ্যে আমিন উপাধিতে ভূষিত হয়েছিলেন। হযরত খাদিজাতুল কুবরার(রাঃ) কানে এই পবিত্র ব্যক্তির কথা না পৌছাটা অসম্ভব ব্যাপার ছিল। তিনি নিজের ব্যবসা তত্ত্বাবধানের জন্য এই ধরনের গুণ বিশিষ্ট ব্যক্তির সন্ধানেই ছিলেন। তিনি হুজুরকে (সাঃ) বাণিজ্যিক পণ্য সিরিয়া নিয়ে যাওয়ার জন্য বলে পাঠালেন এবং জানালেন যে, যদি এতে সম্মত হন তাহলে তিনি তাঁকে ভালভাবেই স্মরণ রাখবেন।

www.bjilibrary.com

প্রিয় নবী (সাঃ) সে সময় তাঁর চাচা আবু তালিবের অভিভাবকত্বে ছিলেন। তিনি মাঝে মধ্যে হযরত খাদিজার(রাঃ) ব্যবসা সংক্রান্ত বিষয়ে অবহিত হতেন। তিনি (সাঃ) হযরত খাদিজার প্রস্তাব মঞ্জুর করলেন এবং বাণিজ্যিক পণ্য নিয়ে বসরা রওয়ানা হয়ে গেলেন। রওয়ানার প্রাক্কালে হযরত খাদিজা(রাঃ) নিজের বিশেষ গোলাম মাইছারাহকে হুজুরের (সাঃ) সঙ্গে দিলেন এবং তাকিদ দিয়ে বলে দিলেন যে, সফরকালে যেন তাঁর কোন কষ্ট না হয়।

রাসূলুল্লাহর (সাঃ) দিয়ানতদারী বা বিশ্বস্ততা এবং সুন্দর আচরণের বদৌলতে সকল পণ্য দ্বিগুণ লাভে বিক্রি হয়ে গেল। সফরকালে কাফেলা সরদার অর্থাৎ প্রিয় নবী (সাঃ) সাথী বা সতীর্থদের সাথে এমন সুন্দর আচরণ করলেন যে, সকলেই তাঁর প্রশংসাকারী এবং জীবন উৎসর্গকারী হয়ে গেল। কাফেলা যখন মক্কা ফিরে এলো তখন হযরত খাদিজা (রাঃ) মাইছারাহর মুখে সফরের বর্ণনা ও লাভের বিস্তারিত তথ্য শুনতে পেয়ে অত্যন্ত প্রভাবান্বিত হলেন এবং নিজের দাসী নফিসার মাধ্যমে হুজুরের (সাঃ) নিকট বিয়ের পয়গাম প্রেরণ করলেন। হুজুরের (সাঃ) ইঙ্গিত পেয়ে সে হযরত খাদিজার(রাঃ) চাচা আমর বিন আসাদকে ডেকে আনলো। সে সময় তিনিই তাঁর অভিভাবক ছিলেন।

অন্যদিকে সারওয়ারে আলম (সাঃ) নিজের চাচা আবু তালিব এবং বংশের অন্যান্য গণ্যমান্যদেরকে সঙ্গে নিয়ে হযরত খাদিজার (রাঃ) বাড়ী তাশরীফ নিলেন। হযরত আবু তালিব বিয়ের খুতবাহ পড়লেন এবং পাঁচ'শ দিরহাম মোহর নির্ধারিত হলো। সে সময় প্রিয় নবীর (সাঃ) বয়স ছিল ২৫ বছর এবং হযরত খাদিজার (রাঃ) বয়স ছিল ৪০ বছর।

বিয়ের পর হুজুর (সাঃ) প্রায়ই ঘরের বাইরে কাটাতে লাগলেন। একাধারে কয়েকদিন মক্কার পাহাড়ে গিয়ে আল্লাহর ইবাদাতে মশগুল থাকতেন। মোট কথা, এভাবেই ১০টি বছর কেটে গেল। একদিন এমনিভাবেই প্রিয় নবী (সাঃ) হেরা পর্বতের গুহায় এবাদাতে ব্যাপৃত ছিলেন। আল্লাহর নির্দেশে জিবরিল আমিন (আঃ) তাঁর নিকট আবির্ভূত হলেন এবং বললেন, ' কুম ইয়া মুহাম্মাদ।' অর্থাৎ হে মুহাম্মাদ! দাঁড়াও। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) দৃষ্টি ওপরের দিকে ওঠালেন। এ সময় তিনি সামনে নূরানী চেহারার একজনকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখতে পেলেন। তাঁর মাথায় কালেমায়ে তাইয়েবা খচিত ছিল। জিবরিল আমিন (আঃ) হুজুরকে (সাঃ) গলা জড়িয়ে ধরে চাপ দিলেন এবং বললেন, পড়। হুজুর (সাঃ) বললেন, আমিতো লিখা–পড়া জানিনা। জিবরিল (আঃ) পুনরায় একই কথা বললেন এবং হুজুরও (সাঃ) একই জবাব দিলেন। তৃতীয়বার যখন জিবরিল (আঃ) বললেনঃ

www.bjilibrary.com

"পড়ুন (হে রাসূল) আপনার রবের নাম নিয়ে, যিনি পয়দা করেছেন। জমাট পিন্ড থেকে মানুষ পয়দা করেছেন। আপনি পড়ুন, আপনার রব বড়ই দয়ালু। যিনি কলমের সাহায্যে জ্ঞান শিক্ষা দিয়েছেন।"

জিবরিল (আঃ) যা বললেন হুজুরের (সাঃ) পবিত্র মুখ দিয়েও একই কথা বেরিয়েএলো।

এই আশ্চর্যজনক ঘটনায় রাসূলের (সাঃ) ওপর সীমাহীন প্রভাব পড়লো। বাড়ী ফিরে বললেন, زَمِّلُوْنِيْ زَمِّلُوْنِيْ "আমাকে কাপড় দিয়ে ঢেকে দাও, আমাকে কাপড় দিয়ে ঢেকে দাও।" হযরত খাদিজা (রাঃ) নির্দেশ পালন করলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন, " আপনি কোথায় ছিলেন? আমিতো চিন্তিত হয়ে কয়েকজনকে আপনার সন্ধানে পাঠিয়েছি।" প্রিয় নবী (সাঃ) সকল ঘটনা হযরত খাদিজার (রাঃ) নিকট হুবহু বর্ণনা করলেন। হযরত খাদিজা (রাঃ) বললেন, " আপনি সত্যি কথা বলে থাকেন, গরীবদের সাহায্য করেন, অতিথিপরায়ণ, আত্মীয়দের সঙ্গে সম্পর্ক রক্ষা করেন, আমানতদার এবং দুঃখী মানুষের খোঁজ-খবর আপনি নেন। আল্লাহ আপনাকে একাকী ছেড়ে দেবেননা।" অতঃপর রাসূলকে (সাঃ) সঙ্গে নিয়ে নিজের চাচাতো ভাই ওয়ারকাহ বিন নাওফলের নিকট গেলেন। জাহেলী যুগে এই ওয়ারকাহ মূর্তি পূজা পরিত্যাগ করে খৃষ্টান হয়েছিলেন। তিনি ছিলেন তাওরিত, যাবুর ও ইনজিলের একজন বড় আলেম। বিবি খাদিজা (রাঃ) হুজুরের (সাঃ) সাথে সংঘটিত সকল ঘটনা তাঁর সামনে বর্ণনা করলেন। ওয়ারকাহ ঘটনা শুনতেই বলে উঠলেনঃ

"এতো সেই জিবরিল (আঃ) যিনি মুসার (আঃ) ওপর অবতীর্ণ হয়েছিলেন। আফসোস! আমি যদি সেই সময় পর্যন্ত জীবিত থাকতাম, যখন আপনার কওম আপনাকে স্বদেশ থেকে বহিষ্কার করবে।"

হুজুর (সাঃ) জিজ্ঞেস করলেন, "এইসব মানুষ কি আমাকে বহিষ্কার করবে?" ওয়ারকাহ বললেন, "হাঁ, আপনার ওপর যা অবতীর্ণ হয়েছে, তা কারোর ওপর অবতীর্ণ হলে দুনিয়া তাঁর বিরোধী হয়ে যায়। আমি যদি সে সময় পর্যন্ত জীবিত থাকি তাহলে আপনাকে আমি পুরোপুরি সাহায্য করবো।"

www.bjilibrary.com

এই আলোচনার পর খুব শিগগিরই ওয়ারকাহ পরলোকগমন করেছিলেন। তবুও হযরত খাদিজার (রাঃ) পূর্ণ আস্থা জন্মেছিল যে, হুজুর (সাঃ) রিসালতের মর্যাদায় ভূষিত হয়েছেন। বস্তুত তিনি নির্দ্বিধায় হুজুরের (সাঃ) ওপর ঈমান আনলেন। সকল চরিতকারই ঐকমত্য পোষণ করেন যে, মহিলাদের মধ্যে সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণকারিনী হলেন হযরত খাদিজাতুল কুবরা (রাঃ)।

প্রিয় নবীর (সাঃ) সঙ্গে বিয়ের পর হযরত খাদিজাতুল কুবরা (রাঃ) প্রায় ২৫ বছর (অর্থাৎ ওহি নাযিলের প্রায় ৯ বছর পর পর্যন্ত) জীবিত ছিলেন। এই সময় তিনি রাসূলের (সাঃ) সঙ্গে প্রত্যেক ধরনের অন্তর কম্পিত করা মুসিবত হাসিমুখে বরদাশত এবং প্রিয় নবীর (সাঃ) বন্ধুত্ব ও জীবন উৎসর্গের হক আদায় করেন। হযরত খাদিজাতুল কুবরার (রাঃ) ইসলাম গ্রহণের পর রাসূলের (সাঃ) সঙ্গে সংশ্লিষ্টদের মধ্যেও ইসলামের স্পন্দন সৃষ্টি হয়। যুবকদের মধ্যে হযরত আলী কাররামাল্লাহু ওয়াজহাহু, বয়স্কদের মধ্যে হযরত আবুবকর সিদ্দিক (রাঃ) এবং হযরত যায়েদ (রাঃ) বিন হারেছাহ সর্বপ্রথম ঈমান আনেন। তাঁদের পর অন্যান্য সুন্দর স্বভাবের লোকও আস্তে আস্তে ইসলাম গ্রহণ শুরু করেন। ইসলামের ব্যাপকতায় হযরত খাদিজা (রাঃ) খুবই আনন্দিত হতেন এবং তিনি অমুসলিম আত্মীয়-স্বজনের তীক্ষ্ণ বিদ্রূপ ও উপহাসকে উপেক্ষা করে নিজেকে হকের তাবলীগে রাসূলের (সাঃ) দক্ষিণ হস্ত হিসেবে প্রমাণ করতে লাগলেন। তিনি সমস্ত ধন-সম্পদ ইসলামের জন্য ও এতিম-বিধবাদের উন্নতি, অসহায়দের সাহায্য ও অভাবগ্রস্তদের অভাব দূরীকরণে ওয়াকফ করে দিয়েছিলেন। এদিকে কোরেশ কাফেররা নও-মুসলিমদের ওপর বিভিন্ন ধরনের নির্যাতন চালাচ্ছিল এবং হকের তাবলীগের পথে সব ধরনের বাধা আরোপ করছিল। তারা প্রিয় নবী (সাঃ) এবং তাঁর অনুসারীদের ওপর নির্যাতন চালানোর প্রশ্নে সামান্যতম কুণ্ঠাও প্রকাশ করেনি।

কাফেরদের অর্থহীন এবং বাজে কথায় যখন রাসূলের হৃদয়তন্ত্রী দুঃখ ভারাক্রান্ত হয়ে উঠতো তখন খাদিজাতুল কুবরা (রাঃ) আরজ করতেনঃ " ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি দুঃখিত হবেন না। এমন কোন রাসূল কি আজ পর্যন্ত আগমন করেছেন, যাঁকে নিয়ে মানুষ উপহাস করেনি!" হযরত খদিজার (রাঃ) এই কথায় হুজুরের (সাঃ) দুঃখ-কষ্ট দূর হয়ে যেত। মোট কথা, সেই দুর্যোগপূর্ণ দিনে হযরত খাজিদাতুল কুবরা (রাঃ) শুধুমাত্র রাসূলের (সাঃ) হামখেয়াল এবং দুঃখের ভাগীদারই ছিলেন না। বরং প্রতিটি আপদ-বিপদে তাঁকে সাহায্যের জন্য প্রস্তুত থাকতেন।

www.bjilibrary.com

প্রিয় নবী (সাঃ) বলতেনঃ "আমি যখন কাফেরদের নিকট থেকে কোন কথা শুনতাম এবং আমার নিকট অসহনীয় মনে হতো তখন আমি তা খাদিজাকে (রাঃ) বলতাম। সে আমাকে এমনভাবে সাহস যোগাতো যে আমার অন্তর শান্ত হয়ে যেত। আর এমন কোন দুঃখ ছিল না যা খাদিজার (রাঃ) কথায় আসান এবং হাল্কা হতো না।"

আফিফ কিন্দী বর্ণনা করেছেন, জাহেলী যুগে একবার আমি কিছু দ্রব্য ক্রয়ের জন্য মক্কা এসেছিলাম এবং আব্বাস (রাঃ) বিন আব্দুল মুত্তালিবের নিকট অবস্থান করেছিলাম। পরের দিন সকালে আব্বাসের (রাঃ) সাথে বাজারের দিকে গেলাম। যখন কাবার নিকট দিয়ে অতিক্রম করছিলাম তখন এক যুবক সেখানে এলো। সে নিজের মাথা আসমানের দিকে উঁচু করে দেখলো এবং কিবলার দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে গেল। কিছুক্ষণ পর সেখানে একটি কিশোর এলো এবং প্রথম যুবকের পাশে দাঁড়িয়ে গেল। এর সামান্য পর একজন মহিলা এলো এবং সেও সেই দু'জনের পিছনে দাঁড়িয়ে গেল। এই তিনজন নামায পড়লো এবং চলে গেল। আমি আব্বাস (রাঃ) জিজ্ঞাসা করলাম, "আব্বাস! মক্কায় বিপ্লব আসছে বলে অনুমিত হচ্ছে।" আব্বাস (রাঃ) বললেন, "হ্যা, এই তিনজন কে তা কি তুমি জানো?" আমি বললাম, "না।" আব্বাস (রাঃ) বললেন, "এই যুবক এবং কিশোর উভয়েই আমার ভ্রাতুষ্পুত্র। যুবকটি হলো আব্দুল্লাহ বিন আব্দুল মুত্তালিবের পুত্র মুহাম্মাদ (সাঃ) এবং কিশোরটি হলো আবু তালিব বিন আব্দুল মুত্তালিবের পুত্র আলী (রাঃ)। যে মহিলা উভয়ের পিছনে নামায পড়লো সে আমার ভ্রাতুষ্পুত্র মুহাম্মাদের (সাঃ) স্ত্রী এবং খুয়ায়েলদের কন্যা খাদিজা (রাঃ)। আমার ভ্রাতুষ্পুত্রের দাবী হলো, তার দ্বীন ইসহামী দ্বীন এবং সে খোদার হুকুমে প্রত্যেক কাজ করে থাকে। কিন্তু এখন পর্যন্ত এই তনিজন ছাড়া অন্য কেউ এই দ্বীনের অনুসারী আছে বলে আমার জানা নেই।" আব্বাসের (রাঃ) এই কথা শুনে আমার অন্তরে সাধ জাগলো যে, হায়! আমি যদি চতুর্থ ব্যক্তি হতাম!

এই ঘটনায় অনুমান করা যায় যে, কি প্রতিকূল অবস্থায় হযরত খাদিজা (রাঃ) প্রিয় নবীকে (সাঃ) সহযোগিতা করেছিলেন। হযরত খাদিজার (রাঃ) এই হামদরদি, আন্তরিকতা ও জীবন উৎসর্গের কারণেই প্রিয় নবী (সাঃ) তাঁকে সীমাহীন ভালোবাসতেন। যতদিন তিনি জীবিত ছিলেন ততদিন হুজুর (সাঃ) দ্বিতীয় বিয়ে করেননি। হযরত খাদিজা (রাঃ) অত্যন্ত সুন্দরভাবে সন্তানদের লালন-পালন, সুষ্ঠুভাবে সাংসারিক কাজ এবং সম্পদ ও বিত্তশালী হওয়া সত্ত্বেও প্রিয় নবীর (সাঃ) খিদমত স্বহস্তে করতেন। সহিহ বুখারীতে বর্ণিত আছে যে, একবার হযরত জিবরাইল (আঃ) হুজুরের (সাঃ) নিকট তাশরীফ আনলেন এবং বললেন, "খাদিজা

বরতনে বা পাত্রে কিছু আনছেন। আপনি তাঁকে আল্লাহ এবং আমার সালাম পৌঁছে দেবেন।"

রাসূলুল্লাহর (সাঃ) প্রতি হযরত খাদিজার (রাঃ) এত গভীর ভালোবাসা ও আস্থা ছিল যে, নবুয়ত প্রাপ্তির পূর্বে এবং পরে হুজুর (সাঃ) যা কিছু বলেছেন সব সময় তাই তিনি জোরের সাথে সমর্থন ও সত্য হিসেবে মেনে নিয়েছেন। এজন্য হুজুর (সাঃ) তাঁকে সীমাহীন প্রশংসা করতেন।

নবুয়ত প্রাপ্তির সাত বছর পর কোরেশ মুশরিকরা বনু হাশিম ও বনু মুত্তালিবকে শে'বে আবি তালিবে অবরোধ করে। এই বিপদের সময় হযরত খাদিজাও (রাঃ) রাসূলুল্লাহর (সাঃ) সঙ্গে ছিলেন। অবরোধের পুরো তিনটি বছর অবর্ণনীয় দুঃখ-কষ্ট তিনি সাহসিকতার সাথে বরদাশত করেন।

নবুয়ত প্রাপ্তির দশম বছরে এই নির্যাতনমূলক অবরোধ শেষ হয়। কিন্তু তারপর হযরত খাদিজা (রাঃ) বেশী দিন জীবিত ছিলেন না। পবিত্র রমযানে অথবা তার কিছুদিন পূর্বে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। প্রিয় নবী (সাঃ) তাঁর চিকিৎসা ও সেবা-শুশ্রুষাতে কোনো কমতি করেননি। হায়! মৃত্যুর তো কোন চিকিৎসা নেই। নবুয়তের ১০ম বছরের ১১ই রমযান তিনি আল্লাহর ডাকে সাড়া দিয়ে পরপারে যাত্রা করলেন। মক্কার হাজুন নামক কবরস্তানে তাঁর লাশ দাফন করা হলো। সে সময় তাঁর বয়স প্রায় ৬৫ বছর ছিল।

তাঁর ওফাতে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) সীমাহীন দুঃখ পেলেন। হযরত সাওদা'র (রাঃ) সঙ্গে বিয়ে না হওয়া পর্যন্ত তিনি প্রায় সময়েই বিষণ্ন থাকতেন।

হযরত খাদিজাতুল কুবরার (রাঃ) ইন্তেকালের পরও তাঁর প্রতি প্রিয় নবীর (সাঃ) গভীর ভালোবাসা বিদ্যমান ছিল। যখন কোন কুরবানী করতেন তখন প্রথম হযরত খাদিজার (রাঃ) বান্ধবীদেরকে গোশ্‌ত প্রেরণ করতেন এবং পরে অন্যদেরকে দিতেন। হযরত খাদিজার (রাঃ) কোন আত্মীয় তাঁর নিকট এলে তিনি তাদের খুব যত্ন করতেন।

হযরত খাদিজাতুল কুবরার (রাঃ) তিরোধানের পর একটি সময় পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ততক্ষণ ঘর থেকে বাইরে বেরুতেন না যতক্ষণ হযরত খাদিজার (রাঃ) প্রশংসা না করতেন। এমনিভাবে যখন ঘরে প্রবেশ করতেন তখন তাঁর উল্লেখ করে অনেক প্রশংসা করতেন। হযরত আয়েশা সিদ্দিকাহ (রাঃ) বলেন, একবার হুজুর (সাঃ) যথারীতি খাদিজাতুল কুবরার তারিফ শুরু করলেন। আমার ঈর্ষা হলো। আমি বললাম," ইয়া রাসূলাল্লাহ! তিনি একজন বৃদ্ধা বিধবা মহিলা ছিলেন। খোদা তাঁর পর

www.bjilibrary.com

আপনাকে তাঁর থেকে উত্তম স্ত্রী দিয়েছেন।" এ কথা শুনে হুজুরের (সাঃ) চেহারা মুবারক ক্রোধে লাল হয়ে গেল এবং বললেনঃ

"খোদার কসম। খাদিজা (রাঃ) থেকে ভালো স্ত্রী আমি পাইনি। যখন সবাই কাফের ছিল তখন সে ঈমান এনেছিল। সবাই যখন আমাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিল তখন সে আমাকে সত্য হিসেবে মেনে নিয়েছিল। সে নিজের সকল ধন-সম্পদ আমার জন্য কুরবানী করে দিয়েছিল। যখন অন্যরা আমাকে বঞ্চিত রেখেছিল তখন আল্লাহ তার পেটে আমার সন্তান দিয়েছিলেন।"

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, আমি ভয় পেয়ে গেলাম এবং সেই দিনই প্রতিজ্ঞা করলাম যে, ভবিষ্যতে হুজুরের (সাঃ) সামনে কখনো খাদিজাতুল কুবরাকে (রাঃ) এমন তেমন বলবো না।

হযরত খাদিজাতুল কুবরার (রাঃ) পেটে আল্লাহ পাক হুজুরকে (সাঃ) ৬টি পুত্র ও কন্যা সন্তান দিয়েছিলেন। সর্বপ্রথম কাসেম ভূমিষ্ঠ হন। তিনি শৈশবকালেই ইন্তেকাল করেন। অতঃপর যয়নব (রাঃ), তারপর আব্দুল্লাহ। তিনিও ছোট বয়সেই মারা যান (তাঁর উপাধি ছিল তাইয়েব এবং তাহের)। অতঃপর রোকাইয়া (রাঃ)। এরপর উম্মে কুলসুম (রাঃ) এবং তারপর ফাতিমাতুজ যোহরা (রাঃ) জন্মগ্রহণ করেন।

হযরত খাদিজাতুল কুবরার (রাঃ) প্রশংসায় বহু সংখ্যক হাদীস বর্ণিত আছে।

www.bjilibrary.com

উম্মুল মুমিনিন হযরত ছাওদা (রাঃ) বিনতে যামা'আ

নাম ছাওদা (রাঃ)। কোরেশের আমের বিন লুয়ী গোত্রের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত ছিলেন। নসবনামা হলোঃ ছাওদা (রাঃ) বিনতে যামা'আ বিন কায়েস বিন আবদি শামস বিন আবদি উদ্দ বিন নাসার বিন মালিক বিন হাছাল বিন আমের বিন লুয়ী।

মাতার নাম ছিল সামুস বিনতে কায়েস। আনসারের বনু নাজ্জার বংশের সাথে সম্পর্কযুক্ত ছিলেন। হযরত ছাওদার (রাঃ) প্রথম বিয়ে হয়েছিল চাচাতো ভাই হযরত সাকরান (রাঃ) বিন আমরের সঙ্গে।

আল্লাহ পাক হযরত ছাওদাকে (রাঃ) অত্যন্ত পূত-পবিত্র স্বভাব দান করেছিলেন। রাসূলে করিম (সাঃ) যখন হকের দাওয়াত প্রদান শুরু করলেন তখন তিনি কালবিলম্ব না করে তাতে সাড়া দিলেন। তাঁর নেক প্রকৃতির স্বামীও তাঁর সঙ্গে ইসলাম গ্রহণ করেন। হাবশার দ্বিতীয় হিজরতে হযরত ছাওদা (রাঃ) এবং হযরত সাকরানও (রাঃ) অন্যান্য মুসলমানের সহগামী হয়ে হাবশায় হিজরত করেন। কয়েক বছর সেখানে অবস্থানের পর মক্কা ফিরে আসেন। কিছুদিন পর হযরত সাকরান (রাঃ) ওফাত পান এবং হযরত ছাওদা (রাঃ) বিধবা হয়ে যান।

এ সময় হযরত খাদিজা (রাঃ) ইন্তেকাল করেছিলেন। মাতাহীন শিশুদেরকে দেখে দেখে প্রিয় নবী (সাঃ) মন মরা প্রকৃতির হয়ে গিয়েছিলেন। রাসূলের (সাঃ) একজন জীবন উৎসর্গকারী মহিলা সাহাবী হযরত খাওলাহ (রাঃ) বিনতে হাকিম একদিন নবীর (সাঃ) খিদমতে আরজ করলেনঃ

"হে আল্লাহর রাসূল। খাদিজার (রাঃ) ইন্তেকালের পর সব সময়ই আপনাকে বিষণ্ন দেখতে পাচ্ছি।" হুজুর (সাঃ) বললেন, "হাঁ, সাংসারিক কাজ এবং শিশুদের লালন-পালন খাদিজার (রাঃ) ওপরই ন্যস্ত ছিল।" খাওলা (রাঃ) আরজ করলেন, তাহলে তো আপনার একজন সাথী ও দুঃখের অংশীদার প্রয়োজন। ইজাজত বা অনুমতি পেলে আপনার দ্বিতীয় বিয়ের জন্য চেষ্টা করতে পারি।"

www.bjilibrary.com

হুজুর (সাঃ) এই আরজ মঞ্জুর করলেন। হযরত খাওলা (রাঃ) তৎক্ষনাৎ হযরত ছাওদার (রাঃ) নিকট গমন করলেন এবং তাঁর নিকট রাসূলের (সাঃ) ইচ্ছার কথা বর্ণনা করলেন। হযরত ছাওদা (রাঃ) সন্তুষ্ট চিত্তে নবীর (সাঃ) হেরেমবাসিনী হওয়ার ব্যাপারে সম্মতি দান করলেন। তাঁর পিতা যামা'আও হুজুরের (সাঃ) পয়গাম কবুল করলেন এবং নিজের কলিজার টুকরার বিয়ে সারওয়ারে কায়েনাতের (সাঃ) সঙ্গে চারশ' দিরহাম মোহরানার বিনিময়ে নিজেই পড়ালেন। বিয়ের পর তাঁর পুত্র আব্দুল্লাহ বাড়ী এলেন। তিনি তখন পর্যন্ত ইসলাম গ্রহণ করেননি। এই বিয়ের কথা শুনে তিনি খুব বিরক্ত হলেন এবং মাথায় মাটি মাখলেন। ইসলাম গ্রহণের পর সারা জীবন তিনি এই নাদানীর জন্য দুঃখ প্রকাশ করেছিলেন। নবুয়ত প্রাপ্তির দশম বছরে এই শুভ বিবাহ সুসম্পন্ন হয়েছিল।

যারকানী (রঃ) বর্ণনা করেছেন, প্রথম স্বামী হযরত সাকরানের (রাঃ) জীবদ্দশায় একবার হযরত ছাওদা (রাঃ) স্বপ্নে দেখলেন যে, তিনি বালিশে ঠেস দিয়ে শুয়ে আছেন। এমন সময় আসমান ফেটে গেল এবং চাঁদ তাঁর ওপর এসে পড়লো। তিনি এই স্বপ্নের কথা হযরত সাকরানের নিকট বর্ণনা করলেন। হযরত সাকরান বললেন, "এই স্বপ্নের তাবির তো এই মনে হয় যে, শিগগিরই আমি মারা যাবো এবং আরবের চাঁদ মুহাম্মাদ (সাঃ) তোমাকে বিয়ে করবেন।" বাস্তবিকই এই স্বপ্নের তাবির কিছুদিন পরই পূর্ণ হলো।

কতিপয় রাওয়ায়েত অনুযায়ী হযরত খাদিজার (রাঃ) ওফাতের পর হুজুর (সাঃ) হযরত ছাওদাকে (রাঃ) বিয়ে করেন। কিন্তু অন্যদের মতে হযরত আয়েশার (রাঃ) সঙ্গে হুজুরের দ্বিতীয় বিবাহ অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

নবুয়ত প্রাপ্তির ১৩ বছর পর বিশ্বনবী মুহাম্মাদ মুস্তাফা (সাঃ) হিজরত করে মদীনা তাশরীফ নেন। সেখান থেকে তিনি হযরত আবু রাফে (রাঃ) এবং যায়েদ (রাঃ) বিন হারেছাকে হযরত ফাতিমাতুজ জোহরা, উম্মে কুলছুম ও হযরত ছাওদা (রাঃ) প্রমুখকে সঙ্গে করে নিয়ে আসার জন্য মক্কা প্রেরণ করেছিলেন। সুতরাং তাঁরা সকলেই হযরত যায়েদ (রাঃ) বিন হারেছা এবং আবু রাফে'র (রাঃ) সঙ্গে মদীনা চলে আসেন।

পর্দার আয়াত নাজিলের পূর্বে হযরত ছাওদা (রাঃ) প্রাকৃতিক কাজ প্রভৃতি সম্পাদনের জন্য বাইরে যেতেন। হযরত ওমর ফারুকের (রাঃ) মত ছিল যে, নবীর (সাঃ) স্ত্রীদের বাইরে বেরুনো উচিত নয়।

www.bjilibrary.com

প্রসঙ্গটি তিনি একবার নবী করিমের (সাঃ) নিকট উত্থাপনও করেছিলেন। কিন্তু প্রিয় নবী (সাঃ) তখন চুপ ছিলেন। একদিন হযরত ছাওদা (রাঃ) প্রকৃতির ডাকে সাড়া দানের জন্য জঙ্গলের দিকে যাচ্ছিলেন। রাস্তায় হযরত ওমরের (রাঃ) সঙ্গে দেখা। হযরত ছাওদা (রাঃ) দীর্ঘাকৃতির ছিলেন। হযরত ওমর (রাঃ) তাঁকে চিনে ফেললেন এবং বললেন, "ছাওদা! আমি তোমাকে চিনে ফেলেছি।" হযরত ওমরের (রাঃ) এই বাক্য হযরত ছাওদার (রাঃ) নিকট অত্যন্ত অসহনীয় মনে হল এবং তিনি রাসূলের (সাঃ) কাছে হযরত ওমরের (রাঃ) বিরুদ্ধে অভিযোগ করলেন। সহিহ বুখারীতে আছে যে, এই ঘটনার পর পর্দার আয়াত নাযিল হলো এবং সকল মহিলা পর্দার পাবন্দ হয়ে গেলেন।

হযরত ছাওদা (রাঃ) কিছুটা কড়া মেজাজের ছিলেন। অবশ্য তিনি হাসি-কৌতুকেরও অধিকারিনী ছিলেন। ইবনে সা'দ (রঃ) বর্ণনা করেছেন, কখনো কখনো তিনি জেনে বুঝে বেঢঙ্গা চলতেন। হুজুর (সাঃ) তা দেখে হাসতেন। এক রাতে রাসূলের (সাঃ) সঙ্গে নামায পড়লেন। হুজুর (সাঃ) দীর্ঘক্ষণ রুকুতে রইলেন। সকাল হলে তিনি বলতে লাগলেন, " ইয়া রাসূলাল্লাহ! রাতে নামাযের সময় আপনি এত দীর্ঘক্ষণ রুকুতে ছিলেন যে, আমার নাকশিরা ফেটে যাওয়ার আশংকা দেখা দিয়েছিল। সুতরাং আমি অনেকক্ষণ যাবত নাক চেপে রেখেছিলাম।" হুজুর (সাঃ) তাঁর কথা শুনে মুচকি হেসে দিয়েছিলেন।

হযরত ছাওদা (রাঃ) অত্যন্ত রহম দিল এবং দানশীলা ছিলেন। যা কিছু তাঁর নিকট আসতো তা তিনি অত্যন্ত উদার হস্তে অভাবগ্রস্তদের মধ্যে বন্টন করে দিতেন। হাফিজ ইবনে হাজার (রঃ) "ইছাবাহ" গ্রন্থে লিখেছেন, হযরত ছাওদা (রাঃ) হাতের কাজে পারদর্শিনী ছিলেন এবং তায়েফের চামড়া প্রস্তুত করতেন। এই কাজে যা আয় হতো তা সব খোদার রাস্তায় খরচ করে ফেলতেন।

হযরত ওমর ফারুক (রাঃ) তাঁর খিদমতে দিরহামের একটি থলে প্রেরণ করেছিলেন। থলেটি ছিল উপঢৌকন স্বরূপ। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, এতে কি আছে? লোকজন বললো, "দিরহাম।" তিনি বললেন, "থলেটি দেখতে তো খেজুরের থলের মতো।" এ কথা বলে তিনি খেজুর বন্টনের মত সকল দিরহাম অভাবগ্রস্তদের মধ্যে বন্টন করে দিলেন।

হযরত ছাওদার (রাঃ) বয়স বেশী হয়ে গিয়েছিল। এদিকে হযরত আয়েশার (রাঃ) বয়স ছিল কম। এজন্য তিনি তাঁর পালা হযরত আয়েশাকে (রাঃ) দিয়ে দিয়েছিলেন। হযরত আয়েশা সিদ্দিকাহ (রাঃ) হৃষ্টচিত্তে তা গ্রহণ করেছিলেন। হযরত

www.bjilibrary.com

আয়েশা সিদ্দিকাহ (রাঃ) বলেনঃ "হযরত ছাওদা (রাঃ) ছাড়া অপর কোন নারীকে আমি হিংসা ও পরশ্রীকাতরতা মুক্ত দেখিনি।"

হযরত ছাওদা (রাঃ) অত্যন্ত পবিত্র চরিত্রের মানুষ ছিলেন। একবার হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেছিলেন।, "ছাওদা ছাড়া অপর কোন নারী সম্পর্কে আমার মনে আকাংখাও জাগেনি যে, তার দেহে যদি আমার আত্মা হতো।"

হযরত ছাওদা (রাঃ) দশম হিজরীতে রাসূলে করিমের (সাঃ) সঙ্গে হজ্ব করেন। তিনি ছিলেন দীর্ঘদেহী মানুষ। এজন্য দ্রুত চলতে বাধ্য হতেন। মুযদালিফা থেকে রওয়ানার পূর্বেই হুজুর (সাঃ) তাঁকে যাওয়ার অনুমতি দিয়েছিলেন। যাতে ভিড়ে তাঁর কষ্ট না হয়।

বিদায় হজ্বের সময় রাসূলে করিম (সাঃ) সকল স্ত্রীকে সম্বোধন করে বলেছিলেনঃ " এই হজ্বের পর নিজেদের ঘরে বসে থাকতে হবে।"

বস্তুত হযরত ছাওদা (রাঃ) এবং হযরত যয়নব (রাঃ) বিনতে জাহাশ কঠোরভাবে এই নির্দেশ পালন করেছিলেন। অন্য স্ত্রীগণ হজ্ব আদায় প্রশ্নে এই নির্দেশ ছিল না বলে মনে করতেন। কিন্তু হযরত ছাওদা (রাঃ) এবং হযরত যয়নব (রাঃ) রাসূলের (সাঃ) ওফাতের পর সারা জীবন ঘর থেকে বের হননি।

হযরত ছাওদা (রাঃ) বলতেনঃ " আমি হজ্ব এবং ওমরাহ দু'ই আদায় করেছি। এখন নির্দেশ অনুযায়ী ঘর থেকে বাইরে বেরুবো না।"

হযরত ছাওদা (রাঃ) হযরত ওমর ফারুকের (রাঃ) শাসনামলে ২২ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন।

হযরত সাকরানের (রাঃ) ঔরসে তাঁর একটি পুত্র ছিল। তাঁর নাম ছিল আব্দুর রহমান (রাঃ)। তিনি হযরত ওমর ফারুকের (রাঃ) খিলাফতকালে জালুলার যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন এবং বীরত্বের সঙ্গে লড়াই করে শহীদের মর্যাদায় ভূষিত হন।

রাসূলের (সাঃ) ঔরসে হযরত ছাওদার গর্ভে কোন সন্তান হয়নি। হযরত ছাওদা (রাঃ) থেকে পাঁচটি হাদীস বর্ণিত আছে।

www.bjilibrary.com

উম্মুল মুমিনিন হযরত আয়েশা সিদ্দিকাহ (রাঃ)

নাম আয়েশা। লকব সিদ্দিকাহ এবং হোমায়রা। উম্মে আব্দুল্লাহ কুনিয়ত। কোরেশের বনু তাইম খান্দানের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত ছিলেন। নসবনামা হলোঃ আয়েশা (রাঃ) বিনতে আবুবকর সিদ্দিক (রাঃ) বিন আবি কাহাফা (রাঃ) বিন আমের বিন আমর বিন কা'ব বিন সা'দ বিন তাইম বিন মাররাহ বিন কা'ব বিন লুয়ী।

মাতার নাম ছিল উম্মে রুমান (রাঃ) বিনতে আমের এবং তিনিও ছিলেন জালিলুল কদর সাহাবীয়াহ। নবীর (সাঃ) নবুয়ত প্রাপ্তির চার বছর পর শওয়াল মাসে হযরত আয়েশা (রাঃ) জন্মগ্রহণ করেন।

হযরত আয়েশার (রাঃ) শৈশবকাল কেটেছিল সিদ্দিকে আকবরের (রাঃ) মত জালিলুল কদর সাহাবার ছায়াতলে। শৈশবকাল থেকেই তিনি ছিলেন সীমাহীন মেধাসম্পন্ন এবং শৈশবকালের সকল কথাই তাঁর স্মরণ ছিল। বলা হয়ে থাকে যে, অন্য কোন সাহাবী অথবা সাহাবীয়ার এত স্মরণ শক্তি ছিল না।

শৈশবকালে একবার হযরত আয়েশা (রাঃ) খেলনা নিয়ে খেলা করছিলেন। এ সময় প্রিয় নবী (সাঃ) নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন। শিশু আয়েশার (রাঃ) খেলনার মধ্যে পাখা বিশিষ্ট একটি ঘোড়াও ছিল। হুজুর (সাঃ) জিজ্ঞাসা করলেন, "আয়েশা। এটা কি?" তিনি জবাব দিলেন, " ঘোড়া।" হুজুর (সাঃ) বললেন, " ঘোড়ার তো পাখা হয় না।" তিনি নির্দ্বিধায় জবাব দিলেন, " ইয়া রাসূলাল্লাহ! কেন হবে না। হযরত সোলায়মানের (আঃ) ঘোড়ার তো পাখা ছিল।" হুজুর (সাঃ) এই জবাব শুনে মুচকি হেসেদিলেন।

ইমাম বুখারী (রঃ) বর্ণনা করেছেন, যখন

بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدْهَىٰ وَأَمَرُّ (سورة قمر)

মক্কায় অবতীর্ণ হলো তখন হযরত আয়েশা (রাঃ) খেলাধূলায় মশগুল ছিলেন।

www.bjilibrary.com

হুজুরের (সাঃ) পূর্বে হযরত আয়েশার (রাঃ) সম্পর্ক জাবির বিন মাতয়ামের পুত্রের সঙ্গে স্থির হয়েছিল। কিন্তু জাবির মায়ের ইঙ্গিতে এই সম্পর্ক বাতিল করে দেয়। কেননা হযরত আবুবকর সিদ্দিক (রাঃ) এবং তাঁর পরিজন ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। এরপর হযরত খাওলা (রাঃ) বিনতে হাকিমের উদ্যোগে হুজুর (সাঃ) হযরত আবুবকর সিদ্দিককে (রাঃ) হযরত আয়েশার (রাঃ) জন্য পয়গাম প্রেরণ করলেন। হযরত আবুবকর সিদ্দিক (রাঃ) রাসূলে করিমের (সাঃ) মুখে ডাকা ভাই ছিলেন। তিনি তাজ্জব হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, " ভাইয়ের কন্যার সঙ্গে কি বিয়ে হয়?" খাওলা (রাঃ) এ কথা হুজুরকে (সাঃ) জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, " আবুবকর (রাঃ) আমার দ্বীনি ভাই। এ ধরনের ভাইদের সন্তানদের সঙ্গে বিয়ে জায়েজ আছে।" হযরত সিদ্দিকে আকবরের (রাঃ) এরচেয়ে বড় খুশী আর কি ছিল যে, তাঁর কন্যার বিয়ে হবে রাসূলের (সাঃ) সঙ্গে। তিনি তৎক্ষণাৎ রাজি হয়ে গেলেন। বস্তুত হিজরতের তিন বছর আগে শওয়াল মাসে ৬বছর বয়সে রাসূলের (সাঃ) সঙ্গে হযরত আয়েশার (রাঃ) বিবাহ সুসম্পন্ন হয়। হযরত আবুবকর সিদ্দিক (রাঃ) স্বয়ং বিয়ে পড়ালেন। পাঁচশ' দিরহাম মোহর নির্ধারিত হলো।

একবার শাওয়াল মাসে আরবে প্লেগ রোগ মহামারী আকারে দেখা দিয়েছিল। এই রোগে হাজার হাজার পরিবার বিরান হয়ে গিয়েছিল। সে সময় থেকে আরববাসীর নিকট শাওয়াল মাস অপয়া মাস হিসেবে বিবেচিত হতো এবং তারা এ মাসে আনন্দ-উৎসব করতে অনীহা প্রকাশ করতো। হযরত আয়েশার (রাঃ) বিয়েও শওয়াল মাসে সম্পন্ন হয়েছিল এবং কয়েক বছর পর কন্যা বিদায়ও শওয়াল মাসেই হয়েছিল। সেই সময় থেকে শওয়াল মাস অপয়া হওয়ার চিন্তা মানুষের অন্তর থেকে দূর হয়।

হুজুর (সাঃ) হযরত আয়েশার (রাঃ) সঙ্গে বিয়ের সুসংবাদ স্বপ্নে লাভ করেছিলেন। তিনি স্বপ্নে দেখেন যে, এক ব্যক্তি রেশমে লেপ্টানো কোন বস্তু তাঁকে প্রদর্শন করছে এবং বলছে, "এই বস্তু আপনার।" তিনি তা খুলে হযরত আয়েশাকে (রাঃ)পেয়েছিলেন।

খুব সাদাসিধাভাবে হযরত আয়েশার (রাঃ) বিয়ে হয়েছিল। তিনি বলেনঃ "রাসূলুল্লাহ (সাঃ) যখন আমাকে বিয়ে করেন তখন আমি সঙ্গীদের সঙ্গে খেলা করতাম। আমি এ বিয়ে সম্পর্কে কিছুই জানতাম না। ইত্যবসরে আমার পিতা আমাকে বাইরে বেরুনো নিষেধ করে দিলেন।

www.bjilibrary.com

হযরত আয়েশা (রাঃ) জন্মগতভাবে মুসলমান ছিলেন। তিনি রাওয়ায়েত করেছেন, " যখন আমি পিতা–মাতাকে চিনতে শুরু করি তখন তাঁদেরকে মুসলমান হিসেবে পেয়েছি।" এ থেকে স্পষ্ট হয় যে, রোজে আযল থেকেই হযরত আয়েশার (রাঃ) ওপর কুফর ও শিরকের ছায়াও পড়েনি।

হযরত আয়েশার (রাঃ) সঙ্গে বিয়ের তিন বছর পর রহমতে আলম (সাঃ) হযরত আবুবকরকে (রাঃ) সাথে নিয়ে হিজরত করে মদীনা তাশরীফ নেন। মদীনা পৌছে প্রিয় নবী (সাঃ) এবং হযরত আবুবকর সিদ্দিক (রাঃ) পরিবার–পরিজন আনার জন্য হযরত যায়েদ (রাঃ) বিন হারেছা, আবু রাফে (রাঃ) এবং আবদুল্লাহ বিন আরিকতকে মক্কা প্রেরণ করেন। যখন তাঁরা ফিরে এলেন তখন হযরত যায়েদ (রাঃ) বিন হারেছার সঙ্গে ছিলেন হযরত ফাতিমাতুজ জোহরা (রাঃ),হযরত উম্মে কুলছুম (রাঃ),হযরত ছাওদা (রাঃ) বিনতে যামআ, উম্মে আইমান (রাঃ) এবং উসামা(রাঃ)বিন যায়েদ (রাঃ)। অন্যদিকে আবদুল্লাহ বিন আরিকতের সঙ্গে ছিলেন আব্দুল্লাহ বিন আবি বকর (রাঃ), উম্মে রুমান (রাঃ), আয়েশা সিদ্দিকাহ (রাঃ) এবং আসমা বিনতে আবুবকর (রাঃ)।

মদীনা পৌছে হযরত আয়েশা (রাঃ) বনু হারেছের মহল্লায় অবস্থিত শ্রদ্ধেয় পিতার গৃহে অবতরণ করলেন। প্রথম দিকে মদীনার আবহাওয়া মুহাজিরদের সহ্য হলো না। হযরত আবুবকর সিদ্দিক (রা)ঃ কঠিন রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়লেন। হযরত আয়েশা (রাঃ) অত্যন্ত দ্রুততার সাথে তাঁর সেবা–শুশ্রুষা করলেন। যখন হযরত আবুবকর সিদ্দিক (রাঃ) সুস্থ হয়ে উঠলেন তখন তিনি স্বয়ং অসুস্থ হয়ে পড়লেন। অসুখও এত কঠিন ছিল যে, মাথার চুল পড়ে গেল। এ সত্ত্বেও জীবনে বেঁচে গেলেন। যখন স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধার হলো তখন সিদ্দিকে আকবর (রাঃ) হুজুরের (সাঃ) নিকট আরজ করলেন, "ইয়া রাসূলুল্লাহ। আয়েশাকে (রাঃ) আপনি উঠিয়ে নেন না কেন? রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন, " বর্তমানে আমার নিকট মোহর নেই।" সিদ্দিকে আকবর (রাঃ) নিজের নিকট থেকে পাঁচশ দিরহাম হুজুরের (সাঃ) খিদমতে করজে হাসানা হিসেবে পেশ করলেন। এই অর্থ তিনি গ্রহণ করলেন এবং হযরত আয়েশার (রাঃ) নিকট তা প্রেরণ করে প্রথম হিজরীর শওয়াল মাসে তাঁকে তুলে নিলেন। সে সময় হযরত আয়েশা সিদ্দিকাহর (রাঃ) বয়স ছিল ৯ বছর। অন্য রাওয়ায়েতে ১২ বছর বলা হয়েছে।

তৃতীয় হিজরীতে ওহোদের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। একটি ভুলের কারণে যখন যুদ্ধের দৃশ্য পরিবর্তিত হয়ে গেল এবং হুজুরের (সাঃ) শাহাদাতের খবর ছড়িয়ে

www.bjilibrary.com

পড়লো তখন মদীনা থেকে হযরত আয়েশা সিদ্দিকাহ (রাঃ), হযরত ছুফিয়া (রাঃ), সাইয়েদাতুন নিসা ফাতিমাতুজ জোহরা (রাঃ) এবং অন্য মুসলমান মহিলারা পাগলিনীর মত যুদ্ধের ময়দানের দিকে এগিয়ে গেলেন। সেখানে পৌঁছে হুজুরকে (সাঃ) সহি সালামত দেখে শুকরিয়ার সিজদা আদায় করলেন। তাঁরা সকলে মিলে রাসূলের (সাঃ) ক্ষতস্থান পরিষ্কার করলেন এবং মশক ধরে ক্ষতস্থানে পানি ঢাললেন। এদিক ওদিক বিশৃংখল অবস্থায় অবস্থানরত সাহাবীরা যখন হুজুরের (সাঃ) চারপাশে একত্রিত হওয়া শুরু করলেন তখন তাঁরা মদীনা ফিরে গেলেন।

ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (রঃ) লিখেছেন, হযরত আয়েশা (রাঃ) খন্দকের বা পরিখার যুদ্ধেও দুর্গের বাইরে বেরিয়ে যুদ্ধের চিত্র দেখতেন। রাসূলের (সাঃ) নিকট অন্যান্য যুদ্ধেও অংশগ্রহণের অনুমতি চেয়েছিলেন। কিন্তু অনুমতি পাননি। সহিহ বুখারীতে আছে, তিনি রাতে ঘুম থেকে উঠে কবরস্তানে চলে যেতেন। এইসব রাওয়ায়েতে প্রমাণিত হয় যে, উম্মুল মুমিনিন প্রকৃতিগতভাবে অত্যন্ত সাহসী এবং ভয়হীনছিলেন।

হযরত আয়েশা সিদ্দিকাহর (রাঃ) পবিত্র জীবনে চারটি ঘটনা অপরিসীম গুরুত্বের দাবীদার। এই চারটি ঘটনা হলোঃ ইফ্ক, ইলা, তাহরিম এবং তাখাইয়্যির।

(১) ইফ্কের ঘটনা এভাবে সংঘটিত হয়েছিলঃ বনু মুসতালিকের যুদ্ধের সফরে হযরত আয়েশা (রাঃ) হুজুরের (সাঃ) সফর সঙ্গী ছিলেন। রাস্তায় এক স্থানে রাতে কাফেলা অবস্থান করলো। হযরত আয়েশা (রাঃ) প্রকৃতির ডাকে সাড়া দেয়ার জন্য তাঁবু থেকে বের হয়ে দূরে চলে গেলেন। আসাবধানতাবশত গলার হার সেখানে পড়ে গেল। এ হার তিনি সহোদরা হযরত আসমার (রাঃ) নিকট থেকে চেয়ে এনেছিলেন। সেখান থেকে ফিরে যখন বুঝতে পারলেন যে, হারটি হারিয়ে গেছে তখন খুব দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হলেন। অতঃপর ফিরে সেদিকে গেলেন। ধারণা করেছিলেন যে, কাফেলা রওয়ানা হওয়ার পূর্বেই হারটি সন্ধান করে ফিরে আসতে পারবেন। যখন হার সন্ধান করে ফিরে এলেন তখন কাফেলা রওয়ানা হয়ে গেছে। তিনি খুব ঘাবড়ে গেলেন। অনভিজ্ঞতার বয়স। চাদর উড়িয়ে সেখানেই শুয়ে রইলেন। হযরত ছাফওয়ান (রাঃ) বিন মুয়াত্তাল নামক এক সাহাবী কোন ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রয়োজনে কাফেলার পিছনে রয়ে গিয়েছিলেন। তিনি হযরত আয়েশাকে (রাঃ) চিনে ফেললেন। কেননা শৈশবে (অথবা পর্দার আয়াত নাযিল হওয়ার পূর্বে) তাঁকে দেখেছিলেন। তিনি তাঁকে পিছে পড়ার কারণ জিজ্ঞেস করলেন। যখন ঘটনা জ্ঞাত হলেন তখন খুব হামদরদী প্রদর্শন করলেন। অতঃপর উম্মুল মুমিনিনকে (রাঃ) উটে বসিয়ে দ্রুত

www.bjilibrary.com

কাফেলার দিকে রওয়ানা হলেন এবং দ্বিপ্রহরের সময় কাফেলার সঙ্গে গিয়ে একত্রিত হলেন। নামকরা মুনাফিক আব্দুল্লাহ বিন উবাই যখন এই ঘটনার কথা জানতে পারলো তখন সে হযরত আয়েশা সিদ্দিকাহর (রাঃ) ব্যাপারে রটিয়ে দিল যে তিনি আর এখন পবিত্র নেই। সাদাসিধে মনের কতিপয় মুসলমানও ভুল ধারণার শিকার হলেন। জনাব রাসূলে করিমও (সাঃ) প্রাকৃতিকভাবে কিছুটা দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়লেন এবং হযরত আয়েশা সিদ্দিকাহ (রাঃ) অন্যায় অপবাদের দুঃখে রোগাক্রান্ত হয়ে পড়লেন। এ সময় আল্লাহর কুদরতের বহিঃপ্রকাশ ঘটলো এবং পবিত্রতার আয়াত নাযিল হলোঃ

لَوْلَآ اِذْ سَمِعْتُمُوْهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُوْنَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِاَنْفُسِهِمْ
خَيْرًا وَّقَالُوْا هٰذَآ اِفْكٌ مُّبِيْنٌ (سورۂ نور)

"যখন তোমরা এই ঘটনা শুনলে তখন মুমিন পুরুষ ও মহিলাদের সম্পর্কে সুন্দর ধারণা কেন পোষণ করনি এবং কেন বলনি যে এটা নীরেট অপবাদ।"

পবিত্রতার আয়াত নাযিল হওয়ার পর শত্রুদের মুখ কালো হয়ে গেল এবং সাদা মনের মুসলমান, যারা ভুল ধারণার শিকার হয়েছিলেন, তাঁরা খুব লজ্জিত হলেন। তাঁরা অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসূলের (সাঃ) নিকট ক্ষমা চাইলেন। আয়েশার (রাঃ) মাথা গৌরবে উঁচু হয়ে গেল। তিনি বললেন, আমি শুধু আমার আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞ এবং অন্য কারো নিকট কৃতজ্ঞ নই।

(২) তাহরিমের ঘটনাঃ প্রিয় নবীর (সাঃ) নিয়ম ছিল আছরের নামাযের পর স্ত্রীদের (রাঃ) নিকট কিছুক্ষণের জন্য গমন করতেন। একবার হযরত যয়নব (রাঃ) বিনতে জাহাশের নিকট বেশ দেরী হয়ে গেল। এতে হযরত আয়েশা (রাঃ) ঈর্ষান্বিত হলেন। তিনি গোপনে খোঁজ নিয়ে জানতে পেলেন যে, হুজুর (সাঃ) যয়নবের (রাঃ) নিকট থেকে মধু খেয়েছেন। এই মধু কেউ তাঁকে তোহফা হিসেবে পাঠিয়েছিলেন। হযরত আয়েশা (রাঃ) হযরত হাফছাকে (রাঃ) বললেন, যখন হুজুর (সাঃ) আমাদের এবং তোমাদের ঘরে তাশরীফ আনেন তখন বলতে হবে, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি মাগাফিরের মধু খেয়েছেন (মাগাফির এক ধরনের ফুল। মৌমাছি এই ফুলে বসে মধু আহরণ করে। আর এ মধুতে সামান্য দুর্গন্ধ হয় এবং প্রিয় নবী (সাঃ) সব ধরনের দুর্গন্ধই অপছন্দ করতেন)। যখন হুজুর (সাঃ) বলবেন যে, যয়নব (রাঃ) মধু পান করিয়েছে তখন তোমরা বলবে, সম্ভবত এই মধু আরফতের মৌমাছির আহরিত মধু। যখন হুজুর (সাঃ) হযরত হাফছার (রাঃ) নিকট তাশরীফ নিলেন তখন এই

www.bjilibrary.com

সওয়াল–জওয়াব হলো। অতঃপর হযরত ছুফিয়া (রাঃ) ও হযরত আয়েশাও (রাঃ) একই কথার দ্বিরুক্তি করলেন। ফলে হুজুরের (সাঃ) মনে হলো তাঁর পবিত্র শরীরে কেমন যেন গন্ধ সৃষ্টি হয়েছে। বস্তুত যখন তিনি পুনরায় হযরত যয়নবের (রাঃ) নিকট তাশরীফ নিলেন এবং তিনি নিয়মমত মধু পেশ করলেন তখন তিনি বললেন, " তা আমার প্রয়োজন নেই। আমি ভবিষ্যতে মধু খাবো না।" এতে এই আয়াত নাযিল হলোঃ يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِىُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَآ أَحَلَّ ٱللَّهُ لَكَ تَبْتَغِى مَرْضَاتَ أَزْوَٰجِكَ

"হে নবী। আপনি আপনার স্ত্রীদের সন্তুষ্টির জন্য যে বস্তু খোদা হালাল করেছেন, তা নিজের ওপর হারাম করেছেন কেন?"

(৩) ইলার ঘটনাঃ পূত পবিত্র স্ত্রীদের জন্য খাদ্য ও খেজুরের যে পরিমাণ নির্ধারিত ছিল তা তাঁদের প্রয়োজনের তুলনায় যথেষ্ট ছিল না এবং তাঁরা অভাবের মধ্যে সময় কাটাতেন। এদিকে গনিমতের মাল ও বার্ষিক রাজস্ব আয় যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছিল। সুতরাং পবিত্র স্ত্রীরা (রাঃ) নির্ধারিত জীবিকা বৃদ্ধির ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। হযরত আবুবকর সিদ্দিক (রাঃ) এবং হযরত ওমর ফারুক (রাঃ) নিজেদের কন্যাদ্বয় যথাক্রমে হযরত আয়েশা (রাঃ) ও হযরত হাফছাকে (রাঃ) বুঝিয়ে এই দাবী থেকে বিরত রাখলেন। কিন্তু অন্য স্ত্রীরা (রাঃ) ঐ দাবীর ওপর আটল রইলেন। ঘটনাক্রমে সেই সময় হুজুর (সাঃ) ঘোড়ার ওপর থেকে পড়ে যান এবং পাঁজরে আঘাত পান। তিনি হযরত আয়েশার (রাঃ) হুজরা সংলগ্ন ওপর তলায় এক কক্ষে অবস্থান গ্রহণ করলেন এবং ওয়াদা করলেন যে, এক মাস পর্যন্ত স্ত্রীদের (রাঃ) সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন না। মুনাফিকরা এ ধরনের মওকারই সন্ধানে থাকতো। তারা রটিয়ে দিল যে, হুজুর (সা)ঃ স্ত্রীদেরকে তালাক দিয়ে দিয়েছেন। সকল সাহাবা এই খবর শুনে অত্যন্ত দুঃখিত হলেন। হযরত ওমর ফারুক (রাঃ) হুজুরের (সাঃ) খিদমতে হাজির হলেন। তিনি একটি চারপায়ীর ওপর শুয়ে ছিলেন এবং পবিত্র শরীরে রশির দাগ পড়ে গিয়েছিল। ফারুকে আযম (রাঃ) হুজুরের (সাঃ) এই অবস্থা দেখে খুবই মনোকষ্ট পেলেন এবং আরজ করলেন, "ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি কি আপনার স্ত্রীদের তালাক দিয়ে দিয়েছেন? "হুজুর (সাঃ) বললেন, "না"।

হযরত ওমর ফারুক (রাঃ) এই সুসংবাদ সব লোককে শুনিয়ে দিলেন। এতে সকল মুসলমান এবং পূত–পবিত্র স্ত্রীদের (রাঃ) মধ্যে খুশীর ঢেউ বয়ে গেল।

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, " আমি এক এক করে দিন গুণছিলাম। ২৯তম দিনে হুজুর (সাঃ) ওপর তলার কক্ষ থেকে নেমে সর্বপ্রথম আমার নিকট তাশরীফ

www.bjilibrary.com

আনলেন। আমি আরজ করলাম "ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি এক মাসের ওয়াদা করেছিলেন। আর আজ ২৯ দিন।" তিনি বললেন, " মাস কখনো ২৯ দিনেও হয়।"

(৪) তাখাইয়্যিরের ঘটনাঃ ইলার ঘটনার পর একদিন হুজুর (সাঃ) হযরত আয়েশা সিদ্দিকাহর (রাঃ) নিকট তাশরীফ নিলেন এবং বললেন, " আয়েশা, আমি তোমাকে একটি কথা জিজ্ঞেস করছি। তোমার মাতা-পিতার সাথে পরামর্শ করে যদি জবাব দাও তাহলে ভালো হবে।"

হযরত আয়েশা (রাঃ) আরজ করলেন, "ইয়া রাসূলাল্লাহ! কথাটি কি?" হুজুর (সাঃ) সূরায়ে আহযারের এই আয়াত তিলাওয়াত করলেনঃ

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا
فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ۝ وَإِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ
اللّٰهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللّٰهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنٰتِ
مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا ۝

"হে নবী! আপনার স্ত্রীদেরকে বলে দিন, যদি তোমাদের পার্থিব জীবন এবং তার শোভা প্রয়োজন হয় তাহলে এসো আমি তোমাদেরকে কিছু দিয়ে সুন্দরভাবে বিদায় করে দেই এবং যদি তোমার আল্লাহ ও তাঁর রাসূল এবং আখিরাতের গৃহ ভালো মনে হয় তাহলে তোমাদের মধ্যে যে নেককার তার জন্য আল্লাহ বড় ছওয়াব নির্দিষ্ট করে রেখেছেন।"

হযরত আয়েশা (রাঃ) আরজ করলেনঃ "হে আল্লাহর রাসূল। এতে মাতা-পিতার সাথে পরামর্শের কি আছে! আমি তো আল্লাহ, আল্লাহর রাসূল এবং আখিরাতের ঘর এখতিয়ার করলাম।" হুজুর (সাঃ) এই উত্তর পছন্দ করলেন। এই কথা যখন অন্য স্ত্রীদেরকে জিজ্ঞেস করলেন তখন তাঁরাও একই ধরনের জবাব দিলেন।

প্রিয় নবী (সাঃ) হযরত আয়েশাকে (রাঃ) সীমাহীন ভালোবাসতেন। মুসনাদে আবু দাউদে বর্ণিত আছে, হুজুর (সাঃ) বলতেন, " হে আল্লাহ! এমনিতেই তো আমি সকল স্ত্রীর সঙ্গে সমান ব্যবহার করে থাকি। কিন্তু অন্তর আমার আয়ত্তের বাইরে।

www.bjilibrary.com

অন্তর আয়েশাকেই (রাঃ) বেশী ভালবাসে। হে আল্লাহ! তুমি অন্তরকে ক্ষমা করে দিও।"

প্রিয় নবী (সাঃ) পবিত্রতার ব্যাপারে খুব সতর্ক থাকতেন এবং নিজের মেসওয়াক বার বার ধৌত করাতেন। এই খিদমতের দায়িত্ব হযরত আয়েশার (রাঃ) ওপরই ন্যস্ত ছিল।

হযরত আয়েশা (রাঃ) প্রিয় নবীর (সাঃ) ওপর জীবন বাজি রাখতেন। একবার হুজুর (সাঃ) রাতের বেলায় ঘুম থেকে উঠে কোথাও গেলেন। হযরত আয়েশা (রাঃ) চক্ষু খুললেন এবং রাসূলকে (সাঃ) না দেখে খুব পেরেশান হলেন। পাগলিনীর মত উঠলেন এবং এদিক ওদিকে অন্ধকারের মধ্যে তালাশ করতে লাগলেন। অবশেষে এক স্থানে হুজুরে (সাঃ) কদম মুবারক নজরে এলো। তিনি দেখলেন যে, হুজুর (সাঃ) সিজদারত অবস্থায় আল্লাহর স্মরণে মশগুল আছেন। এই সময় তিনি দুশ্চিন্তামুক্ত হলেন।

একবার হুজুর (সাঃ) কম্বল গায়ে দিয়ে মসজিদে তাশরিফ আনলেন। একজন সাহাবী আরজ করলেনঃ "ইয়া রাসূলাল্লাহ! এতে দাগ দেখা যাচ্ছে বলে মনে হয়।" তিনি তা গোলামের হাতে হযরত আয়েশার (রাঃ) নিকট পাঠিয়ে দিলেন। হযরত আয়েশা (রাঃ) পানি আনলেন। নিজের হাতে সেই দাগ ধুলেন। এরপর কম্বল শুকিয়ে রাসূলের (সাঃ) খিদমতে ফেরত পাঠালেন।

প্রিয় নবী (সাঃ) যখন ইহরাম বাঁধতেন অথবা ইহরাম খুলতেন তখন হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রাঃ) শরীরে খোশবু লাগিয়ে দিতেন।

একবার সফরে হযরত আয়েশার (রাঃ) হার হারিয়ে গেল। হুজুর (সাঃ) তা অনুসন্ধানে কতিপয় সাহাবীকে প্রেরণ করলেন। তাঁরা হার অনুসন্ধানে বের হলেন। রাস্তায় নামাযের সময় হলো। দূর-দূরান্ত পর্যন্ত পানি ছিল না। এজন্য তাঁরা ওজু ছাড়াই নামায পড়লেন। ফিরে এসে তাঁরা রাসূলের (সাঃ) নিকট ঘটনা বর্ণনা করলেন। এ সময় তায়াম্মুমের আয়াত নাযিল হলো। হযরত উসায়েদ (রাঃ) বিন হাজিয়া একে হযরত আয়েশার (রাঃ) বড় ফজিলত হিসেবে মনে করলেন এবং তাঁকে সম্বোধন করে বললেনঃ

"উম্মুল মুমিনিন! আল্লাহ আপনাকে উত্তম জাযা দিন। আপনি এমন কোন ঘটনার সম্মুখীন হননি যা থেকে আপনি পরিত্রাণ পাননি এবং মুসলমানদের জন্য তা এক বরকত হিসেবে প্রমাণিত হয়েছে।"

www.bjilibrary.com

হযরত আয়েশার (রাঃ) দাম্পত্য জীবনের ন'বছর পর প্রিয় নবী (সাঃ) মৃত্যু রোগে আক্রান্ত হলেন। তের দিন যাবত তিনি মৃত্যু শয্যায় ছিলেন। এই তের দিনের মধ্যে ৫ দিন তিনি অন্য স্ত্রীদের নিকট অবস্থান করেন এবং ৮ দিন ছিলেন হযরত আয়েশার (রাঃ) নিকট। কঠিন রোগের দুর্বলতার কারণে হুজুর (সাঃ) হযরত আয়েশার (রাঃ) নিকট মিসওয়াক দিতেন। তিনি নিজের দাঁত দিয়ে তা চিবিয়ে নরম করে দিতেন এবং রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ব্যবহার করতেন।

১১ হিজরীর ৯ অথবা ১২ই রবিউল আউয়ালে সারওয়ারে কাওনাইনের (সাঃ) রুহ মুবারক আলমে কুদসের দিকে যাত্রা করলো। এ সময় হুজুরের (সাঃ) পবিত্র মাথা হযরত আয়েশার (রাঃ) বুকের ওপর রাখা ছিল এবং তাঁর হুজরা মুবারকেই চির শয়ানে শায়িত হন।

প্রিয় নবীর (সাঃ) ওফাতের সময় হযরত আয়েশার বয়স ছিল ১৮ বছর। ৪৮ বছর তিনি বৈধব্যের জীবন অতিবাহিত করেন। এই সুদীর্ঘ সময়ে তিনি ইসলামী বিশ্বের হেদায়াত, ইলম ও ফজিলত এবং খায়ের ও বরকতের কেন্দ্রবিন্দু ছি েন। তাঁর থেকে ২ হাজার ২শ' ১০টি হাদীস বর্ণিত আছে। অনেকেই বলেছেন, শরীয়তের হুকুম আহকামের এক চতুর্থাংশ হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বিবৃত হয়েছে।

বড় বড় জালিলুল কদর সাহাবী (রাঃ) তাঁর খিদমতে হাজির হয়ে সব ধরনের মাসয়ালা জিজ্ঞাসা করতেন। হযরত আবু মুসা আশয়ারী (রাঃ) বলেন, আমরা এমন কোন বিষয়ের সম্মুখীন হইনি যার জ্ঞান হযরত আয়েশার (রাঃ) নিকট ছিল না। অর্থাৎ প্রত্যেক মাসয়ালা সম্পর্কেই তিনি রাসূলের (সাঃ) আদর্শ পরিজ্ঞাত ছিলেন। হযরত উরওয়াহ বিন যোবায়ের (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, আমি কুরআন, হাদীস, ফিকাহ, ইতিহাস এবং বংশনামা সম্পর্কে জ্ঞানের ক্ষেত্রে উম্মুল মুমিনিন হযরত আয়েশার (রাঃ) থেকে বড় আর কাউকে দেখিনি। আহনাফ বিন কায়েস (রাঃ) এবং মুসা বিন তালহা (রাঃ) বলেছেন, হযরত আয়েশার (রাঃ) থেকে সুন্দর ভাষার লোক আমারা দেখিনি।

হযরত মাবিয়া (রাঃ) বলেছেন, হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বেশী বাগ্মী, বেশী শুদ্ধ ভাষা প্রয়োগকারী এবং বেশী তীক্ষ্ম মেধার বক্তা আর আমি দেখিনি।

চরিতগ্রন্থসমূহে প্রাপ্ত বিভিন্ন রাওয়ায়েতে প্রমাণিত হয় যে, হযরত আয়েশা সিদ্দিকার (রাঃ) দ্বীনী জ্ঞান ছাড়াও চিকিৎসা, ইতিহাস এবং সাহিত্যেও বিশেষ দখল ছিল।

www.bjilibrary.com

প্রকৃতপক্ষে হযরত আয়েশার (রাঃ) জ্ঞান ও ফজিলত ছিল বিরাট। এই জ্ঞান ও ফজিলত বর্ণনার জন্য হাজার হাজার পৃষ্ঠার প্রয়োজন। সংক্ষেপে বলতে গেলে তিনি ছিলেন উম্মাহর কল্যাণকামী।

কতিপয় বিশেষ ফজিলতে হযরত আয়েশা (রাঃ) সকল সাহাবী ও মহিলা সাহাবীর মধ্যে বিশেষ মর্যাদার অধিকারিনী। কাসিম বিন মুহাম্মাদের (রাঃ) বর্ণনা অনুযায়ী হযরত আয়েশা (রাঃ) স্বয়ং বলেছেন, আমার মধ্যে ১০টি গুণ এমন রয়েছে যা রাসূলের (সাঃ) অন্য স্ত্রীর মধ্যে নেই।

(১) কুমারী অবস্থায় রাসূলের (সাঃ) সঙ্গে শুধু আমারই বিয়ে হয় (২) জিবরিল আমিন (আঃ) আমার সুরতে হুজুরের (সাঃ) সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং বলেন যে, আয়েশাকে (রাঃ) বিয়ে করুন। (৩) আল্লাহ পাক আমার জন্য বারায়াত বা পবিত্রতার আয়াত নাযিল করেন (৪) আমার মাতা-পিতা উভয়েই মুহাজির (৫) আমি হুজুরের (সাঃ) সম্মুখে থাকতাম এবং তিনি নামাযে মশগুল হতেন (৬) আমি এবং রাসূলে করিম (সাঃ) একই পাত্রে গোসল করতাম। (৭) ওহী নাযিলের সময় শুধু আমি তাঁর পাশে থাকতাম। (৮) যেদিন আমার পালা ছিল সেইদিনই রাসূলুল্লাহর (সাঃ) ইন্তেকাল হয়। (৯) যখন প্রিয় নবীর (সঃ) পবিত্র রুহ আল্লাহর দিকে যাত্রা করে তখন হুজুরের (সাঃ) পবিত্র মাথা আমার কোলের ওপর ছিল। (১০) আমার হুজরাতেই রাহমাতুললিল আলামীনকে (সাঃ) দাফন করা হয়।

হাফিজ ইবনে আব্দুল বার (রাঃ) " ইসতিয়াব" গ্রন্থে হুজুরের (সাঃ) এই ইরশাদ নকল করেছেনঃ

"মহিলাদের মধ্যে আয়েশার (রাঃ) মর্যাদা এমন যেমন সাধারণ খাদ্যের ওপর শুরবা মিশ্রিত রুটির মর্যাদা।"

হযরত ওমর ফারুকের (রাঃ) খিলাফতকালে রাসূলের (সাঃ) সকল স্ত্রীর (রাঃ) বার্ষিক ভাতা ছিল ১০ হাজার দিরহাম। অবশ্য হযরত আয়েশা (রাঃ) ১২ হাজার দিরহাম পেতেন। হযরত ওমর (রাঃ)এর কারণ বর্ণনা করে বলেছেন, তিনি হুজুরে আকরামের (সঃ) অত্যন্ত প্রিয় ছিলেন।

ইরাক বিজয়ের সময় গনিমতের মালের মধ্যে মুক্তার একটি পাত্রও ফারুকে আজমের (রাঃ) খেদমতে প্রেরণ করা হয়েছিল। তিনি জনগণের অনুমতি নিয়ে তা হযরত আয়েশার (রাঃ) খিদমতে পাঠিয়ে দিলেন।

www.bjilibrary.com

উম্মুল মুমিনিন (রাঃ) বললেনঃ "হে খোদা। হুজুরের (সাঃ) পর ওমর (রাঃ) আমার ওপর বড় ইহসান করেছেন। ভবিষ্যতে তাঁর উপঢৌকনের জন্য আমাকে জীবিতরেখোনা।"

হযরত ওমর ফারুকের (রাঃ) ওফাতের সময় যখন সমুপস্থিত হলো তখন তিনি নিজের পুত্র হযরত আব্দুল্লাহকে (রাঃ) উম্মুল মুমিনিনের (রাঃ) খিদমতে প্রেরণ করে তাঁকে রাসূলের (সাঃ) পাশে দাফন হওয়ার অনুমতি প্রর্থনা করলেন।

হযরত আয়েশা (রাঃ) বললেনঃ " আমার দাফনের জন্য এই স্থান রেখেছিলাম। কিন্তু ওমরের (রাঃ) খাতিরে আমি আজ তা থেকে হাত গুটিয়ে নিলাম।"

হযরত আয়েশা সিদ্দিকার (রাঃ) এই নজিরবিহীন উদারতার কারণেই ফারুকে আযম (রাঃ) আজ সারওয়ারে কাওনাইনের (সাঃ) পাশে শুয়ে আছেন।

হযরত ওমরের (রাঃ) পর হযরত ওসমান জুন্নুরাইন (রাঃ) খলিফা হলেন। তাঁর শাসনকালে মুসলিম উম্মাহর মধ্যে ভয়াবহ ফিতনা এবং ষড়যন্ত্র মাথা তুলে দাঁড়ায় যার ফলশ্রুতিতে হযরত ওসমান গনির (রাঃ) শাহাদাতের দুঃখজনক ঘটনা সংঘটিত হয়। তিন দিনের ক্ষুৎ পিপাসায় কাতর বার্দ্ধক্যে পীড়িত আমিরুল মুমিনিন (রাঃ)কে কুরআন মজিদ তিলাওয়াত অবস্থায় জালেমরা যে নির্দয়তার সাথে শহীদ করে তাতে হযরত আয়েশার (রাঃ) অন্তর খুন হয়ে গেল। বস্তুত চতুর্থ খলিফা হযরত আলী কাররামাল্লাহু ওয়াজহাহুর শাসনামলে কতিপয় সাহাবী (রাঃ) এবং মুসলমানদের একটি দল ওসমানের (রাঃ) বদলা নেয়ার জন্য উঠে দাঁড়ালেন। এই দলে হযরত যোবায়ের (রাঃ) বিন আওয়াম এবং হযরত তালহার (রাঃ) মত জালিলুল কদর সাহাবীও ছিলেন।

হযরত ওসমানের (রাঃ) শাহাদাতে হযরত আয়েশার (রাঃ) মনে নিদারুণ দুঃখ ছিল। এজন্য তিনি নেক নিয়তের সঙ্গে এই দলকে সমর্থন করেন। এই দলের ধারণা ছিল যে, ওসমান (রাঃ) হন্তাদের কতিপয় ব্যক্তি হযরত আলীর (রাঃ) আশ্রয়ে রয়েছে। ওদিকে হযরত আলীর (রাঃ) বক্তব্য ছিল, পূর্ণ তদন্তের পর যতক্ষণ পর্যন্ত হত্যাকারীদের সনাক্ত না করা হবে ততক্ষণ তাদের ওপর দন্ড জারি করা সম্ভব নয়। এই মতভেদের কারণে উষ্ট্রের যুদ্ধের মত দুঃখজনক ঘটনা ঘটে গেল। হযরত আয়েশা (রাঃ) পরিস্থিতি শোধরানোর জন্য নিজের দলসহ বসরা গেলেন। দুর্ভাগ্যজনকভাবে সেখানে হযরত আলীর (রাঃ) সঙ্গে যুদ্ধ বেধে গেল। এই যুদ্ধে উভয় পক্ষেরই ব্যাপক জীবন হানি ঘটলো। এ সত্ত্বেও হযরত আলী বিজয়ী হলেন। তিনি অত্যন্ত সম্মানের সঙ্গে উম্মুল মুমিনিনকে (রাঃ) ফেরত পাঠিয়ে দিলেন। যখনই হযরত আয়েশা (রাঃ)–

www.bjilibrary.com

র এই যুদ্ধের কথা স্মরণ হতো তখনই ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতেন এবং বলতেনঃ" হায়! ২০ বছর আগে যদি আমার মৃত্যু হতো।"

হযরত আয়েশার (রাঃ) প্রায় দুশ শাগরিদ বা শিষ্য ছিলেন। এইসব শিষ্যের মধ্যে কাসিম বিন মুহাম্মাদ (রাঃ) মাসরুক তাবেয়ী (রাঃ), আয়েশা বিনতে তালহা (রাঃ), আবুসালমা (রাঃ) এবং উরওয়াহ বিন যোবায়েরের (রাঃ) নাম প্রসিদ্ধ।

হযরত আয়েশা (রাঃ) কোন হাদিস বর্নণা কালে তার নেপথ্য কারণও বর্ণনা করতেন। যে ব্যাখ্যা তিনি দিতেন তা আর বিশ্লেষণের প্রয়োজন হতোনা। তিনি অন্ধ আনুগত্য পছন্দ করতেন না। সব সময়ই প্রিয় নবার (সাঃ) কথা ও কাজের প্রকৃত তথ্য অনুসন্ধানের চেষ্টা করতেন। মুহাদ্দিসরা এমন কতিপয় রাওয়ায়েত উল্লেখ করেছেন, যাতে হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রাঃ) অন্যান্য সাহাবী (রাঃ) থেকে ভিন্ন মত ব্যক্ত করেছেন। এ ধরনের কতিপয় রাওয়ায়েত এখানে উল্লেখ করা হলো ঃ

হযরত আয়েশার (রাঃ) সামনে একজন বর্ণনা করলো, আবু হুরায়রা (রাঃ) বলে থাকেন যে, তিনটি বস্তু অশুভ বা অপয়া। তাহলো মহিলা, ঘর এবং ঘোড়া। হযরত আয়েশা (রাঃ) বললেন, আবু হুরায়রা (রাঃ) অর্ধেক কথা শুনেছে। যখন আবু হুরায়রা (রাঃ) এলো তখন নবী করিম (সাঃ) বাক্যের প্রথম অংশ বলেছিলেন। তাহলোঃ "ইহুদীরা বলে থাকে, মহিলা, ঘর এবং ঘোড়াএই তিন বস্তু অমঙ্গল বা অশুভ।" হযরত ওমর (রাঃ) থেকে মৃত ব্যক্তির শোনা সম্পর্কিত একটি রাওয়ায়েত আছে। হযরত ওমর (রাঃ) রাসূলকে জিজ্ঞাসা করার পর তিনি বলেনঃ সে তোমাদের থেকে বেশী শুনে থাকে, কিন্তু জবাব দিতে পারেনা।"

হযরত আয়েশা যখন এই রাওয়ায়েত শুনলেন তখন বললেন, ওমর (রাঃ) শুনতে ভূল করেছে। এটা রাসুলের (সাঃ) ইরশাদ ছিলনা। কেননা, পবিত্র কুরআনে এর বিরুদ্ধে স্পষ্ট দলিল রয়েছেঃ

فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ (سورة روم) وَمَا أَنتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ (سورة فاطر)

অর্থাৎ আপনি মুর্দাদেরকে শোনাতে পারেন না--- এবং যারা কবরে রয়েছে তাদেরআপনিশুনানেওয়ালানন।

হযরত আব্দুল্লাহ বিন ওমর (রাঃ) এবং হযরত আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, "ঘরের লোকদের কান্নায় মৃত ব্যক্তির ওপর আযাব হয়।" হযরত আয়েশা (রাঃ) যখন এই রাওয়ায়েত শুনলেন তখন তা মানতে অস্বীকার করলেন এবং বললেন, প্রকৃত ঘটনা হলো এই যে, রাসূলে করিম (সাঃ) এক ইহুদী মহিলার

www.bjilibrary.com

জানাজার পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তার নিকটাত্মীয় ও বন্ধু বান্ধব ক্রন্দন করছিল। হুজুর (সাঃ) বললেন, মানুষেরা কাঁদছে আর তার ওপর আযাব হচ্ছে (অর্থাৎ সে নিজের আমলের সাজা ভুগছে)। এরপর বললেন যে, কালামে মজিদে স্পষ্ট উল্লেখ করা হয়েছেঃ" কেউ অন্যের গুনাহর বোঝা উঠায়না।"

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) একজন বিরাট মর্যাদাসম্পন্ন সাহাবী ছিলেন। যখন তাঁর মৃত্যুকাল ঘনিয়ে এলো তখন তিনি নতুন কাপড় চেয়ে নিয়ে পরিবর্তন করলেন এবং বললেনঃ "হুজুরে আকরাম (সাঃ) ইরশাদ করেছেন, মুসলমান যে পোশাকে মৃত্যুবরণ করবে সেই পোশাকেই তাকে উঠানো হবে।" হযরত আয়েশা (রাঃ) একথা শুনে বললেন, "খোদা আবু সাঈদের (রাঃ) ওপর রহম করুন। রাসূলের (সাঃ) নিকট পোশাকের অর্থ ছিল আমল।"

হযরত ওমর ফারুক (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে," হুজুর (সাঃ) ইরশাদ করেছেন, আছর ও ফযরের নামাযের পর কোন নামায নেই অর্থাৎ নফল ও সুন্নতও জায়েজ নয়।" দৃশ্যত এই নিষিদ্ধকরনের কোন কারণ পরিলক্ষিত হয়না। যখন হযরত আয়েশা (রাঃ) এই রাওয়ায়েত শুনলেন তখন বললেন," ওমর (রাঃ) ধারণার বশবর্তী হয়ে এ কথা বলেছে। হুজুর (সাঃ) শুধুমাত্র কোন ব্যক্তিকে সূর্যোদয় এবং অস্তকে তাক্ করে নামায পড়তে নিষেধ করেছেন (যাতে সূর্য পূজার সাথে সাদৃশ্য না হয়)।"

নৈতিক মর্যাদার দিক থেকে হযরত আয়েশার (রাঃ) স্থান অনেক উর্ধে ছিল। তিনি অসীম দানশীল, অতিথিপরায়ন এবং দরিদ্র সেবী ছিলেন। একবার হযরত আব্দুল্লাহ বিন যোবায়ের (রাঃ) তাঁকে এক লাখ দিরহাম প্রেরণ করলেন। তিনি তৎক্ষনাৎ তা গরীব– মিসকিনদের মধ্যে বন্টন করে দিলেন। সেদিন তিনি রোযা ছিলেন। সন্ধ্যায় খাদেম বললোঃ" উম্মুল মুমিনিন। কত ভালই না হতো, যদি আপনি ইফতারের জন্য ঐ অর্থ থেকে কিছু গোশ্‌ত কিনতেন।" তিনি বললেন," তুমিতো স্মরণ করিয়ে দিতে পারতে।"

হযরত উরওয়াহ বিন যোবায়ের (রাঃ) বলেন, একবার হযরত আয়েশার (রাঃ) নিকট ৭০ হাজার পরিমাণ দিরহাম এলো। তিনি তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তা খোদার রাস্তারয় বিলিয়ে দিলেন এবং দোপাট্টার আঁচল ঝেড়ে দিলেন।

ইমাম মালিকের (রঃ) মুয়াত্তায় আছে, হযরত আয়েশা (রাঃ) একদিন রোযা ছিলেন এবং গৃহে একটি রুটি ছাড়া কিছুই ছিলনা। ইত্যবসরে একজন ভিখারিনী এসে হাঁক দিল। তিনি দাসীকে সেই রুটি ভিখারিনীকে দিয়ে দেয়ার নির্দেশ দিলেন। দাসী বললো, সন্ধ্যায় ইফতার কি দিয়ে করবেন? উম্মুল মুমিনিন বললেন, তাকে

www.bjilibrary.com

রুটিতো দিয়ে দাও। সন্ধ্যা হলো। এসময় কোন এক ব্যক্তি হাদিয়া হিসেবে বকরীর গোশ্‌ত প্রেরণ করলো। তিনি দাসীকে বললেন, দেখ, আল্লাহ রুটির চেয়ে উত্তম জিনিস প্রেরণ করেছেন।

উম্মুল মুমিনিনের (রাঃ) বদান্যতার কোন সীমা-পরিসীমা ছিল না। হযরত আব্দুল্লাহ বিন যোবায়ের (রাঃ) ছিলেন তাঁর ভাগিনা এবং মুখে ডাকা পুত্র। প্রায়ই তিনি তাঁর খিদমত করতেন। খালার বদান্যতা দেখে দেখে একবার তিনিও ভড়কে গেলেন এবং মুখ ফসকে বলে ফেললেন যে, এখন থেকে তিনি আর কিছু দেবেন না। হযরত আয়েশা (রাঃ) এ কথা জানতে পেরে খুব অসন্তুষ্ট হলেন এবং ইবনে যোবায়েরের (রাঃ) সঙ্গে আর কখনো কথা বলবেন না বলে কসম খেলেন। দীর্ঘদিন যাবত তিনি আর তাঁর সঙ্গে কথা বললেন না। তাতে হযরত আব্দুল্লাহ বিন যোবায়ের (রাঃ) খুব ঘাবড়ে গেলেন এবং অতি কষ্টে হযরত মিছওয়ার (রাঃ) বিন মাখরামাহ ও আব্দুর রহমান (রাঃ) বিন আছওয়াদকে মধ্যস্থতা করে অপরাধ ক্ষমা করিয়েছিলেন। হযরত আয়েশা (রাঃ) কসম ভাঙ্গার কাফফারা হিসেবে ৪০টি গোলাম আযাদ করে দেন। এই ঘটনা যখন তাঁর স্মরণ হতো তখন কেঁদে কেঁদে আঁচল ভিজিয়ে ফেলতেন। ইবনে সায়াদ (রঃ) বর্ণনা করেছেন, হযরত আয়েশা (রাঃ) নিজের বাসগৃহ আমীর মাবিয়ার (রাঃ) নিকট বিক্রি করে দিয়েছিলেন। বিক্রি বাবত যে অর্থ পেয়েছিলেন তা খোদার রাস্তায় দিয়ে দেন।

উম্মুল মুমিনিন (রাঃ) রাত -দিনের বেশীর ভাগ সময়ই ইবাদাত অথবা মাসয়ালা-মাসায়েল বলে কাটাতেন। প্রেম-প্রীতি ও স্নেহ-ভালোবাসায় তাঁর হৃদয় ছিল পূর্ণ। শত্রু এবং বিরোধীদেরকেও তিনি ক্ষমা করে দিতেন। প্রখ্যাত সাহাবী কবি হাসসান (রাঃ) বিন ছাবিত ইফকের ঘটনায় ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী হয়ে হযরত আয়েশার (রাঃ) বিরোধিতা করেছিলেন। এই ঘটনায় হযরত আয়েশার (রাঃ) মনে খুব দুঃখ ছিল। কিন্তু এ সত্ত্বেও তিনি হযরত হাসসান (রাঃ) বিন ছাবিতকে ক্ষমা করে দিয়েছিলেন এবং তাঁকে অত্যন্ত সম্মান করতেন। হযরত আয়েশার (রাঃ) কিছু আত্মীয় (রাঃ) ইফকের ঘটনায় জড়িত থাকার কারণে হযরত হাসসানকে (রাঃ) গালি দিতে চাইতেন। হযরত আয়েশা (রাঃ) তাঁদেরকে অত্যন্ত কঠোরভাবে এ কাজ করতে নিষেধ করেন এবং বলেন, তাঁকে খারাপ বলো না। তিনি রাসূলের (সাঃ) তরফ থেকে মুশরিক কবিদের জবাব দিতেন।

সহোদর মুহাম্মদ বিন আবি বরক (রাঃ) মাবিয়া বিন খাদিজের হাতে নিহত হয়েছিলেন। এজন্য তিনি তাঁর ওপর অসন্তুষ্ট ছিলেন। কিন্তু যখন তিনি শুনলেন যে,

www.bjilibrary.com

জিহাদের ময়দানে অধীনস্তদের সঙ্গে মাবিয়া অত্যন্ত সুন্দর আচরণ করেন, কারোর পশু মরে গেলে তাঁকে নিজের পশু দিয়ে দেন, কারোর গোলাম পালিয়ে গেলে তাকে নিজের গোলাম দান করেন এবং সকলেই তাঁর ওপর সন্তুষ্ট, তখন তিনি বললেন, "আসতাগফিরুল্লাহ! যে ব্যক্তির মধ্যে এই সকল গুণ আছে তার ওপর তো অসন্তুষ্ট থাকতে পারি না। যদিও সে আমার ভাইয়ের হত্যাকারী। রাসূলুল্লাহকে (সাঃ) আমি এই দোয়া করতে শুনেছি, "হে খোদা! যে ব্যক্তি আমার উম্মাতের প্রতি দয়া প্রদর্শন করবে তার প্রতি তুমিও দয়া প্রদর্শন করো। যে তার প্রতি কঠোরতা প্রদর্শন করবে তার প্রতি তুমিও কঠোরতা প্রদর্শন করো।"

উম্মুল মুমিনিন (রাঃ) গিবত বা পরনিন্দা এবং খারাব কথা মোটেই পছন্দ করতেন না। তাঁর থেকে বর্ণিত কোন হাদীসে কোন ব্যক্তিকে হেয়প্রতিপন্ন করার অথবা অপকথার একটি শব্দও পাওয়া যায় না। তিনি এত উদার হৃদয়ের অধিকারিনী ছিলেন যে, সতীনদের গুণাবলী ও প্রশংসা হৃষ্টচিত্তে বর্ণনা করতেন।

তাঁর অন্তরে সীমাহীন খোদাভীতি ছিল। কোন সময় শিক্ষণীয় কোন কথা স্মরণ হলে শুধু কাঁদতেন। একবার তিনি বলেন, ক্রন্দন ছাড়া কখনো আমি পেট পুরে খাই না। তাঁর এক শিষ্য এই কথায় জিজ্ঞেস করলেন, তা কেন? তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) যে অবস্থায় দুনিয়া ত্যাগ করেন তা আমার মনে পড়ে। খোদার কসম! রাসূলুল্লাহ (সাঃ) কোন দিন দু'বেলা পেট পুরে রুটি ও গোশ্‌ত খাননি।

হযরত আয়েশা (রাঃ) আল্লাহর ইবাদাতের প্রতি ছিলেন গভীরভাবে অনুরক্ত। ফরজ নামায ছাড়াও বেশী বেশী সুন্নাত ও নফল নামায পড়তেন। জীবনে তাহাজ্জুদ ও চাশতের নামায বাদ দেননি। কঠোরভাবে হজ্ব পালন করতেন। রমযানের রোযা ছাড়া প্রচুর নফল রোযা রাখতেন।

হযরত আয়েশা সিদ্দিকাহ (রাঃ) ৫৮ হিজরীর রমযান মাসে ৬৭ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন। ওছিয়ত অনুযায়ী রাতে বিতরের নামাযের পর জান্নাতুল 'বাকি'তে তাঁকে দাফন করা হয়। হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) জানাযার নামায পড়ান। জানাযায় এত লোকের সমাগম হয়েছিল যা আগে কখনো দেখা যায়নি। তাঁর ইন্তেকালে ইসলামী বিশ্বে শোকের ছায়া নেমে আসে।

হযরত আয়েশা সিদ্দিকাহর (রাঃ) কোন সন্তান হয়নি। তিনি হুজুরের (সাঃ) ইরশাদ অনুযায়ী ভাগিনা হযরত আব্দুল্লাহ বিন যোবায়েরের (রাঃ) নামানুসারে নিজের কুনিয়ত রেখেছিলেন "উম্মে আব্দুল্লাহ।"

www.bjilibrary.com

উম্মুল মুমিনিন হযরত হাফসা বিনতে ওমর (রাঃ)

নাম হাফসা (রাঃ)। তিনি কেরেশের আদি বংশের সাথে সম্পর্কযুক্ত। বংশনামা হলোঃ হাফসা (রাঃ) বিনতে ওমর ফারুক (রাঃ) বিন খাত্তাব বিন নুফায়েল বিন আব্দুল উজ্জা বিন রাবাহ্ বিন আব্দুল্লাহ্ বিন কুরত বিন যাররাহ্ বিন আদি বিন কাব বিন লুব্বী।

হযরত যয়নব (রাঃ) বিনতে মাজউন ছিলেন মা। তিনি একজন অত্যন্ত সম্মানীয়া সাহাবী ছিলেন। মহান সাহাবী হযরত ওসমান (রাঃ) বিন মাজউন ছিলেন হযরত হাফসার (রাঃ) মামু এবং ইসলামের ফকিহ্ হযরত আব্দুল্লাহ (রাঃ) বিন ওমর (রাঃ) ছিলেন সহোদর।

হযরত হাফসা (রাঃ) নবীর (সাঃ) নবুয়ত প্রাপ্তির পাঁচ বছর পূর্বে জন্মগ্রহণ করেন। হযরত খুনাইস (রাঃ) বিন হুজাফা বিন কায়েস বিন আদির সঙ্গে প্রথম বিয়ে হয়। তিনি বনু সাহাম গোত্রের লোক ছিলেন। তিনি দাওয়াতে হকের প্রথম যুগে ইসলাম গ্রহণ করার সৌভাগ্য অর্জন করেন এবং হযরত হাফসাও (রাঃ) তাঁর সঙ্গেই ইসলাম গ্রহণ করেন। নবুয়তের ৬ বছর পর হযরত খুনাইস (রাঃ) হিজরত করে হাবশা গমন করেন। নবীর (সাঃ) হিজরতের কিছুদিন পূর্বে মক্কা ফিরে আসেন এবং পুনরায় হযরত হাফসার (রাঃ) সঙ্গে হিজরত করে মদীনা গমন করেন।

হযরত খুনাইস (রাঃ) হক পথের একজন জানবাজ সিপাহী ছিলেন। দ্বিতীয় হিজরীতে বদরের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এই যুদ্ধে তিনি অত্যন্ত উৎসাহ-উদ্দীপনার সাথে অংশগ্রহণ করেন। অতঃপর তৃতীয় হিজরীতে সংঘটিত ওহোদের যুদ্ধে প্রচন্ড বীরত্ব প্রদর্শন করেন এবং লড়াই করতে করতে আহত হন। আহত অবস্থায় তাঁকে মদীনা নিয়ে যাওয়া হয়। অনেক চিকিৎসার পরও তিনি আর সুস্থ হননি এবং পরপারের দিকে যাত্রা করেন। ফলে হযরত হাফসা (রাঃ) বিধবা হয়ে যান। ইদ্দত পুরো হলে হযরত ওমর ফারুক (রাঃ) তাঁর দ্বিতীয় বিয়ের চিন্তা করলেন। একদিন রাসূলে করিম (সাঃ) নির্জনে হযরত আবুবকর সিদ্দিকের (রাঃ) সঙ্গে হযরত হাফসার (রাঃ) প্রসঙ্গ উথাপন করলেন। হযরত ওমর (রাঃ) ব্যাপারটি অবহিত ছিলেন না। সুতরাং তিনি হযরত আবুবকরকে (রাঃ) হযরত হাফসাকে (রাঃ) বিয়ে করার জন্য বললেন। কিন্তু তিনি চুপ রইলেন। এতে হযরত ওমর (রাঃ) মনোক্ষুণ্ন হলেন। অতঃপর তিনি হযরত ওসমানের (রাঃ) নিকট গেলেন। সে সময় হযরত রোকেয়া (রাঃ) বিনতে

www.bjilibrary.com

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) মারা যান। হযরত ওমর (রাঃ) তাঁকে নিজের কলিজার টুকরাকে বিয়ে করতে বলেন। হযরত ওসমান (রাঃ) বলেন, আমি এখন বিয়ে করতে চাই না। এ সময় হযরত ওমর ফারুক (রাঃ) রাসূলের (সাঃ) খিদমতে হাজির হয়ে সকল ঘটনাবর্ণনাকরলেন।

হুজুর (সাঃ) বললেনঃ "হাফসার (রাঃ) বিয়ে আবুবকর (রাঃ) এবং ওসমান (রাঃ) উভয় থেকে উত্তম ব্যক্তির সঙ্গে কেন হতে পারবে না।"

এরপর হুজুর (সাঃ) হযরত হাফসাকে (রাঃ) বিয়ে করেন এবং নিজের দ্বিতীয় কন্যা হযরত উম্মে কুলছুমকে (রাঃ) হযরত ওসমানের (রাঃ) সঙ্গে বিয়ে দেন।

সহিহ বুখারীতে আছে, একবার রাসূলে করিম (সাঃ) উম্মুল মুমিনিন হযরত যয়নব (রাঃ) বিনতে জাহাশের নিকট নিয়মের অতিরিক্ত সময় কাটিয়েছিলেন। কেননা, তিনি সেখানে মধুপানে ব্যস্ত ছিলেন। হাদিয়া হিসেবে এই মধু কেউ তাঁকে পাঠিয়েছিল। স্বাভাবিকভাবে হযরত আয়েশা (রাঃ) এতে ঈর্ষান্বিত হলেন। হযরত হাফসার (রাঃ) সঙ্গে তাঁর খুব বন্ধুত্ব ছিল। সুতরাং তিনি হযরত হাফসার (রাঃ) নিকট গেলেন, ঘটনা বর্ণনা করলেন এবং বললেন, যখন রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তোমার নিকট আসবেন তখন বলবে, "ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি কি মাগাফির খেয়েছেন?" এতে একটি সূক্ষ্ম ইঙ্গিত ছিল। মাগাফির এক ধরনের ফুল। এই ফুলে মৌমাছি বসে। ফুলটিতে কিছুটা অস্বস্তিকর গন্ধ থাকে এবং রাসূলে আকরামের (সাঃ) দুর্গন্ধ খুবই অপছন্দনীয় ছিল। এ কথা বলার উদ্দেশ্য ছিল, হুজুর (সাঃ) যাতে মনে করেন হযরত যয়নবের (রাঃ) নিকট থেকে যে মধু খেয়েছিলেন তার কারণে মাগাফিরের গন্ধ পবিত্র শরীর থেকে বের হ চ্ছিল। হযরত হাফসা (রাঃ) রাসূলকে (সাঃ) সেই কথা বললেন। হুজুর (সাঃ) তাঁর পবিত্র শরীর থেকে মাগাফিরের গন্ধ বেরুচ্ছে এ কথা শুনে খুব অসন্তুষ্ট হলেন এবং বললেন, ভবিষ্যতে আমি কখনো মধু খাবো না। এতে তাহরিমের আয়াত নাযিল হয়ঃ

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ (سورة تحريم)

হে নবী। নিজের স্ত্রীদের সন্তুষ্টির জন্য তুমি খোদা কর্তৃক হালালকৃত বস্তুকে নিজের ওপর হারাম করছো কেন।"

কতিপয় নেতৃস্থানীয় মুফাসসির وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا এর তাফসির করে লিখেছেন যে, হুজুর (সাঃ) হাফসার (রাঃ) নিকট কোন গোপন কথা বলেছিলেন। কিন্তু তিনি তা ফাঁস করে দেন। কাজী সালমান মানসুরপুরী "

রাহমাতুললিল আলামীন" গ্রন্থে মত প্রকাশ করে বলেছেন যে, আল্লাহ রাব্বুল আলামীন নিজের হাবিবের (সাঃ) পারিবারিক ইজ্জত ও হুরমতের প্রতি যেখানে এত গুরুত্ব দিয়েছেন এবং কারোর নাম উল্লেখ করেননি সেখানে আমাদেরকে সে ব্যাপারে সাহস দেখানো উচিত নয়।

সহিহ বুখারীর এক রাওয়ায়েতে আছে, হযরত হাফসার (রাঃ) মেজাজে কিছুটা তিরিক্ষেপনা ছিল এবং কখনো কখনো রাসূলকেও (সাঃ) কড়া জবাব দিতেন। একদিন তাঁর শ্রদ্ধেয় পিতা হযরত ওমর ফারুক (রাঃ) একথা জানতে পেরে হযরত হাফসাকে (রাঃ) জিজ্ঞেস করলেন, "আমি শুনেছি তুমি রাসূলকে (সাঃ) সমানে সমান জবাব দাও। এ কথা কি ঠিক?"

হযরত হাফসা (রাঃ) জবাব দিলেনঃ " অবশ্যই আমি এ ধরনের করে থাকি।"

হযরত ওমর ফরুক (রাঃ) তাঁকে বললেনঃ "বেটি, খবরদার! আমি তোমাকে আল্লাহর ভয় দেখাচ্ছি। তুমি ঐ মহিলার (হযরত আয়েশা) সমকক্ষ হতে চেষ্টা করো না। রাসূলের (সাঃ) মহব্বতের কারণে তাঁর নিজের রূপের ওপর গৌরব আছে।"

হযরত হাফসা (রাঃ) রাসূলে করিমকে (সাঃ) সকল ধরনের মাসয়ালা নির্দ্বিধায় জিজ্ঞাসা করতেন। একবার হুজুর (সাঃ) বললেনঃ "বদর ও হুদায়বিয়ায় অংশগ্রহণকারীরা জাহান্নামে প্রবেশ করবে না।

হযরত হাফসা (রাঃ) বললেন, "ইয়া রাসূলাল্লাহ! আল্লাহ তো বলেন, وَإِنْ مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا "তোমাদের মধ্যে সকলেই জাহান্নামে প্রবেশ করবে।"

হুজুর (সাঃ) বললেনঃ হাঁ, কিন্তু এও তো আছে

ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوا وَّنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا

"অতঃপর আমরা পরহেজগারদেরকে নাজাত দেব এবং জালেমদেরকে হাটুর ওপর উপুড় করে ছেড়ে দেব।"

মেজাজের তিরিক্ষেপনা সত্ত্বেও হযরত হাফসা (রাঃ) অত্যন্ত খোদাভীরু ছিলেন এবং বেশীর ভাগ সময় আল্লাহর ইবাদাতে কাটাতেন। হাফিজ ইবনে আব্দুল বার (রঃ) "আল-ইসতিয়াব" গ্রন্থে এই হাদীস তাঁর শানে বয়ান করেছেনঃ একবার

জিবরিল আমিন (আঃ) হযরত হাফসার (রাঃ) প্রসঙ্গে এই শব্দাবলী হুজুরের (সাঃ) সম্মুখে উল্লেখ করেনঃ "সে খুব ইবাদতকারী, রোযা রাখনেওয়ালী। (হে মুহাম্মাদ) সে জান্নাতেও আপনার স্ত্রী।"

রাসূলে করিম (সাঃ) হযরত হাফসার (রাঃ) শিক্ষার বিশেষ ব্যবস্থা করেছিলেন। মুসনাদে আহমদে (রঃ) আছে, হুজুরের (সাঃ) নির্দেশ অনুযায়ী হযরত শাফা' (রাঃ) বিনতে আব্দুল্লাহ আদবিয়া তাঁকে লিখা শিখিয়েছিলেন। ইমাম আহমদ এও লিখেছেন যে, হযরত শাফা' (রাঃ) তাঁকে পিঁপড়া কাটার মন্ত্রও শিখিয়েছিলেন। কতিপয় চরিতকার লিখেছেন, প্রিয় নবী (সাঃ) কুরআনে হাকিমের সকল লিখিত অংশ একত্রিত করে হযরত হাফসার (রাঃ) নিকট রেখে দিয়েছিলেন। এই সকল অংশ হুজুরের (সাঃ) ওফাতের পর সারা জীবন তাঁর নিকট ছিল। এটি একটি বিরাট মর্যাদার ব্যাপার ছিল। হযরত হাফসা (রাঃ) এই মর্যাদায় ভূষিত হয়েছিলেন।

হযরত হাফসা (রাঃ) দাজ্জালকে খুব ভয় পেতেন। সহিহ মুসলিমে বর্ণিত আছে যে, মদীনায় ইবনে ছাইয়াদ নামক এক ব্যক্তি ছিলো। তারমধ্যে দাজ্জালের কিছু চিহ্ন বিদ্যমান ছিল। একদিন সে হযরত আব্দুল্লাহ (রাঃ) বিন ওমরকে (রাঃ) রাস্তায় পেল। তিনি তার কতিপয় কাজে ঘৃণা প্রকাশ করলেন। ইবনে ছাইয়াদ হযরত আব্দুল্লাহ বিন ওমরকে (রাঃ) রাস্তায় আটকে দাঁড়িয়ে গেল। তিনি তাকে পেটানো শুরু করলেন। হযরত হাফসা (রাঃ) খবর পেয়ে ভাইকে বলতে লাগলেনঃ

"তুমি তাকে কেন জড়িত কর। তোমার কি জানা নেই যে, প্রিয় নবী (সাঃ) বলেছেন, ক্রোধই দাজ্জালের আগমনের হেতু হবে।"

হযরত হাফসা (রাঃ) ৪৫ হিজরীতে মদীনায় ওফাত পান। মদীনার গবর্নর মারওয়ান নামাযে জানাযা পড়ান এবং কিছুদূর পর্যন্ত মূর্দা কাঁধে করে নিয়ে যান। এরপর হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) জানাযা কবর পর্যন্ত নিয়ে যান। অতঃপর উম্মুল মুমিনিনের (রাঃ) ভাই হযরত আব্দুল্লাহ বিন ওমর (রাঃ) এবং ভ্রাতুষ্পুত্ররা লাশ কবরেনামান।

ওফাতের পূর্বে হযরত আব্দুল্লাহকে (রাঃ) ওসিয়ত করেন যে, গাবায় অবস্থিত তাঁর সম্পত্তি সাদকা করে ওয়াকফ করে দিতে। হুজুরের (সাঃ) ঔরসে কোন সন্তান তাঁর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেনি।

জ্ঞান ও ফজিলতের দিক থেকেও হযরত হাফসা (রাঃ) অত্যন্ত উঁচু মর্যাদায় সমাসীন ছিলেন। তিনি ৬০টি হাদীস বর্ণনা করেছেন।

www.bjilibrary.com

উম্মুল মুমিনিন হযরত যয়নব (রাঃ) বিনতে খোযায়মা

নাম যয়নব (রাঃ)। লকব উম্মুল মাসাকিন। খোযায়মা বিন হারিছ বিন আব্দুল্লাহ বিন আমর বিন আবদি মান্নাফ বিন হিলাল বিন আমের বিন ছা'ছা'র কন্যা ছিলেন।

প্রথম থেকেই তিনি প্রশস্ত হৃদয় ও উদার হাতের অধিকারিনী ছিলেন। ফকির-মিসকিনদের সাহায্যের জন্য সব সময় এক পায়ে খাড়া থাকতেন এবং ভুখাদেরকে অত্যন্ত উদারতার সাথে খাবার খাওয়াতেন। এইসব গুণাবলীর জন্য তিনি জনসাধারণে "উম্মুল মাসাকিন" উপাধিতে মশহুর হয়ে গিয়েছিলেন। হুজুরের (সাঃ) ফুফাতো ভাই হযরত আব্দুল্লাহ (রাঃ) বিন জাহাশের সঙ্গে তাঁর প্রথম বিয়ে হয়। হযরত আব্দুল্লাহ (রাঃ) বিন জাহাশও একজন জালিলুল কদর সাহাবী ছিলেন। তৃতীয় হিজরীতে ওহোদের যুদ্ধের প্রাক্কালে তিনি এই দোয়া করেছিলেনঃ

"হে খোদা। তুমি আমাকে এমন এক প্রতিপক্ষ দাও যে খুব বাহাদুর। আমি তোমার রাস্তায় যুদ্ধ করতে করতে তার হাতে কতল হয়ে যাবো এবং সে আমার ঠোঁট, নাক ও কান কেটে ফেলবে এবং আমি এই অবস্থায় তোমার সঙ্গে মিলিত হবো। তখন তুমি আমাকে জিজ্ঞাসা করবে যে, হে আব্দুল্লাহ। তোমার ঠোঁট, নাক ও কান কেন কাটা হয়েছে? আমি আরজ করবো, হে খোদা। তোমার এবং তোমার রাসূলের জন্য।"

আল্লাহর দরবারে তাঁর দোয়া কবুল হয় এবং মুলহিম গাইবী তাঁকে শাহাদাতের সুসংবাদ দেন। বস্তুত তিনি বলেনঃ "খোদার কসম! আমি শত্রুর সঙ্গে লড়াই করবো। এমতাবস্থায় সে আমাকে হত্যা করে আমার লাশ বিকৃত করবে।"

সুতরাং ওহোদের প্রান্তরে হযরত আব্দুল্লাহ বিন জাহাশ (রাঃ) এত উৎসাহ-উদ্দীপনার সাথে যুদ্ধ করেছিলেন যে, তরবারী ভেঙ্গে খান খান হয়ে গিয়েছিল। হুজুর (সাঃ) তাঁকে খেজুরের একটি ডাল দিয়েছিলেন। তিনি এই ডালকে তলোয়ার হিসেবে ব্যবহার করেছিলেন। এইভাবেই যুদ্ধ করতে করতে তিনি শাহাদাতের পেয়ালা পান

www.bjilibrary.com

করেন। মুশরিকরা তাঁর ঠোঁট, নাক এবং কান কেটে ফেলে। আর এমনিভাবে তাঁর আকাংখা পূরণ হয়।

হযরত আব্দুল্লাহর (রাঃ) শাহাদাতের পর রাসূলে করিম (সাঃ) সেই বছরেই হযরত যয়নব (রাঃ) বিনতে খোযায়মাকে বিয়ে করেন। ১২ আওকিয়া মোহরানা নির্ধারিত হয়। সে সময় হযরত যয়নবের (রাঃ) বয়স প্রায় ৩০ বছর ছিল।

প্রিয় নবীর (সাঃ) সঙ্গে বিয়ের দু'তিন মাসের মধ্যেই তাঁর পরপারের ডাক এলো। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) স্বয়ং নামাযে জানাযা পড়ালেন এবং জান্নাতুল বাকীতে দাফন করলেন। হযরত খাদিজাতুল কুবরার (রাঃ) পর হযরত যয়নব (রাঃ) বিনতে খোযায়মাহর রাসূলে করিমের (সাঃ) হাতে বিদায় হওয়ার সৌভাগ্য হয়েছিল। অন্যান্য স্ত্রী (রাঃ) হুজুরের (সাঃ) ওফাতের পর ওফাত পান।

www.bjilibrary.com

উম্মুল মুমিনিন হযরত উম্মে সালমা (রাঃ)

নাম হলো হিন্দ। কুনিয়ত উম্মে সালমাহ (রাঃ)। কোরেশের মাখজুম বংশোদ্ভূত ছিলেন। নসবনামা হলোঃ হিন্দ বিনতে আবি উমাইয়া বিন মুগিরাহ বিন আব্দুল্লাহ বিন ওমর বিন মাখজুম। মাতার নাম ছিল আতিকা বিনতে আমের। তিনি ফিরাছ বংশের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত ছিলেন।

হযরত উম্মে সালমার (রাঃ) পিতা আবু উমাইয়া একজন বিত্তশালী ও দানবীর ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর বদান্যতা এবং দানশীলতার কথা খুবই প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল। বিশ বিশজন মানুষ তাঁর দস্তরখানে পালিত হতো। কোন সময়ে সফরে গেলে সকল সাথীর খাদ্য এবং অন্যান্য প্রয়োজন পূরণের দায়িত্ব তাঁর ওপরই ন্যস্ত থাকতো। এইসব উদারতার জন্য তিনি 'যাদুর রাকিব' অর্থাৎ সফরকারীদের সম্পদ উপাধিতে ভূষিত ছিলেন। সমগ্র কোরেশ গোত্রের মধ্যে তাঁকে অত্যন্ত শ্রদ্ধার চোখে দেখাহতো।

হযরত উম্মে সালমার (রাঃ) প্রথম বিয়ে হয়েছিল চাচাতো ভাইয়ের সঙ্গে। তাঁর নাম ছিল আবু সালমা (রাঃ) বিন অব্দুল আসাদ। তিনি অত্যন্ত ভদ্র প্রকৃতির যুবক ছিলেন। রাসূলে করিম (সাঃ) যখন হকের তাবলীগের কাজ শুরু করলেন তখন তাঁর মত পবিত্র স্বভাবের মানুষের পক্ষে এই দাওয়াতে প্রভাবিত না হওয়াটা অস্বাভাবিক ছিল। তিনি নিজের গোত্রের বিরোধিতা ও অন্যান্য মুসিবত মাথায় নিয়ে কালবিলম্ব না করে ইসলাম গ্রহণ করেন। হযরত উম্মে সালমাও (রাঃ) সেই যুগেই ইসলাম গ্রহণ করেন। এইভাবে এই দম্পতি মহান মর্যাদার অধিকারী হয়ে আস-সাবিকুনাল আওয়ালুন হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেন। এই সকল পবিত্র আত্মার মানুষ ইসলামের জন্য সীমাহীন দুঃখ-কষ্ট ও মসিবত সহ্য করলেও হক পথ থেকে বিন্দুমাত্রও বিচ্যুত হননি। মুসলমানদের সংখ্যা যতই বৃদ্ধি পেতে লাগলো কাফেররাও নির্যাতনের মাত্রা বাড়িয়ে দিলো। তাদের নির্যাতন যখন সীমা ছাড়িয়ে গেল তখন রাসূলে করিম (সাঃ) সাহাবায়ে কিরামকে (রাঃ) হাবশায় হিজরত করার অনুমতি দিলেন। প্রিয় নবী (সাঃ) বললেন, যারা নিজের দ্বীন এবং জীবন বাঁচানোর জন্য

www.bjilibrary.com

হিজরত করতে চায় তারা যেন হাবশা চলে যায়। সেখানে একজন নেক দিল খৃষ্টান বাদশাহর শাসন প্রতিষ্ঠিত রয়েছে।

হযরত আবু সালমা (রাঃ) এবং উম্মে সালমা (রাঃ) সে সময় ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। সুতরাং (কতিপয় রাওয়ায়েত অনুযায়ী) তাঁরাও অন্যান্য মুসলমানের সঙ্গে হাবশা রওয়ানা হয়ে গেলেন। কিছুদিন সেখানে অতিবাহিত করার পর ফিরে এলেন এবং মদীনায় হিজরতের ইরাদা করলেন। তখন হযরত আবু সালমার (রাঃ) নিকট শুধু একটি উট ছিল। তার ওপর তিনি হযরত উম্মে সালমা (রাঃ) এবং শিশুপুত্র সালমাকে চড়ালেন ও নিজে উটের রশি ধরে পদব্রজে রওয়ানা দিলেন। কিছু দূর যেতে না যেতেই উম্মে সালমার (রাঃ) বংশের লোকেরা অর্থাৎ বনু মুগিরাহর লোকজন এ কথা জানতে পেল। তাঁরা এসে উট ঘিরে দাঁড়ালো এবং আবু সালমাকে (রাঃ) বললো, তুমি যেতে পার। কিন্তু আমাদের মেয়েকে তোমার সাথে যেতে দিতে পারি না। এ কথা বলে তারা আবু সালমার (রাঃ) হাত থেকে উটের রশি কেড়ে নিল এবং উম্মে সালমাকে (রাঃ) জোরপূর্বক নিজেদের সাথে নিয়ে চললো। ইত্যবসরে আবু সালমার (রাঃ) বংশের লোকেরা এসে পৌঁছলো। তারা উম্মে সালমার (রাঃ) শিশু পুত্র সালমাকে হস্তগত করলো এবং বনু মুগিরাহকে বললো, তোমরা যদি নিজেদের মেয়েকে আবু সালমার (রাঃ) সঙ্গে যেতে না দাও তাহলে আমরা আমাদের কবিলার শিশু পুত্রকে তোমাদের নিকট দেব না। তারা আবু সালমাকে (রাঃ) বললো, "একাকী তোমার যেখানে ইচ্ছা সেখানে চলে যাও।"

সে যুগে সাহাবীরা (রাঃ) মদীনায় হিজরতের অনুমতি পেয়েছিলেন। হযরত আবু সালমা (রাঃ) স্ত্রী ও পুত্র ছাড়াই মদীনার দিকে রওয়ানা হয়ে গেলেন। উম্মে সালমা (রাঃ) বনু মুগিরাহর নিকট এবং তাঁর শিশুপুত্র বনু আব্দুল আসাদের নেকট রয়ে গেল। দ্বীনে হকের খাতিরে পিতা, পুত্র এবং স্ত্রী তিনজন বিচ্ছিন্নতার মুসিবত সহ্য করছিলেন। স্বাভাবিকভাবেই হযরত উম্মে সালমা (রাঃ) স্বামী এবং শিশুর নিকট থেকে বিচ্ছিন্নতার কারণে মনোকষ্টে ভুগছিলেন। তিনি প্রতিদিন সকালে ঘর থেকে বের হয়ে সারাদিন একটি টিলার ওপর বসে কান্নাকাটি করতেন। পুরো একটি বছর এভাবেই কেটে গেল। একদিন বন মুগিরাহর জনৈক প্রভাবশালী ও রহমদিল ব্যক্তি তাঁকে এই অবস্থায় দেখে খুবই প্রভাবিত হলেন। তিনি নিজের গোত্রের লোকদেরকে একত্রিত করে বললেন, "এই মেয়ে আমাদেরই রক্তের অংশ বিশেষ। আমরা কতদিন এই অসহায়াকে স্বামী ও পুত্র থেকে বিচ্ছিন্ন রাখবো! হে বনু মুগিরাহ! খোদার কসম, আমাদের কবিলা সম্ভ্রান্ত এবং বাহাদুর। তারা জুলুমকে কখনো ভালো জানে না।"

www.bjilibrary.com

এই নেকদিল ব্যক্তির বক্তৃতা শুনে অন্যদের মনেও দয়ার উদ্রেক হলো। তারা উম্মে সালমাকে (রাঃ) মদীনায় যাওয়ার অনুমতি দিলো। বনু আব্দুল আসাদ যখন এই ঘটনা শুনলো তখন তাদের মনেও রহম সৃষ্টি হলো এবং সালমাকে মায়ের নিকট পাঠিয়ে দিল। হযরত উম্মে সালমা (রাঃ) শিশু পুত্রকে কোলে নিয়ে উটে সওয়ার হয়ে মদীনার দিকে রওয়ানা দিলেন। পথিমধ্যে তানয়িম নামক স্থানে ওসমান বিন তালহা বিন আবি তালহা নামক এক শরীফ লোকের সঙ্গে সাক্ষাৎ ঘটলো। তিনি যখন উম্মে সালমাকে (রাঃ) এক শিশু পুত্রসহ একাকী সফর করতে দেখলেন তখন তাঁর অন্তর বলে উঠলো, "হে ওসমান! কোরেশের এক মহিলা একাকী সফর করবে আর তুমি তাঁকে সাহায্য করবে না এটা পৌরুষের কথা নয়।" তিনি উম্মে সালমার (রাঃ) উটের রশি ধরলেন এবং আস্তে আস্তে মদীনার দিকে অগ্রসর হলেন। যখনই কোথাও বিশ্রাম নিতেন তখনই তিনি কোন বৃক্ষের পাশে চলে যেতেন এবং যাওয়ার সময় উট তৈরী করে নিয়ে আসতেন। মোট কথা এভাবে চলতে চলতে তাঁরা কুবা পৌছলেন। আবু সালমা (রাঃ) সেখানেই অবস্থান করছিলেন। ওসমান বিন তালহা সেখান থেকে মক্কা ফিরে গেলেন এবং উম্মে সালমা (রাঃ) বিছিন্ন স্বামীর সঙ্গে মিলিত হলেন। তিনি নেক চরিত্রের স্ত্রী এবং পুত্রকে পেয়ে খোদার শুকরিয়া আদায় করলেন।

হযরত উম্মে সালমা (রাঃ) ওসমান বিন তালহার নেক কাজকে সব সময় স্মরণ রেখেছিলেন। তিনি বলতেন, "আমি ওসমান বিন তালহার চেয়ে শরীফ মানুষ আরদেখিনি।"

তৃতীয় হিজরীতে হযরত আবু সালমা (রাঃ) ওহোদের যুদ্ধে শরীক হন এবং তাতে চরম বীরত্ব প্রদর্শন করেন। একটি বিষাক্ত তীরের আঘাত লাগে তাঁর বাহুতে। ফলে তিনি আহত হন। চিকিৎসার পর সাময়িকভাবে সুস্থ হন। কিন্তু কয়েক মাস পর ক্ষতস্থানে আবার ব্যথা দেখা দেয়। আর এই ব্যথার কষ্টেই তিনি পরপারে যাত্রা করেন।

তাঁর ওফাতে হযরত উম্মে সালমা (রাঃ) খুবই ব্যথিত হন। কাতর হয়ে তিনি বারবার বলতেন, "হায়! হায়! বিদেশ বিভূঁয়ে কেমন মৃত্যু এলো!"

প্রিয় নবী (সাঃ) যখন হযরত আবু সালমার (রাঃ) মৃত্যুর খবর পেলেন তখন স্বয়ং তাঁর বাড়ী গেলেন এবং উম্মে সালমাকে (রাঃ) সবরের তালকিন দিলেন এবং বললেন, আবু সালমার মাগফিরাতের জন্য দোয়া কর। মৃত্যুর সময় হযরত আবু সালমার (রাঃ) চোখ খোলা অবস্থায় ছিল। হুজুর (সাঃ) নিজের পবিত্র হাত দিয়ে সেই

www.bjilibrary.com

চোখ বন্ধ করলেন। তাঁর জানাযার নামায পড়ানোর সময় হুজুর (সাঃ) ৯ তাকবীর বললেন। লোকজন জিজ্ঞেস করলো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি ৯ তাকবির কেন বললেন? তিনি বললেন, "আবু সালমা হাজার তাকবিরের যোগ্য।"

হযরত আবু সালমা (রাঃ) অত্যন্ত মর্যাদাবান সাহাবী ছিলেন। একবার হযরত উম্মে সালমা (রাঃ) হযরত আবু সালমাকে (রাঃ) বললেন, " আমি শুনেছি, যদি কোন মহিলার স্বামী তার জীবদ্দশায় মারা যায় এবং সেই মহিলা যদি দ্বিতীয়বার বিয়ে না করে তাহলে আল্লাহ তাকেও জান্নাতে দাখিল করান। এমনিভাবে কোন পুরুষের জীবদ্দশায় যদি তার স্ত্রী মারা যায় এবং সেই পুরুষ যদি দ্বিতীয়বার বিয়ে না করে তাহলে আল্লাহ পাক সেই পুরুষকেও জান্নাতুল ফেরদাউসে স্থান দেন। এসো আমরা দু'জন ওয়াদা করি যে, আমাদের মধ্যে যে-ই প্রথমে মারা যাবে দ্বিতীয় জন তার পর একাকীত্বের জীবন কাটাবে।"

হযরত আবু সালমা বললেন, " তুমি কি আমার কথা মানবে?"

হযরত উম্মে সালমা (রাঃ) জবাব দিলেন, "কেন মানবো না। এরচেয়ে বড় সৌভাগ্য আমার জন্য আর কি হতে পারে!"

হযরত আবু সালমা (রা) বললেন, তাহলে শোন! আমি যদি প্রথমে মারা যাই, তাহলে তুমি আমার পরে অবশ্যই বিয়ে করবে।"

অতঃপর হযরত আবু সালমা (রাঃ) দোয়া করলেনঃ "হে খোদা! আমি যদি উম্মে সালমার জীবদ্দশায় মারা যাই তাহলে তুমি তাকে আমার চেয়ে উত্তম ব্যক্তিকে স্থলাভিষিক্ত করো।"

হযরত উম্মে সালমা (রাঃ) ভাবতেন, আবু সালমার (রাঃ) চেয়ে উত্তম আর কে হতে পারে! যাহোক, হুজুর (সাঃ) তাঁকে বিয়ে করেন।

ইবনে সায়াদ (রঃ) বর্ণনা করেছেন, হযরত আবু সালমার ওফাতের কিছুদিন পর হযরত আবুবকর সিদ্দিক (রাঃ) হযরত উম্মে সালমার (রাঃ) কথা চিন্তা করে বিয়ের পয়গাম প্রেরণ করেন। কিন্তু তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেন। নবী করিমও (সাঃ) হযরত উম্মে সালমার দুঃখ ও নৈরাশ্যের ব্যাপারে খুবই প্রভাবিত ছিলেন এবং আবু সালমা (রাঃ) ও উম্মে সালমা (রাঃ) রাহে হকে যে দুঃখ-কষ্ট স্বীকার করেছিলেন সে অনুভূতিও তীব্র ছিল। সুতরাং সারওয়ারে আলম (সাঃ) হযরত ওমর ফারুকের (রাঃ) মাধ্যমে উম্মে সালমার (রাঃ) নিকট বিয়ের পয়গাম প্রেরণ করেন। হযরত উম্মে সালমা (রাঃ) এই পয়গাম কবুল করেন এবং চতুর্থ হিজরীর শওয়াল মাসে

www.bjilibrary.com

বিয়ে সুসম্পন্ন হয়। বিয়ের পর তাঁকে হযরত যয়নব (রাঃ) বিনতে খোযায়মার গৃহে আনা হয়। ইতিমধ্যে তিনি ইন্তেকাল করেছিলেন। হযরত উম্মে সালমা (রাঃ) প্রথম দিনই স্বহস্তে খানা তৈরী করেছিলেন।

হুজুর (সাঃ) উম্মে সালমাকে (রাঃ) খুরমার ছাল ভরা একটি বালিশ, দু'টো মশক এবং আটা পেশার দু'টি যাঁতা প্রদান করেছিলেন।

হুজুরের (সাঃ) সঙ্গে বিয়ের পরও তিনি প্রথম স্বামীর সন্তানদেরকে অত্যন্ত স্নেহ ও যত্নের সাথে লালন-পালন করতেন। একবার রাসূলে করিমকে (সাঃ) জিজ্ঞাসা করলেন, "ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি কি এইসব সন্তান প্রতি-পালনের সওয়াব পাবো"? তিনি বললেন, "হাঁ।"

হযরত ছফিনা (রাঃ) হযরত উম্মে সালমার (রাঃ) গোলাম ছিলেন। তিনি ছফিনাকে (রাঃ) আজীবন নবী করিমের (সাঃ) খিদমত করার শর্তে আযাদ করে দিয়েছিলেন।

হযরত আবু লুবাবা আনসারী (রাঃ) এক সাদা অন্তরের সাহাবী ছিলেন। খন্দকের যুদ্ধের পর হুজুর (সাঃ) বনু কুরায়জার খারাব ও প্রতিশ্রুতি ভঙ্গকারী ইহুদীদেরকে অবরোধ করলেন। এ সময় তিনি হযরত আবু লুবাবাকে (রাঃ) ইহুদীদের সঙ্গে আলোচনার জন্য প্রেরণ করলেন। আলোচনার সময় তিনি এমন এক ইঙ্গিত দিয়ে বসলেন যে, হুজুর (সাঃ) ইহুদীদেরকে হত্যার ইচ্ছা পোষণ করেন। হযরত আবু লুবাবা (রাঃ) পরে অনুভব করতে পারলেন যে, তিনি মুসলমানদের গোপনীয়তা ফাঁস করে দিয়েছেন। এর ফলে তিনি অত্যন্ত দুঃখিত হলেন। ভ্রান্তি অপনোদনের জন্য তিনি মসজিদে নববীর খুঁটির সঙ্গে নিজেকে বাঁধলেন এবং তওবা ও ইসতিগফারে মশগুল হয়েপড়লেন।

কিছুদিন পর প্রিয় নবী (সাঃ) হযরত উম্মে সালমার (রাঃ) নিকট তাশরীফ নিলেন। সকাল বেলা পবিত্র চেহারায় মুচকি হাসি লেপ্টে ছিল। ফরমালেন, আজ আবু লুবাবার (রাঃ) তওবা কবুল হয়েছে।

হযরত উম্মে সালমাও (রাঃ) সীমাহীন খুশী হলেন। আরজ করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ। অনুমতি হলে আবু লুবাবাকে (রাঃ) সুসংবাদটা শুনিয়ে দিই।"

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন, " যদি চাও, তাহলে শুনিয়ে দাও।"

হযরত উম্মে সালমা (রাঃ) নিজের হুজরার দরজায় দাঁড়িয়ে বললেন, "আবু লুবাবা, তোমার প্রতি মুবারকবাদ। তোমার তওবা কবুল হয়েছে।"

www.bjilibrary.com

হযরত আবু লুবাবা (রাঃ) কতৃজ্ঞতায় সিজদাবনত হলেন। অন্যান্য সাহাবীর মধ্যেও তৎক্ষণাৎ এই খবর ছড়িয়ে পড়লো এবং তাঁরা সকলেই আবু লুবাবাকে মুবারকবাদ দানের জন্য মসজিদে নববীতে একত্রিত হলেন।

একদিন নবী করিম (সাঃ) হযরত উম্মে সালমার (রাঃ) গৃহে অবস্থান করছিলেন। এমন সময় আয়াতে তাতহির

إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ

অবতীর্ণ হলো। হুজুর (সাঃ) হযরত ফাতিমাতুজ জোহরা (রাঃ), হযরত আলী কাররামাল্লাহু ওয়াজহাহু, হযরত ইমাম হাসান (রাঃ) এবং হযরত ইমাম হোসাইনকে (রাঃ) ডেকে আনলেন। তাঁদের ওপর নিজের কম্বল দিলেন এবং বললেন; " ইলাহি আমার। এরা আমার আহলে বাইত।" হযরত উম্মে সালমা (রাঃ) জিজ্ঞেস করলেন," ইয়া রাসূলাল্লাহ। আমিও কি আহলে বাইত?" তিনি বললেন, " তুমি তোমার স্থানে আছ এবং ভালো আছ।"

অন্য এক রাওয়ায়েতে অছে যে তিনি (সাঃ) জবাবে বলেছিলেনঃ "হাঁ, بَلَىٰ إِنْ شَاءَ اللَّهُ খোদা চাইলে।"

৬ষ্ঠ হিজরীতে রাসূলে করিম (সাঃ) ১৪০০ সাহাবী সমভিব্যাহারে বাইতুল্লাহর হজ্বের জন্য মক্কার দিকে রওয়ানা হলেন। কোরেশরা এ খবর শুনে মুসলমানদেরকে বাধা দানের সংকল্প প্রকাশ করলো। হুজুর (সাঃ) কোরেশদের সংকল্পের কথা জানতে পেরে মক্কার কয়েক মাইল দূরে হুদাইবিয়া নামক স্থানে অবস্থান নিলেন এবং হযরত ওসমান জুন্নুরাইনের (রাঃ) মাধ্যমে কোরেশদেরকে পয়গাম পাঠালেন যে, শুধুমাত্র হজ্ব করাই আমাদের উদ্দেশ্য। লড়াই করার কোন ইচ্ছা নেই। হযরত ওসমানের (রাঃ) গমনের পর রটে খেল যে কোরেশরা তাঁকে শহীদ করে ফেলেছে। এ সময় নবী করিম (সাঃ) সকল সাহাবীর (রাঃ) নিকট থেকে জীবন কুরবানীর বাইয়াত গ্রহণ করেন। এই বাইয়াতে বলা হয় যে, মক্কার কোরেশদের বিরুদ্ধে জুলুমের প্রতিশোধ গ্রহণার্থে যদি লড়াইয়ের প্রয়োজন হয় তাহলে জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত যুদ্ধ করা হবে। ইতিহাসে এই বাইয়াত "বাইয়াতে রেদওয়ান" নামে প্রসিদ্ধ। এই বাইয়াতের কথা শুনে কোরেশরা ভীত হয়ে পড়লো এবং তারা নিম্নলিখিত শর্তে মুসলমানদের সঙ্গে সন্ধি করে নিলঃ

(১) দশ বছর পর্যন্ত পারস্পরিক সন্ধি থাকবে। উভয় পক্ষ থেকে কারোর গমনাগমনে বাধা –বিঘ্ন থাকবে না।

www.bjilibrary.com

(২) আগামী বছর মুসলমানরা বাইতুল্লাহর তাওয়াফের অনুমতি পাবে। কিন্তু তাওয়াফের সময় তাদের নিকট হাতিয়ার থাকবে না।

(৩) কোরেশদের সঙ্গে মিশে যাওয়া অথবা মুসলমানদের সমর্থন করা প্রশ্নে সকল গোত্র স্বাধীন থাকবে। মিত্র গোত্রসমূহও এই অধিকার পাবে।

(৪) কোরেশদের কোন ব্যক্তি যদি মুসলমান হয়ে রাসূলে করিমের (সাঃ) নিকট চলে যায়, তাহলে কোরেশরা চাইবামাত্র তাকে ফিরিয়ে দিতে হবে। কিন্তু যদি কেউ মুরতাদ হয়ে বা ধর্মদ্রোহিতা করে কোরেশের নিকট চলে যায় তাহলে কোরেশরা তাকে ফেরত দেবে না।

রাসূলে করিম (সাঃ) খোদার নির্দেশ অনুযায়ী এই সকল শর্ত মেনে নিলেন। কিন্তু মুসলমানরা আল্লাহর মুসলিলহাত বুঝতে অক্ষম হলো। এইসব শর্তে তাঁদের মন ভেঙ্গে গেল। কেননা তাঁরা এইসব শর্তকে মুসলমানদের স্বার্থ বিরোধী মনে করলেন। সন্ধির পর হুজুর (সাঃ) মুসলমানদেরকে কুরবানী করার নির্দেশ দিলেন। ভগ্নহৃদয় সাহাবীরা (রাঃ) কুরবানী প্রদানে কিছুটা চিন্তা–ভাবনা করলেন। হুজুর (সাঃ) এতে পেরেশান হলেন। হযরত উম্মে সালমা (রাঃ) তাঁর সঙ্গে ছিলেন। তিনি তার নিকট পরিস্থিতির কথা বললেন। এ সময় হযরত উম্মে সালমা (রাঃ) পরামর্শ দিয়ে বললেন, "ইয়া রাসূলাল্লাহ! মুসলমানরা আপনার ফরমান ভালোভাবে বুঝতে পারেননি। আপনি স্বয়ং বাইরে বেরিয়ে কুরবানী করুন এবং ইহরাম খোলার জন্য চুল কেটে ফেলুন।" হুজুর (সাঃ) উম্মে সালমার (রাঃ) পরামর্শ কবুল করলেন এবং কাউকে কিছু না বলে নিজেই কুরবানী করলেন ও ইহরাম খুলে ফেললেন। সাহাবায়ে কিরাম (রাঃ) যখন দেখলেন যে, হুজুরের (সাঃ) নির্দেশ পালন আবশ্যিক তখন সবাই ধরাধর কুরবানী করলেন এবং মাথার চুল কেটে ফেললেন।

হাদীস শোনায় হযরত উম্মে সালমার (রাঃ) খুব আগ্রহ ছিল। একদিন চুল বিনুনী করাচ্ছিলেন। এমন সময় রাসূলে করিম (সাঃ) মিম্বরের ওপর তাশরীফ আনলেন এবং খুতবা প্রদান শুরু করলেন। কেবলমাত্র পবিত্র মুখ দিয়ে "হে মানুষেরা!" বাক্যটি বেরিয়েছিল এমন সময় হযরত উম্মে সালমার (রাঃ) চুল বিনুনীকারিনীকে বললেন, "চুল বেঁধে দাও।" সে বললো, " এত তাড়া কিসের। হুজুর (সাঃ) তো সবেমাত্র হে মানুষেরাই বলেছেন।" হযরত উম্মে সালমা (রাঃ) উঠে দাঁড়িয়ে গেলেন। নিজের চুল স্বয়ং বাঁধলেন এবং ঘাবড়ে গিয়ে বললেন, "আমরা কি মানুষের মধ্যে পরিগণিত নই?" অতঃপর অত্যন্ত মনোযোগের সাথে খতুবা শুনলেন।

www.bjilibrary.com

রাসূলে করিমের (সাঃ) প্রতি তাঁর অগাধ ভক্তি–শ্রদ্ধা ছিল। হুজুরের (সাঃ) পবিত্র মোচ বরকত হিসেবে রূপার একটি কৌটাতে সংরক্ষণ করে রেখেছিলেন। সহিহ বুখারীতে আছে, সাহাবীদের (রাঃ) মধ্যে কেউ কষ্ট পেলে তিনি এক পেয়ালা পানি ভরে তাঁর নিকট আনতেন। তিনি পবিত্র মোচ বের করে পানিতে নাড়তেন। এই পানির বরকতে কষ্ট দূর হয়ে যেত।

মুসনাদে আহমদে আছে, একবার হযরত উম্মে সালমা (রাঃ) হুজুরকে (সাঃ) জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল। পবিত্র কুরআন শরীফে আমাদের কথা উল্লেখ নেই, এর কারণ কি? হুজুর (সাঃ) তাঁর কথা শুনে মিম্বরের ওপর তাশরীফ নিলেন এবং এই আয়াত পাঠ করলেনঃ

إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ

আল্লামা ইবনে সায়াদ (রঃ) বর্ণনা করেছেন, ১১ হিজরীতে প্রিয় নবী (সাঃ) অসুস্থ হয়ে পড়েন। এ সময় হযরত উম্মে সালমা (রাঃ) হুজরায় প্রায়ই যেতেন। একদিন হুজুরকে (সাঃ) খুবই অসুস্থ দেখে তিনি ডুকরে কেঁদে উঠলেন। হুজুর (সাঃ) নিষেধ করে বললেন, "মুসবিতের সময় চেঁচিয়ে ক্রন্দন করা মুসলমানের জন্য ঠিক নয়।"

হযরত উম্মে সালমা (রাঃ) অত্যন্ত যাহেদ ছিলেন। আল্লাহর ইবাদাতের প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল। রমযানের মাস ছাড়াও প্রত্যেক মাসেই আবশ্যিকভাবে তিনটি রোযা রাখতেন। আদেশ নিষেধ পালনে সীমাহীন যত্নবান ছিলেন।

একবার তিনি একটি হার পরিধান করেছিলেন। এই হারে কিছুটা স্বর্ণ ছিল। হুজুর (সাঃ) তা অপছন্দ করলেন না। ফলে তিনি তা খুলে ফেললেন অথবা ভেঙ্গে ফেললেন।

মুসনাদে আহমদ বিন হাম্বলে বর্ণিত আছে, ৬১ হিজরীর যেদিন ইমাম হোসাইন (রাঃ) মহান মর্যাদাসম্পন্ন সাথীদেরসহ কারবালার মাঠে শাহাদাতের পেয়ালা পান করেন সেদিন রাতে উম্মে সালমা (রাঃ) স্বপ্নে দেখেন যে, রহমতে দো–আলম (সাঃ) তাশরীফ এনেছেন। মাথা ও দাড়ি মোবারক ধূলি ধূসরিত এবং খুবইচিন্তাযুক্ত।

হযরত উম্মে সালমা (রাঃ) জিজ্ঞেস করলেন, " ইয়া রাসূলাল্লাহ! অবস্থা কি?"

www.bjilibrary.com

তিনি বললেন, "হোসাইনের (রাঃ) নিহত স্থান থেকে আসছি।"

হযরত উম্মে সালমার (রাঃ) ঘুম ভেঙ্গে গেল। তিনি ক্রন্দন করতে লাগলেন এবং চেঁচিয়ে বললেন, " ইরাকীরা হোসাইনকে (রাঃ) হত্যা করেছে। খোদা তাদেরকে হত্যা করবেন। তারা হোসাইনের (রাঃ) সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। খোদার অভিশাপ তাদের ওপর।"

হযরত উম্মে সালমাও (রাঃ) পিতার মতই দানশীলা ছিলেন। অন্যদেরকেও তিনি দানের ব্যাপারে উৎসাহিত করতেন। কোন অভাবগ্রস্ত তাঁর গৃহ থেকে শূন্য হাতে ফিরে যাওয়াটা অসম্ভব ব্যাপার ছিল। বেশী না হলেও অল্প যা কিছু থাকতো তাই তিনি অভাবগ্রস্তকে দান করতেন।

হযরত উম্মে সালমা (রাঃ) থেকে ৩৭৮টি হাদীস বর্ণিত আছে। মর্যাদার দিক থেকে হযরত আয়েশার (রাঃ) পরই তাঁর স্থান। অত্যন্ত সুন্দরভাবে তিনি কুরআন শরীফ তিলাওয়াত করতেন এবং তাঁর তিলাওয়াত প্রিয় নবীর (সাঃ) তিলাওয়াতের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ ছিল। আল্লাহ তায়ালা তাঁকে সুন্দর দৃষ্টিশক্তি, জ্ঞান, মেধা এবং সঠিক রায়ের নিয়ামতের বেশ খানিকই দান করেছিলেন।

আল্লামা ইবনে কাইয়েম বর্ণনা করেছেন, হযরত উম্মে সালমার (রাঃ) ফতওয়াসমূহ দিয়ে একটি ছোট পুস্তিকাই প্রণয়ন করা যেতে পারে। তাঁর ফতওয়াবলী সর্বসম্মত ফতওয়া হিসেবেই পরিগণিত। হযরত উম্মে সালমা (রাঃ) ৬৩ হিজরীতে ৮৪ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন। হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) জানাযার নামাজ পড়ান।

হুজুর (সাঃ)-এর ঔরসে তাঁর কোন সন্তান জন্মগ্রহণ করেনি। আবু সালমার (রাঃ) পক্ষ থেকে চার সন্তান (দুই পুত্র এবং দুই কন্যা) জন্ম নিয়েছিল। তাঁদের নাম হলোঃ প্রথম, সালমা (রাঃ)। তিনি হাবশায় জন্মগ্রহণ করেন। রাসূলে করিম (সাঃ) হযরত হামযার (রাঃ) কন্যা উমামার (রাঃ) সঙ্গে তাঁর বিয়ে দিয়েছিলেন। দ্বিতীয়, ওমর (রাঃ)। হযরত আলীর (রাঃ) খিলাফতকালে তিনি বাহরাইন ও পারস্যের রাজস্ব আদায়কারী ছিলেন। তৃতীয় ও চতুর্থ যয়নব (রাঃ) এবং দুররাহ (রাঃ) (অন্য রাওয়ায়েত অনুযায়ী রোকেয়া) তাঁর কন্যা ছিলেন।

www.bjilibrary.com

উম্মুল মুমিনিন হযরত যয়নব (রাঃ) বিনতে জাহাশ

নাম যয়নব (রাঃ)। কুনিয়ত উম্মুল হাকাম। কোরেশের আসাদ বিন খুজাইমা বংশের সঙ্গে তিনি সম্পর্কযুক্ত ছিলেন। তাঁর নসবনামা হলোঃ যয়নব বিনতে জাহাশ বিন রিয়াব বিন লামির বিন সাবরাতা বিন মাররাতা বিন কাছির বিন গানাম বিন দাওদান বিন সাদ বিন খুজাইমা।

মাতার নাম ছিল উমাইমা বিনতে আব্দুল মুত্তালিব। তিনি রাসুলের (সঃ) ফুফু ছিলেন। এইদিক থেকে হযরত যয়নব (রাঃ) রাসূলুল্লাহর (সাঃ) ফুফাতো বোন।

হযরত যয়নব (রাঃ) সেই সৌভাগ্যবতীদের মধ্যে পরিগণিত ছিলেন, যাঁরা আসসাবিকুনা আউয়ালুন হিসেবে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন। রাসুলের (সাঃ) নবুয়ত প্রাপ্তির ১৩ বছর পর তিনি পরিবার–পরিজনের সঙ্গে মদীনা হিজরত করেন।

হযরত যায়েদ (রাঃ) বিন হারিছা রাসুলের (সাঃ) আযাদকৃত গোলাম ও মুখে ডাকা পুত্র ছিলেন। প্রিয় নবী (সাঃ) তাঁকে সীমাহীন ভালবাসতেন। এজন্য তিনি হযরত যয়নবের (রাঃ) বিয়ে হযরত যায়েদ (রাঃ) বিন হারিছার সঙ্গে দেন। আল্লামা ইবনে সাদ (রঃ) লিখেছেন, বিভিন্ন কারণে হযরত যয়নব (রাঃ) এই সম্পর্ক পছন্দ করতেন না। এজন্য তিনি বিয়ের পূর্বে রাসূলে করিমের (সাঃ) নিকট আরজ করেনঃ

"ইয়া রাসূলাল্লাহ। যায়েদকে (রাঃ) আমি নিজের জন্য পছন্দ করিনা।" কিন্তু হুজুর (সাঃ) এই বিয়েতেই কল্যাণ মনে করতেন। এজন্য তাঁর ইচ্ছানুযায়ী হযরত যায়েদের (রাঃ) বিয়ে হযরত যয়নবের সঙ্গেই অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু উভয়ের মধ্যে বনিবনা হয়নি। প্রায় একবছর পর হযরত যায়েদ (রাঃ) রাসুলের (সাঃ) নিকট অভিযোগ করে বললেন যে, "ইয়া রাসূলাল্লাহ! যয়নব (রাঃ) আমার সাথে প্রগলভতামূলক কথা বলে। আমি তাকে তালাক দিতে চাই।"

হুজুর (সাঃ) তাঁকে বুঝালেন, আল্লাহর নিকট তালাক পছন্দনীয় কাজ নয়। বস্তুত সুরায়ে আহযাবের এই আয়াতে সেই দিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছেঃ

وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِيٓ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ
عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَٱتَّقِ ٱللَّهَ

www.bjilibrary.com

হে নবী। সেই সময়ের কথা স্মরণ কর, যখন তুমি সেই ব্যক্তিকে, যার প্রতি আল্লাহ এবং তুমি অনুগ্রহ করেছিলে, বলেছিলে যে, "তোমার স্ত্রীকে পরিত্যাগ করো না এবং খোদাকে ভয় কর।"

যাহোক, হযরত যায়েদ (রাঃ) এবং হযরক যয়নবের (রাঃ) মধ্যে বনিবনা হলো না। অবশেষে হযরত যায়েদ (রাঃ) হযরত যয়নবকে (রাঃ) তালাক দিয়ে দিলেন।

হযরত যয়নবের (রাঃ) ইদ্দত পুরো হলে হুজুর (সাঃ) স্বয়ং তাঁকে বিয়ে করতে চাইলেন। কিন্তু তখন পর্যন্ত আরবে জাহেলী যুগের প্রথার প্রভাব অবশিষ্ট ছিল। লোকজন মুখে ডাকা পুত্রকে আপন পুত্রের সমান মনে করতো। বস্তুত হযরত যায়েদ (রাঃ) প্রিয় নবীর মুখে ডাকা পুত্র ছিলেন এবং মানুষের মধ্যে যায়েদ (রাঃ) বিন মুহাম্মাদ (সাঃ) নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন। এজন্য সাধারণ মানুষের (বিশেষ করে মুনাফিক) অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে রাসূলে করিম (সাঃ) এই বিয়েতে কিছুটা চিন্তাগ্রস্ত হলেন। আল্লাহ পাক যেহেতু জাহেলী প্রথাকে খতম করতে চেয়েছিলেন. এজন্য এই আয়াত নাযিল করলেনঃ

وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللّٰهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللّٰهُ اَحَقُّ
اَنْ تَخْشَاهُ (احزاب)

"তখন তুমি নিজের মনে সেই কথা লুকিয়েছিলে, যা আল্লাহ প্রকাশ করতে চেয়েছিলেন। তুমি লোকদেরকে ভয় করছিলে, অথচ আল্লাহর অধিকার সবচেয়ে বেশী যে, তুমি তাঁকেই ভয় করবে।"

এরপর আল্লাহ পাক স্পষ্ট ভাষায় অভিযোগকারীদেরকে হুশিয়ার করলেনঃ

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ اَبَا اَحَدٍ مِّنْ رِّجَالِكُمْ وَلٰكِنْ رَّسُوْلَ اللّٰهِ وَ
خَاتَمَ النَّبِيّٖنَ-

"(হে মানুষেরা।) মুহাম্মাদ তোমাদের পুরুষদের মধ্যে কারোর পিতা নন, বরং তিনি আল্লাহর রাসূল এবং খাতামুন্নাবী।"

অতঃপর নির্দেশ হলোঃ

اُدْعُوْهُمْ لِاٰبَآئِهِمْ

"মানুষদেরকে তাদের (প্রকৃত) পিতার নাম ধরে ডাকো।"

www.bjilibrary.com

এখন আর কোন বস্তুই নিষেধকারী ছিল না। সুতরাং হুজুর (সাঃ) হযরত যায়েদের (রাঃ) ওপরই বিয়ের পয়গাম নিয়ে হযরত যয়নবের (রাঃ) নিকট গমনের দায়িত্ব অর্পণ করলেন। হযরত যায়েদ (রাঃ) হযরত যয়নবের (রাঃ) গৃহে গেলেন এবং বললেনঃ "যয়নব, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তোমাকে বিয়ে করতে ইচ্ছুক।"

হযরত যয়নব (রাঃ) জবাব দিলেন, " আমি আল্লাহর দরবারে ইস্তিখারাহ করছি।" এ কথা বলেই তিনি জায়নামাযে দাঁড়িয়ে গেলেন। এদিকে আল্লাহ পাক রাসূলে করিমের (সাঃ) ওপর ওহি নাযিল করলেনঃ

فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا

"পরে যায়েদ যখন তার নিকট থেকে নিজের প্রয়োজন পূর্ণ করে নিল তখন আমরা তাকে (তালাকপ্রাপ্তা মহিলাকে) তোমার সাথে বিয়ে দিলাম।"

আল্লাহ যেন স্বয়ং প্রিয় নবীর (সাঃ) সাথে হযরত যয়নবের (রাঃ) বিয়ে দিয়ে দিলেন। এরপর হুজুর (সাঃ) হযরত যয়নবের (রাঃ) গৃহে তাশরীফ নিলেন এবং বিনা অনুমতিতে ভেতরে চলে গেলেন।

সকালে ওয়ালিমার দাওয়াত হলো। দাওয়াতে রুটি ও তরকারির ব্যবস্থা করা হয়েছিল। প্রিয় নবী (সাঃ) হযরত আনাসকে (রাঃ) লোকদের ডেকে আনতে পাঠিয়েছিলেন। দাওয়াতে তিনশ' মানুষ শরীক হয়েছিল। দশজনের এক এক গ্রুপ খাবার খেয়ে চলে গিয়েছিলেন। ঘটনা এরকম দাঁড়িয়েছিল যে, কিছু লোক খাবার খেয়ে গল্পে মশগুল হয়ে গিয়েছিল এবং চলে যাওয়ার খেয়ালও তাদের ছিল না। ভদ্রতার খাতিরে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তাদেরকে চলে যেতেও বলতে পারছিলেন না। তিনি বার বার বাইরে আসছিলেন এবং ভেতরে যাচ্ছিলেন। ঐ গৃহেই হযরত যয়নব (রাঃ) প্রাচীরের দিকে মুখ করে বসেছিলেন। যখন বিলম্ব হতে লাগলো তখন হুজুরের (সাঃ) খুব কষ্ট হলো। এই অবস্থায় পর্দার আয়াত নাযিল হলোঃ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَن يُؤْذَنَ لَكُمْ
إِلَىٰ طَعَامٍ غَيْرَ نَاظِرِينَ إِنَاهُ وَلَٰكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ
فَانتَشِرُوا وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ ۚ إِنَّ ذَٰلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي

www.bjilibrary.com

مِنْكُمْ وَاللّٰهُ لَا يَسْتَحْيٖ مِنَ الْحَقِّ وَاِذَا سَاَلْتُمُوْهُنَّ مَتَاعًا فَسْئَلُوْهُنَّ
مِنْ وَّرَاۤءِ حِجَابٍ (احزاب)

"হে ঈমানদার লোকেরা, তোমরা নবীর ঘরের মধ্যে বিনানুমতিতে ঢুকে পড়ো না, এসে খাওয়ার সময়ের আপেক্ষায় বসে থেকো না। তবে তোমাদেরকে যদি খাওয়ার দাওয়াত দেয়া হয়, তাহলে অবশ্যই আসবে। কিন্তু খাওয়া হয়ে গেলে চলে যেও। কথায় মশগুল হয়ে বসো না। তোমাদের এ ধরনের আচরণ নবীকে কষ্ট দেয়। কিন্তু সে লজ্জায় কিছু বলে না। আর আল্লাহ সত্য কথা বলতে লজ্জাবোধ করেন না। নবীর স্ত্রীদের নিকট থেকে তোমাদের কিছু চেয়ে নিতে হলে পর্দার বাইর থেকেই চেয়ে পাঠাও।"

এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর হুজুরের (সাঃ) ঘরের দরজায় পর্দা লটকিয়ে দেয়া হয় এবং লোকদেরকে ঘরে প্রবেশ নিষিদ্ধ করা হয়।

হযরত যয়নবের (রাঃ) বিয়ের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য ছিলঃ

(১) জাহেলী যুগে মুখে ডাকা পুত্র আসল পুত্রের মর্যাদা প্রাপ্তির প্রথা ছিল। এই প্রথা বাতিল হয়ে যায়।

(২) লোকদেরকে হুকুম দেয়া হয় যে, কাউকে প্রকৃত পিতা ছাড়া অন্যের (মুখে ডাকা) সঙ্গে সংশ্লিষ্ট করা যাবে না।

(৩) আল্লাহ পাক ওহির মাধ্যমে হযরত যয়নবের (রাঃ) বিয়ে দেন।

(৪) অত্যন্ত জাঁকজমকপূর্ণ ওয়ালিমার ব্যবস্থা করা হয়। খাসির গোশ্‌ত, রুটি এবং উম্মে সুলাইমের (রাঃ) প্রেরিত মালিদাহও ওয়ালিমায় স্থান পায়। অনেকে মানুষ পেট পুরে এই ওয়ালিমা খেয়েছিলেন।

(৫) এই সময় পর্দার আয়াত নাযিল হয় এবং পর্দা প্রথার প্রচলন হয়।

এইসব বৈশিষ্ট্যের কারণে হযরত যয়বন (রাঃ) হযরত আয়েশার (রাঃ) সমকক্ষ দাবী করতেন।

হযরত যয়নব (রাঃ) অত্যন্ত দ্বীনদার, পরহেযগার, স্পষ্টবাদী এবং কল্যাণকামী ছিলেন। রাসূলে করিম (সাঃ) স্বয়ং তাঁর ইবাদাতের স্বীকৃতি দিয়েছেন। হাফিজ ইবনে হাজার (রঃ) "ইছাবাহ" গ্রন্থে লিখেছেন, একবার হুজুর (সাঃ)

www.bjilibrary.com

মুহাজিরদের একটি দলের মধ্যে গনিমতের মাল বন্টন করছিলেন। এ সময় হযরত যয়নবও (রাঃ) উপস্থিত ছিলেন। তিনি এমন এক কথা বললেন যা হযরত ওমরের (রাঃ) নিকট অসহনীয় ছিল। হযরত ওমর (রাঃ) অত্যন্ত কড়া ভাষায় হযরত যয়নবকে (রাঃ) এ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করা থেকে নিষেধ করলেন। এ সময় রাসূলে করিম (সাঃ) বললেনঃ " ওমর! তাঁকে কিছু বলো না। সে বড় ইবাদাতগুজার এবং খোদাকে ভয় করে থাকে।"

তাঁর সম্পর্কে হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেনঃ "আমি দ্বীনের ব্যাপারে যয়নব (রাঃ) থেকে উত্তম কোন মহিলা দেখিনি।"

ইফকের (অপবাদ) ঘটনায় হযরত যয়নবের (রাঃ) আপন বোন হামনা (রাঃ) বিনতে জাহাশও ভুল ধারণার শিকার হয়েছিলেন। কিন্তু যখন রাসূলে করিম (সাঃ) হযরত যয়নবের (রাঃ) নিকট হযরত আয়েশা (রাঃ) সম্পর্কে বিস্তারিত জানালেন তখন তিনি পরিষ্কারভাবে বলে দিলেনঃ "আমি আয়েশার (রাঃ) মধ্যে ভালো ছাড়া কিছুই পাইনি।"

ইবনে সা'দ (রঃ) বর্ণনা করেছেন, একবার রাসুলে করিম (সাঃ) স্ত্রীদেরকে (রাঃ) সম্বোধনা করে বললেনঃ

"তোমাদের মধ্যে যার হাত লম্বা হবে সেই আমার সঙ্গে শিগগির মিলিত হবে।"

প্রিয় নবী (সাঃ) লম্বা হাতের মাধ্যমে দানশীলতার কথা বুঝিয়েছিলেন। হযরত যয়নব (রাঃ) সীমাহীন দানশীল ও কল্যাণকামী ছিলেন। বস্তুত রাসূলের (সাঃ) ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী হুজুরের (সাঃ) পর সকল স্ত্রীর (রাঃ) মধ্যে সর্বপ্রথম হযরত যয়নবই ইন্তেকাল করেন। হযরত যয়নব (রাঃ) নিজের হাতে রুজী কামাই করতেন। তিনি চামড়া পাকাকরণের কাজ জানতেন। এই কাজে যা আয় হতো তা তিনি খোদার রাস্তায় সাদকা করে দিতেন।

হযরত ওমর ফারুক (রাঃ) নিজের শাসনামলে হযরত যয়নবের (রাঃ) বৃত্তি ১২ হাজার দিরহাম নির্ধারিত করেছিলেন। তিনি এই বৃত্তি পেতেই অভাবগ্রস্তদের মধ্যে বন্টন করে দিতেন। একবার বার্ষিক বৃত্তি পেয়ে তা নিজের আত্মীয় ও এতিমদের মধ্যে বন্টন করে এই দোয়া করলেনঃ " হে খোদা! ভাবিষ্যতে এই সম্পদ যেন আমি না পাই। কেননা এই সম্পদ ফিতনা।"

www.bjilibrary.com

হযরত ওমর (রাঃ) এ কথা জানতে পেরে বললেনঃ "যয়নব (রাঃ) অত্যন্ত উত্তম মানুষ।" অতঃপর অতিরিক্ত আরো এক হাজার দিরহাম হযরত যয়নবের খিদমতে প্রেরণ করলেন। তিনি কালবিলম্ব না করে তা দান করে দিলেন।

হযরত যয়নব (রাঃ) ৫৩ বছর বয়সে ২০ হিজরীতে ওফাত পান। তাঁর ইন্তেকালে মদীনার ফকির-মিসকিনদের মধ্যে শোকের বন্যা বয়ে গেল। কেননা তিনি তাদের মুরুব্বী ও সাহায্যকারী ছিলেন। মৃত্যুর সময় একটি ঘর ছাড়া তিনি আর কিছুই রেখে যাননি। জীবদ্দশাতেই সবকিছু আল্লাহর পথে বিলিয়ে দিয়েছিলেন। মৃত্যুর কিছু সময় পূর্বে রাসূলের (সাঃ) লাশবাহী খাটিয়ায় তাঁকেও বহন করার ওসিয়ত করেন। বস্তুত তাঁর ওসিয়ত পুরণ করা হয়। মৃত্যুর দিন অত্যন্ত গরম ছিল। হযরত ওমর (রাঃ) কবরের স্থানে তাঁবু টাঙ্গিয়ে দেন।

হযরত ওমর ফারুক (রাঃ) জানাযার নামায পড়ান। হযরত মুহাম্মাদ (রাঃ) বিন জাহাশ, হযরত উসামা (রাঃ) বিন যায়েদ, হযরত আব্দুল্লাহ বিন আহমদ এবং মুহাম্মদ (রাঃ) বিন তালহা (রাঃ) লাশ কবরে নামান।

হযরত যয়নব (রাঃ) বিনতে জাহাশ থেকে ১১টি হাদীস বর্ণিত আছে। তাঁর হাদীস বর্ণনাকারীদের মধ্যে হযরত উম্মে হাবিবা (রাঃ) এবং যয়নব (রাঃ) বিনতে আবি সালমা (রাঃ) প্রমুখ অন্তর্ভূক্ত রয়েছেন।

www.bjilibrary.com

উম্মুল মুমিনিন হযরত জুয়াইরিয়া (রাঃ) বিনতে হারিছ

বাররাহ নাম। খাজায়া গোত্রের মুসতালিক বংশের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত ছিলেন। নসবনামা হলোঃ বাররাহ বিনতে হারিছ বিন আবি জারার বিন হাবিব বিন আয়েজ বিন মালিক বিন জাযিমা (মুসতালিক)। চাচাতো ভাই মাসাফি বিন ছফওয়ানের সাথে প্রথম বিয়ে হয়েছিল।

হযরত জুয়াইরিয়ার (রাঃ) পিতা হারেছ বনু মুসতালিকের সরদার ছিলেন। কোরেশের ইঙ্গিতে মদীনার ওপর হামলার জন্য তিনি নিজের গোত্রকে প্রস্তুত করলেন। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এই খবর পেয়ে পঞ্চম হিজরীর ২রা শাবান মুজাহিদদের একটি দল সঙ্গে নিয়ে বনু মুসতালিকের দিকে রওয়ানা দিলেন। হারেছ মুসলমানদের অগ্রযাত্রার খবর পেয়ে পালিয়ে গেলেন। রাসূলে করিম (সাঃ) মুররাইয়াসিতে অবস্থান নিলেন। এখানকার বাসিন্দারা মুসলমানদের মুকাবিলা করলো। কিন্তু পরাজিত হলো। তাদের ১১ ব্যক্তি নিহত এবং প্রায় ৬শ' গ্রেফতার হলো। এই কয়েদীদের মধ্যে হযরত জুয়াইরিয়াও (রাঃ) ছিলেন। গনিমতের মাল বন্টনের পর তিনি হযরত ছাবিত (রাঃ) বিন কায়েসের অংশে এলেন। বস্তুত তিনি ছিলেন সরদার কন্যা। এজন্য দাসী হিসেবে থাকা অসহনীয় হয়ে উঠলো। হযরত ছাবিতের (রাঃ) নিকট কিছু অর্থ নিয়ে মুক্ত করে দেয়ার নিবেদন জানালেন। তাতে তিনি সম্মত হলেন এবং ৯ আওকিয়া স্বর্ণ দাবী করলেন।

হযরত জুয়াইরিয়া (রাঃ) এতক্ষণে রাসূলে করিমের (সাঃ) খিদমতে হাজির হলেন এবং আরজ করে বললেনঃ "আমি একজন মুসিবতজাদাহ, আযাদ হতে চাই, অনুগ্রহ করে আমাকে সাহায্য করুন।" হুজুর (সাঃ) বললেনঃ "এটাই কি ঠিক হবেনা যে, আমি তোমার আযাদীর বিনিময় মূল্য আদায় করে তোমাকে বিয়ে করবো!"

হযরত জুয়াইরিয়া (রাঃ) তৎক্ষণাৎ রাজি হয়ে গেলেন। সুতরাং প্রিয় নবী (সাঃ) বিনিময় মূল্য আদায় করে তাঁকে বিয়ে করলেন এবং প্রথম নাম বাররাহ পরিবর্তন করে জুয়াইরিয়া রাখলেন। তিনি হেরেমে প্রবেশ করতেই সাহাবারা (রাঃ) নবীর আত্মীয়তাকে সমীহ করে সকল যুদ্ধ বন্দীকে মুক্ত করে দিলেন। ইবনে আছির

www.bjilibrary.com

(রঃ) বর্ণনা করেছেন যে, এ সময় বনূ মুসতালিকের একশ' পরিবার স্বাধীনতার নিয়ামতে ভূষিত হয়েছিলেন।

এই ঘটনা প্রসঙ্গে হযরত আয়েশা সিদ্দিকাহ (রাঃ) বলেছেনঃ " আমি জুয়াইরিয়া (রাঃ) থেকে বেশী অন্য কোন মহিলাকে নিজের গোত্রের জন্য রহমত হিসেবেদেখিনি।"

ইবনে আছির (রঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত জুয়াইরিয়ার (রাঃ) পিতা খবর পেয়েছিলেন যে, তাঁর কন্যাকে দাসী বানানো হয়েছে। এতে তিনি অনেক সম্পদ ও আসবাবপত্র কয়েকটি উটের ওপর বোঝাই করে কন্যার মুক্তির জন্য মদীনা রওয়ানা হলেন। পথিমধ্যে দু'টি পছন্দনীয় উট আকীক নামক স্থানে কোন ঘাঁটিতে লুকিয়ে রেখে অবশিষ্ট উট এবং সম্পদ ও আসবাবসহ মদীনা পৌছলেন। অতঃপর হুজুরের (সাঃ) খিদমতে হাজির হয়ে আরজ করলেনঃ

"আপনি আমার কন্যাকে কয়েদ করে এনেছেন। এইসব মাল ও আসবাব নিন এবং তাকে মুক্ত করে দিন।"

হুজুর (সাঃ) গায়েব থেকে খবর পেলেন যে, এই ব্যক্তি দু'টি উট লুকিয়ে রেখে এসেছে। তিনি বললেনঃ "যে দু'টি উট তুমি লুকিয়ে রেখে এসেছ, তা কোথায়?"
হারিছ এ কথা শুনে হয়রান হয়ে গেলেন। সে সময়ই তিনি রাসূলের (সাঃ) পদ চুম্বন করলেন এবং ইসলাম গ্রহণ করলেন।

যখন তাঁকে বলা হলো যে, জুয়াইরিয়াকে (রাঃ) দাসী বানানো হয়নি, বরং তাঁকে নবীর (সাঃ) হেরেমে স্থান দেয়া হয়েছে, তখন সীমাহীন খুশী হলেন এবং হাসি-খুশীর সাথে কন্যার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে গৃহে ফিরে গেলেন।

অন্য এক রাওয়ায়েতে বলা হয়েছে যে, হারিছ হুজুরের খিদমতে হাজির হয়ে বললেন," আমি আরবের একজন সরদার। আমার কন্যা দাসী হতে পারে না। আপনি তাকে আযাদ করে দিন।"

হুজুর (সাঃ) বললেন, "ব্যাপারটি তোমার কন্যার ওপর ছেড়ে দিলেই ভালো হয়।" হারিছ কন্যাকে বললেন, মুহাম্মাদ (সাঃ) তোমার ওপরই ছেড়ে দিয়েছে। দেখ, আমাকে অপমানিত কর না। তিনি বললেন, " আমি রাসূলের (সাঃ) গোলামী করাকে পছন্দ করি। সুতরাং হুজুর (সাঃ) তাঁকে বিয়ে করে নিলেন।

www.bjilibrary.com

ইবনে সা'দ (রঃ) বলেছেন, হারিছ কন্যার ফিদিয়া মূল্য আদায় করে দিলেন এবং যখন তিনি স্বাধীন হয়ে গেলেন তখন হুজুর (সাঃ) তাঁকে বিয়ে করলেন।

হযরত জুয়াইরিয়া (রাঃ) অত্যন্ত ইবাদাত গুজার ছিলেন। রাসূলে করিম (সাঃ) যখনই গৃহে তাশরীফ রাখতেন তখনই তাঁকে ইবাদাতে মশগুল দেখতেন। একদিন হুজুর (সাঃ) তাঁকে মসজিদে সকালে ইবাদাতরত অবস্থায় পেলেন। দুপুরে তিনি সেদিক দিয়ে পুনরায় যাওয়ার সময় হযরত জুয়াইরিয়াকে (রাঃ) একই অবস্থায় দেখতে পেলেন। হুজুর (সাঃ) জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কি সব সময়ই এইভাবে ইবাদাত করে থাকো?"

তিনি জবাব দিলেন, "অবশ্যই হে আল্লাহর রাসূল।"

হুজুর (সাঃ) বললেন, এই কালেমা পড়। তোমার নফল নামাযের চেয়ে এই কালেমার অগ্রাধিকার রয়েছে।

سبحان الله سبحان الله عدد خلقه سبحان عدد خلقه
سبحان الله رضى نفسه سبحان الله رضى نفسه - سبحان
الله زنة عرشه سبحان الله زنة عرشه سبحان الله
مداد كلماته سبحان الله مداد كلماته ۔

একদিন রাসূলে করিম (সাঃ) হযরত জুয়াইরিয়ার (রাঃ) নিকট তাশরী রাখলেন এবং জিজ্ঞেস করলেনঃ "খাবার কোন জিনিস আছে?"

আরজ করলেনঃ "আমার বাঁদী সাদকার গোশত দিয়েছিল। তাই আছে।"

হুজুর (সাঃ) বললেনঃ "নিয়ে এস। যাকে সাদকা দেয়া হয়েছিল তার নিক পৌছেগেছে।"

হযরত জুয়াইরিয়া (রাঃ) মান-ইজ্জত প্রশ্নে খুব সতর্ক ছিলেন। বস্তুত গ্রেফতার হওয়ার পর আযাদীর জন্য সম্ভাব্য সব রকম চেষ্টাই চালিয়েছিলেন।

হযরত জুয়াইরিয়া (রাঃ) ৬৫ বছর বয়সে ৫০ হিজরীতে ওফাত পান এবং জান্নাতুল বাকী'তে তাঁকে দাফন করা হয়।

হযরত জুয়াইরিয়া (রাঃ) থেকে কতিপয় হাদীস বর্ণিত আছে। তাঁর হাদীস বর্ণনাকারীদের মধ্যে হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রাঃ), হযরত আবদুল্লাহ বিন ওমর (রাঃ) এবং হযরত জাবেরের (রাঃ) মত জালিলুল কদর সাহাবী অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন।

উম্মুল মুমিনিন হযরত উম্মে হাব্বিবা (রাঃ) বিনতে আবু সুফিয়ান (রাঃ)

নাম রামলা। কুনিয়ত উম্মে হাবিবা। নসবনামা হলোঃ উম্মে হাবিবা (রাঃ) বিনতে আবু সুফিয়ান (রাঃ) বিন হারব বিন উমাইয়া বিন আবদি শামস।

মাতার নাম ছিল ছুফিয়া বিনতে আবিল আছ। তিনি হযরত ওসমানের (রাঃ) ফুফু ছিলেন। সম্ভবত হযরত উম্মে হাবিবা (রাঃ) আমীরে মাবিয়ার (রাঃ) সহোদরা এবং নবুয়ত প্রাপ্তির ১৭ বছর পূর্বে মক্কায় জন্মগ্রহণ করেন।

হযরত উম্মে হাবিবার (রাঃ) প্রথম বিয়ে উবায়দুলাহ বিন জাহাশের সঙ্গে হয়েছিল। উভয়েই নবুয়ত প্রাপ্তির প্রথম যুগেই একই সঙ্গে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। হযরত উম্মে হাবিবার (রাঃ) পিতা সেই সময় পর্যন্ত ইসলামের ঘোরতর শত্রু ছিলেন এবং দীর্ঘদিন পর্যন্ত মুসলমানদের ওপর নির্যাতন চালিয়েছিলেন। বস্তুত রাসূলে করিম (সাঃ) যখন মুসলমানদেরকে হাবশায় হিজরতের অনুমতি দেন তখন উবায়দুল্লাহ বিন জাহাশ এবং হযরত উম্মে হাবিবাও (রাঃ) অন্যান্য মুসলমানদের সঙ্গে হিজরত করে হাবশা গমন করেন। হাবশা পৌছার কিছুদিন পর উবায়দুল্লাহ মুরতাদ হয়ে যায় এবং খৃষ্টান ধর্ম গ্রহণ করে মদ পান শুরু করে। হযরত উম্মে হাবিবা (রাঃ) স্বামীকে খুব করে বুঝালেন যে, কেন নিজের পরকাল নষ্ট করছো? কিন্তু খোদা তার অন্তরের ওপর সীলমোহর লাগিয়ে দিয়েছিলেন। এই কথায় কোন ফল হলো না এবং সে খৃষ্টান অবস্থাতেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

উবায়দুল্লাহর ঔরসেই হযরত উম্মে হাবিবার (রাঃ) হাবিবা নাম্নী এক কন্যা ছিলেন। তিনিও সাহাবী ছিলেন। তাঁর নামের নিসবতেই হযরত রামলার (রাঃ) কুনিয়ত উম্মে হাবিবা (রাঃ) নামে মশহুর হয়।

বিদেশ বিভূঁয়ে হযরত উম্মে হাবিবা (রাঃ) বিধবা হয়েছিলেন। ইদ্দত পুরো হওয়ার পর প্রিয় নবী (সাঃ) হযরত আমর (রাঃ) বিন উমাইয়া জামরীকে হাবশার নাজ্জাশী বাদশাহর নিকট প্রেরণ করেছিলেন, যাতে তিনি হুজুরের (সাঃ) পক্ষ থেকে উম্মে হাবিবার (রাঃ) নিকট বিয়ের পয়গাম পৌছান। নাজ্জাশী নিজের এক বাঁদীর মাধ্যমে রাসূলে করিমের (সাঃ) বিয়ের পয়গাম হযরত উম্মে হাবিবার নিকট পৌছে

www.bjilibrary.com

দেন। এই পয়গাম পেয়ে তিনি খুব খুশী হয়েছিলেন। কৃতজ্ঞতা প্রকাশ স্বরূপ বাঁদীকে রৌপ্যের দু'টি চুড়ি এবং আংটি দিয়েছিলেন এবং হযরত খালিদ (রাঃ) বিন সাঈদ বিনুল আছকে নিজের উকিল নিয়োগ করেছিলেন। সন্ধ্যায় নাজ্জাশী হযরত জাফর (রাঃ) বিন আবু তালেব এবং অন্যান্য মুসলমানকে ডেকে স্বয়ং বিয়ে পড়ালেন। বিয়ের প্রথা সমাপনান্তে হযরত খালিদ (রাঃ) বিন সাঈদ সবাইকে খাবার খাইয়ে বিদায় করেছিলেন। বিয়ের কিছুদিন পর উম্মে হাবিবা (রাঃ) হাবশা থেকে মদীনা আগমন করেন। হুজুর (সাঃ) এ সময় খায়বারের অভিযানে ব্যস্ত ছিলেন। এটা ৬ষ্ঠ হিজরীর শেষের দিকের অথবা সপ্তম হিজরীর প্রথম দিককার ঘটনা।

হযরত উম্মে হাবিবা (রাঃ) অত্যন্ত নেক স্বভাবের মহিলা ছিলেন। আল্লাহ পাক তাঁকে পুরাতন ইসলাম গ্রহণকারীর মর্যাদা দান করেছেন। বাস্তবত তাঁর পিতা মক্কা বিজয় পর্যন্ত মক্কার কোরেশদের নেতৃত্ব দান করেন। ইসলামের জন্য তিনি দীর্ঘ সফরের দুঃখ-কষ্ট হাসি মুখে বরণ করেন এবং হাবশায় একাকীত্বের জীবনও বরণ করেন। অথচ বিত্ত-বৈভব ও রাষ্ট্রীয় মর্যাদার দিক থেকে কোরেশের মধ্যে তাঁর পরিবার প্রসিদ্ধ ছিল।

মক্কা বিজয়ের পূর্বে তাঁর পিতা একবার তাঁর সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য মদীনা এলেন। এই আগমনের হেতু এও ছিল যে, নিজের কন্যার মাধ্যমে সন্ধির সময়সীমা বৃদ্ধির প্রচেষ্টা চালানো। যখন তিনি রাসূলের (সাঃ) বিছানার ওপর বসতে উদ্যত হলেন তখন হযরত উম্মে হাবিবা (রাঃ) বিছানা উল্টে দিলেন। আবু সুফিয়ান অত্যন্ত মনোকষ্ট পেলেন এবং বললেন, "তুমি এই বিছানায় নিজের পিতাকেও বসা পছন্দ কর না।" হযরত উম্মে হাবিবা (রাঃ) জবাব দিলেন ঃ "একজন মুশরিক রাসূলে পাকের (সাঃ) বিছানায় বসুক অবশ্যই আমি তা পছন্দ করি না।" আবু সুফিয়ান এ কথা শুনে ক্ষোভ চেপে শুধু এতটুকু বললেন, "তুমি আমার বিরুদ্ধে খুব বেশী বিগড়ে গেছ।"

হযররত উম্মে হাবিবা (রাঃ) খুব সুদর্শনা ছিলেন। সহিহ মুসলিমের এক রাওয়ায়েতে আছে যে, হযরত আবু সুফিয়ান (রাঃ) নিজের কন্যার রূপের গৌরব করতেন।

মুসনাদে আহমদে (রঃ) আছে, একবার রাসূলে করিম (সাঃ) বললেন ঃ "যে ব্যক্তি প্রত্যেক দিন ১২ রাকায়াত নফল পড়বে, জান্নাতে তার জন্য ঘর তৈরী করা হবে।"

www.bjilibrary.com

হযরত উম্মে হাবিবা (রাঃ) এ কথা শুনেছিলেন। এপর সারা জীবন ১২ রাকায়াত নফল নামায প্রতিদিন তিনি অত্যন্ত নিয়ম মাফিক পড়তেন।

যখন তাঁর পিতা আবু সুফিয়ান (রাঃ) ইন্তিকাল করেন তখন তিন দিন পর খোশবু চেয়ে গন্ড এবং বাহুতে লাগালেন এবং বললেনঃ "রাসূলে করিমের (সাঃ) নির্দেশ হলো, ঈমানদার মহিলার কারোর জন্য তিনদিনের বেশী শোক পালন করা জায়েজ নয়। শুধুমাত্র সে স্বামীর মৃত্যুতে ৪ মাস ১০ দিন শোক পালন করবে।"

উম্মুল মুমিনিন হযরত উম্মে হাবিবা (রাঃ) ৪৪ হিজরীতে ৭৩ বছর বয়সে (সহোদর আমীর মাবিয়ার (রাঃ) শাসনকালে) ওফাত পান। ওফাতের পূর্বে হযরত আয়েশাকে (রাঃ) ডাকলেন এবং বললেনঃ "আমার এবং আপনার মধ্যে সতীনের সম্পর্ক ছিল। আমি যদি কোন ভুল করে থাকি তাহলে ক্ষমা করে দেবেন।"

হযরত আয়েশা (রাঃ) বললেনঃ "আমি ক্ষমা করে দিয়েছি।" অতঃপর তাঁর জন্য দোয়া করলেন।

হযরত উম্মে হাবিবা (রাঃ) বললেনঃ "আপনি আমাকে খুশী করেছেন, খোদা আপনাকে খুশীতে রাখুন।

হযরত উম্মে হাবিবা (রাঃ) থেকে ৬৫টি হাদীস বর্ণিত আছে। এইসব হাদীস বর্ণনাকারীদের মধ্যে উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন সাহাবী ও তাবেয়ী রয়েছেন।

www.bjilibrary.com

উম্মুল মুমিনিন হযরত ছুফিয়া (রাঃ) বিনতে হুইয়্যি

ছুফিয়া নাম। তিনি হযরত হারুনের (আঃ) বংশধর ছিলেন। তাঁর বংশনামা হলোঃ ছুফিয়া (রাঃ) বিনতে হুইয়্যি বিন আখতাব বিন সাঈদ বিন আমের বিন উবায়েদ বিন খাজরাজ বিন আবি হাবিব বিন নুজাইর বিন নাহহাম বিন মাইখুম।

মার নাম ছিল বাররাহ (অথবা জাররাহ)। তিনি বনু কোরায়জার নেতৃস্থানীয় সরদার সামবিলের কন্যা ছিলেন। যারকানী (রঃ) বলেছেন, হযরত ছুফিয়ার (রাঃ) আসল নাম ছিল যয়নব। আরবে মালে গনিমতের যে অংশ বিজয়ী সরদারের নিকট আসে তাকে ছুফিয়া বলা হয়। কেননা খায়বারের যুদ্ধের পর বিশ্ব নবীর (সাঃ) সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়েছিল। এজন্য ছুফিয়া নামে প্রখ্যাত হয়েছিলেন। কিন্তু এই বর্ণনা সঠিক নয়। কেননা আরবে ছুফিয়া নাম্নী অনেক মহিলা ছিলেন। স্বয়ং রাসুলের ফুফুর নামও ছিল ছুফিয়া (রাঃ)।

হযরত ছুফিয়ার (রাঃ) পিতা হুইয়্যি বিন আখতাব ইহুদীদের নামকরা গোত্র বনু নজিরের সরদার ছিলেন। নবীর বংশধর হওয়ার কারণে হুইয়্যি নিজের কওমের মধ্যে অত্যন্ত শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন এবং সমগ্র জাতি তাঁর সামনে মাথা অবনত করে রাখতো।

চৌদ্দ বছর বয়সে হযরত ছুফিয়ার (রাঃ) বিয়ে এক প্রখ্যাত অশ্বারোহী সালাম বিন মাসকামুল কারাজীর সঙ্গে সম্পন্ন হয়। কিন্তু স্বামী-স্ত্রী উভয়ের মধ্যে বনিবনা হয়নি। ফলে সালাম বিন মাসকাম তাঁকে তালাক দিয়ে দেয়। এই তালাকের পর হুইয়্যি বিন আখতাব তাঁর বিয়ে বনি কোরায়জার এক নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিত্ব কিনানা বিন আবিল হাকিকের সঙ্গে দেন। তিনি খায়বারের সরদার আবু রাফের ভাতিজা ছিলেন।

সপ্তম হিজরীর প্রথমদিকে নবী আকরাম (সাঃ) ইহুদীদের প্রতিদিনের অপকর্মের মূলোচ্ছেদ করার জন্য তাদের কেন্দ্র খায়বারের ওপর অভিযান চালান। খায়বার মদীনার উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত এক সমৃদ্ধ স্থানের নাম। এখানে ইহুদীরা কয়েকটি মজবুত দুর্গ স্থাপন করেছিল। মদীনা দখল করে ইসলামকে উৎখাত করাই ছিল তাদের সংকল্প। আর এজন্যই তারা দীর্ঘদিন ধরে সৈন্য এবং অস্ত্রশস্ত্র একত্রিত

www.bjilibrary.com

করছিল। সার্বিক প্রস্তুতির পর তারা বনু গাতফান ও বনু আসাদ নামক অন্য গোত্রকেও নিজেদের দলে ভিড়িয়ে নিল। মদীনা দখল করে তাদেরকে অর্ধেক দেয়া হবে বলেও তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দেয়া হলো।

প্রিয় নবী (সাঃ) ইহুদীদের এই প্রস্তুতির কথা অবহিত হলেন। তিনি হযরত সাবা (রাঃ) বিন আরফাতা গিফারীকে মদীনার হাকিম নিয়োগ করে স্বয়ং ১৪শ' সাহাবী (রাঃ) সঙ্গে নিয়ে খায়বারের দিকে রওয়ানা হলেন। মুনাফিক সরদার আব্দুল্লাহ বিন উবাই মুসলমানদের রওয়ানার কথা ইহুদীদেরকে প্রদান করলো। সুতরাং তারা মোকাবিলার জন্য খোলা ময়দানে বের হয়ে এলো। তাদের ধারণা ছিল মুসলমানদের খায়বার পৌছতে বেশ দেরী হবে। কিন্তু ইসলামী বাহিনী হুজুরের (সাঃ) নেতৃত্বে অত্যন্ত দ্রুততার সাথে দূরত্ব অতিক্রম করে এবং রাত-দিন সফর করে একদিন প্রত্যুষে খায়বার এসে পৌছলেন। তাঁদের দেখে ইহুদীরা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়লো। তারা ধারণাও করেনি যে, মুসলমানরা এত তাড়াতাড়ি এসে পৌছবে। খোলা ময়দানে তারা যুদ্ধ করা উচিত মনে করলো না এবং দুর্গ বন্ধ করে মুসলমানদের ওপর তীর ও পাথর বর্ষণ শুরু করলো। ইসলামের মুজাহিদরা অত্যন্ত বীরত্বের সঙ্গে তীর ও পাথরের মোকাবিলা এবং মরণপণ লড়াই করে ইহুদীদের তিনটি দূর্গ দখল করে নিলেন। ইহুদীদের সবচেয়ে মজবুত দুর্গের নাম ছিল আল কামুস। কয়েক দিন অতিবাহিত হল কিন্তু আক্রান্ত চেষ্টার পরও এই দুর্গ বিজিত হলো না। অবশেষে একদিন হুজুর (সাঃ) হযরত আলী কাররামাল্লাহু ওয়াজহাহুকে ডেকে পাঠালেন। তিনি চোখের অসুখে ভুগছিলেন। কিন্তু রাসূলের (সাঃ) দোয়ার বরকতে সুস্থ হয়ে গেলেন। অতঃপর ঝান্ডা প্রদান করে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তাঁকে আল-কামুস পদানত করার জন্য নিয়োগ করলেন। আল-কামুস প্রতিরক্ষার কাজে নিয়োজিত ছিল মারহাব এবং হারিছ নামক দুই ইহুদী সরদার। তারা নামকরা বাহাদুর ছিল এবং তাদের বীরত্বের কথা মুখে মুখে প্রচারিত হতো। সর্বপ্রথম হারিছ হযরত আলীর (রাঃ) সামনে এলো এবং যুদ্ধ শাস্ত্রের নিজের নজিরবিহীন পারদর্শিতা প্রদর্শন করেও জুলফিকার হায়দারের (রাঃ) শিকার হয়ে গেল। অতঃপর তার সহোদর মারহাব ক্রোধান্বিত হয়ে হযরত আলীর (রাঃ) ওপর আপতিত হলো কিন্তু তার পরিণামও নিজের সহোদরের মতই ঘটলো। হায়দারে কাররারের (রাঃ) এই তুলনাহীন বীরত্ব মুসলমানদের মধ্যে আসাধারণ উৎসাহ-উদ্দীপনা সৃষ্টি করলো এবং তাঁরা গগনবিদারী তাকবির ধ্বনি দিতে দিতে সকল শক্তি দিয়ে ইহুদীদের ওপর হামালা করে বসলেন। ইহুদীরা হামলায় জর্জরিত হয়ে দুর্গের অভ্যন্তরে গিয়ে আশ্রয় নিল। হায়দারে কাররার হযরত আলী (রাঃ) বীরত্বের আবেগে আপ্লুত হয়ে আল-কামুস দুর্গের ফটক জোরের সঙ্গে

www.bjilibrary.com

হেলিয়ে ফেললেন এবং তা তুলে দূরে নিক্ষেপ করলেন। এতক্ষণে মুসলমানরা দুর্গের মধ্যে ঢুকে পড়লেন এবং ইহুদীদেরকে তলোয়ারের খোরাক বানালেন। তারা অবিলম্বে অস্ত্র সমর্পণ করলো এবং বিনয়ের সঙ্গে সন্ধির প্রস্তাব করলো। রাহমাতুল্লিল আলামীন (সাঃ) তাদের ওপর দয়া প্রদর্শন করলেন এবং জমির মালিকানা তাদেরই থাকবে কিন্তু উৎপাদিত ফসলের অর্ধেক অবশ্যই মুসলমানদের প্রদান করবে–এই শর্তে সন্ধি করে নিলেন।

খায়বারের যুদ্ধে ৯৩ জন ইহুদী মারা গেল এবং ১৫ জন মুসলমান শহীদ হলেন। এই যুদ্ধ ইহুদীদের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর প্রমাণিত হলো। তাদের কয়েকজন নামকরা বাহাদুর এবং নেতা এই যুদ্ধে নিহত হয়েছিল। হযরত ছুফিয়ার (রাঃ) খান্দানের সকল সদস্যই হয় এই যুদ্ধে নিহত অথবা যুদ্ধবন্দী হয়েছিল। নিহতদের মধ্যে তাঁর পিতা, ভাই এবং স্বামীও ছিলেন। এভাবে তিনি অত্যন্ত কৃপার পাত্র ছিলেন।

যুদ্ধের পর সকল বন্দী ও গনিমতের মাল একত্রিত করা হলো। সাইয়েদেনা বেলাল হাবশী (রাঃ) হযরত ছুফিয়া (রাঃ) এবং তাঁর আত্মীয় সূত্রের এক বোনকে ধরে নিয়ে এলেন। রাস্তায় নিহত ইহুদীদের লাশ রক্তাক্ত অবস্থায় মাটিতে পড়েছিল। তাদের মধ্যে হযরত ছুফিয়ার (রাঃ) প্রিয় পিতা, ভাই এবং স্বামীর লাশও ছিল। বংশের কতিপয় বুজর্গের কর্তিত লাশও পড়েছিল। শোকগ্রস্ত ও অত্যন্ত বেদনার সঙ্গে হযরত ছুফিয়া (রাঃ) এইসব লাশের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন এবং নিশ্চুপ রয়ে গেলেন। অবশ্য তাঁর সঙ্গী বোন নিজেকে আয়ত্তে রাখতে পারলো না। খুব ক্রন্দন ও বুক চাপড়ানো শুরু করলো। হযরত বেলাল (রাঃ) তাদেরকে যখন নবী আকরামের (সাঃ) খিদমতে পেশ করলেন তখন নবী (সাঃ) এই মহিলার ক্রন্দনে প্রভাবিত হলেন। বিবি ছুফিয়া (রাঃ) চুপ করে একদিকে বসে গেলেন এবং ঐ মহিলাকে হুজুর (সাঃ) অন্যদিকে নিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দিলেন। অতঃপর বেলালকে (রাঃ) সম্বোধন করে বললেনঃ "বেলাল! তোমার অন্তরে দয়া বলতে কোন বস্তু নেই। এই মহিলাদেরকে সেই রাস্তা দিয়ে এনেছ যে রাস্তায় তাদের পিতা ও ভাই মাটি ও রক্তে একাকার হয়ে পড়ে রয়েছে।"

গনিমতের মাল বন্টনের সময় হযরত দাহিয়া কালবী (রাঃ) হযরত ছুফিয়াকে (রাঃ) নিজের জন্য পছন্দ করলেন। কেননা তিনি যুদ্ধ–বন্দীদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী মর্যাদাশীলা ছিলেন। এজন্য কতিপয় সাহাবী (রাঃ) আরজ করলেনঃ "ইয়া রাসূলাল্লাহ! ছুফিয়া বনি কোরায়জা ও বনু নজিরের নেত্রী। বংশীয় মর্যাদায় তিনি অনেক উঁচুতে আসীন। তিনি আমাদের নেতার (অর্থাৎ প্রিয় নবীর) জন্যই যথোপযুক্ত।"

www.bjilibrary.com

হুজুর (সাঃ) এই পরামর্শ কবুল করলেন। দাহিয়া কালবীকে (রাঃ) অন্য বাঁদী দিয়ে হযরত ছুফিয়াকে (রাঃ) মুক্ত করে দিলেন এবং তাঁকে নিজের গৃহে ফিরে যাওয়া অথবা রাসূলকে (সাঃ) বিয়ে করার স্বাধীনতা প্রদান করলেন।

হযরত ছুফিয়া (রাঃ) রাসূলকে (সাঃ) বিয়ে করাই পছন্দ করলেন এবং তাঁর ইচ্ছা অনুসারেই হুজুর (সাঃ) তাঁকে বিয়ে করলেন। ছাহবা নামক স্থানে উরুসের রসম আদায় এবং সেখানেই ওয়ালিমার দাওয়াত খাওয়ানো হয়। ছাহবা থেকে রওয়ানার সময় হুজুর (সাঃ) তাঁকে নিজের উটের ওপর চড়ালেন এবং নিজের ওবা দিয়ে তাঁর পর্দা করলেন। হযরত ছুফিয়ার (রাঃ) বয়স সে সময় ১৭ বছর ছিল। এই বিয়ের পর ইহুদীরা আর মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেনি।

মদীনা পৌঁছে হুজুর (সাঃ) হযরত ছুফিয়াকে (রাঃ) হযরত হারিছ (রাঃ) বিন নুমানের গৃহে অবতরণ করালেন। তাঁর রূপের সুখ্যাতি শুনে আনসার মহিলা এবং রাসূলের (সাঃ) অন্যান্য স্ত্রী (রাঃ) তাঁকে দেখতে এলেন। যখন তাঁরা তাঁকে দেখে ফিরে যেতে লাগলেন তখন রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তাঁদের পেছনে পেছনে চললেন এবং হযরত আয়েশাকে (রাঃ) জিজ্ঞেস করলেনঃ "আয়েশা, তুমি তাকে কেমন দেখলে? "জবাবে তিনি বললেন, "সেতো একজন ইহুদী।"

হুজুর (সাঃ) বললেন, "এ কথা বলো না। সেতো মুসলমান হয়ে গেছে। তার নিকট ইসলাম ভালো এবং উত্তম।"

হযরত ছুফিয়ার (রাঃ) চেহারায় কয়েকটি দাগ ছিল। হুজুর (সাঃ) তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, এই দাগগুলো কিসের? হযরত ছুফিয়া (রাঃ) আরজ করলেন, " একরাতে আমি স্বপ্নে দেখলাম যে, আসমান থেকে চাঁদ নিক্ষিপ্ত হয়ে আমার কোলে এসে পড়লো আমি এই স্বপ্নের কথা পিতাকে শুনালাম। এতে সে মারাত্মক ক্রোধান্বিত হলো এবং অত্যন্ত জোরের সাথে আমার মুখের ওপর থাপ্পড় মারলো। সেই থাপ্পড়ের ফলে আমার চেহারায় তার আঙ্গুলের দাগ বসে গেল। অতঃপর সে বললো, " তুমি কি আরবের রাণী হওয়ার স্বপ্ন দেখো?"

হযরত ছুফিয়া (রাঃ) অত্যন্ত নম্র স্বভাব, প্রশস্ত অন্তর এবং ধৈর্যশীলা ছিলেন। তিনি যখন উম্মুল মুমিনিন হিসেবে মদীনা আগমন করলেন তখন হযরত ফাতিমাতুজ জোহরা (রাঃ) তাঁকে দেখতে এলেন। এ সময় তিনি নিজের কানের মূল্যবান ঝুমকো খুলে হযরত ফাতেমাকে (রাঃ) দিয়ে দেন এবং তাঁর সাথে আগত অন্যান্য মহিলাকেও কোন না কোন গহনা প্রদান করলেন।

www.bjilibrary.com

হুজুর (সাঃ) তাঁকে অত্যন্ত ভালোবাসতেন এবং তাঁর মন যোগানোর চেষ্টা রতেন। একবার সফরে অন্যান্য স্ত্রীরাও (রাঃ) সঙ্গে ছিলেন। ঘটনাক্রমে হযরত ফিয়ার (রাঃ) উট অসুস্থ হয়ে পড়লো। এতে তিনি দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়লেন। হুজুর (সাঃ) স্বয়ং উপস্থিত হয়ে তাঁর দুশ্চিন্তা দূর করতে চেষ্টা করলেন এবং হযরত যয়নব (রাঃ) বিনতে জাহাশকে বললেন, "যয়নব, তুমি ছুফিয়াকে একটি উট দাও।"

হযরত যয়নব (রাঃ) অত্যন্ত দানশীল ও ভদ্র ছিলেন। কিন্তু অযাচিতভাবে তাঁর মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, "ইয়া রাসূলাল্লাহ! আম কি এই ইহুদীয়াকে নিজের উট দিয়ে দেব?"

এই কথা রাসূলের (সাঃ) পছন্দ হলো না এবং তিনি দুই–তিন মাস পর্যন্ত হযরত যয়নবের (রাঃ) সঙ্গে কথা পর্যন্ত বলেননি। অতঃপর হযরত আয়েশা (রাঃ) অত্যন্ত মুশকিলের সঙ্গে তাঁর অপরাধ ক্ষমা করান। হযরত যয়নব (রাঃ) বিনতে জাহাশ বর্ণনা করেছেন, " রাসূলের (সাঃ) উষ্মা আমাকে প্রায় নিরাশ করে ফেলেছিল এবং আমি ওয়াদা করেছি যে, ভবিষ্যতে আর এ ধরনের কথা বলবো না।"

ইসলাম গ্রহণের পর ইহুদী হওয়ার ভর্ৎসনা বা ঠাট্টা–বিদ্রূপ তাঁর জন্য বড় অন্তর্জ্বালার ব্যাপার ছিল। কিন্তু তিনি অত্যন্ত ধৈর্যের সঙ্গে চলতেন এবং কাউকেই কোন দিন কঠিন জবাব দেননি।

একবার নবী আকরাম (সাঃ) এলেন। এ সময় হযরত ছুফিয়া (রাঃ) কাঁদছিলেন। কান্নার কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন," আয়েশা (রাঃ) এবং যয়নব (রাঃ) বলে থাকেন, আমরা সকল স্ত্রীর মধ্যে উত্তম। কেননা আমরা নবীর (সাঃ) স্ত্রী হওয়া ছাড়াও তাঁর আত্মীয়ও। কিন্তু তুমি ইহুদী কন্যা।" হুজুর (সাঃ) হযরত ছুফিয়াকে (রাঃ) খুশী করার জন্য বললেনঃ "যদি আয়েশা (রাঃ) এবং যয়নব (রাঃ) এই কথাই বলে থাকে যে তাদের বংশের সঙ্গে নবীর (সাঃ) বংশের সম্পর্ক রয়েছে তাহলে তুমি তাদেরকে কেন বলনি যে, আমার পিতা হারুন (আঃ), আমার চাচা মূসা (আঃ) এবং আমার স্বামী মুহাম্মাদ (সাঃ)।"

একবার কোন কথায় হুজুর (সাঃ) হযরত ছুফিয়ার (রাঃ) ওপর অসন্তুষ্ট হলেন। হযরত ছুফিয়া (রাঃ) হযরত আয়েশার (রাঃ) নিকট গেলেন এবং বললেন," আপনি জানেন, কোন বস্তুর বিনিময়ই আমি আমার পালাকে কাউকে দিই না। কিন্তু আপনি যদি নবীকে (সাঃ) আমার ব্যাপারে রাজি করিয়ে দেন তাহলে আমার পালার দিন আপনাকে দিয়ে দেব।"

www.bjilibrary.com

হযরত আয়েশা (রাঃ) এই কাজের জন্য প্রস্তুত হয়ে গেলেন এবং জাফরানে রঞ্জিত একটি উড়না নিয়ে তার ওপর পানি ছিটিয়ে দিলেন। যাতে তার সুগন্ধ ছড়িয়ে পড়ে। এরপর হুজুরের (সাঃ) খিদমতে হাজির হলেন। তিনি বললেন, " আয়েশা, আজ তো তোমার পালার দিন নয়।"

আয়েশা (রাঃ) বললেন, " এটা খোদার ফজিলত। যাকে ইচ্ছা তাকে দান করেন। অতঃপর সকল কাহিনী হুজুরকে (সাঃ) শুনালেন এবং হুজুর (সাঃ) ছুফিয়ার (রাঃ) ওপর খুশী হয়ে গেলেন।

রাসূলের (সাঃ) প্রতি হযরত ছুফিয়ার (রাঃ) সীমাহীন ভালোবাসা ছিল। হুজুরের (সাঃ) মৃত্যুশয্যায় সকল সম্মানিতা স্ত্রী (রাঃ) প্রিয় নবীর (সাঃ) সেবা-শুশ্রূষার জন্য হযরত আয়েশার (রাঃ) কামরায় উপস্থিত হলেন। হযরত ছুফিয়া (রাঃ) হুজুরকে (সাঃ) অস্বস্তিপূর্ণ অবস্থায় দেখে বললেন, " ইয়া রাসূলাল্লাহ! হায়, আপনার অসুখ যদি আমার হতো। "অন্য স্ত্রীরা (রাঃ) তাঁর দিকে তাকালেন। এ সময় হুজুর (সাঃ) বললেন, " আল্লাহর কসম! সে সঠিক বলেছে।" অর্থাৎ তাঁর এই কথা প্রদর্শনীমূলক নয়। বরং সত্য অন্তরেই সে তা চায়। হযরত আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, "আমি কোন মহিলাকে ছুফিয়া (রাঃ) থেকে ভালো খাবার তৈরী করনেওয়ালীপাইনি।"

হযরত ওমর ফারুকের (রাঃ) শাসনামলে হযরত ছুফিয়ার (রাঃ) একজন দাসী আমীরুল মুমিনিনের কাছে অভিযোগ করলো যে, উম্মুল মুমিনের (রাঃ) নিকট থেকে এখনো ইহুদীর গন্ধ আসে। কেননা এখনো তিনি শনিবারকে ভাল মনে করেন এবং ইহুদীদের সঙ্গে আন্তরিক সম্পর্ক রাখেন। হযরত ওমর (রাঃ) অবস্থা তদন্তের জন্য স্বয়ং উম্মুল মুমিনিন ছুফিয়ার (রাঃ) নিকট তাশরীফ নিলেন। তিনি জবাবে বললেন, " যখন থেকে খোদা আমাকে শনিবারের পরিবর্তে শুক্রবার দিয়েছেন, তখন থেকেই শনিবারের প্রতি ভালোবাসার প্রয়োজন থাকেনি। হাঁ ইহুদীদের সঙ্গে আমার সম্পর্ক রয়েছে। কেননা তারা আমার আত্মীয় এবং আমাকে আত্মীয়দের সঙ্গে সম্পর্ক রাখতে হয়।" হযরত ওমর (রাঃ) উম্মুল মুমিনিনের (রাঃ) স্পষ্টবাদিতায় খুব খুশী হয়ে ফিরে এলেন।

এরপর হযরত ছুফিয়া (রাঃ) দাসীকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন, "আমীরুল মুমিনিনের (রাঃ) নিকট আমার বিরুদ্ধে তোমাকে অভিযোগ করার ব্যাপারে কোন বস্তু উদ্বুদ্ধ করেছে?"

সে বললো, "শয়তান আমাকে প্ররোচনা দিয়েছে।"

www.bjilibrary.com

উম্মুল মুমিনিন (রাঃ) বললেন, " যাও, আমি তোমাকে খোদার রাস্তায় আযাদ করে দিলাম।"

ইলম ও ফজিলতের ক্ষেত্রে হযরত ছুফিয়ার (রাঃ) মর্যাদা অত্যন্ত বুলন্দ ছিল। কুফার মহিলারা প্রায়ই তাঁর নিকট মাসয়ালা জানতে আসতেন। ইমাম যয়নুল আবেদীন (রাঃ), ইসহাক বিন আব্দুল্লাহ (রঃ), ইয়াযিদ বিন মাতার (রঃ) এবং মুসলিম বিন ছাফওয়ান (রাঃ) হযরত ছুফিয়ার (রাঃ) জবানীতে কয়েকটি হাদীস বর্ণনাকরেছেন।

হযরত ছুফিয়া (রাঃ) অত্যন্ত দরদভরা অন্তরের মানুষ ছিলেন। ৩৫ হিজরীতে তৃতীয় খলিফা হযরত ওসমানের (রাঃ) বাড়ী যখন বিদ্রোহীরা অবরোধ করে তখন তিনি খুব দুঃখিত হন। বৃদ্ধ আমিরুল মুমিনিনের মুসিবতে তিনি খুব বেচাইন হলেন। তিনি একজন গোলাম সঙ্গে নিয়ে নিজের খচ্চরের ওপর সওয়ার হয়ে হযরত ওসমানের (রাঃ) গৃহের দিকে রওয়ানা হলেন। আশতার নখয়ী তাঁর গোলাম দেখে চিনে ফেললো এবং সামনে অগ্রসর হয়ে খচ্চরকে মারতে শুরু করলো। যেহেতু পরিস্থিতি সম্পূর্ণ প্রতিকূল ছিল এবং আশতার নখয়ীর বিরুদ্ধে সাফল্য লাভ কঠিন এজন্য তিনি মুসলিহাতান ফিরে গেলেন এবং হযরত ইমাম হাসান (রাঃ) বিন আলী মুরতাজার মাধ্যমে হযরত ওসমানের (রাঃ) নিকট খাবার পাঠালেন।

হযরত ছুফিয়া (রাঃ) ৫০ হিজরীর রমযান মাসে ৬০ বছর বয়সে ওফাত পান। জান্নাতুল বাকীতে তাঁর লাশ দাফন করা হয়। তিনি নিজের বাসগৃহ জীবিতাবস্থায় আল্লাহর রাস্তায় দান করে যান। অবশ্য মৃত্যুর সময় এক লাখ দিরহাম নগদ রেখে যান এবং এর এক তৃতীয়াংশ নিজের ইহুদী ভ্রাতুষ্পুত্রকে দেয়ার জন্য ওসিয়ত করে যান। লোকজন তাকে অর্থদানে গড়িমসি করতে লাগলো। হযরত আয়েশা (রাঃ) শুনে বললেন, "হে লোকেরা! আল্লাহকে ভয় করো এবং ছুফিয়ার ওসিয়ত পূরণ কর।" তাঁর নির্দেশ অনুযায়ী ওসিয়ত পূরণ করা হয়।

www.bjilibrary.com

উম্মুল মুমিনিন হযরত মাইমুনা (রাঃ) বিনতে হারিছ

প্রকৃত নাম ছিল বাররাহ। রাসূলুল্লাহর (সাঃ) সঙ্গে বিয়ে হওয়ার পর মাইমুনা নাম রাখা হয়। কায়েস বিন আইলান গোত্রের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। নসবনামা হলোঃ মাইমুনা (রাঃ) বিনতে হারিছ বিন হাযান বিন বুজাইর বিন হাযাম বিন বাওযাতা বিন আব্দুল্লাহ বিন হিলাল বিন আমের বিন ছা'ছা' বিন মাবিয়া বিন বকর বিন হাওয়াযেন বিন মানছুর বিন আকরামা বিন খাছিফাতা বিন কায়েস বিন আইলান বিন মুদির।

মাতার নাম ছিল হিনদ্ বিনতে আওফ বিন জুহায়ের বিন হারিছ বিন হমাতাতা বিন জারাশ। তিনি হামির গোত্রের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত ছিলেন।

প্রথম বিয়ে হয়েছিল মাসউদ বিন আমর বিন উমায়ের ছাকাফীর সঙ্গে। কোন কারণে তিনি তালাক দিয়ে দিয়েছিলেন। অতঃপর আবু রুহম বিন আব্দুল উজ্জার সঙ্গে বিয়ে হয়। সপ্তম হিজরীতে তিনি মারা যান এবং হযরত মাইমুনা বিধবা হয়ে যান।

একই বছরে প্রিয় নবী (সাঃ) ওমরা আদায়ের জন্য মদীনা থেকে মক্কা রওয়ানা হন। এ সময় তাঁর শ্রদ্ধেয় চাচা হযরত আব্বাস (রাঃ) বিন আব্দুল মুত্তালিব মাইমুনার সঙ্গে বিয়ের কথা বলেন। হুজুর (সাঃ) এই প্রস্তাবে রাজি হয়ে যান। বস্তুত ইহরাম অবস্থাতেই সপ্তম হিজরীর শওয়াল মাসে পাঁচ'শ দিরহাম মোহরের বিনিময়ে হযরত মাইমুনার (রাঃ) সঙ্গে বিয়ে হয়। ওমরাহ পালন শেষে মক্কা থেকে ১০ মাইল দূরে ছারফ নামক স্থানে হুজুর (সাঃ) অবস্থান গ্রহণ করেন। হুজুরের (সাঃ) গোলাম হযরত আবু রাফে (রাঃ) হযরত মাইমুনাকে (রাঃ) সঙ্গে নিয়ে সেখানে এলেন এবং সেখানেই উরুসের রসম আদায় হলো। হযরত মাইমুনা (রাঃ) রাসূলে করিমের (সাঃ) শেষ বিবি ছিলেন। অর্থাৎ তাঁর সঙ্গে বিয়ের পর হুজুর (সাঃ) ওফাত পর্যন্ত আর কোন বিয়েকরেননি।

হযরত মাইমুনা (রাঃ) অত্যন্ত মুত্তাকী এবং খোদার প্রতি ভয় পোষণকারী মানুষ ছিলেন। হযরত আয়েশা সিদ্দিকাহ (রাঃ) তাঁর সম্পর্কে বলেছেনঃ "মাইমুনা (রাঃ) আমাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী খোদার প্রতি ভয় পোষণকারী এবং আত্মীয়তার বন্ধনরক্ষাকারীছিলেন।"

www.bjilibrary.com

একবার মদীনায় একজন মহিলা কঠিন রোগে আক্রান্ত হলেন। তিনি মান্নত মানলেন যে, যদি আল্লাহ পাক সুস্থ করেন তাহলে বাইতুল মাকদাসে গিয়ে নামায পড়বেন। আল্লাহ পাক তাঁকে সুস্থ করলেন এবং তিনি মান্নত পুরো করার জন্য বাইতুল মাকদাস গমনের ইচ্ছা করলেন। সফরে রওয়ানা হওয়ার পূর্বে হযরত মাইমুনার (রাঃ) নিকট বিদায় নিতে এলেন এবং সকল ঘটনা খুলে বললেন। হযরত মাইমুনা (রাঃ) তাঁকে বুঝালেন যে, মসজিদে নববীতে নামায পড়ার সওয়াব অন্য মসজিদে নামায পড়ার সওয়াব থেকে হাজার গুণ বেশী। তুমি বাইতুল মাকদাসে যাওয়ার পরিবর্তে মসজিদে নববীতেই নামাজ পড়ে নাও। সওয়াবও বেশী হবে এবং মান্নতও পূরণ হবে। কেননা আল্লাহর নিকট বাইতুল মাকদাসের চেয়ে মসজিদে নববী বেশীপ্রিয়।

একদিন হযরত আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস (রাঃ) উস্কো-খুস্কো ও অবিন্যস্ত চুল সমেত তাঁর খিদমতে হাজির হলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, " বেটা! চুল অবিন্যস্ত কেন?" হযরত আব্দুল্লাহ (রাঃ) বললেন, "আমার স্ত্রী "দিনগুলিতে" রয়েছে। সেই আমার মাথায় চিরুনী করে। কিন্তু এখন এই অবস্থায় থাকার কারণে তাকে দিয়ে এই কাজ করানো ঠিক মনে করিনি।"

হযরত মাইমুনা বললেন, " হে পুত্র! হাতও কি কখনো অপবিত্র হয়? আমাদের এই অবস্থায় রাসূলে করিম (সাঃ) আমাদের কোলে মাথা রেখে শুতেন এবং কুরআন পড়তেন। আমরা ঐ অবস্থায় মুসাল্লা নিয়ে মসজিদে রেখে আসতান।" অন্য আরো একবার তিনি হযরত ইবনে আব্বাসকে (রাঃ) অত্যন্ত বলিষ্ঠভাবে বুঝিয়েছিলেন যে, মহিলাদের ঐ অবস্থায় স্পর্শ করায় কোন জিনিস অপবিত্র হয় না।

একবার হযরত মাইমুনার (রাঃ) একজন নিকটাত্মীয় তাঁর খিদমতে হাজির হলো। তার মুখ দিয়ে শরাবের গন্ধ আসছিল। তিনি খুব ক্রোধান্বিত হলেন এবং কঠোর ভাষায় বললেন, "খবরদার! ভবিষ্যতে কোনদিন আমার ঘরে পা রাখবে না।"

একবার তিনি একজন বাঁদীকে খোদার রাস্তায় স্বাধীন করে দিলেন। হুজুর (সাঃ) জানতে পেরে বললেন, "খোদা তোমাকে সওয়াব দিন।"

হযরত মাইমুনা (রাঃ) অত্যন্ত কল্যাণকামী এবং দানশীলা ছিলেন। এই দারাজদিলের কারণে মাঝে মধ্যে ঋণও গ্রহণ করতে হতো। একবার বিরাট অংক ঋণ নিয়ে ফেললেন। একজন জিজ্ঞেস করলেন, "উম্মুল মুমিনিন! এতবড় অংক পরিশোধের ব্যবস্থা কি হবে?" তিনি বললেন, "আমি রাসূলুল্লাহ (সাঃ) থেকে শুনেছি,

www.bjilibrary.com

যে ব্যক্তি ঋণ আদায় করার নিয়ত রাখে আল্লাহ স্বয়ং তার ঋণ পরিশোধের ব্যবস্থা করেদেন।"

হযরত মাইমুনা (রাঃ) ৫১ হিজরীতে ছারফে ইন্তেকাল করেন। যখন জানাযা উঠানো হলো তখন হযরত আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস (রাঃ) বললেন, "জানাযাকে বেশী নাড়াচাড়া দিওনা। তিনি রাসুলের (সাঃ) জীবন সঙ্গিনী ছিলেন। আদবের সঙ্গে আস্তে আস্তেচলো।"

হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রাঃ) জানাযার নামায পড়ালেন এবং কবরে রাখলেন।

হযরত মাইমুনা (রাঃ) থেকে ৪৬টি হাদীস (অন্যমতে ৭৬টি) বর্ণিত আছে। তাঁর হাদীস বর্ণনাকারীদের মধ্যে হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রাঃ), আবদুল্লাহ বিন শাদাদ (রঃ), আবদুর রহমান বিন ছায়েব (রঃ), ওবায়দুল্লাহ খাওলানী (রঃ) এবং আতা বিন ইয়াসার (রঃ) অন্তর্ভূক্ত ছিলেন।

হযরত আব্বাসের (রাঃ) স্ত্রী হযরত উম্মুল ফজল (রাঃ) হযরত মাইমুনার (রাঃ) সহোদরা ছিলেন। এই সূত্রে হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রাঃ) তাঁর ভাগিনেয় ছিলেন।

www.bjilibrary.com

হযরত রায়হানা (রাঃ) বিনতে শামউন

নাম রায়হানা। ইহুদী বংশ বনু কুরায়জার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত ছিলেন। নসবনামা হলোঃ রায়হানা বিনতে শামউন বিন যায়েদ বিন খানাফা। অন্য রাওয়ায়েতে তাঁর বংশনামা এভাবে উল্লিখিত হয়েছেঃ রায়হানা বিনতে যায়েদ বিন ওমর বিন খানাফা বিন শামউন বিন যায়েদ। কিন্তু অধিকাংশ চরিতকারের নিকট প্রথম নসবনামাই বিশ্বস্ত। হযরত রায়হানার (রাঃ) পিতার নাম শামউন (রাঃ) বিন যায়েদ। তিনি সাহাবা ছিলেন। তিনি হাদীস শুনেছেন এবং বর্ণনাও করেছেন।

বনু কোরায়জার জনৈক "হাকামের" সঙ্গে হযরত রায়হানার (রাঃ) বিয়ে হয়েছিল। বনু কোরায়জার যুদ্ধের পর যে সকল ইহুদীকে হত্যা করা হয়েছিল, হাজামও তাদে অন্তর্ভুক্ত ছিল। হযরত রায়হানা (রাঃ) সেই সকল ইহুদী মহিলাদের মধ্যে ছিলেন যাদেরকে তখন মুসলমানরা গ্রেফতার করেছিল।

ইবনে সা'দ বর্ণনা করেছেন যে, হুজুর (সাঃ) তাঁকে হযরত উম্মুল মানযার (রাঃ) বিনতে কায়েসের বাড়ীতে রেখেছিলেন। তাঁর ইসলাম গ্রহণের ব্যাপারে দু'ধরনের রাওয়ায়েত পাওয়া যায়। প্রথম রাওয়ায়েত হলো, হুজুর (সাঃ) তাঁকে বললেন, তুমি চাইলে ইসলাম গ্রহণ করতে পারো এবং চাইলে নিজের ধর্মের (ইহুদী) ওপর কায়েম থাকতে পারো। তিনি নিজের ধর্মকে অগ্রাধিকার দিলেন। এরপর হুজুর (সাঃ) বললেন, "যদি তুমি ইসলাম গ্রহণ কর, তাহলে আমি তোমাকে আমার নিকট রাখবো।" কিন্তু তিনি নিজের কথার ওপর অটল থাকলেন। তাঁর এই আচরণে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) মনোকষ্ট পেলেন এবং তিনি হযরত রায়হানাকে নিজের অবস্থার ওপর ছেড়ে দিলেন।

হযরত রাসূলে করিম (সাঃ) একদিন একদল সাহাবীর (রাঃ) মধ্যে বসেছিলেন। হঠাৎ করে জনৈক ব্যক্তির পায়ের আওয়াজ শোনা গেল। রাসূলের (সাঃ) মুখাবয়ব হাস্যোজ্জ্বল হয়ে উঠলো এবং তিনি সাহাবীদেরকে (রাঃ) সম্বোধন করে বললেন, এই ব্যক্তি ছা'লাবা (রাঃ) বিন সায়িয়াহ। সে রায়হানার (রাঃ) ইসলাম গ্রহণের সুসংবাদ নিয়ে আসছে। ইবনে হিশাম লিখেছেন, ছা'লাবা (রাঃ) নবীর (সাঃ)

www.bjilibrary.com

খিদমতে হাজির হয়ে আস্তে আস্তে হুজুরকে (সাঃ) রায়হানার (রাঃ) ইসলাম গ্রহণের সুসংবাদ শুনালেন। হুজুর (সাঃ) খুব খুশী হলেন এবং সাহাবাদেরকে (রাঃ) বললেন, ছা'লাবা (রাঃ) রায়হানার (রাঃ) ইসলাম গ্রহণের সুসংবাদ নিয়ে এসেছে।)

দ্বিতীয় রাওয়ায়েত হলো, হযরত রায়হানা (রাঃ) বন্দী হয়ে এলে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তাঁকে বললেন, "যদি তুমি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে গ্রহণ কর তাহলে আমি তোমাকে বিশেষভাবে গ্রহণ করবো।" তিনি আরজ করলেন, "আমি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে (সাঃ) গ্রহণ করলাম।"

ইসলাম গ্রহণের পর হুজুর (সাঃ) তাঁকে নিজের মালিকানায় রাখলেন। অন্য রাওয়ায়েতে আছে যে, তিনি তাঁকে আযাদ করে দেন এবং তাঁকে বিয়ে করে পবিত্র স্ত্রীদের অন্তর্ভুক্ত করলেন। যাহোক, তিনি পর্দার সঙ্গে থাকতেন এবং তাঁর জন্যও পালার দিন নির্ধারিত ছিল। হুজুর (সাঃ) তাঁকে খুব ভালোবাসতেন এবং তিনি তাঁর সব ফরমায়েশ পূরণ করতেন। তাঁর স্থায়ী আবাসস্থল ছিল কায়েস বিন ফাহাদের গৃহ। তিনি সুদর্শন এবং পবিত্র চরিত্রের অধিকারিনী ছিলেন।

সারওয়ারে আলমের (সাঃ) ওফাতের কায়েক মাস পূর্বে (এক রাওয়ায়েত অনুযায়ী ১০ মাস পূর্বে) তিনি ইন্তেকাল করেন এবং জান্নাতুল বাকীতে তাঁর দাফন সম্পন্ন হয়।

www.bjilibrary.com

হযরত মারিয়া কিবতিয়া (রাঃ)

হুদায়বিয়ার সন্ধির (৬ষ্ঠ হিজরী) পর সারওয়ারে আলম (সাঃ) পত্রাবলী প্রেরণ করে দূর ও নিকটের শাসকদেরকে ইসলামের দাওয়াত পৌছান। তাদের মধ্যে একটি চিঠি ইসকান্দারিয়ার রোমক বাতরিকের (PATRIARCH) নামেও ছিল। আরবরা তাকে মুকাওকিস বলতো। প্রখ্যাত সাহাবী হযরত হাতির (রাঃ) বিন আবি বালতা হুজুরের (সাঃ) চিঠি নিয়ে মুকাওকিসের নিকট পৌছলেন। কিন্তু তিনি ইসলাম গ্রহণ করলেন না। তবে হযরত হাতিবের (রাঃ) সঙ্গে অত্যন্ত মর্যাদাপূর্ণ ব্যবহার করলেন। যখন সাহাবী হাতিব ইসকান্দারিয়া থেকে চলে যেতে লাগলেন তখন দু'টি কিবতী মেয়ে তাঁর সঙ্গে দিয়ে দেয়া হলো এবং তাঁর পক্ষ থেকে তাদেরকে হুজুরের (সাঃ) খিদমতে পেশ করার কথা বলা হলে। তিনি একটি চিঠিও দিয়ে দিলেন। চিঠিতে লিখা হলো যে, আপনার খিদমতে দু'টি মেয়েকে প্রেরণ করছি। মেয়ে দু'টি কিবতীদের মধ্যে মর্যাদার দাবীদার।

মেয়ে দু'টির নাম ছিল হযরত মারিয়া (রাঃ) (MARRY) ও হযরত সিরনী (রাঃ)। সিরিন থেকে ফেরার পথে উভয়েই হযরত হাতিবের (রাঃ) তাবলীগে ইসলাম গ্রহণ করেন। মদীনা পৌছে হযরত হাতিব (রাঃ) তাঁদেরকে হুজুরের (সাঃ) খিদমতে পেশ করলেন। এ সময় প্রিয় নবী (সাঃ) হযরত সিরিনকে (রাঃ) হযরত হাসসান বিন ছাবিতের (রাঃ) মালিকানায় দিয়ে দিলেন এবং হযরত মারিয়াকে (রাঃ) নিজের হেরেমে দাখিল করে নিলেন। ৮ম হিজরীতে তাঁর গর্ভে হুজুরের (সাঃ) সাহেবজাদা ইবরাহিম (রাঃ) জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৭-১৮ মাস জীবিত থাকার পর ইন্তেকাল করেন। তাঁর ইন্তেকালে হযরত মারিয়া খুব ক্রন্দন করতে লাগলেন এবং হুজুরের (সাঃ) চক্ষুও অশ্রুতে পূর্ণ হয়ে গেল।

চরিতকাররা বর্ণনা করেছেন, প্রিয় নবী (সাঃ) পবিত্র স্ত্রীদের সঙ্গে যে ধরনের ব্যবহার করতেন ঠিক একই ধরনের ব্যবহার হযরত মারিয়ার (রাঃ) সঙ্গেও করতেন এবং তাঁকেও পর্দায় থাকার নির্দেশ দিয়েছিলেন। হুজুর (সাঃ) বলতেন, "কিবতীদের

www.bjilibrary.com

(মিসরের খৃস্টান) সঙ্গে ভালো আচরণ কর। কারণ, তাদের সঙ্গে ওয়াদা ও বংশ উভয় সম্পর্কই রয়েছে। তাদের সঙ্গে বংশের সম্পর্কের ধরন হলো, হযরত ইসমাইলের (আঃ) মা এবং আমার পুত্র ইবরাহিমের মা (মারিয়া) উভয়েই একই কওমের। প্রতিশ্রুতি বা চুক্তির ব্যাপার হলো, তাদের সঙ্গে চুক্তি হয়েছে।"

আল্লাহ পাক হযরত মারিয়াকে (রাঃ) সুশ্রী ও সুন্দর চরিত্র দান করেছিলেন। উম্মুল মুমিনিন হযরত আয়েশা সিদ্দিকাহ (রাঃ) বলতেন, মারিয়ার (রাঃ) ওপর যত ঈর্ষা আমার ছিল, অন্য কারোর ওপর তা ছিল না।

হাফিজ ইবনে কাছির (রঃ) "আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া" গ্রন্থে লিখেছেন, হযরত মারিয়া (রাঃ) অত্যন্ত পবিত্র ও নেক চরিত্রের অধিকারিনী ছিলেন।

হুজুরের (সাঃ) ইন্তেকালের পর প্রথম খলিফা হযরত আবুবকর সিদ্দিক (রাঃ) এবং দ্বিতীয় খলিফা হযরত ওমর ফারুকও (রাঃ) হযরত মারিয়ার মর্যাদা বহাল রেখেছিলেন।

হযরত মারিয়া (রাঃ) হযরত ওমর ফারুকের (রাঃ) খিলাফতকালে ১৬ হিজরীর মুহাররাম মাসে ইন্তেকাল করেন। আমীরুল মুমিনিন সকল মদীনাবাসীকে একত্রিত করে নিজে নামাযে জানাযা পড়ে জান্নাতুল বাকীতে তাঁর লাশ দাফন করেন।

www.bjilibrary.com

রাসূলের (সাঃ) কন্যা হযরত যয়নব (রাঃ) বিনতে রাসূলুল্লাহ (সাঃ)

নাম ছিল যয়নব (রাঃ)। রহমতে আলম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সবচেয়ে বড় কন্যা ছিলেন। মাতা ছিলেন হযরত খাদিজাতুল কুবরা (রাঃ)। নবীর (সাঃ) নবুয়ত প্রাপ্তির ১০ বছর পূর্বে মক্কা মুয়াজ্জামাতে জন্মগ্রহণ করেন। প্রিয় নবীর (সাঃ) বয়স ছিল সে সময় ৩০ বছর।

হযরত যয়নবের (রাঃ) বিয়ে শৈশবকালেই (নবুয়ত প্রাপ্তির পূর্বে) খালাতো ভাই আবুল আছের (রাঃ) (লকিত) সঙ্গে হয়েছিল।

রাসূলে করিমের (সাঃ) নবুয়ত প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে কালবিলম্ব না করে হযরত যয়নব (রাঃ) ঈমান আনয়ন করেন।

নবুয়ত প্রাপ্তির পর মক্কার কাফিররা প্রিয় নবী (সাঃ) ও হকপন্থীদের ওপর সীমাহীন নির্যাতন শুরু করলো। রাসূলে করিমের (সাঃ) দু' কন্যা হযরত রোকাইয়া (রাঃ) এবং হযরত উম্মে কুলসুমের (রাঃ) আবু লাহাবের দু' পুত্রের সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল। কিন্তু তাদের রুখসত অনুষ্ঠান তখনো হয়নি। তারা উভয়েই পিতার কথামতো রাসুলের (সাঃ) দু'কন্যাকেই তালাক দেয়। কাফেররা আবুল আছকেও হযরত যয়নবকে (রাঃ) তালাক দেয়ার জন্য উত্যক্ত করেছিল। কিন্তু তিনি তাদের আবদার প্রত্যাখ্যান করেন এবং হযরত যয়নবের (রাঃ) সঙ্গে সুন্দর ব্যবহার করতে থাকেন। রাসূলে করিম (সাঃ) আবুল আছের (রাঃ) এই কাজের সব সময় প্রশংসা করতেন। এত শরীফ এবং পূণ্যাত্মা হওয়া সত্ত্বেও আবুল আছ (রাঃ) নিজের পিতা ও পিতামহের ধর্ম ত্যাগ করেননি। ইত্যবসরে রাসূলে করিম (সাঃ) হিজরত করে মদীনা তাশরীফ নিয়ে গেলেন। হযরত যয়নব (রাঃ) সে সময় শ্বশুর বাড়ীতে অবস্থান করছিলেন।

দ্বিতীয় হিজরীর রমযান মাসে হক ও বাতিলের মধ্যে বদর নামক স্থানে প্রথম সংঘর্ষ বাধে। এই যুদ্ধে হক বিজয়ী হয় এবং মক্কার কোরেশদের বহু লোক মুসলমানদের হাতে গ্রেফতার হয়। গ্রেফতারকৃতদের মধ্যে আবুল আছও (রাঃ) ছিলেন

www.bjilibrary.com

জনৈক আনসার হযরত আব্দুল্লাহ বিন জাবির (রাঃ) তাঁকে গ্রেফতার করেছিলেন। মক্কাবাসী যখন এই খবর পেল, তখন কয়েদীদের আত্মীয়–স্বজনেরা তাদের মুক্তির জন্য রাসূলের (সাঃ) খিদমতে ফিদিয়া প্রেরণ করলো। হযরত যয়নবও (রাঃ) মক্কা থেকে নিজের দেবর আমর বিন রবির হাতে ইয়েমেনী আকিক পাথরের হার স্বামীর মুক্তির জন্য প্রেরণ করলেন। এই হার হযরত যয়নবকে (রাঃ) তাঁর মা হযরত খাদিজাতুল কুবরা (রাঃ) বিয়ের সময় দিয়েছিলেন। বিশ্ব নবী হযরত মুহাম্মাদের (সাঃ) নিকট যখন এই হার পেশ করা হলো তখন হুজুরের (সাঃ) হযরত খাদিজাতুল কুবরার কথা স্মরণ হলো এবং তাঁর চক্ষু অশ্রু সজল হয়ে উঠলো।

হুজুর (সাঃ) সাহাবাদেরকে সম্বোধন করে বললেন, "যদি ভালো মনে করো তাহলে এই হার যয়নবকে (রাঃ) ফেরত পাঠিয়ে দিতে পারো। এটা তার মা'র নির্দশন। আবুল আছের (রাঃ) ফিদিয়া হলো, সে মক্কা গিয়ে হযরত যয়নবকে (রাঃ) কালবিলম্ব না করে মদীনা পাঠিয়ে দেবে।" সকল সাহাবী (রাঃ) নবীর (সাঃ) ইরশাদের সামনে মাথা নত করে দিলেন। হযরত আবুল আছও (রাঃ) এই শর্ত কবুল করে নিলেন এবং মুক্ত হয়ে মক্কা পৌছলেন। প্রিয় নবী (সাঃ) তাঁর সঙ্গে হযরত যায়েদ (রাঃ) বিন হারিছাকে প্রেরণ করলেন এবং নির্দেশ দিয়ে দিলেন যে, সে যেন বাত্ন অথবা জাজ নামক স্থানে অবস্থান করে অপেক্ষা করতে থাকে। যয়নব (রাঃ) যখন মক্কা থেকে সেখানে পৌছবে তখন তাকে সঙ্গে নিয়ে মদীনা চলে আসবে। হযরত আবুল আছ (রাঃ) ওয়াদা অনুযায়ী নিজের ছোট ভাই কিনানার সঙ্গে হযরত যয়নবকে (রাঃ) মক্কা থেকে মদীনার দিকে রওয়ানা করে দিলেন। মক্কার কাফিররা যখন এই খবর পেল তখন কিনানা বিন রাবি হযরত যয়নবের (রাঃ) পিছু নিল এবং "জিতাওয়া" নামক স্থানে গিয়ে তাদেরকে ঘিরে নিল। হযরত যয়নব (রাঃ) উটের ওপর সওয়ার ছিলেন। কাফেরদের মধ্যেকার হিবার বিন আসওয়াদ হযরত যয়নবকে (রাঃ) বর্শা দিয়ে মাটিতে ফেলে দিল (অথবা উটের মুখ ফেরানোর জন্য বর্শ ঘুরিয়েছিল এবং হযরত যয়নব (রাঃ) মাটিতে পড়ে গিয়েছিলেন।) তিনি অন্তঃসত্ত্বা ছিলেন। কঠিন আঘাত প্রাপ্তির কারণে গর্ভপাত হয়ে গেল। কিনানা বিন রাবি' অগ্নিশর্মা হয়ে উঠলেন। নিজের তীর বের করলেন এবং তা ধনুতে চড়িয়ে হুংকার ছেড়ে বললেন, খবরদার! তোমাদের মধ্যে কেউ এখন সামনে অগ্রসর হলে একদম ছিদ্র করে ফেলবো। এই হুংকারে কাফিররা থেমে গেল। আবু সুফিয়ানও তাদের মধ্যে ছিলেন। তিনি বললেন, "ভ্রাতুষ্পুত্র! তীর সম্বরণ কর। আমি তোমার সঙ্গে কিছু কথা বলতে চাই।" কিনানা জিজ্ঞেস করলেন, বল কি বলতে চাও? আবু সুফিয়ান তাঁর কানে কানে বললেন, "মুহাম্মাদের (সাঃ) হাতে আমরা যেভাবে অপমানিত এবং

www.bjilibrary.com

অপদস্থ হয়েছি তা তুমি ভালোভাবে জানো। যদি তুমি তাঁর কন্যাকে এইভাবে প্রকাশ্যে আমাদের সামনে দিয়ে নিয়ে যাও তাহলে আমরা খুব লজ্জিত হই। তারচেয়ে বরং এটাই উত্তম যে, তুমি এখন যয়নবকে (রাঃ) সঙ্গে নিয়ে মক্কা ফিরে চলো এবং অন্য কোন সময় চুপিসারে তাকে মদীনা নিয়ে যাবে।" কিনানা এই পরামর্শ মেনে নিলেন এবং হযরত যয়নবকে (রাঃ) নিয়ে মক্কা ফিরে এলেন। কিছুদিন পর তিনি রাতের বেলা চুপিসারে হযরত যয়নবকে (রাঃ) সঙ্গে নিয়ে বাতন অথবা জাজে পৌছলেন এবং তাঁকে হযরত যায়েদ (রাঃ) বিন হারিছার নিকট পৌছে দিয়ে মক্কা ফিরে গেলেন। হযরত যায়েদ (রাঃ) হযরত যয়নবকে (রাঃ) সঙ্গে নিয়ে মদীনা মুনাওয়ারাপৌছলেন।

হযরত আবুল আছ (রাঃ) হযরত যয়নবকে (রাঃ) খুবই ভালোবাসতেন। হযরত যয়নব (রাঃ) চলে যাওয়ার পর তিনি খুব বেচাইন হয়ে পড়লেন। একবার যখন তিনি সিরিয়া সফর করছিলেন তখন খুব দরদভরা কণ্ঠে এই কবিতা আবৃত্তি করলেনঃ

"আমি যখন ইরিম অতিক্রম করছিলাম তখন যয়নবকে স্মরণ করলাম এবং বললাম, হে খোদা! যে ব্যক্তি হেরেমে অবস্থান করছে তাকে তুমি চির সবুজ রেখো। আমীনের কন্যাকে আল্লাহ উত্তম বদলা দিন এবং প্রত্যেক স্বামীই সেই কথারই প্রশংসা করে যা সে ভালোভাবে জানে।"

হযরত আবুল আছ (রাঃ) অত্যন্ত শরীফ এবং দিয়ানতদার মানুষ ছিলেন। লোকজন তাঁর নিকট আমানতসমূহ রাখতেন। তিনি তা অত্যন্ত বিশ্বস্ততার সঙ্গে সংরক্ষণ করতেন এবং মালিকরা তা চাইবার সঙ্গে সঙ্গে ফিরিয়ে দিতেন। মক্কায় তাঁর এত প্রভাব ছিল যে, মানুষ নিজের ব্যবসায়িক পণ্য তাঁর নিকট রেখে বিক্রয়ের জন্য অন্য দেশে প্রেরণ করতো। ৬ষ্ঠ হিজরীতে আবুল আছ (রাঃ) একটি বাণিজ্যিক কাফেলার সঙ্গে সিরিয়া যাচ্ছিলেন। এমন সময় আয়েছ নামক স্থানে ইসলামের মুজাহিদরা কুরায়েশ কাফেলার ওপর চোরাগোপ্তা হামলা চালিয়ে সকল সম্পদ ও আসবাব দখল করে নেয়। হযরত আছ (রাঃ) পালিয়ে মদীনা চলে গেলেন এবং অন্যান্য মুশরিকদেরকে মুসলমানরা গ্রেফতার করে নিলেন। হযরত আবুল আছ (রাঃ) মদীনা পৌছে হযরত যয়নবের (রাঃ) আশ্রয় নিলেন। তিনি রাসূলে করিমের (সাঃ) নিকট সুপারিশ করে বললেন যে, আবুল আছের (রাঃ) মাল তাঁকে ফেরত দেয়া হোক। বস্তুত আবুল আছ (রাঃ) মক্কায় হযরত যয়নবের (রাঃ) সঙ্গে ভালো আচরণ করেছিলেন। এজন হুজুর (সাঃ) তাঁকে মান্য করতেন। তিনি সাহাবীদেরকে বললেন, "তোমরা যদি আবুল আছের (রাঃ) মাল ফিরিয়ে দাও তাহলে আমি কৃতজ্ঞ থাকবো।"

www.bjilibrary.com

সাহাবীরা (রাঃ) সব সময় রাসূলের (সাঃ) সন্তুষ্টিই চাইতেন। তৎক্ষণাৎ তাঁরা সকল মাল-আসবাব হযরত আবুল আছকে (রাঃ)ফিরিয়ে দিলেন। তিনি মালমাত্তা নিয়ে মক্কা পৌছলেন এবং সকল মানুষের আমানত ফিরিয়ে দিলেন।

অতঃপর মক্কাবাসীদেরকে সম্বোধন করে বললেন, "হে কোরেশবাসী! এখন আমার জিম্মায় কারোর কোন আমানত নেই তো?"

সকল মক্কাবাসী একবাক্যে বললো, "মোটেই না। খোদা তোমাকে উত্তম জাযা দিন। তুমি একজন নেক্কার ও ওয়াদা পূরণকারী মানুষ।"

হযরত অবুল আছ (রাঃ) বললেন, "তাহলে শুনে নাও। আমি মুসলমান হলাম। খোদার কসম! ইসলাম গ্রহণে আমাকে শুধুমাত্র এই জিনিসই বাধা দিয়ে রেখেছিল যে, তোমরা আমাকে খেয়ানতকারী মনে না কর।" এ কথা বলে তিনি কালেমায়ে শাহাদাত পাঠ করলেন এবং তারপর হিজরত করে মদীনা তাশরীফ রাখলেন। সপ্তম হিজরীর মুহাররাম মাসে এই ঘটনা ঘটেছিল।

বস্তুত শিরকের কারণে হযরত যয়নব (রাঃ) ও হযরত আবুল আছের (রাঃ) মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটেছিল। এজন্য আবুল আছ (রাঃ) যখন ইসলাম গ্রহণ করে মদীনা পৌছলেন তখন হুজুর (সাঃ) হযরত যয়নবকে (রাঃ) পূর্বেকার মোহরানাতেই দ্বিতীয়বার বিয়ে দিয়ে হযরত আবুল আছের (রাঃ) গৃহে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন।

এই ঘটনার পর হযরত যয়নব (রাঃ) আর বেশী দিন জীবিত ছিলেন না এবং অষ্টম হিজরীতে স্রষ্টার সান্নিধ্যে পৌছে গিয়েছিলেন। গর্ভপাতের কষ্টই এই মৃত্যুর কারণ ছিল। প্রথমবার তিনি যখন মক্কা থেকে আসছিলেন তখন জিতাওয়া নামক স্থানে এই গর্ভপাত হয়েছিল।

হযরত উম্মে আইমান (রাঃ), হযরত ছাওদা (রাঃ) এবং হযরত উম্মে সালমা (রাঃ) রাসূলের (সাঃ) হেদায়াত অনুযায়ী মাইয়্যেতকে গোসল দিয়েছিলেন। গোসল সমাপনের পর রাসূলকে (সাঃ) খবর দেয়া হয়েছিল। তিনি নিজের তহবন্দ দান করলেন এবং তা কাফনের মধ্যে পরিয়ে দেয়ার নির্দেশ দিলেন।

সহিহ বুখারিতে প্রখ্যাত মহিলা সাহাবী উম্মে আতিয়া (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, আমিও যয়নব (রাঃ) বিনতে রাসূলের (সাঃ) গোসলে অংশ নিয়েছিলাম। গোসলের পদ্ধতি স্বয়ং রাসূল (সাঃ) বলে যেতেন। তিনি বললেন, প্রথমত প্রত্যেক অঙ্গই তিনবার অথবা পাঁচবার ধৌত কর এবং তারপর কর্পূর লাগাও।

www.bjilibrary.com

অন্য এক রাওয়ায়েতে আছে, হুজুর (সাঃ) হযরত উম্মে আতিয়াকে (রাঃ) বললেনঃ "হে উম্মে আতিয়া! আমার কন্যাকে ভালোভাবে কাফনে জড়াবে। তার চুলের তিনটি চুঁটি বানাবে এবং তাতে সর্বোত্তম সুগন্ধী মাখবে।"

জানাযার নামায স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (সাঃ) পড়িয়েছিলেন এবং হযরত আবুল আছ (রাঃ) লাশ কবরে নামিয়েছিলেন। অন্য এক রাওয়ায়েতে আছে, হুজুর (সাঃ) নিজেওকবরেনেমেছিলেন।

যেদিন হযরত যয়নব (রাঃ) ইন্তেকাল করেন সেদিন রাসূলুল্লাহ (সাঃ) খুবই শোকাভিভূত ছিলেন। তাঁর চক্ষু দিয়ে পানি গড়িয়ে পড়ছিল এবং তিনি বলছিলেনঃ "আমার সবচেয়ে ভালো মেয়ে ছিল যয়নব (রাঃ)। আমাকে ভালোবাসার জন্য তাকে কষ্ট দেয়া হয়েছিল।"

হযরত যয়নব (রাঃ) এক পুত্র ও এক কন্যা রেখে গিয়েছিলেন। পুত্রের নাম ছিল আলী (রাঃ) এবং কন্যার নাম ছিল উমামাহ। এক রাওয়ায়েত অনুযায়ী মক্কা বিজয়ের সময় আলী (রাঃ) বিন আবুল আছ (রাঃ) রাসূলে করিমের (সাঃ) সাথে উটের ওপর সওয়ার ছিলেন। অন্য আর এক রাওয়ায়েত মতে তিনি ইয়ারমুকের যুদ্ধে শাহাদাত পান এবং তৃতীয় এক রাওয়ায়েত অনুসারে তিনি বালেগ হওয়ার পূর্বেই ইন্তেকালকরেন।

কিছুদিন পর হযরত আবুল আছও (রাঃ) ওফাত পান। ওফাতের পূর্বে তিনি কন্যা উমামাহকে হযরত যোবায়ের (রাঃ) বিন আওয়ামের (নিজের মামাতো ভাই) অভিভাবকত্বে প্রদান করেন। হযরত ফাতিমাতুজ জোহরার (রাঃ) ওফাতের পর হযরত উমামাহর (রাঃ) হযরত যোবায়েরের ইঙ্গিতে হযরত আলীর (রাঃ) সঙ্গে বিয়ে হয়।

www.bjilibrary.com

হযরত রোকেয়া (রাঃ) বিনতে রাসূলুল্লাহ (সাঃ)

নাম রোকেয়া (রাঃ)। রাসূলে করিমের (সাঃ) দ্বিতীয় কন্যা ছিলেন। মা ছিলেন হযরত খাদিজাতুল কুবরা (রাঃ)। রাসুলের (সাঃ) নবুয়ত প্রাপ্তির সাত বছর পূর্বে জন্মগ্রহণ করেন। সে সময় প্রিয় নবীর (সাঃ) বয়স ছিল ৩৩ বছর। হযরত রোকেয়া (রাঃ) হযরত যয়নব (রাঃ) থেকে তিন বছরের ছোট ছিলেন।

চাচাতো ভাই উতবাহ বিন আবু লাহাবের সঙ্গে তাঁর প্রথম বিয়ে হয়েছিল। সুরায়ে তাববাত ইয়াদা আবি লাহাবি অবতীর্ণ হওয়ার পর উতবাহ পিতা আবি লাহাবের নির্দেশ মুতাবিক হযরত রোকেয়াকে (রাঃ) তালাক দেয়। অথচ তখন পর্যন্ত তাঁর রুখসতের অনুষ্ঠানও সম্পন্ন হয়নি।

কিছুদিন পর হযরত ওসমান (রাঃ) বিন আফফান ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি অত্যন্ত সৎ ও ভদ্র যুবক ছিলেন। হুজুর (সাঃ) তাঁকে নিজের জামাই হিসেবে নির্বাচন করেন। হযরত ওসমানের (রাঃ) আন্তরিক ইচ্ছাও তাই ছিল। বস্তুত রাসূলে করিম (সাঃ) মক্কাতেই হযরত ওসমানের সাথে হযরত রোকেয়ার (রাঃ) বিয়ে দেন।

কাফিররা মক্কায় যখন মুসলমানদের ওপর সীমাহীন নির্যাতন শুরু করলো তখন হুজুর (সাঃ) তাঁদেরকে হাবশায় হিজরতের অনুমতি দিলেন। হযরত ওসমানও (রাঃ) হযরত রোকেয়া (রাঃ) সমভিব্যাহারে হাবশা হিজরত করেন। রাসূলে করিম (সাঃ) যখন এ কথা জানতে পেলেন তখন তিনি বললেনঃ "ইবরাহিম (আঃ) এবং লুতের (আঃ) পর ওসমানই (রাঃ) প্রথম ব্যক্তি যিনি আল্লাহর পথে নিজের স্ত্রীসহ হিজরত করলেন।"

কিছুদিন পর হযরত ওসমান (রাঃ) এবং হযরত রোকেয়া (রাঃ) মক্কা ফিরে এলেন। কিন্তু সে সময় কাফিরদের নির্যাতন পূর্বের চেয়ে আরো বেড়ে গিয়েছিল। সুতরাং তাঁরা দ্বিতীয়বার হাবশা হিজরত করলেন। বেশ কিছু দিন তাঁদের খবর না পেয়ে রাসুলে করিম (সাঃ) অত্যন্ত চিন্তান্বিত হলেন। একদিন একজন মহিলা এসে

www.bjilibrary.com

খবর দিল যে, তিনি ওসমান (রাঃ) এবং রোকেয়াকে (রাঃ) স্বচক্ষে হাবশায় সুস্থ অবস্থায় দেখেছেন। এতে রাসূলে করিমের (সাঃ) মনে শান্তি এলো।

দীর্ঘদিন হাবশায় অবস্থানের পর হযরত ওসমান (রাঃ) খবর পেলেন যে, প্রিয় নবী (সাঃ) মদীনায় হিজরত করতে যাচ্ছেন। সুতরাং কতিপয় মুসলমান এবং হযরত রোকেয়ার (রাঃ) সঙ্গে তিনি মক্কা ফিরে এলেন। এর কয়েকদিন পর রাসূলের (সাঃ) অনুমতি সহ হযরত রোকেয়াকে (রাঃ) সঙ্গে নিয়ে তিনি হিজরত করে মদীনা চলে গেলেন। সেখানে তিনি হযরত আওস (রাঃ) বিন ছাবিতের গৃহে অবস্থান করতে লাগলেন। কিছুদিন পর হুজুরও (সাঃ) মদীনা তাশরীফ আনলেন। দ্বিতীয় হিজরীতে হযরত রোকেয়ার (রাঃ) শরীরে বসন্ত বের হয়। এ সময় হুজুর (সাঃ) বদর যাত্রার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। রওয়ানার পূর্বে তিনি হযরত ওসমানকে (রাঃ) নির্দেশ দিলেন যে, সে যেন রোকেয়ার তত্ত্বাবধানের জন্য মদীনাতেই অবস্থান করে। এর বিনিময়ে আল্লাহ পাক তাঁকে জিহাদে অংশগ্রহণের সওয়াবও দেবেন এবং গনিমতের মালের অংশও সে পাবে। এজন্য হযরত ওসমান (রাঃ) হযরত রোকেয়ার (রাঃ) নিকটেই রয়ে গেলেন। রাসূলে করিম (সাঃ) বদরেই ছিলেন, এ সময় হযরত রোকেয়ার (রাঃ) কষ্ট বেড়ে গেল এবং তিনি ২১ বছর বয়সে আল্লাহর ডাকে সাড়া দিয়ে চলে গেলেন। তাঁর লাশ কবরে শুইয়ে কেবলমাত্র মাটি নিক্ষেপ করা হচ্ছিল ঠিক তৎক্ষণাৎ হযরত যায়েদ (রাঃ) বিন হারিছা বদরের যুদ্ধে মুসলমানদের বিজয়ের সুসংবাদ নিয়ে মদীনা প্রাবেশকরলেন।

সারওয়ারে আলম (সাঃ) প্রাণের টুকরা হযরত রোকেয়ার (রাঃ) ওফাতের খবর পেয়ে শোকাভিভূত হ য়ে পড়লেন এবং তাঁর চক্ষু দিয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়লো। মদীনা ফিরে হুজুর (সাঃ) হযরত রোকেয়ার (রাঃ) কবরে তাশরীফ নিলেন এবং বললেনঃ "ওসমান (রাঃ) বিন মাজউন চলে গেছেন। এখন তুমিও তাঁর সঙ্গে গিয়ে মিলিত হও।" (মুহাজিরদের মধ্যে হযরত ওসমান (রাঃ) বিন মাজউনই প্রথম সাহাবী ছিলেন যিনি মদীনা এসে ওফাত পেয়েছিলেন)। হুজুরের (সাঃ) এই ইরশাদে মহিলাদের মধ্যে ক্রন্দন শুরু হয়ে গেল। হযরত ওমর (রাঃ) তাঁদেরকে কাঁদতে নিষেধ করলেন। হুজুর (সাঃ) বললেন, "ওমর। তাদেরকে কাঁদতে দাও। অন্তর এবং চক্ষুর ক্রন্দনে কোন অসুবিধা নেই। অবশ্য বিলাপ করা থেকে বেঁচে থাকা চাই।"

হযরত ফাতিমাতুজ জোহরাও (রাঃ) সহোদরার কবরে উপস্থিত হয়ে কবরের কিনারে বসে কাঁদতে লাগলেন। প্রিয় নবী (সাঃ) নিজের পবিত্র চাদরের কিনারা দিয়ে তাঁর চোখের পানি মুছিয়ে দিতে লাগলেন।

www.bjilibrary.com

হাবশায় অবস্থানকালে হযরত রোকেয়ার (রাঃ) একটি পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করেছিল। তাঁর নাম রাখা হয়েছিল আব্দুল্লাহ। এই পুত্রের নামানুসারে হযরত ওসমান (রাঃ) নিজের কুনিয়ত রেখে ছিলেন আবু আব্দুল্লাহ।

হযরত আব্দুল্লাহর (রাঃ) বয়স সবেমাত্র ৬ বছর হয়েছিল। এ সময় একটি মোরগ তাঁর চোখে ঠোকর মারে। ফলে তাঁর সমগ্র মুখমন্ডল ফুলে যায়। আর এই কষ্টেই চতুর্থ হিজরীর জমাদিউল উলায় তিনি মারা যান। হুজুর (সাঃ) জানাযার নামায পড়ান এবং হযরত ওসমান (রাঃ) তাঁকে কবরে নামান।

হযরত রোকেয়া (রাঃ) এবং হযরত ওসমানের (রাঃ) মধ্যে পারস্পরিক গভীর ভালোবাসা ছিল। তাঁদের সম্পর্ক সুমধুর এবং উদাহরণযোগ্য ছিল। লোকেরা উদাহরণ হিসেবে এই প্রবাদবাক্য সব সময় বলতেনঃ "রোকেয়া এবং ওসমানের (রাঃ) চেয়ে উত্তম দম্পত্তি কখনো দেখিনি।"

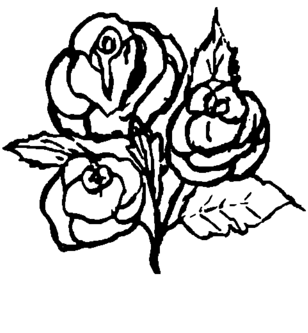

www.bjilibrary.com

হযরত উম্মে কুলছুম (রাঃ) বিনতে রাসূলুল্লাহ (সাঃ)

উম্মে কুলছুম (রাঃ) নাম। তিনি রাসূলের (সাঃ) তৃতীয় কন্যা ছিলেন। মাতার নাম ছিল হযরত খাদিজাতুল কুবরা (রাঃ)। অধিকাংশ চরিতকার লিখেছেন যে, রাসূলের (সাঃ) নবুয়ত প্রাপ্তির ৬ বছর পুর্বে তিনি জন্মগ্রহণ করেন।

নবীর (সাঃ) নবুয়ত প্রাপ্তির পূর্বেই তাঁর বিয়ে আবু লাহাব তনয় উতাইবার সঙ্গে হয়েছিল। নবুয়ত প্রাপ্তির পর রাসূল (সাঃ) যখন মানুষকে ইসলামের দাওয়াত প্রদান শুরু করলেন তখন আবি লাহাব এবং তার স্ত্রী রাসূলের (সাঃ) কট্টর দুশমন হয়ে গেল। রাসূলের (সাঃ) কষ্ট প্রদানে তারা সামান্যতম দ্বিধাও করতো না। এজন্যই আল্লাহর অহমিকাবোধ জেগে উঠলো এবং সূরায়ে তাব্বাত ইয়াদা আবিলাহাব নাযিল হলো। এতে আবু লাহাব অগ্নিশর্মা হয়ে উঠলো। তার এক পুত্র উতবা এবং অন্য পুত্র উতাইবার সঙ্গে নবীর (সাঃ) কন্যা যথাক্রমে রোকেয়া (রাঃ) এবং উম্মে কুলছুমের (রাঃ) বিয়ে হয়েছিল। (যদিও তখন পর্যন্ত তাদের রুখসাত অনুষ্ঠান হয়নি।) আবু লাহাব দু' পুত্রকে ডাকলো এবং তাদেরকে সম্বোধন করে বললোঃ

"তোমরা যদি মুহাম্মাদের (সাঃ) কন্যাকে তালাক না দাও তাহলে তোমাদের সাথে আমার ওঠা-বসা হারাম।" দু' পুত্র এই হতভাগা পিতার নির্দেশ পালন করলো। উতবাহ হযরত রোকেয়াকে (রাঃ) এবং উতাইবা হযরত উম্মে কুলছুমকে (রাাঃ) তালাক দিয়ে দিল।

তালাকের পর হযরত রোকেয়ার (রাঃ) বিয়ে হয় হযরত ওসমানের সঙ্গে। বিয়ের মাত্র কয়েক বছর পরই হযরত রোকেয়ার (রাঃ) শেষ সময় এসে উপস্থিত হয় এবং তিনি ২ হিজরীতে ওফাত পান। তাঁর ওফাতে হযরত ওসমান (রাঃ) খুবই মনোকষ্ট পান। সেই সময়ই হযরত ওমর ফারুকের (রাঃ) কন্যা হযরত হাফছাও (রাঃ) বিধবা হন। তিনি হযরত ওসমানের (রাঃ) নিকট হযরত হাফছাকে (রাঃ) বিয়ে করার প্রস্তাব দেন। হযরত ওসমান (রাঃ) এই প্রস্তাবে চিন্তা করতে লাগলেন। রাসূলে করিম (সাঃ) এই খবর পেয়ে হযরত ওমরকে (রাঃ) বললেন, আমি তোমাকে হাফছার (রাঃ) জন্য ওসমানের (রাঃ) থেকেও উত্তম ব্যক্তির সন্ধান দিচ্ছি

www.bjilibrary.com

এবং ওসমানের (রাঃ) জন্য ভালো সম্পর্কের কথা বলছি। অতঃপর তিনি বললেন আমার সঙ্গে হাফছার বিয়ে দাও এবং আমি আমার কন্যার বিয়ে ওসমানের (রাঃ সঙ্গে সম্পাদন করছি। রোকেয়ার (রাঃ) মৃত্যুর পর সে খুব দুশ্চিন্তাগ্রস্ত আছে।

হযরত ওমর (রাঃ) তৎক্ষণাৎ রাজি হয়ে গেলেন। বস্তুত রাসূলের (সাঃ) সঙ্গে হযরত হাফছার বিয়ে হয়ে গেল এবং ওসমানের (রাঃ) সঙ্গে তিনি হযরত উম্মে কুলছুমের (রাঃ) বিয়ে পড়িয়ে দিলেন। বিয়ের সময় নবী করিম (সাঃ) হযরত ওসমানকে (রাঃ) বললেন, আল্লাহ্ পাক জিবরিল আমীনের মাধ্যমে আমাকে আমার কন্যা উম্মে কুলছুমকে (রাঃ) রোকেয়ার (রাঃ) নির্ধারিত মোহরানায় তোমার সঙ্গে বিয়েদেয়ারনির্দেশদিয়েছেন।

এই বিয়ের পর হযরত উম্মে কুলছুম (রাঃ) ৬ বছর জীবিত ছিলেন এবং ৯ হিজরীর শাবান মাসে ওফাত পান। হযরত ছুফিয়া (রাঃ) বিনতে আব্দুল মুত্তালিব, হযরত উম্মে আতিয়াহ (রাঃ) এবং হযরত আসমা (রাঃ) বিনতে আমিস রাসূলের (সাঃ) নির্দেশ মুতাবেক গোসল দিলেন। কাফনের জন্য নবী করিম (সাঃ) নিজের চাদর দিলেন এবং স্বয়ং জানাযার নামায পড়ালেন। হযরত আলী কাররামাল্লাহু ওয়াজহাহু , হযরত আবু তালহা (রাঃ), হযরত উসামাহ (রাঃ) বিন যায়েদ (রাঃ) এবং হযরত ফজল বিন আব্বাস (রাঃ) কবরে নেমে তাঁকে জান্নাতুল বাকিতে দাফন করলেন।

হযরত আনাস (রাঃ) বিন মালিক থেকে বর্ণিত আছে যে, যে সময় সাইয়েদা উম্মে কুলছুমকে (রাঃ) কবরে নামানো হলো তখন হুজুর (সাঃ) কবরের নিকট উপস্থিত ছিলেন এবং তাঁর চক্ষু দিয়ে আঝোর ধারায় অশ্রু গড়িয়ে পড়ছিলো। হযরত উম্মে কুলছুমের (রাঃ) কোন সন্তান ছিল না।

www.bjilibrary.com

খাতুনে জান্নাত হযরত ফাতিমাতুজ জোহরা (রাঃ)

নাম ফাতিমা। রাসূলে করিমের (সাঃ) চতুর্থ এবং সর্বকনিষ্ঠ কন্যা ছিলেন। সাইয়েদাতুন নিসায়াল আলামীন, সাইয়েদাতুন নিসায়ি আহলিল জান্নাত, জোহরা, বতুল, তাহেরাহ, মুতহিরাহ, রাজিয়াহ, মুরজিয়াহ এবং যাকিয়াহ তাঁর লকব বা উপাধিছিলো।

সাইয়েদা ফাতিমাতুজ জোহরার (রাঃ) জন্মকাল সম্পর্কে বিভিন্ন ধরনের রাওয়ায়েত রয়েছে। এক রাওয়ায়েত অনুযায়ী নবীর (সাঃ) নবুয়ত প্রাপ্তির পাঁচ বছর পূর্বে তাঁর জন্ম হয়েছিল। এ সময় রাসূলের (সাঃ) বয়স ৩৫ বছর ছিল। অন্য এক রাওয়ায়েত অনুসারে তাঁর জন্ম নবুয়ত প্রাপ্তির এক বছর পূর্বে হয়েছিল। আর এক রাওয়ায়েত আছে যে, তিনি নবুয়ত প্রাপ্তির এক বছরের মধ্যে জন্মগ্রহণ করেছিলেন।

শৈশবকাল থেকেই তিনি অত্যন্ত গম্ভীর এবং নির্জন প্রিয় ছিলেন। তিনি কোন সময় কোন খেলাধূলায় অংশ নেননি এবং ঘরের বাইরে পা রাখেননি। সব সময় মায়ের পাশে পাশে থাকতেন। তাঁর ও রাসূলের (সাঃ) নিকট এমন প্রশ্ন করতেন যাতে তাঁর তীক্ষ্ণ মেধার পরিচয় পাওয়া যেত। আত্মপ্রকাশ ও প্রদর্শনীতে ছিল প্রচন্ড অনীহা। হযরত খাদিজাতুল কুবরার (রাঃ) এক আত্মীয়ের ছিল বিয়ে। তিনি ফাতিমাতুজ জোহরার (রাঃ) জন্য ভালো কাপড় ও গহনা বানালেন। বিয়েতে যোগদানের জন্য যখন বাড়ী থেকে বের হওয়ার সময় এলো তখন হযরত ফাতিমা (রাঃ) এই মূল্যবান কাপড় এবং গহনা পড়তে স্পষ্টভাবে অস্বীকার করলেন এবং সাদা-সিধেভাবেই বিয়ের মাহফিলে অংশ নিলেন। শৈশবকাল থেকেই তাঁর সকল তৎপরতায় খোদা প্রেমের বহিঃপ্রকাশ ঘটতো।

হযরত খাদিজাতুল কুবরা (রাঃ) সাইয়েদা ফাতিমাতুজ জোহরার (রাঃ) শিক্ষা-দীক্ষার প্রতি বিশেষ নজর দিতেন। একবার যখন তিনি শিক্ষা দিচ্ছিলেন তখন শিশুটি জিজ্ঞেস করলেন, "আম্মাজান,। আল্লাহর অসংখ্য কুদরত আমরা প্রতিনিয়ত দেখতে পাই। আল্লাহ কি স্বয়ং দেখা দিতে পারেন না। ?"

www.bjilibrary.com

হযরত খাদিজাতুল কুবরা ফরমালেন, "বেটি আমার। যদি আমরা দুনিয়ায় ভালো কাজ এবং খোদার নির্দেশ অনুযায়ী কাজ করি তাহলে কিয়ামতের দিন খোদার সন্তুষ্টির হকদার হবো এবং সেখানেই খোদার দর্শন লাভ ঘটবে।"

•

নবুয়তের দশম বছরে হযরত খাদিজাতুল কুবরা ওফাত পেলে হযরত ফাতিমার (রাঃ) ওপর বিপদের পাহাড় নেমে এলো। তাঁর শিক্ষা ও তত্ত্বাবধানের জন্য হুজুর (সাঃ) হযরত ছাওদাহকে (রাঃ) বিয়ে করলেন। হুজুরের (সাঃ) সমগ্র পবিত্র জীবন হকের তাবলীগের কাজে সম্পূর্ণরূপে ওয়াকফ ছিল। কিন্তু যখনই ফুরসত পেতেন তখনই তিনি ফাতিমাতুজ জোহরার নিকট তাশরীফ আনতেন এবং তাঁকে আদর ও মূল্যবান নসিহত প্রদান করতেন।

একাকীত্বের সময় হযরত হাফছা (রাঃ) বিনতে ওমর ফারুক (রাঃ), হযরত আয়েশা (রাঃ) বিনতে আবুবকর সিদ্দিক (রাঃ), হযরত আসমা (রাঃ) বিনতে আবুবকর সিদ্দিক (রাঃ) এবং ফাতিমা বিনতে যোবায়ের (রাঃ) প্রমুখ তাঁর নিকট প্রায়ই আসতেন এবং দুঃখ লাঘবের চেষ্টা করতেন। হকের তাবলীগের অপরাধে মুশরিকরা প্রিয় নবীকে (সাঃ) খুব কষ্ট দিত। কখনো পবিত্র মাথায় মাটি ঢেলে দিত। রাস্তায় কাঁটা বিছিয়ে রাখতো। যখন হুজুর (সাঃ) ঘরে আসতেন তখন ফাতিমা (রাঃ) তাঁকে সান্ত্বনা দিতেন। কখনো স্বয়ং জালিলুল কদর পিতার মুসিবতে রোরুদ্যমান হয়ে পড়তেন। সে সময় হুজুর (সাঃ) তাঁকে সান্ত্বনা দিতেন এবং বলতেন, "প্রিয় বেটি আমার! ঘাবড়িয়ো না। খোদা তোমার পিতাকে একা ছেড়ে দেবেন না।"

একবার হুজুর (সাঃ) কাবা শরীফে নামায আদায় করছিলেন। কাফিররা অকাজে মেতে উঠলো। তারা উটের উঝুরি নিয়ে এলো এবং সিজদারত অবস্থায় হুজুরের পবিত্র গর্দানের ওপর রেখে দিল। এই পান্ডাদের নেতৃত্ব দিচ্ছিল উকবাহ বিন আবি মুঈত। জনৈক ব্যক্তি হযরত ফাতিমাতুজ জোহরার নিকট এসে বললো যে, তোমার পিতার সঙ্গে পান্ডারা এই ব্যবহার করছে। একথা শুনতেই তিনি অস্থির হয়ে পড়লেন এবং দৌড়ে কাবা গৃহে পৌঁছে পবিত্র ঘাড় থেকে উঝুরি সরালেন। এ সময় কাফিররা চারপাশে দাঁড়িয়ে হাসছিল এবং তালি বাজাচ্ছিল। প্রিয় নবীর জালিলুল কদর কন্যা তাদের প্রতি রক্ত চক্ষু নিক্ষেপ করলেন এবং বললেন, "হতভাগারা! আহকামুল হাকিমিন তোমাদের এই অপকর্মের অবশ্যই শাস্তি দেবেন।" খোদার কি কুদরত! কয়েক বছর পর এইসব বদবখত বদরের যুদ্ধে অত্যন্ত জিল্লতীর সঙ্গে মারা গিয়েছিল।

মক্কায় কাফির–মুশরিকদের জুলুম–নির্যাতন সীমা ছাড়িয়ে গেল, তখন আল্লাহর তরফ থেকে রাসুলের (সাঃ) প্রতি হিজরতের নির্দেশ দেয়া হলো। নবুয়তের ১৩ বছরে এক রাতে হুজুর (সাঃ) হযরত আলী কাররামাল্লাহু ওয়াজহাহুকে নিজের পবিত্র বিছানায় শুইয়ে রেখে হযরত আবুবকর সিদ্দিককে (রাঃ) সঙ্গে নিয়ে মদীনা অভিমুখে রওয়ানা দিলেন। মদীনা পৌছার কিছুদিন পর হুজুর (সাঃ) পরিবার–পরিজনকে আনার জন্য নিজের গোলাম হযরত আবু রাফে (রাঃ) এবং হযরত যায়েদ (রাঃ) বিন হারিছাকে মক্কা প্রেরণ করলেন। এই দুই ব্যক্তির সঙ্গে হযরত ফাতিমাতুজ জোহরা, হযরত উম্মে কুলছুম (রাঃ), হযরত সাওদা (রাঃ) বিন যায়েদ (রাঃ) মদীনায় হিজরত করেন। মদীনায় পৌছে হযরত সাওদা (রাঃ) এবং অন্য কন্যারা হুজুরের (সাঃ) নিকট নতুন ঘরে অবস্থান শুরু করেন।

মদীনায় হিজরতের সময় সাইয়েদা ফাতিমাতুজ জোহরা (রাঃ) বয়োপ্রাপ্ত হয়েছিলেন। হযরত আবুবকর সিদ্দিক (রাঃ) হুজুরের (সাঃ) নিকট হযরত ফাতিমার (রাঃ) জন্য পয়গাম প্রেরণ করলেন। কিন্তু প্রিয় নবী (সাঃ) চুপ রইলেন অথবা কতিপয় রাওয়ায়েত মুতাবেক ফরমালেন, "যা খোদার হুকুম হবে।" অতঃপর হযরত ওমর (রাঃ) বিন খাত্তাব হযরত ফাতিমার (রাঃ) জন্য পয়গাম পাঠালেন। হুজুর (সাঃ) তাঁকেও একই জবাব দিলেন। কিছুদিন পর হুজুর (সাঃ) হযরত ফাতিমাতুজ জোহরার সম্পর্ক শেরে খোদা হযরত আলী কাররামাল্লাহ'র সঙ্গে স্থাপন করলেন। এই সম্পর্ক কিভাবে স্থাপিত হলো সে ব্যাপারে তিন ধরনের বর্ণনা পাওয়া যায়।

প্রথম বর্ণনা হলো, একদিন হযরত আবুবকর সিদ্দিক (রাঃ), ওমর ফারুক (রাঃ) এবং সায়াদ (রাঃ) বিন আবি ওকাস পরামর্শ করলেন। তাঁরা বললেন, ফাতিমাতুজ জোহরার (রাঃ) জন্য হুজুরের (সাঃ) নিকট কয়েকটি পয়গাম এসেছে। কিন্তু তিনি কোন পয়গামই মঞ্জুর করেননি। এখন আলী (রাঃ) বাকী রয়েছে। সেতো রাসূলের (সাঃ) জন্য জীবন উৎসর্গকারী এবং অত্যন্ত প্রিয় ও চাচাতো ভাই। জানা যায় যে, দারিদ্রতা ও অসচ্ছলতার কারণেই সে ফাতিমার (রাঃ) জন্য পয়গাম প্রেরণ করতে পারেনা। তাকে পয়গাম প্রেরণের জন্য উৎসাহিত করা হোক এবং প্রয়োজন হলে তাকে সাহায্যও করা হোক। পরামর্শের পর এই তিন বুজর্গ ব্যক্তি হযরত আলীকে (রাঃ) খুঁজতে বের হলেন। তিনি জঙ্গলে নিজের উট চরাচ্ছিলেন। তাঁরা অত্যন্ত আন্তরিকতার সঙ্গে হযরত আলীকে (রাঃ) হযরত ফাতিমার (রাঃ) জন্য পয়গাম প্রেরণে উদ্বুদ্ধ করলেন। কিন্তু সহায় সম্বলহীন হওয়ার কারণে তাঁর পয়গাম প্রেরণে চিন্তা হলো। তবে এই বুজর্গ ব্যক্তিবর্গ বাধ্য করায় রাজি হলেন। এর পূর্বে অন্তরের আকাংখাওতো তাঁর এই ছিল। স্বভাবজাত লজ্জার কারণে পয়গাম প্রেরণ

www.bjilibrary.com

করতে পারেননি। এক্ষণে সাহস করে হুজুরের (সাঃ) নিকট পয়গাম পাঠিয়ে দিলেন। হুজুর (সাঃ) তৎক্ষণাৎ তাঁর প্রার্থনা মঞ্জুর করলেন। অতঃপর হুজুর (সাঃ) হযরত ফাতিমার (রাঃ) কাছে এ কথা বললেন। তিনিও চুপ থেকে নিজের সম্মতির কথা প্রকাশকরলেন।

দ্বিতীয় বর্ণনায় আছে যে, আনসারদের (রাঃ) একটি দল হযরত আলীকে (রাঃ) হযরত ফাতিমার (রাঃ) জন্য পয়গাম প্রেরণে অনুপ্রাণিত করলেন। হযরত আলী (রাঃ) হুজুরের খিদমতে হাজির হয়ে এ কথা বললেন। হুজুর (সাঃ) তৎক্ষাণাৎ বললেন, "আহলান ওয়া মারহাবা।" অতঃপর চুপ মেরে গেলেন। আনসার দলটি বাইরে অপেক্ষা করছিলেন। হযরত আলী (রাঃ) তাঁদেরকে হুজুরের (সাঃ) জবাব শুনালেন। তাঁরা হযরত আলীকে (রাঃ) মুবারকবাদ দিলেন। তাঁরা বললেন যে, হুজুর (সাঃ) আপনার পয়গাম মঞ্জুর করেছেন।

তৃতীয় বর্ণনা হলো, হযরত আলীর (রাঃ) আযাদকৃত একজন দাসী একদিন তাঁকে জিজ্ঞেস করলেনঃ "কেউ কি ফাতিমার (রাঃ) জন্য পয়গাম. প্রেরণ করেছে?" হযরত আলী (রাঃ) জবাব দিলেন, "আমি জানি না।" সে বললো, "আপনি কেন পয়গাম প্রেরণ করেন না?" আলী মুরতাজা (রাঃ) বললেন, "আমার নিকট কি আছে যে, আমি বিয়ে করবো?"

এই নেকবখত মহিলা হযরত আলীকে (রাঃ) জোর করে হুজুরের (সাঃ) খিদমতে পাঠালেন। কিছুটা রাসূলের (সাঃ) শান এবং কিছুটা নিজের স্বভাবজাত লজ্জার কারণে তিনি মুখ খুলে কিছু বলতে পারলেন না। মাথা নীচু করে চুপচাপ বস্রেইলেন।

হুজুর (সাঃ) স্বয়ং দৃষ্টি আকর্ষণ করে জিজ্ঞাসা করলেন, "আলী। কি ব্যাপার আজ যে নিয়ম ভঙ্গ করে সম্পূর্ণ চুপচাপ রইলে, ফাতিমার (রাঃ) সঙ্গে বিয়ের আবেদন নিয়ে এসেছ নাকি?"

হযরত আলী আরজ করলেন, "অবশ্যই, হে আল্লাহর রাসূল।"

হুজুর (সাঃ) জিজ্ঞাসা করলেন, "তোমার কাছে মোহর আদায় করার মত কিছু আছে কি?" হযরত আলী না সূচক জবাব দিলেন।

পুনরায় হুজুর (সাঃ)বললেন, "আমি তোমাকে যে যেরাহ বা লৌহবর্ম দিয়েছিলাম, তাই মোহর হিসেবে দিয়ে দাও।"

www.bjilibrary.com

হযরত আলী কাররামাল্লাহু ওয়াজহাহু নবীর (সাঃ) নির্দেশের সামনে মাথা নতকরেদিলেন।

এরপর হযরত আলী (রাঃ) বর্মটি বিক্রির জন্য বাজারের দিকে রওয়ানা হলেন। রাস্তায় হযরত ওসমান জুন্নুরাইনের (রাঃ) সাথে দেখা হলো। তিনি চার শ' ৮০ দিরহাম দিয়ে বর্মটি কিনে নিলেন। অতঃপর তা আবার হযরত আলীকে (রাঃ) উপঢৌকন হিসেবে ফেরত দিলেন।

যেরাহ বিক্রির অর্থ হযরত আলী মুরতাজা (রাঃ) হুজুরের (সঃ) খিদমতে হাজির করলেন। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন, ''এর তিনভাগের দু'ভাগ খোশবু ইত্যাদি ক্রয়ে খরচ কর এবং অবশিষ্ট একভাগ বিয়ের সাজ–সরঞ্জাম ও অন্যান্য খাদ্যদ্রব্য ক্রয়েব্যয়কর।''

অতঃপর হুজুর (সঃ) হযরত আনাসকে (রাঃ) আবুবকর (রাঃ), ওমর (রাঃ), আবদুর রহমান (রাঃ) বিন আওফ ও অন্যান্য মুহাজির ও আনসারকে (রাঃ) ডেকে আনার নির্দেশ দিলেন। যখন সবাই রাসূলের (সাঃ) দরবারে একত্রিত হলেন, তখন হুজুর (সাঃ) মিম্বরের ওপর তাশরীফ নিলেন এবং বললেনঃ

''হে মুহাজির ও আনসারের দল। এক্ষণই জিবরিল আমীন (আঃ) আমার নিকট এই খবর নিয়ে এসেছিলেন যে, আল্লাহ পাক বাইতুল মা'মূরে ফাতিমা (রাঃ) বিনতে মুহাম্মদের (সাঃ) বিয়ে নিজের খাছ বান্দাহ আলী (রাঃ) বিন আবি তালিবের সঙ্গে দিয়েছেন এবং আমার প্রতি নির্দেশ হয়েছে যে, নতুন করে বিয়ের আকদ করে সাক্ষীদের সামনে ইজাব কবুল করাও।''

এরপর হুজুর (সাঃ) বিয়ের খুতবা পাঠ করলেন এবং মুচকি হেসে আলী মুরতাজাকে বললেনঃ ''আমি চারশ' মিসকাল রৌপ্য মোহরের বিনিময়ে ফাতিমাকে (রাঃ) তোমার সঙ্গে নিকাহ দিলাম। তুমি কি তা কবুল করছো?''

হযরত আলী (রাঃ) আরজ করলেন, ''জ্বী, কবুল করলাম।'' অতঃপর হুজুর (সঃ) দোয়া করলেন। সকলেই এই দোয়ায় শরীক হলেন।

বিয়ের কাল সম্পর্কে বিভিন্ন ধরনের বর্ণনা পাওয়া যায়। কেউ বলেন, এই পবিত্র বিয়ে দ্বিতীয় হিজরীর সফর মাসে সুসম্পন্ন হয়েছিল। আবার কেউ বলেন, দ্বিতীয় হিজরীর রজব মাসে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। অন্য এক রাওয়ায়েতে তৃতীয় হিজরীর শওয়াল মাসে বিয়ে অনুষ্ঠানের কথা বলা হয়েছে। কতিপয় ঐতিহাসিক বলেছেন, ওহোদের যুদ্ধের পর এবং হযরত আয়েশার (রাঃ) রুখসতের সাড়ে ৪ মাস পর এই

www.bjilibrary.com

বিয়ে অনুষ্ঠিত হয়। যা হোক, অধিকাংশ চরিতকারের মতে বিয়ের সময় হযরত ফাতিমাতুজ জোহরার বয়স প্রায় ১৫ বছর ছিলো। হযরত আলীর (রাঃ) বয়স ছিল ২১ বছর।

হযরত আলী কাররামাল্লাহু ওয়াজহাহু প্রিয় নবীর (সাঃ) বাসভবন থেকে কিছুদূরে ভাড়ায় একটি বাড়ী নিয়েছিলেন। সাইয়েদাতুন নিসা (রাঃ) রুখসত হয়ে এই বাড়ীর রাণী হলেন। রুখসত বা বিদায়ের পূর্বে হুজুর (সাঃ) হযরত ফাতিমাতুজ জোহরাকে (রাঃ) ডাকলেন। নিজের মুবারক সিনার ওপর তাঁর মাথা রাখলেন এবং কপালে চুমু দিলেন। অতঃপর লখতে জিগর বা কলিজার টুকরা হযরত ফাতিমার (রাঃ) হাত হযরত আলীর (রাঃ) হাতে দিয়ে বললেনঃ "হে আলী। পয়গম্বরের (সাঃ) কন্যা তোমার জন্য মুবারাক হোক।"

এরপর হযরত ফাতিমাকে (রাঃ) সম্বোধন করে বললেনঃ "হে ফাতিমা! তোমার স্বামী খুব ভালো।"

অতঃপর তিনি স্বামী–স্ত্রী উভয়কেই ফরজ এবং অধিকার সম্পর্কে নসিহত করলেন এবং বিদায় জানানোর জন্য স্বয়ং দরজা পর্যন্ত এলেন। দরজায় আলী মুরতজার (রাঃ) দুই বাহু ধরে দোয়া দিলেন। হযরত আলী (রাঃ) ও সাইয়েদাতুন নিসা উভয়েই উটে সওয়ার হলেন। হযরত সালমান (রাঃ) ফারসী উটের রশি ধরলেন। হযরত আসমা (রাঃ) বিনতে আমিম এবং অন্য কতিপয় রাওয়ায়েতে সালমা (রাঃ) উম্মে রাফে অথবা উম্মে আইমন (রাঃ) তাঁদের সঙ্গে গিয়েছিলেন।

সারওয়ারে কায়েনাত (রাঃ) বিয়েতে নিজের কলিজার টুকরাকে যেসব সামান দিয়েছিলেনতাহলোঃ

১– উল ভরা মিসরী কাপড়ে প্রস্তুত বিছানা

২– নকশা করা একটি পালং

৩– খেজুরের ছাল ভর্তি চামড়ার একটি বালিশ

৪–একটি মশক

৫ পানির জন্য দু'টি পাত্র বা ঘড়া

৬– যাকি । একটি চাক্কি বা যাঁতা

৭–একটি পেয়ালা

৮–দু'টোচাদর

৯–দু'টি বাজুবন্দ

১০– একটি জায়নামায

www.bjilibrary.com

বিয়ের পর হুজুর (সাঃ) হযরত আলীকে (রাঃ) ওয়ালিমার দাওয়াতের ব্যবস্থা করতে বললেন। মোহর আদায়ের পর যে অর্থ বেঁচে গিয়েছিল হযরত আলী (রাঃ) সেই অর্থ দিয়ে ওয়ালিমার ব্যবস্থা করলেন। এতে পনির, খেজুর, জবের নান এবং গোশত্ ছিল। হযরত আসমা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, তৎকালীন যুগে এটা ছিল সর্বোত্তমওয়ালিমা।

ফাতিমাতুজ জোহরা (রাঃ) যখন নিজের নতুন গৃহে গেলেন তখন হুজুর (সাঃ) তাঁর নিকট তাশরীফ নিলেন। দরজায় দাঁড়িয়ে অনুমতি চাইলেন। অতঃপর ভেতরে প্রবেশ করলেন। একটি পাত্রে পানি আনালেন। নিজের পবিত্র হাত তাতে রাখলেন এবং হযরত আলীর (রাঃ) বুক ও বাহুতে পানি ছিটালেন। এরপর হযরত ফাতিমাতুজ জোহরাকে নিজের কাছে ডাকলেন। তিনি লজ্জায় অবনত হয়ে হুজুরের (সাঃ) সামনে এলেন। হুজুর (সাঃ) তাঁর ওপরও পানি ছিটালেন এবং বললেনঃ"হে ফাতিমা। আমি তোমার বিয়ে স্ব- খান্দানের সর্বোত্তম ব্যক্তির সাথে দিয়েছি।"

হযরত ফাতিমার (রাঃ) গৃহ রাসূলের (সাঃ) বাসভবন থেকে কিছু দূরে অবস্থিত ছিল। যাতায়াতে কষ্ট হতো। একদিন রাসূলে করিম (সাঃ) হযরত ফাতিমাকে (রাঃ) বললেন," বেটি। প্রায়ই তোমাকে দেখতে আসতে হয়। তোমাকে আমি কাছে নিয়ে যেতে চাই।"

হযরত ফাতিমা (রাঃ) আরজ করলেন, "হুজুরের (সাঃ) আশেপাশে হারিসা (রাঃ) বিন নু'মানের অনেক বাড়ী আছে। আপনি তাঁকে কোন একটি বাড়ী খালি করারজন্য বলে দিন।"

হারিসা (রাঃ) বিন নু'মান একজন ধনী আনসার এবং বেশ কয়েকটি বাড়ীর মালিক ছিলেন। হুজুর(সাঃ) মদীনা তাশরীফ আনার পর তিনি পর পর কয়েকটি বাড়ী ইতিমধ্যেইতাঁকেদিয়েছিলেন।

হযরত ফাতিমা (রাঃ) যখন হারিসার (রাঃ) বাড়ীর আকাংখা প্রকাশ করলেন তখন হুজুর (সাঃ) বললেনঃ"আমার কলিজার টুকরা। হারিসার (রাঃ) কোন বাড়ী চাইতে এখন আমার লজ্জা লাগে। কেননা সে প্রথমেই আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের (সাঃ) সন্তুষ্টির জন্য কয়েকটি বাড়ী দিয়ে দিয়েছে।"

এ কথা শুনে ফাতিমা চুপ হয়ে গেলেন। আস্তে আস্তে এ কথা হযরত হারিসা (রাঃ) বিন নু'মানের কানে পৌছলো। তিনি জানতে পেলেন যে, হুজুর (সাঃ)

www.bjilibrary.com

ফাতিমাকে (রাঃ) নিজের কাছে আনতে চান। কিন্তু বাড়ী পাওয়া যাচ্ছে না। তিনি তক্ষুণি হুজুরের (সাঃ) খিদমতে হাজির হয়ে আরজ করলেনঃ ''হে আল্লাহর রাসুল! আপনি ফাতিমাকে (রাঃ) নিকটবর্তী কোন বাড়ীতে আনতে চান। আপনার বাসগৃহের সন্নিহিত বাড়ীটি আমি খালি করিয়ে দিচ্ছি। আপনি ফাতিমাকে (রাঃ) ডেকে পাঠান। হে আমার প্রভু! আমার জীবন ও সম্পদ আপনার ওপর কুরবান হোক। খোদার কসম! হুজুর (সাঃ) যে জিনিস আমার নিকট থেকে নেবেন তা আমার নিকট থাকার তুলনায় হুজুরের নিকট থাকাটাই আমি বেশী পছন্দ করবো।" হুজুর (সাঃ) বললেনঃ ''তুমি সত্যি বলেছ। আল্লাহ পাক তোমাকে বরকত ও কল্যাণ দান করুন।'' অতঃপর তিনি হযরত আলী (রাঃ) এবং হযরত ফাতিমাকে (রাঃ) হারিসা (রাঃ) বিন নু'মানেরবাড়ীতেনিয়েএলেন।

হযরত ফাতিমাতুজ জোহরা (রাঃ) কথা-বার্তা, আচার-আচরণ ও চাল-চলনে রাসূলে করিমের (সাঃ) সর্বোত্তম উদাহরণ ছিলেন। তিনি অত্যন্ত মুত্তাকী, ধৈর্যশীলা এবং দ্বীনদার মহিলা ছিলেন। গৃহের সকল কাজ স্বহস্তে করতেন। যাঁতা ঘুরাতে ঘুরাতে হাতে ফোস্কা পড়ে যেত। ঘর ঝাড়ু দেয়া এবং উনুন ফুঁকতে ফুঁকতে কাপড় ময়লা হয়ে যেত। কিন্তু এ সত্ত্বেও এসব কাজ থেকে রেহাই ছিল না। গৃহের কাজ ছাড়া বেশী বেশী ইবাদাত করতেন। হযরত আলী কাররামাল্লাহু ওয়াজহাহু ফকিরদের বাদশাহ ছিলেন। হযরত ফাতিমাতুজ জোহরাও দারিদ্র ও বুভুক্ষায় তাঁকে পুরোপুরি সহযোগিতা করতেন। মহান সম্মানিত বা জালিলুলকদর পিতা আরবের তথা দোজাহানের বাদশাহ ছিলেন। কিন্তু জামাই ও কন্যা কয়েক বেলা অব্যাহতভাবে অভুক্ত থাকতেন। একদিন স্বামী-স্ত্রী উভয়েই আট প্রহর পর্যন্ত ভুখা ছিলেন। কোন স্থানে মজুরির বিনিময়ে হযরত আলী (রাঃ) এক দিরহাম পেয়েছিলেন। তখন রাত হয়ে গেছে। কোন স্থান থেকে এক দিরহামের যব কিনে বাড়ী পৌঁছলেন। ফাতিমা (রাঃ) হাসি-খুশীভাবে নামদার স্বামীকে অভ্যর্থনা জানালেন। তাঁর নিকট থেকে যব নিয়ে পিষলেন। রুটি বানালেন এবং আলী মুরতাজার (রাঃ) সামনে তা রাখলেন। তাঁর খাওয়ার পর তিনি খেতে বসলেন। হযরত আলী (রাঃ) বলেন, সে সময় আমার সাইয়েদুল বাশারের (সাঃ) এই ইরশাদ স্মরণে এলো যে, ''ফাতিমা দুনিয়ার সর্বোত্তম মহিলা।''

এটা ছিল সেই যুগ যখন প্রতিদিন ইসলামী বিজয় ছড়িয়ে পড়ছিল। মদীনা মুনাওয়ারায় অধিক পরিমাণে গনিমতের মাল আসা শুরু হয়েছিল। একদিন হযরত আলী (রাঃ) জানতে পেলেন যে, গনিমতের মালে কিছু দাসীও এসেছে। তিনি হযরত ফাতিমাকে (রাঃ) বললেন, ''ফাতিমা! যাঁতা পিষতে পিষতে তোমার হাতে ফোস্কা

www.bjilibrary.com

এবং উনুন জ্বালাতে জ্বালাতে তোমার চেহারার রং পরিবর্তন হয়ে গেছে। হুজুরের (সাঃ) নিকট আজ গনিমতের মালের মধ্যে অনেক দাসী এসেছে। দোজাহানের বাদশাহর (সাঃ) নিকট গিয়ে একটি দাসী চেয়ে নিয়ে এসো।''

হযরত ফাতিমাতুজ জোহরা (রাঃ)নবী করিমের (সাঃ) খিদমতে হাজির হলেন। কিন্তু লজ্জায় মুখ দিয়ে কিছু চাইতে পারলেন না। কিছুক্ষণ হুজুরের (সাঃ) খিদমতে অবস্থান করে ফিরে এলেন এবং হযরত আলীকে (রাঃ) বললেন যে, হুজুরের (সাঃ) নিকট কোন দাসী চাওয়ার সাহস তাঁর হয়নি। অতঃপর স্বামী-স্ত্রী উভয়েই হুজুরের (সাঃ) খিদমতে হাজির হয়ে কাজের কষ্টের কথা উল্লেখ করে একটি দাসী প্রাপ্তির আবেদন জানালেন।

সারওয়ারে কায়েনাত হযরত রাসূলে করিম (সাঃ) বললেনঃ ''আমি কোন কয়েদীকে তোমাদের খিদমতের জন্য দিতে পারি না। আসহাবে ছুফফার খাওয়া-পড়ার সন্তোষজনক ব্যবস্থা এখন আমাকে করতে হবে। আমি তাদেরকে কি করে ভুলে যেতে পারি যারা নিজেদের বাড়ী-ঘর ছেড়ে খোদা ও খোদার রাসূলের (সাঃ) সন্তুষ্টির জন্য দারিদ্র ও বুভুক্ষা গ্রহণ করে নিয়েছে।''

স্বামী-স্ত্রী উভয়েই চুপচাপ ঘরে ফিরে গেলেন। ইবনে সা'দ (রঃ) এবং হাফিজ ইবনে হাজার (রঃ) লিখেছেন, রাতে হুজুর (সাঃ) তাঁদের নিকট তাশরীফ নিলেন এবং বললেন, তোমরা যে বস্তুর অভিলাষী ছিলে তা' থেকে উত্তম একটি বস্তু আমি তোমাদেরকে বলছি। প্রত্যেক নামাযের পর দশ দশবার সুবহানাল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ এবং আল্লাহু আকবার পড় এবং শোয়ার সময় সুবহানাল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ তেত্রিশবার এবং আল্লাহু আকবার ৩৪ বার পড়ে নিও। এই আমল তোমাদের জন্য অতি উত্তম খাদেম হিসেবে পরিগণিত হবে।

একবার রাসূলে করিম (সাঃ) হযরত ফাতিমাতুজ জোহরার (রাঃ) গৃহে গিয়ে দেখলেন যে, সাইয়েদাতুন নিসা (রাঃ) উটের চামড়ার পোশাক পরে আছেন এবং তাতেও ১৩টি পট্টি মারা। তিনি আটা পিষছেন এবং মুখ দিয়ে আল্লাহর কালাম উচ্চারণ করে চলেছেন। হুজুর (সাঃ) এই দৃশ্য দেখে বিহবল হয়ে বললেনঃ ''ফাতিমা! সবরের মাধ্যমে দুনিয়ার কষ্ট শেষ কর এবং আখিরাতের স্থায়ী খুশীর অপেক্ষা কর। আল্লাহ তোমাদেরকে নেক পুরস্কার দেবেন।''

হযরত আবু যর গিফারী (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, একবার হুজুর (সাঃ) আমাকে হযরত আলীকে (রাঃ) ডেকে আনার নির্দেশ দিলেন। আমি যখন তাঁর গৃহে

www.bjilibrary.com

পৌছলাম তখন দেখলাম যে সাইয়েদাতুন নিসা (রাঃ) হযরত হোসাইনকে (রাঃ) কোলে নিয়ে যাঁতা পিষছেন।

বাস্তবত হযরত ফাতিমা (রাঃ) প্রায়ই দু'বেলা অভুক্ত থাকতেন এবং সন্তানদের কোলে নিয়ে যাঁতা পিষতেন।

একবার ফাতিমাতুজ জোহরা (রাঃ) মসজিদে নববীতে তাশরীফ নিলেন এবং রুটির একটি অংশ প্রিয় নবীকে (সাঃ) দিলেন। হুজুর (সাঃ) জিজ্ঞাসা করলেন, "এই রুটি কোথেকে এলো?" হযরত ফাতিমা (রাঃ) বললেন, "আব্বাজান! সামান্য যব পিষে রুটি বানিয়েছিলাম। যখন বাচ্চাদেরকে খাওয়াচ্ছিলাম তখন খেয়াল এলো যে আপনাকেও কিছু খাইয়ে দিই। হে খোদার রাসূল! তৃতীয় বেলা অভুক্ত থাকার পর এই রুটি ভাগ্যে জুটেছে।" হুজুর (সাঃ) রুটি খেলেন এবং বললেনঃ "হে আমার কন্যা! চার বেলা অভুক্ত থাকার পর এই প্রথম রুটির টুকরা তোমার পিতার মুখে পৌচছে।"

একবার হুজুর (সাঃ) ফাতিমাতুজ জোহরার (রাঃ) গৃহে তাশরীফ নিয়ে দেখলেন যে, দরজায় রঙ্গীন পর্দা ঝুলছে এবং ফাতিমার (রাঃ) হাতে দু'টো রূপোর চুরি। এদেখে তিনি ফিরে এলেন। হযরত সাইয়েদাহ খুব মর্মাহত হলেন এবং কাঁদতে লাগলেন। ইত্যবসরে হুজুরের (সাঃ) গোলাম হযরত আবু রাফে (রাঃ) এসে উপস্থিত হলেন। কাঁদার কারণ জিজ্ঞেস করলেন। হযরত সাইয়েদাহ (রাঃ) ঘটনা বললেন। তিনি বললেন, হুজুর (সাঃ) চুরি ও পর্দা পছন্দ করেননি। হযরত ফাতিমা (রাঃ) তৎক্ষণাৎ উভয় বস্তুকেই হুজুরের (সাঃ) খিদমতে পাঠিয়ে দিলেন এবং বলে দিলেন যে, তিনি এসব খোদার রাস্তায় দিয়ে দিয়েছেন। হুজুর (সাঃ) খুব খুশী হলেন। নিজের কন্যার কল্যাণ ও বরকত কামনা করে দোয়া করলেন এবং তা বিক্রি করে প্রাপ্ত অর্থ আসহাবে ছুফফার ব্যয় নির্বাহে খরচ করে দিলেন।

একবার হযরত আলী (রাঃ) ঘরে ফিরে কিছু খাবার চাইলেন। সাইয়েদাহ (রাঃ) বললেন, "অভুক্ত অবস্থায় আজ তৃতীয় দিন চলছে। যবের একটি দানাও ঘরে নেই।" হযরত আলী (রাঃ) বললেন, "হে ফাতিমা, আমাকে তুমি বলনি কেন?" সাইয়েদাতুন নিসা (রাঃ) জবাবে বললেন, "হে আমার মাথার মুকুট! রুখসতির সময় আমার পিতা (সাঃ) নসিহত করে বলেছিলেন যে, আমি যেন সওয়াল করে আপনাকে লজ্জিত না করি।"

একবার দ্বিপ্রহরের সময় রাসূলে করিম (সাঃ) ক্ষুধার্ত অবস্থায় ঘর থেকে বের হলেন। রাস্তায় হযরত আবুবকর সিদ্দিক (রাঃ) এবং হযরত ওমর ফারুকের (রাঃ)

www.bjilibrary.com

সাথে দেখা হলো। তাঁরাও ক্ষুধার্ত ছিলেন। তিনজন হযরত আবু আইয়ুব আনসারীর (রাঃ) বাগানে পৌঁছলেন। তিনি খেজুরের খোসা ছাড়িয়ে তাঁদের সামনে রাখলেন। এরপর একটি বকরী জবেহ করে তার গোশ্‌ত দিয়ে কাবাব এবং তরকারি পাকালেন। দস্তরখান বিছানো হলো। এ সময় হুজুর (সাঃ) একটি রুটির ওপর সামান্য গোশ্‌ত রেখে তা ফাতিমার (রাঃ) নিকট প্রেরণের কথা বললেন। তিনি জানালেন যে, ফাতিমা (রাঃ) কয়েকদিন অভুক্ত রয়েছে।

একবার বনু সলিম গোত্রের এক দুর্বল বৃদ্ধ মুসলমান হলেন। হুজুর (সাঃ) তাঁকে দ্বীনের জরুরী আহকাম ও মাসায়েল বর্ণনা করলেন অতঃপর জিজ্ঞেস করলেন, তোমার নিকট কি কোন মাল আছে? তিনি বললেন, "খোদার কসম। বনি সলিমের তিন হাজার মানুষের মধ্যে আমিই সবচেয়ে গরীব ও ফকীর।" হুজুর (সাঃ) সাহাবাদের (রাঃ) প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন এবং বললেন, "তোমাদের মধ্যে কে এই মিসকিনকে সাহায্য করবে?"

হযরত সায়াদ (রাঃ) বিন উবাদাহ উঠে দাঁড়ালেন এবং বললেন, "হে আল্লাহর রাসূল (সাঃ)। আমার একটি উটনী আছে। আমি তাঁকে তা দিচ্ছি।" হুজুর (সাঃ) এরপর বললেন, "তোমাদের মধ্যে কে আছ যে, তার মাথা ঢেকে দেবে?"

সাইয়েদেনা আলী মুরতাজা (রাঃ) উঠে দাঁড়ালেন এবং নিজের পাগড়ী খুলে তাঁর মাথায় পরিয়ে দিলেন।

অতঃপর হুজুর (সাঃ) বললেনঃ "কে আছে যে তার খাবারের বন্দোবস্ত করবে?"

হযরত সালমান ফারসী (রাঃ) সেই বৃদ্ধ আরাবীকে সঙ্গে নিলেন এবং তাঁর খাবারের বন্দোবস্ত করার জন্য বেরোলেন। কয়েকটি গৃহে জিজ্ঞেস করলেন। কিন্তু কিছুই পেলেন না। অতঃপর হযরত ফাতিমাতুজ জোহরার (রাঃ) বাড়ীতে গিয়ে দরজায় কড়া নাড়লেন। ভেতর থেকে আওয়াজ এলো, "কে"? তিনি সকল ঘটনা বর্ণনা করলেন এবং আশা প্রকাশ করে বললেন, "হে আল্লাহর সত্য রাসুলের (সাঃ) কন্যা। এই মিসকিনের খাবারের বন্দোবস্ত করুন।"

হযরত ফাতিমা (রাঃ) বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বললেন, "হে সালমান। খোদার কসম। আজ আমরা তৃতীয় দিনের মত অভুক্ত রয়েছি। শিশু দু'টি ভুখা অবস্থায় শুয়ে রয়েছে। কিন্তু সায়েলকে খালি হাতে ফিরে যেতে দেবো না। আমার এই চাদর শামউন ইহুদীর নিকট নিয়ে যাও এবং বলো ফাতিমা ((রাঃ) বিনতে মুহাম্মদের (সাঃ) এই চাদর রেখে গরীব মানুষটিকে কিছু দাও।"

www.bjilibrary.com

সালমান (রাঃ) আরাবীকে সঙ্গে নিয়ে ইহুদীর নিকট গেলেন এবং তাঁকে সকল বৃত্তান্ত বললেন। বৃত্তান্ত শুনে তিনি হয়রান হয়ে পড়লেন এবং বলে উঠলেন, "হে সালমান (রাঃ)। খোদার কসম, এঁরা তাঁরা যাঁদের ব্যাপারে তাওরীতে উল্লেখ করা হয়েছে। তুমি সাক্ষী থেকো যে, আমি ফাতিমার (রাঃ) পিতার (সাঃ) ওপর ঈমান এনেছি।" এরপর কিছু খাদ্য হযরত সালমানকে (রাঃ) দিলেন এবং চাদরও সাইয়েদা ফাতিমাকে (রাঃ) ফেরত পাঠিয়ে দিলেন। তিনি তা নিয়ে তাঁর নিকট পৌছলেন। সাইয়েদা (রাঃ) স্বহস্তে আনাজ পিষলেন এবং তাড়াতাড়ি আরাবীর জন্য রুটি বানিয়ে হযরত সালমানকে (রাঃ) দিলেন। তিনি বললেন, "এ থেকে বাচ্চাদের জন্য কিছু রেখে দিন।" হযরত ফাতিমা (রাঃ) জবাব দিলেন, "সালমান। যা খোদার রাস্তায় দিয়েছি, তা আমার বাচ্চাদের জন্য জায়েজ নয়।"

হযরত সালমান (রাঃ) রুটি নিয়ে হুজুরের (সাঃ) খিদমতে হাজির হলেন। হুজুর (সাঃ) সেই রুটি আরাবীকে দিলেন এবং ফাতিমাতুজ জোহরার (রাঃ) গৃহে তাশরীফ নিলেন। তাঁর মাথায় নিজের স্নেহের হাত বুলালেন, আকাশের দিকে তাকালেন এবং দোয়া করলেনঃ "হে আমার খোদা। ফাতিমা তোমার দাসী। তার প্রতি সন্তুষ্ট থেকো।"

একবার জনৈক ব্যক্তি হযরত ফাতিমাকে (রাঃ) জিজ্ঞাসা করলেন, চল্লিশ উটের যাকাত কি হবে? সাইয়েদা ফাতিমা (রাঃ) বললেন," তোমার জন্য শুধু এক উট। আমার নিকট যদি চল্লিশটি উট থাকে তাহলে আমি সবই আল্লাহর রাস্তায় দিয়ে দেব।"

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, একবার হযরত আলী (রাঃ) সারা রাত ধরে একটি বাগানে সেচ দিলেন এবং মজুরী হিসেবে সামান্য পরিমাণ যব পেলেন। হযরত ফাতিমা (রাঃ) তা থেকে এক অংশ নিয়ে আটা পিষলেন এবং খাবার তৈরী করলেন। ঠিক খাবার সময় এক মিসকিন দরজায় কড়া নাড়লো এবং বললো, "আমি ভূখা আছি।" হযরত সাইয়েদা (রাঃ) সম্পূর্ণ খাবার তাকে দিয়ে দিলেন। অতঃপর অবশিষ্ট আনাজের কিছু অংশ নিয়ে পিষলেন এবং খাবার তৈরী করলেন। খানা তৈরী শেষ হতেই একজন দরজায় এস হাত পেতে দাঁড়ালো। তিনি সব খাবার তাকে দিয়ে দিলেন। অতঃপর অবশিষ্ট আনাজ পিষলেন এবং খাবার তৈরী করলেন। ইতিমধ্যে একজন মুশরিক কয়েদী আল্লাহর রাস্তায় খাবার চাইলো। সেই সকল খাবার তাকে দিয়ে দেয়া হলো। মোট কথা বাড়ীর সকলেই সেদিন অভুক্ত রইলেন।

www.bjilibrary.com

আল্লাহ্ পাক তাঁদের এই দানকে এমন পছন্দ করলেন যে, তাঁদের সবার জন্য এই আয়াত নাযিল হলো।

وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا ـ

এবং সে আল্লাহর রাস্তায় মিসকিন, এতিম এবং কয়েদীকে খাবার খাওয়ায়

ওহোদের যুদ্ধে প্রিয় নবী (সাঃ) মারাত্মক আহত হয়েছিলেন এবং তাঁর শাহাদাতের খবর রটে গিয়েছিল। মদীনায় এই খবর পৌছলে হযরত ফাতিমাতুজ জোহরা (রাঃ) অন্যান্য মহিলাদের সঙ্গে ভারাক্রান্ত হৃদয়ে ওহোদের ময়দানে পৌছলেন। হুজুরকে (সাঃ) জীবিত দেখে ধড়ে প্রাণ এলো। কিন্তু শ্রদ্ধেয় পিতার (সাঃ) অবস্থা দেখে অত্যন্ত দুঃখিত হলেন। হুজুরের (সাঃ) ক্ষত স্থানসমূহ বার বার ধৌত করতে লাগলেন। তবে, কপালের ক্ষত থেকে রক্ত প্রবাহ বন্ধ হচ্ছিল না। অবশেষে খেজুরের চাটাই জ্বালিয়ে ক্ষতের মধ্যে দেয়ায় রক্ত বেরুনো বন্ধ হলো।

একবার সাইয়েদাতুন নিসা (রাঃ) অসুস্থ হয়ে পড়লেন। নবী করিম (সাঃ) সাহাবী হযরত ইমরান (রাঃ) বিন হাছিনকে সঙ্গে নিয়ে কলিজার টুকরাকে সেবা-শুশ্রুষার জন্য গেলেন। বাড়ীর দারজায় গিয়ে প্রবেশের অনুমতি চাইলেন। সাইয়েদা (রাঃ) আরজ করলেনঃ "তাশরীফ রাখুন"। হুজুর (সাঃ) বললেন, আমার সঙ্গে ইমরান বিন হাছিনও রয়েছেন। হযরত বতুল (রাঃ) জবাব দিলেনঃ "আব্বাজান। এক উবা ছাড়া পরদা করার মত দ্বিতীয় কোন কাপড় আমার নিকট নেই।" হুজুর (সাঃ) নিজের মুবারক চাদর ভেতরে নিক্ষেপ করে বললেনঃ "বেটি। এদিয়ে পরদা করো।"

এরপর হুজুর (সাঃ) এবং হযরত ইমরান (রাঃ) ভেতরে তাশরীফ নিলেন এবং তাঁকে তাঁর অবস্থা জিজ্ঞেস করলেন।

ফাতিমাতুজ জোহরা (রাঃ) আরজ করলেনঃ "আব্বাজান। কঠিন ব্যথায় খুব কষ্ট পাচ্ছি এবং ক্ষুধায় কাতর করে রেখেছে। কেননা ঘরে খাবার কিছুই নেই।"

হুজুর (সাঃ) বললেনঃ "হে আমার কন্যা। ধৈর্য ধর। আমিও আজ তিনদিন ধরে ভূখা রয়েছি। আল্লাহ তায়ালার নিকট আমি যাই চাই তা তিনি আমাকে দিয়ে থাকেন। কিন্তু আমি আখিরাতকে দুনিয়ার ওপর অগ্রাধিকার দিয়েছি।"

অতঃপর তিনি (সাঃ) নিজের স্নেহমাখা হাত হযরত ফাতিমার (রাঃ) পিঠের ওপর রাখলেন এবং বললেনঃ "হে কলিজার টুকরা। দুনিয়ার মুসিবতে মন ভেঙ্গো না। তুমি জান্নাতের মহিলাদের সরদার।"

www.bjilibrary.com

ফাতিমাতুজ জোহরা (রাঃ) এই দারিদ্র ও ঐশ্বর্যের সঙ্গে পূর্ণ দরজার আবেদাহ ছিলেন। ইমাম হাসান (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, আমি আমার আম্মাকে সন্ধ্যা থেকে সকাল পর্যন্ত ইবাদাত করতে এবং খোদার দরবারে ক্রন্দন করতে দেখেছি। কিন্তু তিনি কখনো দোয়াতে নিজের জন্য কোন কিছুর আবেদন জানাননি।

একবার সাইয়েদা (রাঃ) অসুস্থ ছিলেন। অসুস্থ থেকেও সারা রাত ইবাদাতে কাটালেন। সকালে হযরত আলী (রাঃ) যখন নামাযের জন্য মসজিদে গেলেন, তখন তিনি নামাযের জন্য দাঁড়িয়ে গেলেন। নামায শেষ করে যাঁতা পিষতে লাগলেন। হযরত আলী (রাঃ) ফিরে এসে তাঁকে যাঁতা পিষতে দেখে বললেনঃ "হে খোদার রাসূলের কন্যা। এতো পরিশ্রম কর না। কিছুক্ষণ আরাম কর। নচেত অসুখ বেশী হয়ে যেতেপারে।"

হযরত ফাতিমা (রাঃ) বলতে লাগলেনঃ খোদার ইবাদাত এবং আপনার ইতায়াত বা আনুগত্য অসুখের সর্বোত্তম চিকিৎসা। এরমধ্যে যদি কোনটি মৃত্যুর কারণ হয় তাহলে তারচেয়ে বেশী আমার জন্য আর সৌভাগ্যের কি হতে পারে!"

একবার হুজুর (সাঃ) সাইয়েদাকে (রাঃ) জিজ্ঞেস করলেনঃ "প্রিয় কন্যা! (মুসলমান) মহিলার কি কি গুণ রয়েছে?"

তিনি আরজ করলেনঃ "আব্বাজান! মহিলাদের উচিত আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূলের (সাঃ) আনুগত্য করা, সন্তানদের প্রতি স্নেহবৎসল হওয়া, নিজের দৃষ্টি অবনত রাখা, নিজের রূপ গোপন রাখা, নিজে অপরকে না দেখা এবং অন্যও যাতে দেখতে না পায় সে ব্যবস্থা করা।" হুজুর (সাঃ) এই জবাব শুনে খুব খুশী হলেন।

প্রিয় নবী (সাঃ) হযরত ফাতিমাতুজ জোহরাকে (রাঃ) সীমাহীন ভালোবাসতেন। সহিহ বুখারীতে বর্ণিত আছে যে, একবার হযরত আলী কাররামুল্লাহ ওয়াজহাহু আবি জেহেল কন্যা গোরাকে বিয়ে করার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। সাইয়েদাতুন নিসা (রাঃ) খুব দুঃখিত হলেন। রাসূলে করিম (সাঃ) তাঁর নিকট তাশরীফ আনলেন তখন সাইয়েদা (রাঃ) আরজ করলেনঃ "হে আল্লাহর রাসূল! আলী (রাঃ) আমার ওপর সতীন আনতে চায়।" এ কথা শুনে হুজুরের (সাঃ) অন্তরে খুব আঘাত লাগলো। এদিকে গোরার অভিভাবকও হুজুরের (সাঃ) নিকট এই বিয়ের অনুমতি নিতে এলো। হুজুর মসজিদে তাশরীফ নিলেন এবং মিম্বরে দাঁড়িয়ে বললেনঃ

www.bjilibrary.com

"হিশামের বংশধররা আলীর (রাঃ) সঙ্গে নিজের কন্যা বিয়ে দেয়ার জন্য আমার নিকট অনুমতি চায়। কিন্তু আমি অনুমতি দিব না। অবশ্য আলী (রাঃ) আমার কন্যাকে তালাক দিয়ে অন্য মেয়েকে বিয়ে করতে পারে। ফাতিমা (রাঃ) আমার শরীরের একটি অংশ। যে তাকে কষ্ট দেয় সে আমাকে কষ্ট দেয়। যে তাকে দুঃখ দেয় সে আমাকে দুঃখ দেয়। আমি হালালকে হারাম এবং হারামকে হালাল করতে চাই না। কিন্তু খোদার কসম! আল্লাহর রাসূলের কন্যা এবং খোদার দুশমনের কন্যা উভয়ে এক স্থানে একত্রিত হতে পারে না।"

রাসূলের (সাঃ) এই ভাষণের এমন প্রভাব হলো যে, হযরত আলী (রাঃ) তৎক্ষণাৎ বিয়ের ইচ্ছা ত্যাগ করলেন এবং সাইয়েদা ফাতিমাতুজ জোহরা (রাঃ) জীবিত থাকালীন অবস্থায় অতঃপর দ্বীতিয়বার বিয়ে করার চিন্তা আর অন্তরে কখনো আনেননি।

হুজুর (সাঃ) নিজের কন্যাকে যেমন ভালোবাসতেন তেমনি নিজের জামাইদেরকেও সীমাহীন স্নেহ করতেন। তাঁদেরকে বলতেনঃ "যাদের প্রতি তুমি নারাজ হয়ে গেছ, তাদের প্রতি আমিও অসন্তুষ্ট হবো। যাদের সঙ্গে তোমাদের যুদ্ধ, আমারও তাদেরর সঙ্গে যুদ্ধ। যাদের সঙ্গে তোমাদের সন্ধি রয়েছে তাদের সঙ্গে আমারও সন্ধি রয়েছে।"

হযরত আলীকে (রাঃ) বলতেনঃ "হে আলী। তুমি দুনিয়া ও আখিরাতে আমার ভাই।"

ফাতিমাতুজ জোহরার (রাঃ) পুত্র ইমাম হাসান (রাঃ) ও হোসাইনকে (রাঃ) হুজুর (সাঃ) নিজের কলিজার টুকরা মনে করতেন। অত্যন্ত ভালোবাসার সঙ্গে তাঁদেরকে চুমু দিতেন এবং নিজের কাঁধের ওপর উঠিয়ে নিয়ে বেড়াতেন।

প্রিয় নবীর (সাঃ) ইন্তেকালের কিছুদিন পূর্বে হযরত ফাতিমাতুজ জোহরা (রাঃ) খবর নেয়ার জন্য হযরত আয়েশা সিদ্দিকাহর (রাঃ) হুজরাতে তাশরীফ নিলেন। হুজুর (সাঃ) অত্যন্ত স্নেহের সঙ্গে তাঁকে নিজের কাছে বসালেন এবং কানে আস্তে আস্তে কিছু বললেন। এ কথা শুনে তিনি কাঁদতে লাগলেন। অতঃপর হুজুর (সাঃ) অন্য কোন কথা তাঁর কানে কানে বললেন। এ কথা শুনে তিনি হাসতে লাগলেন। যখন তিনি ফিরে চললেন তখন আয়েশা সিদ্দিকাহ (রাঃ) তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন. "হে ফাতিমা। তোমার কাঁদা এবং হাসার মধ্যে কি রহস্য রয়েছে?" সাইয়েদা (রাঃ) বললেন, " যে কথা হুজুর (সাঃ) গোপন রেখেছেন, আমি তা প্রকাশ করবো না।"

www.bjilibrary.com

রাসূলে করিমের (সাঃ) বিদায়ের পর একদিন হযরত আয়েশা সিদ্দিকাহ (রাঃ) অন্য রাওয়ায়েত অনুযায়ী হযরত উম্মে সালমা (রাঃ) হযরত ফাতিমাকে (রাঃ) সেই দিনের ঘটনার বিস্তারিত জানতে চাইলেন। হযরত ফাতিমা (রাঃ) বললেনঃ "প্রথমবার হুজুর (সাঃ) বলেছিলেন যে, প্রথমে জিবরীল আমীন (আঃ) বছরে সব সময় একবার কুরআন মজিদ পাঠ করতেন। এই বছর নিয়ম ভঙ্গ করে দু'বার পাঠ করেছেন। এ থেকে ধারণা করা হয় যে, আমার ওফাতের সময় নিকটে এসে গেছে।" এতে আমি কাঁদতে লাগলাম।

অতঃপর হুজুর (সাঃ) বলেছিলেনঃ "আহলে বাইতের মধ্যে সর্বপ্রথম তুমি আমার সঙ্গে মিলিত হবে এবং তুমি জান্নাতে মহিলাদের সর্দার হবে।" এ কথায় আমি খুব খুশী হলাম এবং হাসতে লাগলাম।

ইন্তেকালের পূর্বে রাসূলে করিম (সাঃ) যখন বার বার সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়ছিলেন তখন হযরত ফাতিমার (রাঃ) অন্তর টুকরা টুকরা হয়ে যাচ্ছিল। তিনি বলেছিলেন, হায়! "আমার পিতার অশান্তি!"

হুজুর (সাঃ) বলেছিলেন, "আজকের পর তোমার পিতা আর অশান্তিতে ভুগবেননা।"

প্রিয় নবীর (সাঃ) ইন্তেকালের পর হযরত ফাতিমাতুজ জোহরার (রাঃ) ওপর শোক ও দুঃখের পাহাড় ভেঙ্গে পড়েছিল। তিনি বলে উঠলেনঃ "প্রিয় পিতা (সাঃ) হকের দাওয়াত কবুল করেছিলেন এবং জান্নাতুল ফেরদাউসে দাখিল হয়েছেন। আহ! জিবরীলকে (আঃ) তাঁর ইন্তেকালের খবর কে পৌঁছাতে পারে!"

এরপর দোয়া করলেনঃ "ইলাহী আমার! ফাতিমার (রাঃ) অন্তরকে মুহাম্মাদের (সাঃ) অন্তরের নিকট পৌঁছে দিন। হে খোদা আমার! আমাকে রাসূলে করিমের (সাঃ) দীদার লাভ করিয়ে খুশী করে দিন। ইলাহী! হাশরের দিন মুহাম্মাদের (সাঃ) শাফায়াত থেকে মাহরুম করো না।"

কতিপয় রাওয়ায়েতে রাসূলের (সাঃ) ইন্তেকালে তিনি একটি মরসিয়া আবৃত্তি করেছিলেন বলে বলা হয়েছে। এই মরসিয়ায় তিনি বলেনঃ

"আকাশ ধূলি–ধূসর হয়ে গেল। সূর্য ঢেকে গেল। দুনিয়া অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে পড়লো। নবীর (সাঃ) পর যমিন শুধু দুশ্চিন্তাগ্রস্তই নয় বরং বেদনায় ফেটে গেছে। তার ওপর মুদির গোত্রের লোক এবং সমগ্র ইয়েমেনবাসী ক্রন্দন করে থাকে। বড় বড়

www.bjilibrary.com

পাহাড় এবং শহর কাঁদছে। হে খাতামুর রাসূল! খোদা আপনার ওপর রহমত নাযিল করুন।"

নবী আকরামের (সাঃ) দাফনের পর সাহাবা (রাঃ) ও মহিলা সাহাবীরা (রাঃ) শোক প্রকাশের জন্য তাঁর নিকট এসেছিলেন। কিন্তু তিনি কোন মতেই নিজেকে স্থির রাখতে পারছিলেন না। সকল চরিতকারই এ ব্যাপারে একমত যে, হুজুরের (সাঃ) ইন্তেকালের পর কেউই সাইয়েদা ফাতিমাতুজ জোহরাকে (রাঃ) হাসতে দেখেননি।

রাসূলের (সাঃ) ইন্তেকালের পর তাঁর মিরাসের মাসয়ালা উথাপিত হলো। ফিদক নামক একটি মৌজা ছিল। হুজুর (সাঃ) কতিপয় লোককে এই শর্তে তা দিয়ে রেখেছিলেন যে, তাতে যা উৎপন্ন হবে তার অর্ধেক তারা রাখবে এবং বাকী অর্ধেক হুজুরের (সাঃ) নিকট পাঠিয়ে দেবে। হুজুর (সাঃ) নিজের অংশ থেকে কিছু নিজের পরিবার-পরিজনের খরচের জন্য রাখতেন এবং অবশিষ্ট মুসাফির ও মিসকিনদের জন্য ব্যয় করতেন। কতিপয় ব্যক্তি হযরত ফাতিমাকে (রাঃ) বললো, ফিদক নবীর (সাঃ) ব্যক্তিগত মালিকানার সম্পত্তি ছিল এবং আপনি তার ওয়ারিস। বস্তুত তিনি প্রথম খলিফা হযরত আবুবকর সিদ্দিকের (রাঃ) নিকট ফিদকের ওয়ারাসাতের দাবী জানালেন।

হযরত আবুবকর সিদ্দিক (রাঃ) জবাব দিলেনঃ "হে ফাতিমা! আমি রাসূলের (সাঃ) নিকটাত্মীয়দেরকে আমার নিকটাত্মীয় থেকে বেশী ভালোবাসি। কিন্তু মুশকিল হলো নবীরা (আঃ) মৃত্যুর সময় যে সম্পদ রেখে যান তার সম্পূর্ণটাই ছাদকা হয়ে যায় এবং তাতে ওয়ারাসাত জারি হয় না। এজন্য আমি সেই সম্পদ ভাগ করতে পারি না। অবশ্য হুজুরের (সাঃ) জীবদ্দশায় আহলে বাইত তা থেকে যে উপকার নিতেন তা এখনো নিতে পারেন।"

এই জবাবে হযরত ফাতিমাতুজ জোহরা (রাঃ) খুব দুঃখিত হলেন এবং তিনি হযরত আবুবকর সিদ্দিকের (রাঃ) ওপর অসন্তুষ্ট হয়ে গেলেন। তিনি আজীবন তাঁর সঙ্গে কথা বলেননি।

অন্য এক রাওয়ায়েতে আছে, তিনি অসুস্থ হয়ে পড়লে হযরত আবুবকর সিদ্দিক (রাঃ) শুশ্রূষার জন্য উপস্থিত হলেন। সাইয়েদা (রাঃ) তাঁকে নিজের গৃহের অভ্যন্তরে যাওয়ার অনুমতি দেন এবং এভাবে মনের দুঃখ দূর করেন।

রাসূলে করিমের (সাঃ) বিচ্ছিন্নতামূলক দুঃখ সবচেয়ে বেশী বেজেছিল হযরত ফাতিমার (রাঃ) অন্তরে। তিনি সব সময় দুঃখভারাক্রান্ত থাকতেন। তাঁর অন্তর ভেঙ্গে

www.bjilibrary.com

গিয়েছিল। রাসূলের (সাঃ) ইন্তেকালের ৬ মাস পরই ১১ হিজরীর রমযান মাসে ২৯ বছর বয়সে তিনি জান্নাতুল ফেরদাউসের পথে যাত্রা করেন। ওফাতের পূর্বে হযরত আসমা (রাঃ) বিনতে আমিসকে ডেকে বলেছিলেনঃ "আমার জানাযা নেয়ার সময় এবং দাফনের সময় পর্দার পুরো ব্যবস্থা রাখতে হবে এবং আপনি ও আমার স্বামী ছাড়া অন্য কোন ব্যক্তির নিকট থেকে গোসলের ব্যাপারে সাহায্য নেয়া যাবে না। দাফনের সময় বেশী ভিড় হতে দেয়া যাবে না।"

হযরত আসমা (রাঃ) বলেন, "হে রাসূলের কন্যা। হাবশায় জানাযার ওপর গাছের ডাল বেঁধে ডুলি আকৃতির বানানো হয় এবং তার ওপর পর্দা দিয়ে দেয়া হয়।" অতঃপর তিনি খেজুরের কয়েকটি ডাল আনালেন এবং তা জোড়া দিলেন। অতঃপর তার ওপর কাপড় টাঙিয়ে সাইয়েদা (রাঃ) বতুলকে দেখালেন। তিনি তা পছন্দ করলেন। বস্তুত ওফাতের পর তাঁর জানাযা ঐভাবেই উঠানো হলো। জানাযায় খুব কম সংখ্যক লোকেরই অংশগ্রহণের সুযোগ হয়েছিল। সাইয়েদার (রাঃ) ওফাত রাতে হয়েছিল এবং ওছিয়ত অনুযায়ী হযরত আলী (রাঃ) রাতেই দাফন করেছিলেন। হযরত আব্বাস (রাঃ) নামাযে জানাযা পড়ান এবং হযরত আলী, হযরত আব্বাস এবং হযরত ফজল বিন আব্বাস (রাঃ) তাঁর লাশ কবরে নামান। দারে আকিলের এক অংশে তাঁকে দাফন করা হয়।

সাইয়েদাতুন নিসা ফাতিমাতুজ জোহরার (রাঃ) ৬টি সন্তান জন্মগ্রহণ করেছিল। হযরত ইমাম হাসান (রাঃ), হযরত ইমাম হোসাইন (রাঃ), হযরত মুহসিন (রাঃ), হযরত উম্মে কুলছুম (রাঃ), রোকেয়া (রাঃ) ও যয়নব (বাঃ)। মুহসিন (রাঃ) এবং রোকেয়া (রাঃ) শৈশবকালেই মারা যান। হযরত ইমাম হাসান (রাঃ) , ইমাম হোসাইন (রাঃ) এবং হযরত উম্মে কুলছুম (রাঃ) নামকরা ব্যক্তিত্ব ছিলেন। হুজুরের (সাঃ) বংশধারা ফাতিমাতুজ জোহরাকে (রাঃ) দিয়েই অব্যাহত ছিল।

চরিতকাররা হযরত ফাতিমার (রাঃ) অসংখ্য ফজিলত এবং গুণের বর্ণনা করেছেন। তারমধ্যে কিছু নিম্নরূপঃ

সাইয়েদুল মুরছালিন (সাঃ) হযরত ফাতিমাকে (রাঃ) জান্নাতের মহিলাদের সরদার হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন।

হুজুর (সাঃ) হযরত ফাতিমাকে (রাঃ) বলতেন, "হে ফাতিমা। তুমি, তোমার স্বামী, তোমরা সন্তান আমার সঙ্গে জান্নাতে একস্থানে থাকবে।"

একবার হুজুর (সাঃ) বললেনঃ "ফাতিমা আমার গোশ্তের টুকরা। যে তাকে ক্রোধান্বিত এবং অসন্তুষ্ট করবে সে আমাকে ক্রোধান্বিত ও অসন্তুষ্ট করে।"

www.bjilibrary.com

হযরত ফাতিমাতুজ জোহরা (রাঃ), তাঁর স্বামী নামদার এবং পুত্রদের শানে আল্লাহ্ তায়ালা তাতহিরের আয়াত নাযিল করেন।

হাদীসের কিতাবসমূহে হযরত ফাতিমাতুজ জোহরা (রাঃ) থেকে ১৮টি হাদীস বর্ণিত আছে। তাঁর হাদীসকারদের মধ্যে রয়েছেন হযরত আলী কাররামাল্লাহু ওয়াজহাহু, হযরত হাসান (রাঃ), হযরত হোসাইন (রাঃ), হযরত আয়েশা সিদ্দিকাহ (রাঃ) এবং হযরত উম্মে সালমা (রাঃ)।

হযরত ফাতিমা (রাঃ) বিনতে আসাদ

নবী করিমের (সাঃ) হিজরতের চার –পাঁচ বছর পরের ঘটনা। একদিন রহমতে আলম (সাঃ) এক দুঃখজনক খবর শুনে খুবই বেদনাভারাক্রান্ত ও দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়লেন এবং চোখ দিয়ে পানি গড়িয়ে পড়লো। এটি ছিল একজন মহিলার মৃত্যুর খবর। তিনি কালবিলম্ব না করে মৃত ব্যক্তির গৃহে তাশরীফ নিলেন এবং চির শয়ানে শায়িত মহিলার মাথার নিকট দাঁড়িয়ে বললেনঃ

"হে আমার আম্মা। খোদা আপনার ওপর রহম করুন। আপনি আমার আম্মার পর আম্মা ছিলেন। আপনি নিজে অভুক্ত থাকতেন, অথচ আমাকে খাওয়াতেন। আপনার নিজের পোশাক প্রয়োজন হতো, অথচ আপনি আমাকে কাপড় পরাতেন।"

এরপর তিনি শোকাভিভূত গৃহকর্তাকে নিজের পবিত্র কামিস প্রদান করলেন এবং তাঁকে এই কামিসের কাফন পরানোর নির্দেশ দিলেন।

অতঃপর তিনি হযরত উসামা (রাঃ) বিন যায়েদ (রাঃ) এবং হযরত আবু আইউব আনসারীকে (রাঃ) জান্নাতুল বাকীতে গিয়ে কবর খোঁড়ার নির্দেশ দিলেন। যখন তাঁরা কবরের ওপরের অংশ খোঁড়ার কাজ শেষ করলেন তখন প্রিয় নবী (সাঃ) স্বয়ং নীচে নামলেন এবং নিজের পবিত্র হাত দিয়ে কবর খুঁড়লেন এবং স্বয়ং কবর থেকে মাটি বের করলেন। যখন কবর খোঁড়ার কাজ শেষ হলো তখন হাওজে কাওসারের সাকী (সাঃ) কবরের মধ্যে শুয়ে পড়লেন এবং দোয়া করলেনঃ

www.bjilibrary.com

"ইলাহী আমার! আমার আম্মাকে ক্ষমা কর এবং তাঁর কবর প্রশস্ত করে দাও।"

এই দোয়া করে তিনি কবর থেকে বের হয়ে এলেন। এ সময় চরম দুশ্চিন্তায় তিনি দাড়ি মুবারক ধরে ছিলেন এবং গন্ড দিয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়ছিলো।

এই ভাগ্যবতী এবং উঁচু মর্যাদাশীল মহিলার নাম ছিল হযরত ফাতিমা (রাঃ) বিনতেআসাদ।

হযরত ফাতিমা (রাঃ) বিনতে আসাদ ছিলেন অন্যতম জালিলুল কদর মহিলা সাহাবী। উম্মাতে মুসলিমা তাঁকে নিয়ে গৌরব করে থাকেন। তিনি ছিলেন কোরেশ সরদার হাশিম বিন আবদি মান্নাফের পুতি বা নাত্নী হযরত অবদুল মুত্তালিবের ভাতিজী এবং পত্রবধূ, হযরত আবু তালিবের স্ত্রী, রাসূলে করিমের (সাঃ) চাচী ও বেয়াইন, মাওতা যুদ্ধের শহীদ হযরত জাফর তাইয়ার (রাঃ) এবং শেরে খোদা হযরত আলী মুরতাজার (রাঃ) মা এবং খাতুনে জান্নাত সাইয়েদাতুন নিসা হযরত ফাতিমাতুজ জোহরা বতুলের (রাঃ) শাশুড়ী। হযরত ফাতিমার (রাঃ) পিতা আসাদ বিন হাশিম রহমতে আলমের (সাঃ) দাদা হযরত আবদুল মুত্তালিব বিন হাশিমের সৎ ভাই ছিলেন। (আসাদের মার নাম ছিল কাইলাহ বিনতে আমের এবং হযরত আব্দুল মুত্তালিব সামা বিনতে আমর বিন যায়েদ নাজুরীর ঔরসজাত ছিলেন) ইতিহাসে আসাদ বিন হাশিমের কাহিনী কমই পাওয়া যায়।

হযরত ফাতিমা (রাঃ) কোরেশের সম্ভ্রান্ত পরিবার বনু হাশিমে জন্মগ্রহণ করেন এবং এই পরিবারেই লালিত পালিত হন। বর্ণনা করা হয়ে থাকে যে, শৈশবকাল থেকেই তিনি অত্যন্ত উঁচু চরিত্রের অধিকারিনী ছিলেন। বস্তুত হযরত আব্দুল মুত্তালিবের মুক্তা নির্বাচনকারী চক্ষু তাঁকে পুত্রবধূ বানানোর জন্য নির্বাচিত করেছিল এবং পুত্র আবদি মান্নাফের (আবু তালিব) সঙ্গে তাঁর বিয়ে দিয়ে দিয়েছিলেন। আল্লাহ পাক তাঁর ঔরসে চার পুত্র এবং তিন কন্যা দান করেছিলেন। পুত্রদের নাম হলোঃ তালিব, আকিল (রাঃ), জাফর (রাঃ) ও আলী (রাঃ)। কন্যাদের নামঃ উম্মেহানী (তাঁর আসল নাম বিভিন্ন মত অনুসারে ফাখতা, হিন্দ অথবা ফাতিমা), জুমানা এবং রবতাহ। আল্লামা ইবনে আবদুল বার (রঃ) "ইসতিয়াব" গ্রন্থে লিখেছেন, তিনিই ছিলেন প্রথম হাশেমী মহিলা, যাঁর ঔরস থেকে হাশেমী সন্তান জন্মগ্রহণ করেছিল। বলা হয়ে থাকে যে, কবি ও কাব্য শাস্ত্রেও তাঁর ব্যুৎপত্তি ছিল।

নবুয়ত প্রাপ্তির পর রহমতে আলম (সাঃ) হকের দাওয়াত প্রদান শুরু করলেন। এ সময় বনু হাশেমই তাঁকে বেশী সহযোগিতা করেছিল। হযরত ফাতিমার

www.bjilibrary.com

(রাঃ) পুত্র হযরত আলী কাররামাল্লাহু ওয়াজহাহুতো হক দাওয়াত কবুলকারী প্রথম যুবক ছিলেন। স্বয়ং হযরত ফাতিমাও (রাঃ) দাওয়াতের সূচনা পর্বে ইসলাম গ্রহণের সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন। কিছুদিন পর তাঁর দ্বিতীয় পুত্র জাফরও (রাঃ) হক পূজারীদের মধ্যে গণ্য হয়ে গেলেন। আল্লামা ইবনে আছির (রঃ) "উসূদুল গাব্বাহ" গ্রন্থে লিখেছেন, একদিন রহমতে আলম (সাঃ) হযরত আলীর (রাঃ) সঙ্গে ইবাদাতে মশগুল ছিলেন। হযরত আবু তালিব তাঁদেরকে দেখলেন এবং জাফরকে বললেন, "বেটা! তুমিও চাচার পুত্রের সঙ্গে দাঁড়িয়ে যাও।"

হযরত জাফর (রাঃ) হুজুরের (সাঃ) বাম দিকে দাঁড়িয়ে গেলেন। ইবাদাতে তিনি এত মজা পেলেন যে, আরকাম গৃহে রাসূলে করিমের (সাঃ) অবরুদ্ধ হয়ে পড়ার পূর্বেই ইসলাম গ্রহণ করে ফেললেন।

হযরত আবু তালিব, হযরত ফাতিমা (রাঃ), হযরত আলী (রাঃ) এবং হযরত জাফর (রাঃ) প্রিয় নবীকে (সাঃ) যার পর নাই ভালোবাসতেন। প্রকৃতপক্ষে হযরত আব্দুল মুত্তালিবের ওফাতের পর হযরত আবু তালিব এবং তাঁর স্ত্রী ফাতিমা (রাঃ) যে অকপটতা ও আন্তরিকতার সঙ্গে রাসূলে করিমের (সাঃ) অভিভাবকত্ব করেছিলেন এবং অত্যন্ত প্রতিকূল অবস্থাতেও তাঁকে হিফাজত ও সহযোগিতার জন্য জীবন বাজি রেখেছিলেন তার উদাহরণ ইতিহাসে পাওয়া যায় না।

নবুয়ত প্রাপ্তির পর হকপন্থীদের ওপর কোরেশ-মুশরিকদের জুলুম-নির্যাতন চরম পর্যায়ে পৌঁছলে রাসূলে করিম (সাঃ) মুসলমানদেরকে হাবশায় হিজরত করার অনুমতি দেন। সুতরাং নবুয়ত প্রাপ্তির ৫ ও ৬ বছর পর মুসলমানদের দু'টি কাফেলা একের পর এক মক্কাকে বিদায় জানিয়ে হাবশা চলে গেলেন। এই মুহাজিরদের মধ্যে হযরত ফাতিমা (রাঃ) তনয় হযরত জাফরও (রাঃ) ছিলেন। তাঁর সঙ্গে ছিলেন তাঁর স্ত্রী হযরত আসমা (রাঃ) বিনতে আমিস। ইবনে ইসহাক বর্ণনা করেছেন, হযরত জাফর (রাঃ) হাবশায় হিজরতকারী প্রথম দলের অন্তর্ভূক্ত ছিলেন। কিন্তু মুসা বিন উকবা মাগাজীতে লিখেছেন যে, তিনি হিজরতকারী দ্বিতীয় দলে ছিলেন। মোট কথা, হযরত ফাতিমা (রাঃ) অত্যন্ত ধৈর্য এবং সাহসিকতার সঙ্গে পুত্র ও পুত্রবধূর বিচ্ছিন্নতাবরদাশতকরেছিলেন।

নবুয়তের সপ্তম বছরে কোরেশের মুশরিকরা এক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিল। সিদ্ধান্তে বলা হলো যে, যতক্ষণ পর্যন্ত বনু হাশিম এবং বনু মুত্তালিব হত্যার জন্য মুহাম্মাদকে (সাঃ) তাদের নিকট অর্পণ না করবে ততক্ষণ কোন ব্যক্তি তাদের সঙ্গে কোন রকম সম্পর্ক রাখবে না, তাদের নিকট কোন বস্তু বিক্রয় করা যাবে না এবং

www.bjilibrary.com

তাদের সঙ্গে কোন আত্মীয়তার সম্পর্কও স্থাপন করা যাবে না। সিদ্ধান্তটি লিপিবদ্ধ করে প্রত্যেক গোত্রের প্রতিনিধি তাতে স্বাক্ষর করলো এবং তা কাবার দরজায় লটকিয়ে দেয়া হলো। হযরত আবু তালিব এই চুক্তির কথা অবহিত হয়ে হাশিম এবং তাঁর ভাই মুত্তালিবের সকল সন্তান-সন্ততিকে সঙ্গে নিয়ে শেবে আবিতালিবে আশ্রয় নিলেন। শুধুমাত্র আবু লাহাব এবং তার অধীন কতিপয় হাশেমী মুশরিকদের সঙ্গ নিল। বনু হাশিম এবং বনু মুত্তালিব অব্যাহতভাবে তিন বছর শেবে আবি তালিবে জুলুম-নির্যাতন সইতে লাগলেন। এই সময় অবরুদ্ধদের মধ্যে হযরত ফাতিমা (রাঃ) বিনতে আসাদও ছিলেন। এই পরীক্ষার যুগে তিনি নিজের পরিবার-পরিজনের সঙ্গে চূড়ান্ত পর্যায়ের সাহস ও ধৈর্যের পরিচয় দিয়েছিলেন।

নবুয়তের দশম বছরে হুজুরের (সাঃ) চাচা হযরত আবু তালিব মৃত্যুবরণ করেন। এ সময় রাসূলের (সাঃ) অভিভাবকত্বের দায়িত্ব হযরত ফাতিমা গ্রহণ করেন। তিনি রাসূলকে (সাঃ) নিজের সন্তানদের চেয়েও বেশী স্নেহ করতেন।

সাধারণ মুসলমানরা যখন মদীনায় হিজরতের নির্দেশ পেলেন তখন হযরত ফাতিমাও (রাঃ) হিজরত করে মদীনায় তাশরীফ নিলেন। হিজরতের সময় তাঁর কলিজার টুকরা হযরত আলী মুরতাজা (রাঃ) এক বিরল সৌভাগ্য অর্জন করেন। হুজুর (সাঃ) তাঁকে নিজের বিছানায় শুইয়ে হিজরতের সফরে রওয়ানা হয়ে যান।

নবীর (সাঃ) হিজরতের দু' অথবা তিন বছর পর হযরত ফাতিমা (রাঃ) বিনতে আসাদের পুত্র জনাব আলী মুরতাজার (রাঃ) বিয়ে রহমতে আলমের (সাঃ) কলিজার টুকরা হযরত ফাতিমাতুজ জোহরা (রাঃ) বতুলের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হয়। এ সময় বতুলের (রাঃ) স্বামী নিজের শ্রদ্ধেয় মাকে সম্বোধন করে বলেনঃ

"ফাতিমা বিনতে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) আসছে। আমি পানি ভরবো এবং বাইরের কাজ করবো। আর সে যাঁতা পিষা, আটা ভাঙ্গার কাজে আপনাকে সাহায্য করবে।"

প্রিয় নবী (সাঃ) হযরত ফাতিমা (রাঃ) বিনতে আসাদকে খুবই ভালোবাসতেন। তিনি প্রায়ই তাঁর সঙ্গে দেখা করার জন্য যেতেন এবং তাঁর গৃহে আরাম করতেন। হুজুর (সাঃ) কয়েকবার তাঁর স্নেহ, শরাফত ও সুন্দর চরিত্রের কথা উল্লেখ করেছেন। দুররে মনসুরে বর্ণিত আছেঃ "এই সেই ফাতিমা যার ফজিলত এবং প্রভাবের কথা চরিত গ্রন্থে বর্ণনা করা হয়েছে।"

হিজরতের কয়েক বছর পর রাসূলে আকরামের (সাঃ) জীবদ্দশাতেই হযরত ফাতিমা (রাঃ) বিনতে আসাদ ওফাত পান। হুজুর (সাঃ) তাঁর ওফাতকে চরমভাবে

www.bjilibrary.com

অনুভব করলেন। নিজের কামিস খুলে কাফন দিলেন এবং দাফনের পূর্বে কবরে নেমে শুয়ে পড়লেন। লোকজন এতে অশ্চর্য হলে তিনি বললেনঃ

"আবু তালিবের পর তাঁর থেকে বেশী আমার সঙ্গে কেউই মেহেরবানী করেননি। আমি আমার কোর্তা বা কামিস এজন্য পরিয়েছি যে, যাতে তিনি জান্নাতে তা লাভ করেন এবং কবরে এজন্য শুয়েছি যে, সম্ভবত কবর যাতে সহজ হয়।"

এক রাওয়ায়েতে আছে, এ সময় হুজুর (সাঃ) এও বলেছিলেন যে, আল্লাহ পাক ৭০ হাজার ফেরেশতাকে ফাতিমা (রাঃ) বিনতে আসাদের ওপর দরুদ পাঠের নির্দেশ দিয়েছেন। হযরত আলী (রাঃ) এবং হযরত জাফর (রাঃ) ছাড়া হযরত ফাতিমা বিনতে আসাদের পুত্র আকিল (রাঃ) এবং কন্যাদের মধ্যে উম্মেহানি (রাঃ) ও জুমানাও (রাঃ) ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। রবতার কথা জানা যায় না।

যে মহিলা সাইয়েদুল মুরসালিন ফখরে মওজুদাতের (সাঃ) কামিস কাফন হিসেবে পেয়েছিলেন এবং যাঁর শেষ আরামস্থলে রাসূলের (সাঃ) পবিত্র দেহের স্পর্শ লেগেছিল তাঁর মহান মর্যাদার কথা কে অনুমান করতে পারে।

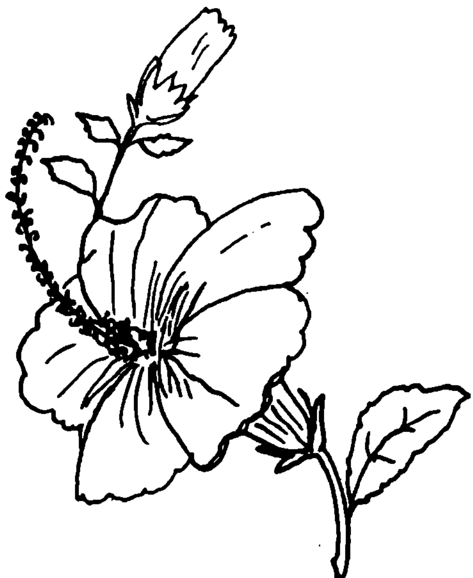

www.bjilibrary.com

হযরত উম্মে আইমান (রাঃ)

প্রিয় নবী (সাঃ) ছিলেন রাহমাতুললিল আলামীন। তিনি আরবের ইসলামী রাষ্ট্রের নেতা বা প্রধান ছিলেন। আবার সৃষ্টির সর্বোত্তমও ছিলেন। খোদার সৃষ্ট জীবের ওপর তাঁর করুণা ও দয়া বর্ষণ অব্যাহতভাবেই ঘটতো। কোন সওয়ালকারী তাঁর দরজায় এলো আর খালি হাতে ফিরে গেল এটা কোনক্রমেই সম্ভব ছিল না। অসহায় ও অভাবগ্রস্তরা আসতো এবং অভাবহীন হয়ে ফিরে যেতো। একদিন এক মহিলা রাসূলের (সাঃ) দরবারে এলেন। মহিলাটির চেহারায় রুচি ও মর্যাদার ছাপ বিদ্যমান ছিল। অত্যন্ত গাম্ভীর্যের সঙ্গে তিনি রাসূলের (সাঃ) দরবারে হাজির হলেন। তাঁকে দেখেই হুজুর (সাঃ) "আম্মী আম্মী" বলে সম্মানার্থে দাঁড়িয়ে গেলেন এবং অত্যন্ত ইজ্জত ও তাজিমের সঙ্গে তাঁকে বসালেন। অতঃপর জিজ্ঞেস করলেন, "আম্মী! আজ কেমন কষ্ট করেছেন?"

মহিলাঃ হে আল্লাহর রাসূল! আমার একটি উট প্রয়োজন। তাই চাইতে এসেছি।

রাসূলে আকরাম (সাঃ)ঃ আপনি উট দিয়ে কি করবেন?

মহিলাঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! আজকাল আমার নিকট সওয়ারীর কোন পশু নেই–গাধাও নেই, উটও নেই। কোন সময় দূরের সফর হলে তখন খুব কষ্ট হয়।

রাসূলে আকরাম (সাঃ) (মুচকী হেসে)ঃ আচ্ছা, উটের একটি বাচ্চা দিয়ে দিই।

মহিলাঃ আহা! আমার মাতা–পিতা আপনার ওপর কুরবান হোক। উটের বাচ্চা নিয়ে আমি কি করবো। আমারতো উট দরকার, উট।

রাসূলে আকরাম (সাঃ)ঃ আমিতো আপনাকে উটের বাচ্চাই দিব।

মহিলাঃ উটের বাচ্চা আমার কি কাজে আসবে? তাতো আমার বোঝাই বইতে পারবে না। আমাকে উট দিন।

www.bjilibrary.com

রাসূলে আকরাম (সাঃ)ঃ "আপনি উটের বাচ্চাই পাবেন এবং আমি তার ওপরই আপনাকে সওয়ার করাবো।"

এ কথা বলেই হুজুর (সাঃ) একজন খাদেমকে ইঙ্গিত দিলেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই সে মোটা–তাজা একটি জওয়ান উট নিয়ে এলো এবং তার রশি সওয়ালকারী মহিলার হাতে দিলো।

হুজুর (সাঃ) বললেনঃ "আম্মি! একটু দেখুনতো। এটা উটের বাচ্চা না অন্য কিছু?"

এতক্ষণে মহিলাটি রাসূলের (সাঃ) কৌতুকের গভীরতায় পৌছলেন এবং হেসে ফেললেন। তিনি দোয়া করতে লাগলেন। মজলিসে উপস্থিত সকলেই খুব আনন্দিত হলেন। এই মহিলা, যাঁকে রাসূলে করিম (সাঃ) এত সম্মান দিয়েছিলেন এবং তাঁর সঙ্গে এই ধরনের পবিত্র কৌতুকও করেছিলেন তিনি ছিলেন হযরত উম্মে আইমান(রাঃ)।

হযরত উম্মে আইমানের (রাঃ) নাম ছিল বারকাতাহ এবং ডাক নাম ছিল উম্মিজ জুবা। পিতার নাম ছিল ছা'লাবা বিন আমর। সে হাবশার বাসিন্দা ছিলো। সে মক্কায় কখন এবং কিভাবে এসেছিলো। ঐতিহাসিকরা এ ব্যাপারে ব্যাখ্যা করেননি। অবশ্য এটা স্বীকৃত ব্যাপার যে, হযরত উম্মে আইমান (রাঃ) রাসূলে আকরামের (সাঃ) ভূমিষ্ঠ হওয়ার পূর্বে বয়োপ্রাপ্তা হয়েছিলেন এবং শৈশবকাল থেকেই হুজুরের (সাঃ) পিতা হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্দুল মুত্তালিবের সঙ্গে দাসী হিসেবে থাকতেন। হযরত আবদুল্লাহর মৃত্যু হলে তিনি হুজুরের (সাঃ)মাতা হযরত আমেনার খিদমত করতে থাকেন। সারওয়ারে আলমের (সাঃ) শুভ জন্মের সময় হযরত আমেনার খবরাখবর নেয়া এবং খিদমতে তিনিই নিয়োজিত ছিলেন। প্রিয় নবী (সাঃ) পাঁচ অথবা ছয় বছর পর্যন্ত হযরত হালিমা সাদিয়া'র (রাঃ) নিকটই লালিত পালিত হন। তারপর হযরত হালিমা (রাঃ) তাঁকে তাঁর মায়ের নিকট সোপর্দ করে দেন। কিছুদিন পর হযরত আমেনা শিশু মুহাম্মাদ (সাঃ) এবং হযরত উম্মে আইমানকে (রাঃ) সঙ্গে নিয়ে ইয়াছরাব (মদীনা মুনাওয়ারা) তাশরীফ নেন। সম্ভবত ইয়াছরাবের মাটি সেই সময়ই দোজাহানের মালিকের পদধূলিতে সৌভাগ্য মন্ডিত হয়েছিল। এই সময় তাঁর বয়স ছিল মাত্র ৬ বছর। ইয়াছরাবে হযরত আমেনা বনু নাজ্জার বংশে অবস্থান করেন। এই বংশ হুজুরের (সাঃ) দাদার মাতামহ ছিলো। তিনি ইয়াছরাবে কম–বেশী এক মাস অবস্থানের পর শিশু হুজুর (সাঃ) ও উম্মে আইমানকে (রাঃ) সঙ্গে নিয়ে পুনরায় মক্কা ফিরে এলেন। প্রত্যাবর্তনকালে তিনি যখন মক্কা ও মদীনার মধ্যবর্তী স্থান

www.bjilibrary.com

আবওয়াতে পৌঁছলেন তখন রোগাক্রান্ত হয়ে পরকালের দিকে যাত্রা করলেন। সফরকালে হযরত আমেনার হঠাৎ মৃত্যুতে শিশু হুজুর (সাঃ) এবং উম্মে আইমান (রাঃ) খুবই দুঃখ পেলেন। কিন্তু উম্মে আইমান (রাঃ) অত্যন্ত ধৈর্য ও সাহসিকতার পরিচয় দিলেন। তিনি কোমরে হিম্মত বেঁধে হযরত আমেনাকে সেখানেই সমাধিস্থ করলেন এবং হুজুরকে (সাঃ) অত্যন্ত স্নেহের সঙ্গে সাথে নিয়ে দুঃখ ভারাক্রান্ত মনে মক্কা পৌঁছলেন। মক্কা পৌঁছার পর আবদুল মুত্তালিব আমেনার পুত্রকে (সাঃ) নিজের লালন পালনে নিলেন এবং উম্মে আইমানকে (রাঃ) হুজুরের (সাঃ) দেখাশুনার জন্য নিয়োগ করলেন।

আল্লামা ইবনে সা'দ (রঃ) বর্ণনা করেছেন, শিশু হুজুরের (সাঃ) সঙ্গে ইয়াছরাব অবস্থানকালের একটি বিশেষ ঘটনা হযরত উম্মে আইমানের (রাঃ) দীর্ঘদিন স্মরণ ছিল। তিনি বলতেন, "ইয়াছরাব অবস্থানকালে ইহুদীদের একটি দলের লোকেরা এসে শিশু মুহাম্মাদকে (সাঃ) দেখতো। একদিন আমি এক ইহুদীকে এ কথা বলতে শুনলাম যে, ছেলেটিকে তো শেষ নবী বলে মনে হয় এবং এই শহরই তাঁর হিজরতের স্থান হবে। এই ইহুদীর এই কথা আমার অন্তরের ওপর ছাপ ফেলে।"

সারওয়ারে আলম (সাঃ) যুবক হওয়ার পর ওয়ারিস সূত্রে উম্মে আইমান (রাঃ) হুজুরের অংশে এলেন। কিন্তু তিনি তাঁকে স্বাধীন করে দিলেন।

হযরত উম্মে আইমানের (রাঃ) প্রথম বিয়ে হয়েছিল ওবায়েদ বিন যায়েদের সঙ্গে। মাওলানা সাঈদ আনসারী (রঃ) "সিয়রুস সাহাবিয়াত" গ্রন্থে লিখেছেন, ওবায়েদ ইয়াছরাবের খাজরাজ বংশের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত ছিল। কিন্তু ইবনে সা'দ এবং ইবনে মান্দাহ তাঁর নসবনামা এইভাবে লিখেছেনঃ

ওবায়েদ বিন যায়েদ বিন আমর বিন বিলাল বিন আবিলহারবা বিন কায়েস বিন মালিক বিন ছালিম বিন গানাম বিন আওফ বিন খাজরাজ।

এই নসবনামার আলোকে তিনি আওফ বিন খাজরাজের বংশের সদস্য বলে মনে হয়। তাঁকে হাবালির বংশধর বলেও বলা হয়। কেননা হাবালি ছালিম বিন গানামের লকব ছিল। তার পেট বড় হওয়ার কারণে তাকে এই নাম দেয়া হয়েছিল। ইয়াছরেবে এই বংশটি অত্যন্ত মর্যাদাবান হিসেবে প্রতিষ্ঠিত ছিল। প্রখ্যাত মুনাফিক আবদুল্লাহ বিন উবাই এই বংশেরই সদস্য ছিল।

জাহেলী যুগে ওবায়েদ ইয়াছরেব থেকে মক্কা এসে স্থায়ী বাসিন্দা হয়ে গিয়েছিলেন। মক্কাতেই উম্মে আইমানের (রাঃ) সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়। বিভিন্ন প্রমাণে জানা যায়, হুজুরের (সাঃ) নবুয়ত প্রাপ্তির পর তিনি উম্মে আইমানের (রাঃ) সঙ্গে

www.bjilibrary.com

ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। কেননা কতিপয় রাওয়ায়েতে তাঁকে সাহাবী এবং অনসারীও লিখা হয়েছে। বিয়ের কিছুদিন পর ওবায়েদ উম্মে আইমানকে (রাঃ) সঙ্গে নিয়ে ইয়াছরাব চলে যান। সেখানেই তাঁর ঔরসে মশহুর সাহাবী হযরত আইমান (রাঃ) জন্মগ্রহণ করেন। পুত্রের জন্মের পর ওবায়েদ বেশী দিন জীবিত ছিলেন না। এবং তিনি নবীর (সাঃ) হিজরতের কয়েক বছর আগে ইয়াছরাবেই ওফাত পান।

নিয়াজ ফতেহপুরী নিজের পুস্তক "সাহাবিয়াতে" লিখেছেন, "ওবায়েদ হুনাইনের যুদ্ধে শহীদ হন।" এটা সম্পূর্ণ ভুল কথা। কোন কারণে নিয়াজ সাহেব এই ভুল করেছেন। সকল চরিত গ্রন্থ থেকে এটা প্রমাণিত হয়েছে যে, নবীর (সাঃ) হিজরতের পূর্বেই ওবায়েদের ইন্তেকাল হয়েছিল। মতপার্থক্য যদি হয় তাহলে তা হবে ওবায়েদের মৃত্যু নিয়ে। অর্থাৎ তাঁর মৃত্যু মক্কায় হয়েছিল না ইয়াছরেবে। যাহোক, ওবায়েদের মৃত্যুর পর হযরত উম্মে আইমান (রাঃ) পুত্র আইমানকে (রাঃ) সঙ্গে নিয়ে হুজুরের (সাঃ) খিদমতে হাজির হন। তিনি তাঁকে সার্বিকভাবে সাহায্য করেন। একদিন সাহাবাদের (রাঃ) সমাবেশে তিনি ইরশাদ করলেনঃ

"যদি কোন ব্যক্তি জান্নাতের মহিলাকে বিয়ে করতে চায় তাহলে সে উম্মে আইমানকে (রাঃ) বিয়ে করতে পারে।" হুজুরের (সাঃ) ইরশাদ শুনে তাঁর বিশেষ বন্ধু হযরত যায়েদ (রাঃ) বিন হারেছা হযরত উম্মে আইমানকে (রাঃ) বিয়ে করলেন। নবুয়ত প্রাপ্তির ৭ বছর পর হযরত উম্মে আইমানের (রাঃ) গর্ভে হযরত উসামাহ বিন যায়েদ (রাঃ) ভূমিষ্ঠ হন।

প্রিয় নবীর (সাঃ) নবুয়ত প্রাপ্তির পর যে সকল সৌভাগ্যবান ব্যক্তি সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণের ভাগ্য লাভ করেছিলেন তাদের মধ্যে হযরত উম্মে আইমানও (রাঃ) অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। সাবিকিনাল আউয়ালিনের এই পূত পবিত্র দল যে বিষময় দুঃখ-মুসিবতের মুখোমুখি হয়েছিলেন তা ইতিহাসের এক করুণ অধ্যায় যেমন তেমনি তা আবার ধৈর্য, স্থৈর্য ও সাহসিকতার এক ঈমানদীপ্ত কাহিনীও বটে। হযরত উম্মে আইমান (রাঃ) সেই কাহিনীর অন্যতম চরিত্র। কাফিরদের জুলুম-নির্যাতন থেকে তিনিও রেহাই পাননি। নির্যাতন যখন চরম পর্যায়ে পৌছলো তখন হুজুর (সাঃ) নবুয়ত প্রাপ্তির পঞ্চম বছরে মুসলমানদেরকে হাবশায় হিজরতের অনুমতি দিলেন। সেই বছরই ১১ জন পুরুষ এবং চারজন মহিলা হিজরত করেন। অতঃপর নবুয়তের ৬ষ্ঠ বছরে ৮৩ জন পুরুষ এবং ১৮ জন মহিলার একটি দল হাবশায় হিজরত করলেন। তাঁরা ছাড়াও অনেক মুসলমান বিচ্ছিন্নভাবে হিজরত করে হাবশা গমন করেন। হযরত উম্মে আইমান (রাঃ) এই ধরনের মুহাজিরদেরই অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।

www.bjilibrary.com

প্রিয় নবীর (সাঃ) ইঙ্গিত এবং স্বামীর (হযরত যায়েদ (রাঃ) বিন হারিছার) অনুমতিক্রমে তিনি হাবশা গমন করেন। ইতিহাসবিদরা তাঁর হাবশা হিজরতের সময় সম্পর্কে বিস্তারিত কিছু লিখেননি। কিন্তু ধারণা করা হয় যে, তিনি নবুয়তের ৬ষ্ঠ বছরের পর হাবশা গমন করেন এবং সেখানেই কয়েক বছর অবস্থান করেন। এমনকি মহানবীর (সাঃ) মদীনা হিজরতের পরও তিনি সেখানে ছিলেন। হযরত উম্মে আইমান (রাঃ) হুজুরের (সাঃ) মদীনা হিজরতের খবর অবহিত হওয়ার পর হাবশা থেকে মদীনা চলে আসেন। এভাবে তিনি দুই হিজরতের সৌভাগ্য অর্জন করেন। যে সময় তিনি মদীনা আসেন তখন বদরের যুদ্ধ শেষ হয়ে গিয়েছিল। ওহোদের যুদ্ধের সময় (তিন হিজরী) যদিও তিনি খুব ব্যস্ত ছিলেন তবুও তাঁর অন্তর ঘরে বসে থাকতে সায় দিল না। সুতরাং তিনি সেই মহিলাদের দলে অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেলেন যাঁরা মুজাহিদদের পানি পান এবং রোগীদের সেবা-শুশ্রুষা করতেন। ওহোদের পর তিনি খাইবারের যুদ্ধে অংশ নেন এবং একই খিদমত আঞ্জাম দেন। কতিপয় রাওয়ায়েতে বর্ণিত আছে যে, তাঁর পুত্র আইমানও (রাঃ) এই যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন এবং অত্যন্ত বাহাদুরীর সঙ্গে লড়াই করে শহীদ হয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু অধিকাংশ চরিত গ্রন্থে খাইবারের শহীদদের তালিকায় হযরত আইমানের (রাঃ) নাম পাওয়া যায় না। অবশ্য ইবনে ইসহাক (রঃ) তাঁকে হুনাইনের শহীদদের অন্তর্ভুক্ত করেছেন এবং লিখেছেন যে, তিনি সেই আট সাহাবার অন্যতম ছিলেন যাঁরা হুনাইনের যুদ্ধের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত হুজুরের (সাঃ) সঙ্গে যুদ্ধের ময়দানে অটল ছিলেন। আর এই আট ব্যক্তির মধ্যে শুধুমাত্র আইমানই (রাঃ) শাহাদাতের মর্যাদায় ভূষিত হন। তাঁর শাহাদাতে হযরত উম্মে আইমান (রাঃ) অত্যন্ত ধৈর্যের পরিচয় দেন এবং তাঁর পুত্র হাজ্জাজকে নিজের স্নেহের ছায়ায় আশ্রয় দান করেন। হাজ্জাজ বড় হয়ে মদীনার একজন বুজর্গ ব্যক্তি হিসেবে পরিগণিত হন। কতিপয় হাদীসও তাঁর থেকে বর্ণিত আছে।

মাওতার যুদ্ধে উম্মে আইমানের (রাঃ) স্বামী হযরত যায়েদ (রাঃ) বিন হারিছা শহীদ হন। এতে তিনি খুব দুঃখ পেয়েছিলেন। এ সত্ত্বেও রাসুলের (সাঃ)অভিভাবকত্ব ও আন্তরিকতার ফলে তাঁর দুঃখের অনেকাংশই লাঘব হয়। তাঁর পুত্র হযরত উছামাহ (রাঃ) বিন যায়েদকে (রাঃ) প্রিয় নবী (সাঃ) খুবই ভালোবাসতেন এবং তিনি ''রাসূলুল্লাহর প্রিয়'' বলে খ্যাত ছিলেন। হুজুর (সাঃ) হযরত হাসান (রাঃ) এবং হযরত হোসাইন (রাঃ) থেকে কাউকে ভালোবাসতেন না। কিন্তু তিনি অনেক সময় এই ভালোবাসায় হযরত উছামাহকেও (রাঃ) স্থান দিতেন।

www.bjilibrary.com

সহিহ বুখারীতে আছে, হুজুর (সাঃ) এক হাঁটুর ওপর হযরত হাসানকে (রাঃ) এবং অন্য হাঁটুর ওপর হযরত উছামাহকে (রাঃ) বসাতেন এবং বলতেনঃ "হে খোদা। আমি এই দু'জনকে ভালোবাসি। এজন্য তুমিও তাদেরকে ভালোবাসো।"

হযরত উছামাহর (রাঃ) প্রতি হুজুরের (সাঃ) অসাধারণ ভালবাসা দেখে অনেকে তাঁর প্রতি হিংসা পোষণ শুরু করে এবং তারা রটিয়ে দেয় যে, উছামাহ (রাঃ) যায়েদের (রাঃ) ঔরসের নয় (এটা মুতার যুদ্ধের পূর্বেকার ঘটনা)। বিদ্বেষ পোষণকারীদের এই অপপ্রচারের প্রভাব হযরত উম্মে আইমানের (রাঃ) ওপরও পড়েছিল। হুজুরের (সাঃ) পবিত্র কানে এ কথা পৌঁছলে তিনিও খুব মনোকষ্ট পান। ঘটনাক্রমে সে সময় একদিন আরবের প্রখ্যাত চেহারা দেখে মনের ভাব নিরূপণকারী মুজাররাজ মুদালজী হুজুরের (সাঃ) খিদমতে হাজির হলো। এ সময় হযরত উছামাহ (রাঃ) পিতা যায়েদের (রাঃ) সঙ্গে মাথা থেকে পা পর্যন্ত চাদর দিয়ে ঢেকে বসেছিলেন। পিতা-পুত্র উভয়ের শুধুমাত্র পা চাদরের বাইরে ছিল। হুজুর (সাঃ) মুজাররাজকে বললেন, "বলতো, এই দু'জনের পায়ের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক কি?" মুজাররাজ পায়ের ওপর দৃষ্টি নিক্ষেপ করলো এবং আরজ করলো, "তারা পিতা-পুত্র।" তার জবাব শুনে হুজুর (সাঃ) খুব খুশী হলেন এবং বিদ্বেষ পোষণকারীদের মুখ চিরতরের জন্য বন্ধ হয়ে গেল।

১১ হিজরীতে হুজুর (সাঃ) মুতার যুদ্ধের প্রতিশোধ গ্রহণার্থে একটি বাহিনী প্রস্তুত করলেন। এই বাহিনীতে হযরত আবুবকর সিদ্দিক (রাঃ), হযরত ওমর (রাঃ), হযরত আবু ওবায়দাহ (রাঃ), ইবনুল জারাহ (রাঃ) হযরত সা'দ (রাঃ) বিন আবি ওয়াক্কাস, হযরত সাঈদ (রাঃ) বিন যায়েদ এবং আরো কতিপয় জালিলুল কদর সাহাবী অন্তর্ভূক্ত ছিলেন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এই বাহিনীর নেতৃত্ব প্রদান করলেন যুবক উছামাহ (রাঃ) বিন যায়েদকে (রাঃ)। এ সময় হুজুরের (সাঃ) রোগ দেখা দিয়েছিল তবুও তিনি সৈন্য বাহিনী রওয়ানা হওয়ার নির্দেশ দিলেন। তিনি মদীনা থেকে রওয়ানা হয়ে জরফ নামক স্থানে তাঁবু ফেললেন। তখন রাসূলের (সাঃ) অসুস্থতা খুব কঠিন হয়ে দেখা দিল। হযরত উম্মে আইমান (রাঃ)হাশেমী বংশের অনেক নারী-পুরুষের শেষ সময় দেখেছিলেন। হুজুরের (সাঃ) অসুস্থতায় এমন কিছু আলামত প্রকাশ পেল, যাতে তাঁর বিশ্বাস হলো যে, তিনি এই নশ্বর জগৎ ছেড়ে যাবেন। তিনি তৎক্ষণাৎ হযরত উছামাহ'র (রাঃ) পেছনে মানুষ প্রেরণ করে বলে পাঠালেন যে, কালবিলম্ব না করে মদীনা চলে এসো। সুতরাং হযরত উছামাহ (রাঃ) অন্য কতিপয় সাহাবী সমেত তৎক্ষণাৎ জরফ থেকে মদীনা ফিরে এলেন এবং হুজুরের (সাঃ) ইন্তেকালের পর তাঁর কাফন-দাফনে শরীক হলেন।

www.bjilibrary.com

রাসূলের (সাঃ) ইন্তেকালে হযরত উম্মে আইমান (রাঃ) খুব মনোকষ্ট পেলেন। শোকে অভিভূত হয়ে পড়লেন। তাঁর ক্রন্দন আর থামতে চায় না। হযরত আবুবকর সিদ্দিক (রাঃ) ও হযরত ওমর ফারুক (রাঃ) জানতে পেরে তাঁর নিকট গেলেন এবং সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, ''রাসূলে আকরামের (সাঃ) জন্য খোদার নিকট উত্তম বস্তু মওজুদ রয়েছে।'' হযরত উম্মে আইমান (রাঃ) জবাব দিলেন, ''আমি তো তা জানি। আমি এজন্য ক্রন্দন করছি যে, এখন ওহীর সিলসিলা বন্ধ হয়ে গেছে। এ কথা শুনে হযরত আবুবকর সিদ্দিক (রাঃ) ও হযরত ওমর ফারুক (রাঃ) আবেগাপ্লুত হয়ে পড়লেন এবং দু'জনই ক্রন্দন করতে লাগলেন। এই রাওয়ায়েত সহিহ মুসলিমের।

তাবকাতে ইবনে সায়াদে বর্ণনা করা হয়েছে যে, লোকজন হযরত উম্মে আইমানকে (রাঃ) বুঝানো শুরু করলে তিনি বলতে লাগলেন, ''আমি তো এটা জানি যে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) আমাদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছেন। কিন্তু আমি কাঁদছি এ কারণে যে, এখন ওহীর সিলসিলা বন্ধ হয়ে গেছে।''

হযরত উম্মে আইমান (রাঃ) শুধুমাত্র হুজুরকে (সাঃ) কোলে করে নিয়েই বেড়াননি এবং লালন-পালনই করেননি বরং তিনি তাঁর পিতা-মাতা- দাদা ও অন্যান্য বুজর্গ ব্যক্তিদেরকে স্বচক্ষে দেখেছিলেন। এজন্য হুজুর (সাঃ) তাঁকে সীমাহীন সম্মান করতেন এবং প্রায়ই তাঁর বাড়ী যেতেন। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলতেন, ''আমার মা'র পর উম্মে আইমান আমার মা।'' বস্তুত হুজুর (সাঃ) তাঁকে ''আম্মী'' বলে সম্বোধন করতেন। সহিহ বুখারীতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, তিনি (সাঃ) তাঁর দিকে ইঙ্গিত করে বলতেন, ''হাজাল বাকিয়াতু আহলি বাইতি।'' হযরত উম্মে আইমানও (রাঃ) হুজুরের (সাঃ) ব্যাপারে অত্যন্ত গৌরব করতেন। একবার রাসূল (সাঃ) তাঁর বাড়ী গেলেন। এ সময় তিনি তাঁর খিদমতে শরবত পেশ করলেন। হুজুর (সাঃ) কোন কারণে তা পান করার ব্যাপারে ওজর পেশ (সম্ভবত তিনি রোযা ছিলেন) করলেন। তাতে উম্মে আইমান (রাঃ) রেগে গেলেন। এ সত্ত্বেও হুজুর (সাঃ) তাঁর কথায় কিছু মনে করলেন না।

হুজুরের (সাঃ) নিকট আনসারদের প্রদত্ত বহু খেজুরের বাগান ছিল। যখন বনু কোরায়জা এবং বনু নজিরের ওপর বিজয় ঘটলো তখন হুজুর (সাঃ) আনসারদেরকে তাদের বাগান ফেরতদান শুরু করলেন। এইসব বাগানের মধ্যে কিছু বাগান হযরত আনাস (রাঃ) বিন মালিকেরও ছিল। রাসূলে করিম (সাঃ) তা উম্মে আইমানকে (রাঃ) দিয়েছিলেন। নবী করিম (সাঃ) যখন এই বাগান হযরত আনাসকে (রাঃ)

ফেরত দিলেন এবং তিনি তা দখল করতে গেলেন তখন তা ফেরত দিতে হযরত উম্মে আইমান (রাঃ) দ্বিধায় পড়ে গেলেন। হুজুর (সাঃ)এই খবর জানতে পেরে এই বাগানের দশগুণ বেশী প্রদান করে উম্মে আইমানকে (রাঃ) সম্মত করালেন।

আল্লামা ইবনে আছির (রঃ) উসুদুল গাব্বাহ গ্রন্থে লিখেছেন, রাসূলে করিমের (সাঃ) ইন্তেকালের পাঁচ-ছয় মাস পর হযরত আবুবকর সিদ্দিকের (রাঃ) খিলাফতকালে হযরত উম্মে আইমান (রাঃ) ইন্তেকাল করেছিলেন। কিন্তু অন্যান্য শক্তিশালী রাওয়ায়েত এই রাওয়ায়েতকে সমর্থন করে না। হাফিজ ইবনে হাজার (রঃ) ''ইছাবাহ''তে বলেছেন, ২৪ হিজরীতে হযরত ওমর ফারুক (রাঃ) শাহাদাদপ্রাপ্ত হন। এতে উম্মে আইমান (রাঃ) খুব দুঃখ পেয়েছিলেন। তিনি কেঁদে কেঁদে বলেছিলেন, "আজ ইসলাম দুর্বল হয়ে গেছে।"

তাবকাতের লিখক আল্লামা ইবনে সায়াদ (রঃ) বর্ণনা করেছেন, হযরত ওসমান জুন্নুরাইনের (রাঃ) খিলাফতকালে খেজুর বৃক্ষের দাম খুব চড়ে গিয়েছিল। একেকটি গাছ এক হাজারেও বিক্রি হতো। সেই যুগেই একদিন হযরত উছামাহ (রাঃ) একটি খেজুর বৃক্ষের মাথি বের করছিলেন। লোকজন আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞেস করলো, ''আপনি একি করছেন! এত মূল্যবান বৃক্ষ আপনি নষ্ট করছেন?'' হযরত উছামাহ (রাঃ) জবাব দিলেনঃ ''আমার আম্মা এই ফরমায়েশ করেছেন। তিনি যে কাজের নির্দেশ দেন তা পালন করা আমি ফরজ মনে করি।''

এই রাওয়ায়েত থেকে জানা যায় যে, হযরত উম্মে আইমান (রাঃ) হযরত ওসমানের (রাঃ) শাসনকালে জীবিত ছিলেন এবং এটাই ঠিক যে, তিনি ওসমানের (রাঃ) শাসনামলে সুদীর্ঘ বয়সে ইন্তেকাল করেন। তাঁর থেকে কতিপয় হাদীসও বর্ণিত আছে। বর্ণনাকারীদের মধ্যে হযরত আনাস (রাঃ) বিন মালিক, হানাশ (রঃ) বিন আব্দুল্লাহ এবং আবু ইয়াযিদ মাদানী (রঃ) অন্তর্ভুক্ত রয়েছেন।

www.bjilibrary.com

হযরত ছুফিয়াহ (রাঃ) বিনতে আব্দুল মুত্তালিব

খন্দকের যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল পঞ্চম হিজরীতে। এ সময় সমগ্র আরবের মুশরিক এবং ইহুদীরা ঐক্যবদ্ধভাবে ইসলামের কেন্দ্রের ওপর হামলা করে বসেছিল। বিশেষভাবে মদীনার অভ্যন্তরে বনু কোরায়জার ইহুদীরা বিশ্বাসঘাতকতা করে হকপন্থীদের জীবন বিপন্ন করে তুলেছিল। মুসলমানদের জন্য এটা ছিল মারাত্মক পরীক্ষা। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার, আল্লাহর পবিত্র বান্দারা এই কঠিন সময়েও মুহূর্তের জন্যও পদস্খলিত হননি। তাঁরা তো নিজের জান–মাল হক পথে বিক্রি করে দিয়েছিলেনই এবং জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত কুফর ও শিরকের বিরুদ্ধে মুকাবিলার দৃঢ় ইচ্ছা পোষণ করে রেখেছিলেন। এ সত্ত্বেও মহিলা ও শিশুদেরকে ঘরের দুশমন বনু কোরায়জার হাত থেকে রক্ষা করা অপরিহার্য ছিল। বস্তুত রহমতে আলম (সাঃ) সকল মুসলমান মহিলা এবং "শিশুদেরকে সতর্কতামূলকভাবে ''ফারে" অথবা "আতাম" নামক একটি দুর্গে স্থানান্তর করলেন এবং হযরত হাসসান (রাঃ) বিন ছাবিতকে (রাসূলের কবি) এই দুর্গের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বে নিয়োগ করলেন। দুর্গটি যদিও খুব মজবুত ছিল। তবুও ভীতির উর্ধে ছিল না। প্রিয় নবী (সাঃ) সকল বাহাদুর সঙ্গীসহ জিহাদে ব্যাপৃত ছিলেন এবং বনু কোরায়জার মহল্লা ও এই দুর্গের মধ্যে কোন সেনাবাহিনী ছিল না। এই ভয়ংকর সময়ে একদিন এক ইহুদী সেদিকে এলো এবং দুর্গে অবস্থানরত লোকদের সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করতে লাগলো। ঘটনাক্রমে একজন শক্ত–সামর্থ বৃদ্ধ মহিলা এই ইহুদীকে দেখে ফেললেন। তিনি খোদাপ্রদত্ত বিচক্ষণতার সাহায্যে বুঝতে সক্ষম হলেন যে, লোকটি গুপ্তচর। সে ফিরে গিয়ে যদি বনু কোরায়জার দুষ্টু প্রকৃতির লোকদের বলে দেয় যে, দুর্গে শুধুমাত্র মহিলা ও শিশু রয়েছে তাহলে তারা ময়দান খালি দেখে দুর্গের ওপর হামলা করে বসতে পারে। সুতরাং তিনি দুর্গের রক্ষক হযরত হাসসানকে(রাঃ) বাইরে বেরিয়ে ইহুদীকে হত্যা করার কথা বললেন।

হযরত হাসসান (রাঃ) ওজর পেশ করলেন। চরিতকাররা এই ওজরের কারণ হিসেবে তাঁর শারীরিক অথবা মনের দুর্বলতার কথা বলেছেন। কোন অসুখে ভোগার ফলে তাঁর এই রোগ হয়েছিল। অন্য কতিপয় রাওয়ায়েতে বর্ণিত আছে যে, তিনি এই

www.bjilibrary.com

সময় এই জবাব দিয়েছিলেনঃ "আমি যদি এই ইহুদীর সঙ্গে লড়াই করার যোগ্যই হতাম তাহলে এ সময় আল্লাহর রাসুলের (সাঃ) সঙ্গে থাকতাম না?"

হযরত হাসসানের (রাঃ) এই জবাব শুনে মহিলাটি তৎক্ষণাৎ উঠে দাঁড়ালেন এবং দুর্গের একটি খুটি উঠিয়ে দুর্গের বাইরে এলেন এবং সেই ইহুদীর মাথার ওপর এমন জোরে মারলেন যে সে সেখানেই লাশ হয়ে পড়ে গেল। হাফিজ ইবনে হাজার (রঃ) "ইসাবাহ" গ্রন্থে লিখেছেন, ইহুদীকে হত্যা করার পর তিনি হযরত হাসসানকে (রাঃ) বললেন, গিয়ে তার মাথা কেটে আনো। তিনি তাতেও ওজর পেশ করলেন। বাহাদুর মহিলাটি স্বয়ং তার মাথা কেটে দুর্গের নীচে নিক্ষেপ করলেন। বনু কোরায়জার ইহুদীরা কর্তিত মস্তক দেখে স্থির বিশ্বাস করলো যে, দুর্গের অভ্যন্তরেও মুসলমানদের সৈন্য আছে। বস্তুত তাদের আর দূর্গের ওপর হামলার সাহস হলো না।

আল্লামা ইবনে আছির (রঃ) জাফরী বর্ণনা করেছেন, এরপর মহিলাটি হযরত হাসসানকে (রাঃ) বললেনঃ এখন গিয়ে নিহত ইহুদীর সামান খুলে নিয়ে এসো।" তিনি বললেন, "আমার সে ইচ্ছা নেই।" ইবনে আছির (রঃ) বলেন, একজন মুসলমান মহিলার পক্ষ থেকে এই প্রথম বাহাদুরী প্রকাশ পেয়েছিল। সুতরাং সারওয়ারে আকরাম (সাঃ) তাঁকে গনিমতের মালের অংশ দিয়েছিলেন।

এই শেরদিল মহিলার বাহাদুরী এবং ভীতিহীনতা এক বড় আশংকা নির্মূল করে দিয়েছিল এবং সকল মুসলমান মহিলা ও শিশুকে ইহুদী নির্যাতনের হাত থেকে রক্ষা করেছিল। এই মহিলা ছিলেন বনু হাশিমের নয়নমনি রাসুলে করিমের (সাঃ) ফুফু হযরত ছুফিয়াহ (রাঃ) বিনতে আব্দুল মুত্তালিব।

হযরত ছফিয়াহ (রাঃ) বিনতে আবদুল মুত্তালিব অন্যতম জালিলুল কদর মহিলা সাহাবী ছিলেন। তিনি হালাহ বিনতে ওয়াহিব (অথবা আহিব) বিন আবদি মান্নাফ বিন যাহরাহ বিন কিলাব বিন মাররাহর সন্তান ছিলেন। তিনি প্রিয় নবীর (সাঃ) মা আমিনা বিনতে ওয়াহাব বিন আবদি মান্নাফের চাচাতো বোন ছিলেন। এই সূত্রে তিনি হুজুরের (সাঃ) খালাতো বোনও হতেন। শেরে খোদা এবং শহীদে ওহোদ হযরত হামযা (রাঃ) তাঁর সহোদর ছিলেন। সারওয়ারে আলমের (সাঃ) পিতা আবদুল্লাহ –আব্দুল মুত্তালিবের দ্বিতীয় স্ত্রী ফাতিমা বিনতে আমরের গর্ভে জন্ম-গ্রহণ করেছিলেন। এই সূত্রে হযরত ছুফিয়াহ (রাঃ) হুজুরের (সাঃ) ফুফু ছিলেন। এজন্য তাঁকে আম্মাতুন্নাবী বলা হয়। প্রিয় নবীর (সাঃ) অন্যান্য ফুফু উম্মে হাকিম বাজইয়া, উমাইমাহ, আতিকাহ, বাররাহ এবং আরদার ইসলাম গ্রহণের ব্যাপারে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। কিন্তু হযরত ছুফিয়াহর (রাঃ) ইসলাম

www.bjilibrary.com

গ্রহণের ব্যাপারে সকলেই একমত পোষণ করেন। ইবনে আছির (রঃ) "উসুদুল গাবাহ" গ্রন্থে লিখেছেন, সহিহ বা সঠিক কথা হলো তিনি ব্যতীত রাসূলের (সাঃ) কোন ফুফুই ইসলাম কবুল করেননি।

যদিও ইবনে সায়াদ (রঃ) এবং হাফিজ ইবনে কাইয়েম (রঃ) আতিকাহ এবং আরদাকেও ইসলাম গ্রহণকারী মহিলাদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করেছেন তবুও হযরত ছুফিয়াহই (রাঃ) এই মর্যাদায় অভিষিক্ত যা তিনিই হকের দাওয়াতের শুরুতে ঈমান আনার সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন এবং সাবিকুনাল আউয়ালুনের সেই পবিত্র দলের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, যাদেরকে আল্লাহ পাক স্পষ্ট ভাষায় জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছেন। প্রিয় নবী (সাঃ) এবং তিনি প্রায় একই সময়ে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। এজন্য তিনি রাসূলের (সাঃ) প্রায় সমবয়সী ছিলেন।

হযরত ছুফিয়াহর (রাঃ) প্রথম বিয়ে হয়েছিল হারিছ বিন হারার উমুবীর সঙ্গে। তাঁর ঔরসে একটি পুত্র সন্তান জন্মেছিল। তাঁর মৃত্যুর পর আওয়াম বিন খুয়ায়েলদ কারাশীল আসাদীর সঙ্গে হযরত ছুফিয়াহর (রাঃ) আবার বিয়ে হয়। আওয়াম বিন খুয়ায়েলদ উম্মুল মুমিনিন হযরত খাদিজাতুল কুবরার (রাঃ) ভাই ছিল। হাওয়ারীয়ে রাসূল (সাঃ) হযরত যোবায়ের (রাঃ) এই আওয়ামের ঔরসেই জন্মগ্রহণ করেন। শৈশবকালেই হযরত যোবায়ের (রাঃ) পিতার স্নেহছায়া থেকে মাহরুম হন। সে সময় হযরত ছুফিয়াহ (রাঃ) সম্পূর্ণ যুবতী ছিলেন। কিন্তু এরপর তিনি সমগ্র জীবন বিধবা অবস্থায় কাটান। রহমতে আলম (সাঃ) নবুয়ত পেলেন এবং লোকদেরকে হকের দিকে আহবান জানানো শুরু করলেন। এ সময় কোন চিন্তা–ভাবনা ছাড়াই হযরত ছুফিয়াহ (রাঃ) ইসলাম গ্রহণ করেন। তাঁর সঙ্গে তাঁর ১৬ বছর বয়স্ক পুত্র হযরত যোবায়েরও (রাঃ) ইসলাম গ্রহণ করেন।

হযরত ছুফিয়াহ (রাঃ) অত্যন্ত সুন্দরভাবে হযরত যোবায়েরকে (রাঃ) প্রশিক্ষণ দিয়েছিলেন। তাঁর আকাংখা ছিল যে, তাঁর পুত্র বড় হয়ে একজন ভয়হীন এবং বাহাদুর সিপাহী হবে। বস্তুত তিনি হযরত যোবায়েরকে (রাঃ) দিয়ে অত্যন্ত কঠিন মেহনতের কাজ করিয়ে নিতেন এবং সময়ে সময়ে খুব করে ডাটতেনও। যোবায়েরের (রাঃ) চাচা নওফিল বিন খুয়ায়েলদ একদিন মায়ের হাতে ভাতিজার মার দেখে অস্থির হয়ে পড়লো এবং হযরত ছুফিয়াহকে (রাঃ) খুব করে গালি দিয়ে বললো, এভাবে তো তুমি ছেলেকে মেরেই ফেলবে। নওফিল বনু হাশিম এবং নিজের গোত্রের কতিপয় লোককেও ছুফিয়াহকে (রাঃ) পুত্রের ওপর কঠোরতা অবলম্বন করা থেকে বিরত রাখার জন্য বললো। যখন তাঁর কঠোরতার কথা সাধারণ্যে প্রকাশ হয়ে পড়লো তখন তিনি বললেনঃ "যে ব্যক্তি বলে যে, আমি তার (যোবায়েরের)

www.bjilibrary.com

সঙ্গে শত্রুতা পোষণ করি, সে মিথ্যা বলে। সে যাতে আকলমন্দ হয় এজন্য আমি তাকে মারি।" "এবং সৈন্যকে পরাজিত করে এবং গণিমতের মাল লাভ করে।"

হাফিজ ইবনে হাজার (রঃ) আসকালানী ''ইসবাহ'' গ্রন্থে লিখেছেন, শৈশবকালে একজন শক্তিশালী লোকের সঙ্গে হযরত যোবায়েরের (রাঃ) শক্তি পরীক্ষা হয়ে গেল। তিনি এমন এক আঘাত লাগালেন যে, তার হাত ভেঙ্গে গেল। লোকজন হযরত ছুফিয়াহর (রাঃ) নিকট অভিযোগ করলে তিনি ক্ষমা চাওয়ার পরিবর্তে তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, ''তোমরা যোবায়েরকে কেমন পেয়েছ? সে বাহাদুরনাবুযদিল?''

মোট কথা, মা'র প্রশিক্ষণের প্রভাবে হযরত যোবায়ের (রাঃ) বড় হয়ে ব্যূহ ভেদকারী এক দুর্জয় শক্তির বাহাদুর হন। এমনিতেই প্রকৃতি হযরত যোবায়েরকে (রাঃ) সৌভাগ্য প্রদান করেছিলো। উপরন্তু মায়ের প্রশিক্ষণে তাঁর গুণাবলী আরও প্রোজ্জ্বল হয় এবং তাঁর অন্তরে ইসলাম এবং ইসলামের দায়ী বা আহবানকারীর প্রতি ভালোবাসা পূর্ণমাত্রায়ই ছিলো। রহমতে আলমের (সাঃ) সঙ্গে হযরত যোবায়েরের (রাঃ) এক আশ্চর্য ধরনের সম্পর্ক ছিল। নবুয়তের প্রথম যুগে একদিন গুজব ছড়িয়ে পড়লো যে রাসূলকে (সাঃ) মুশরিক শত্রুরা গ্রেফতার অথবা শহীদ করে ফেলেছে। এ কথা শুনতেই হযরত যোবায়ের (রাঃ) উদ্বিগ্ন অবস্থায় কোনদিকে না তাকিয়ে তলোয়ারসহ বিদ্যুৎ বেগে নবীর (সাঃ) আবাসস্থলে এলেন। সেখানে নবীকে (সাঃ) সুস্থ অবস্থায় পেয়ে প্রকৃতিস্থ হলেন এবং চেহারা খুশীতে ঝলমলিয়ে উঠলো। হুজুর (সাঃ) তাঁর নাঙ্গা তরবারীর প্রতি ইঙ্গিত করে বললেনঃ ''যোবায়ের এটা কি?''

যোবায়ের (রাঃ) আরজ করলেন, ''হে আল্লাহর রাসূল! আমার মাতা-পিতা আপনার ওপর কুরবান হোক। আমি শুনেছি যে, শত্রুরা হয় আপনাকে গ্রেফতার করেছে অথবা সম্ভবত আপনাকে শহীদ করে ফেলেছে।''

হুজুর (সাঃ) মুচকি হেসে বললেনঃ ''বাস্তবিকই যদি এ রকম হয়ে যেত তাহলে তুমি কি করতে?''

হযরত যোবায়ের (রাঃ) নির্দ্বিধায় বললেনঃ ''হে আল্লাহর রাসূল! খোদার কসম আমি মক্কাবাসীদের সঙ্গে লড়াই করে মরতাম।''

নবুয়তের পঞ্চম বছরে হযরত ছুফিয়াহকে (রাঃ) নিজের কলিজার টুকরার সঙ্গে অস্থায়ী বিচ্ছেদের দুঃখ সইতে হয়। ইসলাম গ্রহণের পর অন্যান্য মুসলমানের মত যোবায়েরও (রাঃ) কাফিরদের জুলুম-নির্যাতনের নিশানা বনে গিয়েছিলেন। বিশেষ করে চাচা নওফিল বিন খুয়ায়েলদ তাঁর ওপর চরম নির্যাতন চালাতো। সুতরাং

www.bjilibrary.com

রাসূলের (সাঃ) ইঙ্গিতে ইসলাম গ্রহণকারীদের একটি কাফেলা নবুয়তের পঞ্চম বছরের রজব মাসে হাবশার দিকে হিজরত করেন। এই কাফেলায় হযরত যোবায়েরও (রাঃ) অন্তর্ভূক্ত ছিলেন। তাঁর বিচ্ছিন্নতা মায়ের ওপর এক কঠিন বোঝা স্বরূপ ছিল। কিন্তু হুজুরের (সাঃ) ইঙ্গিত এবং পুত্রের নিরাপত্তার কথা চিন্তা করে তিনি অত্যন্ত ধৈর্য ও সাহসিকতার সঙ্গে প্রিয় পুত্রকে হাবশা রওয়ানা করে দিলেন। হকপন্থী এই মুহাজিরদের হাবশায় কেবলমাত্র তিনমাস অবস্থান হয়েছিল এমন সময় তাঁরা এক আনন্দের সংবাদ পেলেন। সংবাদটি হলো, মক্কার মুশরিকরা ইসলাম গ্রহণ করেছে অথবা (অন্য রাওয়ায়েত অনুযায়ী) রাসূলে আকরাম (সাঃ) ও কাফিরদের মধ্যে সন্ধি হয়ে গেছে। অতএব নবুয়তের পঞ্চম বছরের শওয়াল মাসে সকল (অথবা তাঁদের মধ্যে অধিকাংশ) মুহাজিরই মক্কা ফিরে এলেন। তাঁদের মধ্যে হযরত যোবায়েরও (রাঃ) ছিলেন। যখন তাঁরা মক্কার নিকটে পৌঁছলেন তখন জানতে পেলেন যে, খবরটি সম্পূর্ণ মিথ্যা : সুতরাং প্রত্যাবর্তনকারী সকলেই কোরেশের কোন না কোন সরদারের আশ্রয় নিয়ে মক্কা প্রবেশ করলেন। আল্লামা বালাজুরী (রঃ) বর্ণনা করেছেন, হযরত যোবায়ের (রাঃ) বিনুল আওয়াম যামায়াহ বিনুল আসওয়াদের আশ্রয় নিলেন। হযরত ছুফিয়াহ (রাঃ) নিজের কলিজার টুকরার সঙ্গে মিলিত হয়ে খুব খুশী হলেন এবং এভাবে সুস্থ ও নিরাপদে তাঁর ফিরে আসায় আল্লাহর দরবারে শুকরিয়ার সিজদা আদায় করলেন। কিছুদিন মক্কায় অবস্থানের পর হযরত যোবায়ের (রাঃ) পেশা হিসেবে ব্যবসাকে বেছে নিলেন এবং বাণিজ্যিক কাফেলার সঙ্গে সিরিয়া যাতায়াত করতে লাগলেন। সেই সময় হযরত ছুফিয়াহ (রাঃ) হযরত যোবায়েরের (রাঃ) বিয়ে হযরত আসমা (রাঃ) বিনতে আবুবকর সিদ্দিকের (রাঃ) সঙ্গে দিয়ে দিলেন। আর এমনিভাবে তিনি হযরত আবুবকর সিদ্দিকের (রাঃ) জামাই হয়ে গেলেন।

ঐতিহাসিকরা লিখেছেন, হযরত ছুফিয়াহ (রাঃ) পুত্র হযরত যোবায়েরসহ (রাঃ) মদীনা মুনাওয়ারা হিজরত করেন। বিভিন্ন রাওয়ায়েত থেকে জানা যায় যে, প্রিয় নবী (সাঃ) যে সময় মক্কাকে বিদায় জানিয়ে মদীনা রওয়ানা হলেন তখন হযরত যোবায়ের (রাঃ) বাণিজ্য ব্যাপদেশে সিরিয়া গমন করেছিলেন। যখন তিনি সিরিয়া থেকে মক্কা ফিরে আসছিলেন তখন পথিমধ্যে সারওয়ারে আলম (সাঃ) এবং হযরত আবুবকর সিদ্দিকের (রাঃ) সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। তাঁরা মক্কা থেকে হিজরত করে মদীনা তাশরীফ নিচ্ছিলেন। হযরত যোবায়ের (রাঃ) হুজুর (সাঃ) এবং হযরত আবুবকর সিদ্দিকের (রাঃ) (নিজের শ্বশুর) খিদমতে তোহফা হিসেবে কয়েকখানা সাদা কাপড় পেশ করেন এবং তাঁরা এই সাদা কাপড় পরিধান করেই মদীনা প্রবেশ করেন।

www.bjilibrary.com

সহিহ বুখারীতে হযরত উরওয়াহ বিন যোবায়ের (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছেঃ "রাসূলুল্লাহ (সাঃ) যোবায়েরের (রাঃ) সঙ্গে মিলিত হলেন। যোবায়ের (রাঃ) ছিলেন ব্যবসায়ী। তিনি মুসলমানদের এক কাফেলার সঙ্গে সিরিয়া থেকে ফিরছিলেন। যোবায়ের (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এবং আবুবকরকে (রাঃ) সাদা কাপড় পরিয়েছিলেন।" (বুখারী কিতাবুল মানাকিব, বাবে হিজরাতুন্নবী (সাঃ))।

মক্কা প্রত্যাবর্তনের কিছুদিন পরই হযরত যোবায়ের (রাঃ) মা হযরত ছুফিয়াহ (রাঃ) এবং স্ত্রী হযরত আসমা (রাঃ) বিনতে আবুবকর সিদ্দিকসহ (রাঃ) মদীনার দিকে হিজরত করেন এবং কিছুদিন কুবাতে অবস্থান করেন। সেইখানেই প্রথম হিজরীতে (অন্য এক রাওয়ায়েত অনুযায়ী দ্বিতীয় হিজরীতে) হযরত আসমার (রাঃ) গর্ভে হযরত আব্দুল্লাহ বিন যোবায়ের (রাঃ) জন্মগ্রহণ করেন। হযরত ছুফিয়াহর (রাঃ) এই নাতির জন্ম ইসলামের ইতিহাসে বিশেষ গুরুত্বের দাবীদার। কেননা তাঁর জন্মের পূর্বে কয়েক মাস যাবত মুহাজিরদের কোন সন্তান জন্মগ্রহণ করেনি। এদিকে মদীনার ইহুদীরা রটিয়ে দিয়েছিলো যে, তারা মুসলমানদের ওপর জাদু করেছে। ফলে তাঁদের বংশধারা বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। হযরত আবদুল্লাহর (রাঃ) জন্মে মুসলমানরা যারপরনাই খুশী হয়েছিলেন এবং তাঁরা আবেগে উদ্বেলিত হয়ে এত জোরে নারায়ে তাকবীর উচ্চারণ করেছিলেন যে, পাহাড় ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠেছিল। মদীনায় হযরত ছুফিয়াহ (রাঃ) হযরত যোবায়েরের (রাঃ) সঙ্গেই থাকতেন এবং তিনি তাঁকে অন্তর দিয়ে খিদমত করতেন।

ওহোদের প্রান্তরে (তৃতীয় হিজরী) একটি ভুলের কারণে যখন যুদ্ধের ফলাফল পাল্টে গেল এবং মুসলমানদের মধ্যে বিশৃংখলা দেখা দিল তখন হযরত ছুফিয়াহ (রাঃ) বর্শা হাতে মদীনা থেকে বের হলেন। যাঁরা যুদ্ধের ময়দান থেকে মুখ ফিরিয়ে মদীনার দিকে আসছিলেন তিনি তাঁদেরকে লজ্জা দিয়ে অত্যন্ত ক্রোধের সঙ্গে বলছিলেন, "রাসূলকে (সাঃ) ফেলে রেখে চলে এসেছ?"

রহমতে আলম (সাঃ) হযরত ছুফিয়াহকে (রাঃ) যুদ্ধের ময়দানের দিকে আসতে দেখে তাঁর অটল পুত্র হযরত যোবায়েরকে (রাঃ) কাছে ডেকে নিয়ে বললেনঃ "ছুফিয়াহ (রাঃ) যেন নিজের ভাই হামযার (রাঃ) লাশ দেখতে না পায়।"

হযরত হামযা (রাঃ) বীরত্বপূর্ণ লড়াই করে জোবায়ের বিন মাতয়ামের গোলাম ওয়াহশি বিন হারবের বর্শার আঘাতে শহীদ হয়ে গিয়েছিলেন। হিন্দ বিনতে উতবাহ নিজের পিতা উতবাহ'র (বদরের যুদ্ধে নিহত) প্রতিশোধের আবেগে তাঁর লাশ বিকৃত করে ফেলেছিল। অর্থাৎ নাক এবং কান কেটে ফেলেছিল। বরং তার

www.bjilibrary.com

থেকেও অগ্রসর হয়ে সাইয়েদুশ শুহাদার (রাঃ) পেট চিরে কলিজা বের করে চিবিয়ে ফেলেছিল। রাসূল আকরাম (সাঃ) চাননি যে, ছুফিয়াহ (রাঃ) প্রিয় ও বাহাদুর ভাইয়ের লাশ এই অবস্থায় দেখুন। হযরত যোবায়ের (রাঃ) মাকে হুজুরের (সাঃ) ইরশাদ সম্পর্কে অবহিত করলে তিনি তার কারণ বুঝে গেলেন এবং বললেন, "আমি জেনেছি, আমার ভাইয়ের লাশ বিকৃত করা হয়েছে। আল্লাহর কসম! আমি এটা পছন্দ করি না। কিন্তু ধৈর্য ধারণ করবো এবং ইনশাআল্লাহ ধৈর্যের সঙ্গেই কাজ করবো।"

হুজুর (সাঃ) হযরত ছুফিয়াহর (রাঃ) জবাব সম্পর্কে অবহিত হওয়ার পর তাঁকে হযরত হামযা'র (রাঃ) লাশ দেখার অনুমতি দিলেন। তিনি শোকাভিভূত অবস্থায় লাশের নিকট এলেন এবং প্রিয় ভাইয়ের শরীর ছিন্নভিন্ন অবস্থায় দেখে আহ শব্দ উচ্চারণ করলেন এবং ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন পড়ে চুপ হয়ে গেলেন। অতঃপর তাঁর জন্য মাগফিরাত কামনা করলেন এবং তাঁর দাফনের জন্য হুজুরের (সাঃ) খিদমতে দু'টি চাদর পেশ করে মদীনা ফিরে গেলেন।

হাফিজ ইবনে হাজার (রঃ) "ইছাবাহতে" লিখেছেন, হযরত ছুফিয়াহ (রাঃ) হযরত হামযার (রাঃ) শাহাদাতে একটি দরদপূর্ণ মরসিয়া বর্ণনা করেছিলেন।

এক রাওয়ায়েতে আছে যে, হযরত ছুফিয়াহ (রাঃ) প্রিয় ভাইয়ের জন্য মাগফিরাত কামনার পর অশ্রু সম্বরণ করতে না পেরে কেঁদে উঠলেন। তাঁকে কাঁদতে দেখে প্রিয় নবীর (সাঃ) চক্ষু দিয়েও পানি গড়িয়ে পড়লো। অতঃপর তিনি হযরত ছুফিয়াহকে (রাঃ) সবরের পরামর্শ দিয়ে বললেনঃ

"আমাকে জিবরীল আমিন (আঃ) খবর দিয়েছেন যে, আরশে মুয়াল্লার ওপর হামযাহ (রাঃ) বিন আব্দুল মুত্তালিবকে আসাদুল্লাহ এবং আসাদুর রাসূল (আল্লাহর বাঘ এবং রাসূলের বাঘ) লিখা হয়েছে।"

খন্দকের যুদ্ধে (পঞ্চম হিজরী) হযরত ছুফিয়াহর (রাঃ) নজিরবিহীন বাহাদুরী এবং ভীতিহীনতার কথা ওপরে আলোচনা হয়েছে। সে সময় তাঁর বয়স ছিল ৫৮ বছর।

নেতৃস্থানীয় চরিতকাররা লিখেছেন, হযরত ছুফিয়াহ (রাঃ) তীক্ষ্ণধী সম্পন্ন দূরদর্শী, বাহাদুর এবং ধৈর্যশীল মহিলা ছিলেন এবং সমগ্র আরবে নিজের বংশ, কথা ও কাজের দিক থেকে বিশিষ্ট মর্যাদার অধিকারিনী ছিলেন। আল্লাহ পাক তাঁকে কবিত্বের গুণও প্রদান করেছিলেন। কতিপয় চরিত গ্রন্থে তাঁর রচিত কিছু মরসিয়া

www.bjilibrary.com

পাওয়া যায়। পিতা আবদুল মুত্তালিবের মৃত্যুতে তিনি একটি সুন্দর মরসিয়া বর্ণনা করেছিলেন।

রহমতে আলম (সাঃ) হযরত ছুফিয়াহ'র (রাঃ) ভ্রাতুষ্পুত্র, খালাতো ভাই এবং স্বামীর ভগ্নিপতি ছিলেন। শৈশবকালে তিনি হুজুরের (সাঃ) সঙ্গে একই সাথে একই গৃহে লালিত পালিত হয়েছিলেন। এজন্য হুজুরের (সাঃ) প্রতি তাঁর অসাধারণ ভালোবাসা ছিল। প্রিয় নবীও (সাঃ) তাঁকে অত্যন্ত ভালোবাসতেন এবং তিনি তাঁর সন্তান হযরত যোবায়েরকে (রাঃ) বেশীর ভাগ সময় "ইবনে ছুফিয়াহ" বলে ডাকতেন। ১১ হিজরীতে হুজুরের (সাঃ) ওফাত হলে হযরত ছুফিয়াহ (রাঃ) ওপর শোকের পাহাড় ঢলে পড়ে। এ সময় তিনি এক দরদভরা মরসিয়া বলেছিলেন।

হযরত ছুফিয়াহ (রাঃ) ওমর ফারুকের (রাঃ) খিলাফতকালে ইন্তেকাল করেন। সে সময় তাঁর বয়স ছিল ৭৩ বছর। জান্নাতুল বাকীতে তাঁকে দাফন করা হয়।

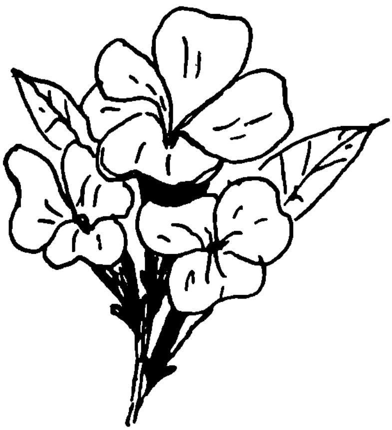

www.bjilibrary.com

হযরত সুমাইয়াহ (রাঃ) বিনতে খাবাত

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তখন নবুয়ত পাননি। মক্কার কোরেশরা তাঁকে "আমীন, আমীন" (আমানতদার, আমানতদার) বলে ডাকতে ডাকতে মুখ দিয়ে ফেনা তুলে ফেলতো। কিন্তু যেই রাসুলুল্লাহ (সাঃ) নবুয়ত পেলেন এবং হকের দাওয়াত প্রদান শুরু করলেন তখনি তারা হুজুরের (সাঃ) খুন পিপাসু হয়ে গেলো। শুধু তাই নয়, হক দাওয়াত বা সত্য দ্বীনের প্রতি যাঁরাই সাড়া দিতেন তাঁদের ওপর তারা অবলীলাক্রমে জুলুম ও নির্যাতন চালিয়ে যেত। তাতে পুরুষ বা মহিলার কোন তারতম্য ছিল না। সেই যুগে প্রিয় নবী (সাঃ) একদিন বনু মাখযুমের মহল্লা দিয়ে অতিক্রম করছিলেন। এমন সময় দেখতে পেলেন যে, কোরেশের কাফিররা একজন বার্ধক্য পীড়িত মহিলাকে লোহার যিরাহ পরিধান করিয়ে রৌদ্রে মাটিতে শুইয়ে পাশে দাঁড়িয়ে অট্টহাসিতে ফেটে পড়ে মহিলাটিকে সম্বোধন করে বলছে, "মুহাম্মাদের দ্বীন কবুল করার স্বাদ কি তা বুঝে নে।"

মজলুম মহিলাটির অসহায়ত্ব দেখে হুজুরের (সাঃ) গন্ড বেয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়লো এবং তিনি তাকে সম্বোধন করে বললেনঃ "ধৈর্য ধর। তোমার ঠিকানা জান্নাত।"

হক পথে নির্যাতন সহ্যকারী এই মহির নাম ছিল হযরত সুমাইয়াহ (রাঃ) বিনতে খাবাত। সাইয়েদুল মুরসালিন (সাঃ) তাঁকে ধৈয্য ধারণের নির্দেশ এবং জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছিলেন।

হযরত সুমাইয়াহ (রাঃ) বিনতে খাবাত অত্যন্ত মর্যাদাবান মহিলা সাহাবীদের অন্যতম হিসেবে পরিগণিত। তিনি হক পথে নিজের বার্ধক্য ও দুর্বলতা সত্ত্বেও বিষবৎ নির্যাতন সহ্য করেছিলেন। এমনকি নিজের জীবনও হক পথে কুরবানী করেছিলেন এবং ইসলামের সর্বপ্রথম শহীদ হওয়ার দুর্লভ মর্যাদার অধিকারিনী হয়েছিলেন।

হযরত সুমাইয়াহ'র (রাঃ) পিতৃপুরুষের মধ্য থেকে শুধুমাত্র তাঁর পিতা "খাবাতের" নাম জানা যায়। তাঁর দেশ এবং বংশ কোনটি ছিল এবং কখন ও কেমন করে মক্কা পৌছেছিলেন এইসব প্রশ্ন সম্পর্কে ইতিহাস গ্রন্থগুলো কোন জবাব দেয়নি। শুধু এতটুকু জানা যায় যে, জাহেলী যুগে তিনি মক্কার এক সরদার আবু হুজায়ফাহ

www.bjilibrary.com

বিনুল মুগিরা'র দাসী ছিলেন। এটা নবুয়ত প্রাপ্তির প্রায় ৪৫ বছর আগের কথা। সেই যুগে ইয়েমেনের কাহতানী বংশোদ্ভূত এক ব্যক্তি ইয়াসির বিন আমের নিখোঁজ ভাইয়ের সন্ধানে মক্কা এসে উপস্থিত হয় এবং এখানেই স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করে আবু হুজাইফাহ বিনুল মুগিরাহ'র মিত্র হয়ে যায়। আবু হুজাইফা হযরত সুমাইয়াহ'র (রাঃ) বিয়ে দেন ইয়াসির বিন আমেরের সঙ্গে। তাঁর ঔরসেই হযরত সুমাইয়াহর (রাঃ) দুই পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। তাঁদের নাম হলো আব্দুল্লাহ (রাঃ) এবং আম্মার (রাঃ)। এ সময় রাসূলে করিম (সাঃ) শৈশব ও যৌবনকাল অতিক্রম করছিলেন। ধারণা করা হয়ে থাকে যে, হুজুরের (সাঃ) এ সমগ্র যুগটা ইয়াসির, সুমাইয়াহ, আবদুল্লাহ এবং আম্মারের (রাঃ) সামনেই অতিক্রান্ত হয়। তাঁরা হুজুরের (সাঃ) মহান ব্যক্তিত্ব ও উন্নত নৈতিক চরিত্রে গভীরভাবে প্রভাবান্বিত হন। কেননা নবুয়ত প্রাপ্তির পর হুজুর (সাঃ) যখন দ্বীনে হকের দাওয়াত প্রদান শুরু করলেন তখন এই পরিবারের সকলেই দ্বিধাহীন চিত্তে তাতে সাড়া দিলেন। সে সময় আবু হোজায়ফা মাখজুমী মারা গিয়েছিল এবং হযরত সুমাইয়াহ (রাঃ) তার উত্তরাধিকারসূত্রের গোলামীতে ছিলেন। হকপন্থীদের জন্য সময়টা ছিল খুবই ভীতিপ্রদ এবং নাজুক। মক্কার যে ব্যক্তিই ইসলাম গ্রহণ করতেন তিনিই কোরেশ মুশরিকদের ক্রোধ ও লোমহর্ষক জুলুম–নির্যাতনের নিশানা হয়ে যেতেন। এ ব্যাপারে মুশরিকরা নিজেদের নিকটতম বন্ধু–বান্ধব এবং আত্মীয়দেরকেও রেহাই দিত না। হযরত ইয়াসির (রাঃ) এবং তদীয় পুত্রদ্বয় বিদেশী ছিলেন এবং হযরত সুমাইয়াহকে (রাঃ) বনু মখজুমের লোকেরা তখনো স্বাধীন করে দেয়নি। তাঁদের ওপর জুলুম–নির্যাতনের পাহাড় চাপিয়ে দেয়ার প্রশ্নে মুশরিকদেরকে বাধা প্রদানেরও কেউ ছিল না। তারা এই অসহায় পরিবারের ওপর এমন এমন নির্যাতন চালালো যে মানবতা মুখ থুবড়ে পড়ে গেল। হযরত ইয়াসির (রাঃ) এবং হযরত সুমাইয়াহ (রাঃ) উভয়েই ছিলেন বার্ধক্য প্রপীড়িত। কিন্তু তাঁদের ঈমানী শক্তি ও দৃঢ়তা ছিল পাহাড়ের মত। মুশরিকরা তাঁদেরকে বিভিন্নভাবে হৃদয়হীন নির্যাতন চালাতো এবং শিরকের ওপর ফিরে আসতে বাধ্য করতো। কিন্তু তাঁদের পা মুহূর্তের জন্যও হক পথ থেকে বিচ্যুত হয়নি। এই অবস্থা তাঁদের পুত্রদেরও ছিল। লোহার যিরাহ বা বর্ম পরিয়ে মক্কার উত্তপ্ত প্রোজ্জ্বলিত বালির ওপর শুইয়ে দেয়া, তাঁদের পিঠে আগুন দিয়ে দাগ দেয়া এবং পানিতে ডুবিয়ে দেয়া কাফিররে নিত্যদিনকার মশকরা ছিল।

একবার প্রিয় নবী (সাঃ) সেই স্থান দিয়ে যাচ্ছিলেন যেখানে এই মজলুমদের ওপর নির্যাতন চালানো হচ্ছিল। এতে তিনি খুবই ব্যথিত হলেন এবং বললেন, "হে ইয়াসিরের সন্তানেরা। ধৈর্য ধারণ কর। তোমাদের জন্য বেহেশতের প্রতিশ্রুতি রয়েছে।"

অন্য এক রাওয়াতে আছে, হুজুর (সাঃ) একবার হযরত ইয়াসির (রাঃ), হযরত সুমাইয়াহ (রাঃ) এবং তদীয় সন্তানদেরকে নির্যাতীত হতে দেখে বললেন, "ধৈর্য ধারণ কর। ইলাহী আমার! ইয়াসির (রাঃ) পরিবারকে ক্ষমা করে দাও এবং তুমি তাদের ক্ষমা করে দিয়েছই।" বৃদ্ধ ইয়াসির (রাঃ) এই নির্যাতন সইতে সইতে একদিন পরপারে যাত্রা করলেন। কিন্তু এ সত্ত্বেও এই পরিবারের ওপর মুশরিকদের কোন দয়া হলো না। তারা হযরত সুমাইয়াহ (রাঃ) এবং তাঁর সন্তানদের ওপর নির্যাতন অব্যাহত রাখলো।

একদিন হযরত সুমাইয়াহ (রাঃ) দিনভর নির্যাতন সহ্য করে সন্ধ্যায় বাড়ী ফিরে এলে আবু জেহেল গালি দেয়া শুরু করলো এবং ক্রোধে উত্তেজিত হয়ে সুমাইয়াহর (রাঃ) প্রতি বর্শা নিক্ষেপ করলো। তিনি তৎক্ষণাৎ মাটির ওপর ঢলে পড়লেন এবং নিজের জীবন আল্লাহর নিকট সপে দিলেন। এক রাওয়ায়েতে আছে, আবু জেহেল তীর মেরে হযরত সুমাইয়াহর (রাঃ) পুত্র আব্দুল্লাহকেও (রাঃ) শহীদ করে ফেলে। এখন শুধু আম্মার (রাঃ) জীবিত ছিলেন। তিনি মায়ের অসহায় মৃত্যুতে খুব দুঃখিত হলেন। ক্রন্দন করতে করতে প্রিয় নবীর (সাঃ) খিদমতে হাজির হলেন এবং এই ঘটনা বর্ণনা করে আরজ করলেনঃ "ইয়া রাসূলাল্লাহ! জুলুমতো এখন শেষ পর্যায়ে পৌছে গেছে।" হুজুর (সাঃ) তাঁকে ধৈর্য ধারণের নির্দেশ দিয়ে বললেনঃ "হে আল্লাহ! ইয়াসির পরিবারকে দোজখ থেকে রেহাই দাও।"

হযরত আম্মার (রাঃ) তো পুত্র ছিলেন। এজন্য মজলুম অবস্থায় মায়ের মৃত্যুর কথা কখনই ভুলতে পারেননি। প্রিয় নবীও (সাঃ) আবু জেহেলের পাষাণ হৃদয় এবং হযরত সুমাইয়াহর (রাঃ) অসহায় মৃত্যুর কথা স্মরণ রেখেছিলেন। বস্তুত বদরের যুদ্ধে (দ্বিতীয় হিজরীর রমযানে) আবু জেহেলের নরকপ্রাপ্তি ঘটলে হুজুর (সাঃ) হযরত আম্মার (রাঃ) বিন ইয়াসিরকে (রাঃ) ডেকে বললেনঃ "কাদ কাতালাল্লাহু কাতিলা উম্মিকা" অর্থাৎ আল্লাহ তোমার মায়ের হত্যাকারীর প্রতিশোধ নিয়েছেন।

হযরত সুমাইয়াহর (রাঃ) শাহাদাত নবীর (সাঃ) হিজরতের কয়েক বছর আগে সংঘটিত হয়েছিল। এজন্য সকল ঐতিহাসিক এবং চরিতকার তাঁকে ইসলামের প্রথম শহীদ হিসেবে আখ্যায়িত করে থাকেন।

www.bjilibrary.com

হযরত উম্মে রুমান (রাঃ)

নবম হিজরীর কথা। প্রিয় নবী (সাঃ) একজন মহিলার মৃত্যুর খবর পেলেন। মহিলাটিও ছিলেন এমন মহিলা যিনি রাসূলের (সাঃ) জন্য জীবন বিলিয়ে দিতে সদা প্রস্তুত ছিলেন। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এই খবর পেয়ে দুঃখ ভারাক্রান্ত হৃদয়ে তাঁর জানাযায় উপস্থিত হলেন। স্বয়ং তাঁর লাশ কবরে নামালেন এবং ইরশাদ করলেন," মহিলাদের মধ্যে যে ব্যক্তি হূরে আইন দেখতে চায় সে উম্মে রুমানকে দেখতে পারে।"

তিনি ছিলেন উম্মে রুমান। সাইয়েদুল মুরসালিন ফখরে মওজুদাত (সাঃ) তাঁকে বেহেশতের হুর আখ্যায়িত করেছিলেন। তিনি হলেন, সাইয়েদেনা সিদ্দিকে আকবরের (রাঃ) জীবন সঙ্গিনী, হুজুরের (সাঃ) শাশুড়ী এবং উম্মুল মুমিনিন হযরত আয়েশা ছিদ্দিকাহর (রাঃ) মাতা।

হযরত উম্মে রুমান (রাঃ) অন্যতম জালিলুল কদর সাহাবী হিসেবে পরিগণিত। কিনানাহ ফিরাস গোত্রের সঙ্গে তিনি সম্পর্কযুক্ত ছিলেন। কোন ঐতিহাসিকই তাঁর প্রকৃত নাম লিখেননি। এজন্য কুনিয়ত "উম্মে রুমান"- এই প্রসিদ্ধি লাভ করেন। তাঁর নসবনামা নিম্নরূপ ঃ

উম্মে রুমান (রাঃ) বিনতে আমের বিন উয়াইমের বিন আবদি শামস বিন ইতাব বিন আজিনাহ বিন সাবি' বিন দাহমান বিন হারিস বিন গানাম বিন মালিক বিনকিনানাহ।

জাহেলী যুগে হযরত উম্মে রুমানের প্রথম বিয়ে হয়েছিল আবদুল্লাহ বিন হারিস বিন সানজারা'র সঙ্গে এবং তাঁর সঙ্গেই মক্কা এসে স্থায়ী বাসিন্দা হয়ে যান। আব্দুল্লাহর ঔরসে তাঁর একটি পুত্র জন্মগ্রহণ করে। তার নাম রাখা হয় তোফায়েল। কিছুদিন পর আব্দুল্লাহ বিন হারিস মরা যায় এবং উম্মে রুমান অসহায় হয়ে পড়েন। বস্তুত আব্দুল্লাহ জীবিতকালে হযরত আবুবকর সিদ্দিকের (রাঃ) মিত্র হয়ে গিয়েছিলো। এজন্য তাঁর ইন্তেকালের কয়েক মাস পর হযরত আববকর সিদ্দিক (রাঃ) উম্মে রুমানকে (রাঃ) স্বয়ং বিয়ে করেন। সিদ্দিকে আকবরের (রাঃ) ঔরসে উম্মে রুমানের (রাঃ) গর্ভে হযরত আয়েশা সিদ্দিকাহ (রাঃ) এবং হযরত আব্দুর রহমান

www.bjilibrary.com

(রাঃ) বিন আবুবকর (রাঃ) জন্মগ্রহণ করেন। ইসলামের ইতিহাসে তাঁরা উজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব হিসেবে পরিচিত।

নবুয়ত প্রাপ্তির পর প্রিয় নবী (সাঃ) হকের দাওয়াত প্রদান শুরু করলে চারজন মহান ব্যক্তিত্বের মধ্যে হযরত আবুবকর সিদ্দিক (রাঃ) (অর্থাৎ উম্মুল মুমিনিন হযরত খাদিজাতুল কুবরা, হযরত আলী কাররামাল্লাহু ওয়াজহাহু, হযরত অবুবকর সিদ্দিক এবং হযরত যায়েদ বিন হারিছা) অন্যতম হিসেবে সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণ করেন। হযরত উম্মে রুমান (রাঃ) হযরত আবুবকরের (রাঃ) ইসলাম গ্রহণের কথা জেনেই নিশ্চিন্তায় তাঁকে অনুস্মরণ করলেন এবং এভাবেই সাবিকুনাল আউয়ালুনের পবিত্র দলের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেলেন।

হিজরতের সফরে সিদ্দিকে আকবার (রাঃ) রহমতে আলমের (সাঃ) সঙ্গীত্বের সুমহান সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন। মক্কা থেকে রওয়ানা হওয়ার সময় তিনিও হুজুরের (সাঃ) পদাংক অনুসরণ করে নিজের পরিবার–পরিজনকে আল্লাহর ওপর সপে দিয়ে শত্রুদের মাঝে পরিত্যাগ করে এসেছিলেন। মদীনা পৌছে যখন কিছুটা স্বস্তি এলো তখন হুজুর (সাঃ) হযরত যায়েদ (রাঃ) বিন হারিছা এবং হযরত রাফে'কে পরিবার–পরিজন আনার জন্য মক্কা প্রেরণ করলেন। হযরত আবুবকর সিদ্দিক (রাঃ) তাঁদের সঙ্গে আব্দুল্লাহ বিন উরাইকিতকে পুত্র আব্দুল্লাহর নামে একটি পত্র দিয়ে প্রেরণ করলেন। তিনি তাঁকে উম্মে রুমান (রাঃ), আসমা (রাঃ) এবং আয়েশাকে (রাঃ) সঙ্গে নিয়ে মদীনা চলে আসতে বললেন। সুতরাং হযরত উম্মে রুমান, হযরত আসমা (রাঃ) এবং হযরত আয়েশা সিদ্দিকাহ (রাঃ) হযরত আব্দুল্লাহ বিন আবুবকরের (রাঃ) সঙ্গে মক্কা মুয়াজ্জামা থেকে রওয়ানা হলেন। হযরত আয়েশা সিদ্দিকাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, হিজরতের সফরে যখন আমরা বাইদা নামক স্থানে পৌছলাম তখন আমার উট হাত থেকে ছুটে গেল। আমি এবং আমার আম্মা উম্মে রুমান (রাঃ) উটের হাওদাতে বসেছিলাম। উট নর্তন–কুর্দন শুরু করে দিল। এতে আমার আম্মা খুব ঘাবড়ে গেলেন এবং তিনি বলতে লাগলেন, "হায়! আমার কন্যা, আমার দুলহিন।" আল্লাহ সব ঠিক করে দিলেন। উট ধরা হলো। আমরা সকলেই সহিহ সালামতে মদীনা মুনাওয়ারা পৌছে গেলাম।

মদীনা মুনাওয়ারাতে হযরত আবুবকর সিদ্দিকের পরিবার–পরিজন বনু হারিস বিন খাজরাজের মহল্লায় অবস্থান করতে লাগলেন। হযরত আবুবকর সিদ্দিক (রাঃ) আগেই এখানে একটি বাড়ী নিয়ে রেখেছিলেন।

www.bjilibrary.com

৬ষ্ঠ হিজরীতে ইফকের দুঃখজনক ঘটনা সংঘটিত হলো। এই ঘটনায় মদীনার মুনাফিকদের ষড়যন্ত্রে হযরত আয়েশা সিদ্দিকাহর (রাঃ) ওপর অপবিত্র তোহমত আরোপ করা হয়। পরিস্থিতি এমন নাজুক হয়ে দাঁড়ায় যে, রাসূলের (সাঃ) পবিত্র চেহারা মলিন হয়ে গিয়েছিল। রাসুলের (সাঃ) চেহারা মলিন হয়ে যাওয়া হযরত আয়েশার (রাঃ) নিকট কিয়ামত থেকে কম ছিল না। দুঃখী কন্যাদের আশ্রয় স্থলতো মায়ের আঁচলই হয়ে থাকে। হুজুরের (সাঃ) নিকট থেকে অনুমতি নিয়ে মরি কি পড়ি অবস্থায় তিনি মাতা-পিতার বাড়ী পৌছলেন। এটা ছিল দ্বিতল বাড়ী। এ সময় হযরত আবুবকর সিদ্দিক (রাঃ) ওপরে বসেছিলেন এবং হযরত উম্মে রুমান (রাঃ) নীচ তলায় ছিলেন। মেয়েকে এই অবস্থায় আসতে দেখে জিজ্ঞেস করলেন, "মেয়ে আমার। ভালোতো? কিভাবে এলে?" হযরত আয়েশা (রাঃ) ঘটনা বর্ণনা করলেন। হযরত উম্মে রুমান ছিলেন মা। তিনি খুব দুঃখ পেলেন। কিন্তু হযরত আয়েশার (রাঃ) মন রাখার জন্য বললেন,"বেটি। ঘাবড়িয়োনা। যে মহিলা স্বামীকে অতিরিক্ত ভালোবাসে তাকে স্বামীর নিকট খাটো করার জন্য এ ধরনের কথা বানানো হয়ে থাকে।"

হযরত আয়েশার (রাঃ) অন্তরে পাথর চেপে বসেছিলো। মা'র কথায় তিনি শান্তি পেলেন না। দুঃখে তিনি চীৎকার দিয়ে উঠলেন।

কন্যার চীৎকার শুনে হযরত আবুবকর সিদ্দিক (রাঃ) দ্বিতল থেকে নীচে নেমে এলেন। ঘটনা শুনলেন। তাঁর মন ছিল খুব নরম। নিজেও কাঁদতে লাগলেন। কিছুটা প্রকৃতিস্থ হলে হযরত আয়েশাকে (রাঃ) বললেন, বেটি, তোমার ঘরে যাও। আমি এক্ষুণি আসছি।

যখন তিনি চলে গেলেন তখন সিদ্দিকে আকবর (রাঃ) উম্মে রুমানকে (রাঃ) সঙ্গে নিয়ে হযরত আয়েশা সিদ্দিকাহ'র (রাঃ) নিকট পৌছলেন। উম্মুল মুমিনিন (রাঃ) দুঃখ ও বেদনায় জ্বরে আক্রান্ত হয়ে পড়েছিলেন। হযরত উম্মে রুমান (রাঃ) তাঁকে কোলে তুলে নিলেন। আছরের নামাযের পর বিশ্ব নবী (সাঃ) তাশরীফ আনলেন এবং সেই অপবাদ সম্পর্কে হযরত আয়েশার (রাঃ) নিকট ব্যাখ্যা চাইলেন। হযরত আয়েশা (রাঃ) মাতা-পিতার দিকে দেখলেন এবং বললেন, আপনারা জবাব দিন। কিন্তু তাঁরা উভয়েই প্রিয় নবীর (সাঃ) সত্যিকারের অনুরক্ত ছিলেন। তাঁকে মলিন অবস্থায় দেখে মেয়ের সমর্থন কি করে করতে পারেন। তাঁরা বললেন, "আমরা কি বলতে পারি!"

www.bjilibrary.com

হযরত আয়েশা সিদ্দিকাহ (রাঃ) আরজ করলেনঃ "হে আল্লাহর রাসুল! আমি সম্পূর্ণ নিষ্পাপ।"

অবশেষে আল্লাহর মর্যাদাবোধ উথলে উঠলো। তিনি স্বয়ং আয়েশা সিদ্দিকাহ'র (রাঃ) পবিত্রতার সাক্ষ্য অত্যন্ত শক্তিশালী ভাষাতেই দিলেন। ইরশাদ হলোঃ

"যখন তুমি এ কথা শুনলে তখন মুমিন পুরুষ ও মুমিন মহিলাদের সম্পর্কে কেন ভালো ধারণা পোষণ করনি এবং কেন বলনি যে, এটা সরাসরি অপবাদ বা তোহমত।" (সুরায়ে নুর)

পবিত্রতার আয়াত নাযিল হওয়ায় হযরত উম্মে রুমান (রাঃ) খুব খুশী হলেন এবং হযরত আয়েশা সিদ্দিকাহ'র (রাঃ) মাথাও গর্বে উঁচু হয়ে গেল। মা কন্যাকে বললেন, "বেটি! ওঠো এবং স্বামীর (সাঃ) পদচুম্বন কর।"

হযরত আয়েশা সিদ্দিকাহ (রাঃ) গর্বে জবাব দিলেন, "আমিতো শুধুমাত্র আমার রবের প্রতি কৃতজ্ঞ। তিনিইতো আমার নিষ্কলুষ হওয়ার সাক্ষ্য দিয়েছেন।"

এই বছরেই শেষের দিকে আরেকটি স্মরণীয় ঘটনা ঘটলো। হযরত আবুবকর সিদ্দিক (রাঃ) আসহাবে সুফফার তিন বুজর্গ ব্যক্তিকে মেহমান হিসেবে নিজের গৃহে আনলেন। তাঁদেরকে রেখে তিনি প্রিয় নবীর (সাঃ) খিদমতে চলে গেলেন। সেখানে বেশ খানিক দেরী হয়ে গেল। বাড়ী ফিরে এলে হযরত উম্মে রুমান (রাঃ) জিজ্ঞেস করলেনঃ "মেহমানদেরকে রেখে আপনি কোথায় গিয়েছিলেন?"

হযরত আবুবকর (রাঃ) জবাব দিলেন, "আমি রাসূলে আকরামের (সাঃ) খিদমতে ছিলাম। তুমি মেহমানদের খাবার খাইয়ে দিতে!"

হযরত উম্মে রুমান আরজ করলেনঃ" আমি তাদের খাবার পাঠিয়েছিলাম। কিন্তু তাঁরা মেযবানের অনুপস্থিতিতে খেতে পছন্দ করেননি।"

এরপর হযরত আবুবকর সিদ্দিক (রাঃ) স্বয়ং খাবার নিয়ে গেলেন এবং তিন বুজর্গকে খাওয়ালেন। এই খাদ্যে এত বরকত হলো যে, মেহমান ও বাড়ীর লোকজন পেট পুরে খেয়েও অনেক বেঁচে গেল। হযরত আবুবকর (রাঃ) উম্মে রুমানকে জিজ্ঞেস করলেন," কত খানা বেঁচেছে!" তিনি বললেন, তিন গুণের বেশী।"

সিদ্দিকে আকবর (রাঃ) এই সকল খাবার উঠিয়ে প্রিয় নবীর (সাঃ) খিদমতে পাঠিয়ে দিলেন।

www.bjilibrary.com

হযরত উম্মে রুমানের (রাঃ) ওফাতের সাল সম্পর্কে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। কেউ ৪ হিজরী, কেউ ৫ হিজরী এবং কেউ ৬ ও ৯ হিজরীও বর্ণনা করেছেন। হাফিজ ইবনে হাজার আসকালানী (রঃ) "ইছাবাহতে" শক্তিশালী দলিল দিয়ে প্রমাণ করেছেন যে, হযরত উম্মে রুমানের (রাঃ) ওফাত ৯ হিজরীর আগে হয়নি। সুতরাং বেশীর ভাগ ঐতিহাসিকই এই মতকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন।

রাসূলে করিম (সাঃ) হযরত উম্মে রুমানকে (রাঃ) অত্যন্ত সম্মান করতেন। বস্তুত তাঁর দাফনের জন্য হুজুর (সাঃ) স্বয়ং কবরে নামেন এবং তাঁর জন্য মাগফিরাত কামনা করেন।

আল্লামা ইবনে সায়াদ (রঃ) হযরত উম্মে রুমান (রাঃ) সম্পর্কে লিখেছেনঃ "উম্মে রুমান অত্যন্ত নেক্কার মহিলা ছিলেন।"

www.bjilibrary.com

হযরত আসমা (রাঃ) বিনতে আবুবকর সিদ্দিক (রাঃ)

ঐতিহাসিক রাত। হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা (সাঃ) হযরত আবু বকরের (রাঃ) সঙ্গে মক্কা মুয়াজ্জমা থেকে হিজরত করে ছাওর গিরিগুহায় অবস্থান করছেন। মুশরিক নাফরমানরা সারা রাত রাসূলের (সাঃ) বাসগৃহ ঘিরে রেখেছে। তারা অপেক্ষমান। কখন হুজুর (সাঃ) বাইরে তাশরীফ আনবেন। আর তারা তাদের অপবিত্র পরিকল্পনা পূর্ণ করবে। কিন্তু সেই হতভাগারা জানতোনা যে, আল্লাহ পাক রাতে তাদের চোখের ওপর পট্টি লাগিয়ে দিয়েছেন এবং বিশ্বনবী (সাঃ) সূরায়ে ইয়াসিনের প্রারম্ভিক আয়াত পড়তে পড়তে তাদের মধ্য দিয়েই বের হয়ে মক্কা মুয়াজ্জমাকে বিদায় জানিয়ে চলে গেছেন। ভোরের গগন পরিষ্কার হলো। মুশরিক কাফিররা মাথায় হাত দিয়ে দেখলো যে, রাসূলের (সাঃ) পবিত্র বিছানায় হযরত আলী (রাঃ) আরাম করছেন। তারা সব কিছুই বুঝতে পারলো। কিন্তু তখন করার আর কিছুই ছিল না। পরিকল্পনায় ব্যর্থ হয়ে তাদের নেতা আবু জেহেল ক্রোধ ও রাগে পাগল হয়ে গেল। সে সোজা হযরত আবুবকর সিদ্দিকের (রাঃ) বাড়ী গিয়ে জোরে জোরে দরজা খটখটাতে লাগলো। ভেতর থেকে একজন যুবতী মহিলা বাইরে এলেন।

আবু জেহেল তিক্তস্বরে জিজ্ঞেস করলো, " তোমার বাপ কোথায়?"

মহিলা বললেন, " আমি কি বলতে পারি।"

একথা শুনে আবু জেহেল মহিলার মুখের ওপর এত জোরে থাপ্পড় মারলো যে, তাঁর কানের দুল ছিঁড়ে গিয়ে দূরে পড়লো। মজলুম মহিলাটি অত্যন্ত ধৈর্য ও নীরবে গৃহাভ্যন্তরে চলে গেলেন এবং আবু জেহেল শাপ-শাপান্ত করতে করতে সেখান থেকে চলে গেল।

এই মহিলা কোরেশের ফিরাউন আবু জেহেলের ক্রোধ ও গোস্বাকে কোন পাত্তাই দিলেন না এবং হিজরতের ভীতিপূর্ণ গোপনীয়তাকে অন্তরে সংরক্ষিত রাখলেন। এই মহিলা ছিলেন সাইয়েদুল মুরসালিনের (সাঃ) গিরি গহবরের বন্ধু সিদ্দিকে আকবরের (রাঃ) বড় কন্যা হযরত আসমা (রাঃ)।

www.bjilibrary.com

হযরত আসমা (রাঃ) বিনতে আবুবকর সিদ্দিক (রাঃ) (বিন আবু কাহাফাহ ওসমান বিন আমের বিন আমর বিন কা'ব বিন সা'দ বিন তাইম বিন মাররাহ বিন কা'ব বিন লুব্বীল কারাশী) একজন অত্যন্ত মর্যাদাসম্পন্ন মহিলা সাহাবী হিসেবে পরিগণিত। মাতার নাম ছিল কাতিলাহ বিনতে আব্দুল উজ্জা। নানা আব্দুল উজ্জা কোরেশের নামকরা সরদার ছিলেন। উম্মুল মুমিনিন হযরত আয়েশা সিদ্দিকাহ (রাঃ) হযরত আসমার (রাঃ) সতালো বোন ছিলেন এবং বয়সে ছিলেন ছোট। হযরত আব্দুল্লাহ (রাঃ) বিন আবিবকর (রাঃ) হযরত আসমার (রাঃ) সহোদর ছিলেন।

হিজরতের ২৭ বছর পূর্বে হযরত আসমা (রাঃ) মক্কা মুয়াজ্জামাতে জন্মগ্রহণ করেন। সম্ভ্রান্ত পিতা হযরত আবুবকর সিদ্দিক (রাঃ) প্রথম দিন থেকেই অত্যন্ত উন্নত চরিত্র এবং পবিত্র স্বভাবের মানুষ ছিলেন। এই ধরনের পবিত্র ও ফেরেশতাতুল্য স্বভাবের পিতার ছায়াতলে তাঁর শিক্ষা-দীক্ষা কেমন হয়েছিল তা বলাইবাহুল্য।

ইসলাম গ্রহণের ব্যাপারে হযরত আসমার (রাঃ) বিশেষ বৈশিষ্ট্য রয়েছে। তিনি রাসূলের (সাঃ) নবুয়ত প্রাপ্তির প্রথমদিকে ইসলাম গ্রহণ করার সৌভাগ্য লাভ করেন। এ সময় কেবলমাত্র ১৭ জন পবিত্র আত্মার মানুষ ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। এইভাবে আস-সাবিকুনাল আউয়ালুনের কাতারে তিনি ছিলেন ১৮তম ব্যক্তিত্ব।

হযরত আসমার (রাঃ) বিয়ে হয়েছিল হাওয়ারীয়ে রাসূল (সাঃ) হযরত যোবায়ের (রাঃ) বিনুল আওয়ামের সঙ্গে। তিনি ছিলেন আসহাবে আশারায়ে মুবাশশিরার অন্যতম। তিনি প্রিয় নবীর (সাঃ) ফুফাতো ভাই এবং উম্মুল মুমিনিন হযরত খাদিজাতুল কুবরার (রাঃ) আপন ভাতিজা।

নবুয়ত প্রাপ্তির চতুর্থ বছরের প্রথমদিকে রহমতে আলম (সাঃ) প্রকাশ্যভাবে হকের তাবলীগ শুরু করলেন। এ সময় কোরেশ মুশরিকদের ক্রোধের পাহাড় পূর্ণ শক্তিতে ভেঙ্গে পড়লো এবং তারা হকপন্থীদের ওপর এমন হৃদয়বিদারক নির্যাতন শুরু করলো যে, মানবতা মুখ থুবড়ে পড়ে রইলো। হযরত আসমা (রাঃ) এই ধরনের কয়েকটি নির্যাতন স্বচক্ষে দেখেছিলেন। মুসনাদে আবু ইয়া'লায় বর্ণিত আছে যে, একবার হযরত আসমাকে (রাঃ) জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) কাফেরদের হাতে যে নির্যাতন সয়েছিলেন তারমধ্যে কোনটি সবচেয়ে কঠিন ছিল? হযরত আসমা (রাঃ) বর্ণনা করেনঃ "একদিন বেশ কিছু সংখ্যাক মুশরিক মসজিদে হারামে বসে রাসূলের (সাঃ) বিরুদ্ধে মনের ঝাল মিটাচ্ছিলো এবং বলছিলো যে, মুহাম্মাদ (সাঃ) আমাদের মাবুদদেরকে এই এই বলছে। ইতিমধ্যে রাসূলুল্লাহ (সাঃ)

www.bjilibrary.com

সেখানে তাশরিফ আনলেন। মুশরিকরা সকলেই হুজুরের (সাঃ) ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। হযরত আবুবকর (রাঃ) তাদের শোরগোল শুনতে পেলেন। সে সময় তিনি আমাদের নিকট বসেছিলেন। কেউ এসে বললো, কোরেশরা মুহাম্মাদকে (সাঃ) হত্যার জন্য এগুচ্ছে। হযরত আবুবকর (রাঃ) মসজিদে হারামের দিকে দৌড়ে গেলেন। সে সময় তাঁর মাথায় চারটি চুলের গুচ্ছ ছিল এবং তিনি কাফেরদের সম্বোধন করে বলছিলেন, তোমাদের সর্বনাশ হোক। তোমরা সেই ব্যক্তিকে হত্যা করতে চাচ্ছ, যিনি এই কথা বলেন যে, তাঁর রব হলেন আল্লাহ এবং তিনি নিজের রবের নিকট থেকে স্পষ্ট দলিল নিয়ে এসেছেন। মুশরিকরা রাসূলকে (সাঃ) তো ছেড়ে দিল এবং হযরত আবুবকরের (রাঃ) ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে এমনভাবে কিল, ঘুষি মারলো যে তিনি বেহুঁশ হয়ে গেলেন। তাঁকে উঠিয়ে যখন ঘরে আনা হলো তখন তিনি আহত অবস্থায় কাতরিয়ে কাতরিয়ে বলছিলেন, তাবারাকতা ইয়া জাল জালালি ওয়াল ইকরাম।"

প্রিয় নবী (সাঃ), শ্রদ্ধেয় পিতা এবং অন্যান্য হকপন্থীদের ওপর জুলুম-নির্যাতনের পাহাড় আপতিত হতে দেখে হযরত আসমার (রাঃ) মানসিক অবস্থা কেমন দাঁড়াতো তা আন্দাজ করা কঠিন নয়। এসত্ত্বেও তিনি অত্যন্ত ধৈর্য ও অবিচলতার সঙ্গে এই মানসিক কষ্ট সইতে থাকেন। ইত্যবসরে আল্লাহ পাক প্রিয় নবীকে (সাঃ) মদীনায় হিজরতের অনুমতি প্রদান করেন।

হিজরতের সফরে হযরত আসমার (রাঃ) সম্মানিত পিতা "সর্বশ্রেষ্ঠ মানবের বন্ধুর" উপাধিতে ভূষিত হয়েছিলেন। হিজরতের রাতে হুজুর (সাঃ) নিজের পবিত্র বিছানায় আপন চাচার পুত্র হযরত আলী মুরতাজাকে (রাঃ) শুইয়ে দিয়ে স্বয়ং সুরায়ে ইয়াসিনের প্রাথমিক আয়াতগুলো পড়তে পড়তে দুশমনদের মধ্য দিয়ে অতিক্রমে করে হযরত আবুবকর সিদ্দিকের (রাঃ) গৃহে পৌছলেন। মুশরিকদেরকে আল্লাহ পাক এমনভাবে গাফেল করে দিয়েছিলেন যে, তারা বুঝতেই পারেনি হুজুর (সাঃ) কখন নিজের পবিত্র গৃহ ত্যাগ করে বাইরে বেরিয়ে গেছেন। হযরত আবুবকর সিদ্দিক (রাঃ) হযরত আসমা (রাঃ) এবং হযরত আয়েশা সিদ্দিকাহর (রাঃ) সঙ্গে মিলে তৎক্ষণাৎ সফরের সামান ঠিক করলেন। হযরত আসমা (রাঃ) দু'তিন দিনের খাবার তৈরী করে রেখেছিলেন। এই খাবার এক থলেতে রাখলেন এবং একটি মশকে পানি ভরলেন। ঘটনাক্রমে থলে এবং মশকের মুখ বাঁধার মত কোন রশি গৃহে ছিল না। অন্যদিকে প্রতিটি মুহূর্ত ছিল মূল্যবান। হযরত আসমা (রাঃ) কালবিলম্ব না করে নিজের কোমরবন্দ খুলে তা দু'ভাগ করলেন। এক অংশ দিয়ে খাবার পাত্রের মুখ বাঁধলেন

www.bjilibrary.com

এবং অন্য অংশ দিয়ে মশকের। রহমতে আলম (সাঃ) হযরত আসমার (রাঃ) এই খিদমতে খুব খুশী হলেন এবং তাঁকে "জাতুন নিতাকাইন" উপাধি দান করলেন।

অন্য কয়েকটি রাওয়ায়েতে এই ঘটনাকে অন্যভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে, হিজরতের রাতে হুজুর (সাঃ) হযরত আবুবকর সিদ্দিক (রাঃ) সমভিব্যাহারে মক্কা থেকে বের হয়ে ছুর গুহায় অবস্থান নিলেন। হযরত আসমা (রাঃ) এই গোপন খবর জানতেন। তিনি প্রতি রাতে নিজের ভাই হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) বিন আবিবকরের (রাঃ) সঙ্গে চুপিসারে সেখানে উপস্থিত হতেন এবং প্রিয় নবী (সাঃ) ও পিতাকে টাটকা খাবার খাইয়ে ফিরে আসতেন। তৃতীয় রাতের শেষ অংশে আব্দুল্লাহ বিন উরাইকিত নির্দেশ অনুসারে দু'টো উটনীসহ ছুর গুহায় পৌছলো। পথ প্রদর্শনের জন্য তাকে নিয়োগ করা হয়েছিল (আব্দুল্লাহ বিন উরাইকিত–এর সম্পর্ক বনিদ দুঈল–এর সঙ্গে ছিল। যদিও সে অমুসলিম ছিল, তবুও খুবই বিশ্বস্ত ছিল। কারোর সঙ্গে কোন বিষয়ে চুক্তি হলে তা জীবন দিয়ে বাস্তবায়িত করতো। আরবের বিভিন্ন রাস্তা সম্পর্কে তার জ্ঞান ছিল প্রচুর। এজন্য হযরত আবুবকর সিদ্দিক (রাঃ) তাকে অর্থের বিনিময়ে নিয়োগ করেছিলেন। তার নিকট দু'টি উটনী এই নির্দেশসহ সোপর্দ করা হয়েছিল যে, যে সময় এবং যে স্থানে তাকে ডাকা হবে সেখানেই অত্যন্ত গোপনীয়তার সঙ্গে উটনীসহ পৌছে যাবে)। নির্দেশ অনুযায়ী সে দু'টি উটনীসহ ছুর গুহায় পৌছে গেল। সে সময় হযরত আসমাও (রাঃ) এক থলিতে খাবার নিয়ে উপস্থিত। তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বের হওয়ার সময় থলের মুখ বাঁধার জন্য কিছু আনার কথা খেয়াল ছিল না। সুতরাং তিনি নিজের নিতাক (সেই রুমাল বা কাপড় যা সেই যুগে মহিলারা কামিসের উপর কোমড়ের ওপর লেপটে রাখতো) খুলে ছিঁড়লেন। তারপর এক ভাগ দিয়ে খাবারের পাত্রের মুখ বেঁধে এক উটনীর হাওদাজের সঙ্গে লটকে দিলেন এবং দ্বিতীয় অংশ নিজের কোমরের ওপর দিয়ে দিলেন। এজন্য তাঁকে জাতুন নিতাকাইন বলা হয়ে থাকে।

সহিহ বুখারীতে হযরত আসমা (রাঃ) নিজে বর্ণনা করেছেন,যখন খাদ্যপাত্র বাঁধার জন্য কিছুই পাওয়া গেল না তখন তাঁর পিতা তাঁকে নিতাক বা কোমরবন্দ ছিঁড়ে ফেলার নির্দেশ দিলেন। এজন্য তাঁর নাম জাতুন নিতাকাইন রাখা হয়েছে।

কতিপয় রাওয়ায়েতে তাঁর উপাধি জাতুন নিতাকও বর্ণনা করা হয়েছে। সহিহ বুখারীতে (বাবুল হিজরাহ) হযরত আয়েশা সিদ্দিকাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, আসমা (রাঃ) তাঁর নিতাকের এক অংশ ছিঁড়ে তা দিয়ে থলের মুখ বাঁধলেন। এজন্য তাঁর নাম " জাতুন নিতাক" হয়ে গেল। হযরত আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস (রাঃ) ইবনে

www.bjilibrary.com

যোবায়েরের (রাঃ) ব্যাপারে বলতেন, তাঁর মা জাতুন নিতাক। এইসব রাওয়ায়েত থেকে জানা যায়, হযরত আসমাকে (রাঃ) লোকজন " জাতুন নিতাকাইন"ও বলতো এবং "জাতুন নিতাক"ও। ঘটনার রূপ যাই হোক, এই খিদমতের বদৌলতে হযরত আসমা (রাঃ) রাসূলের (সাঃ) পক্ষ থেকে যে উপাধি লাভ করেছিলেন তা আজ ১৪শ' বছর অতিবাহিত হওয়ার পরও জীবন্ত রয়েছে এবং চিরকালের জন্য তা জীবিত থেকে তাঁর প্রতিষ্ঠিত মান-মর্যাদার প্রমাণ অব্যাহত রাখবে।

হিজরতের রাতের পরবর্তী সকালের ঘটনা ওপরে বর্ণনা করা হয়েছে। আবু জেহেল যখন শাপ-শাপান্ত করতে করতে চলে গেল তখন আবুবকর সিদ্দিকের (রাঃ) অন্ধ পিতা আবি কাহাফাহ (তখনো ঈমান আনেননি) হযরত আসমাকে (রাঃ) সম্বোধন করে বললেন, " বেটি! আবুবকর তোমাকে দু' ধরনের মুসিবতে নিক্ষেপ করে গেছে। নিজেও চলে গেছে। আবার সকল সম্পদও সাথে নিয়ে গেছে।"

হযরত আবুবকর (রাঃ) ঠিকই ঘরে রক্ষিত সকল অর্থ নিয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু হযরত আসমা (রাঃ) বৃদ্ধ ও অন্ধ দাদার অন্তর ভাংগা ঠিক মনে করলেন না এজন্য জবাব দিলেনঃ " না, দাদাজান! তিনি অনেক সম্পদ আমাদের জন্য রেখে গেছেন।" অতঃপর তিনি একটি কাপড়ে কিছু পাথর রেখে তা সেই গর্তে অথবা তাকে রেখে দিলেন যেখানে হযরত আবুবকর (রাঃ) নিজের মাল রাখতেন। তারপর তিনি আবু কাহাফার হাত ধরে সেখানে নিয়ে গেলেন এবং বললেনঃ" দাদাজান! আপনি হাত দিয়ে দেখুন, এতে কি রয়েছে।" আবু কাহাফাহ সেই কাপড়ের পুটলীর ওপর হাত রেখে নিশ্চিন্ত হয়ে গেলেন এবং বললেন, " আবুবকর ভালোই করেছে। তোমাদের জন্য যথেষ্ট ব্যবস্থা করে গেছে।"

হিজরতের পর রহমতে আলম (সাঃ) কিছুদিন কুবায় অবস্থান করলেন। অতঃপর নিজের পদযুগল দ্বারা মদীনা মুনাওয়ারাকে অভিষিক্ত করলেন। কয়েক মাস পর হুজুর (সাঃ) হযরত যায়েদ (রাঃ) বিন হারিছা (রাঃ) এবং হযরত আবু রাফেকে (রাঃ) নিজের পরিবার-পরিজন আনার জন্য মক্কা প্রেরণ করলেন। হযরত আবুবকর সিদ্দিকও (রাঃ) তাঁদের সঙ্গে আব্দুল্লাহ বিন উরাইকিতকে পুত্র আব্দুল্লাহর নামে পত্র পাঠালেন। পত্রে তিনি আব্দুল্লাহকে (রাঃ) তাঁর মা (উম্মে রুমান) ও বোনদেরকে মদীনা নিয়ে আসার জন্য লিখেছিলেন। বস্তুত হযরত যায়েদ (রাঃ) এবং হযরত আবু রাফে (রাঃ) উম্মুল মুমিনিন হযরত সাওদাহ (রাঃ), হযরত ফাতিমাতুজ জোহরা (রাঃ), হযরত উম্মে কুলছুম (রাঃ), হযরত উম্মে আইমান (রাঃ) (হযরত যায়েদের স্ত্রী) এবং উসামাহ (রাঃ) বিন যায়েদকে (রাঃ) নিয়ে আসলেন। অন্যদিকে হযরত

www.bjilibrary.com

আব্দুল্লাহ বিন আবিবকর (রাঃ) হযরত উম্মে রুমান (রাঃ), হযরত আসমা (রাঃ) এবং হযরত আয়েশা সিদ্দিকাহকে (রাঃ) সঙ্গে নিয়ে মদীনা মুনাওয়ারা পৌঁছলেন।

এক রাওয়ায়েতে আছে, কিছুদিন পর হযরত আসমা (রাঃ) স্বামী হযরত যোবায়ের (রাঃ) বিনুল আওয়াম এবং হযরত সুফিয়াহ (রাঃ) বিনতে আব্দুল মুত্তালিবকে সঙ্গে নিয়ে হিজরত করেন এবং কুবাতে অবস্থান করেন। কিন্তু অধিকাংশ ঐতিহাসিক পূর্বেকার রাওয়ায়েতকেই অগ্রাধিকার দিয়েছেন।

সহিহ বুখারীতে হযরত উরওয়াহ বিন যোবায়ের (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, নবীর (সাঃ) হিজরতের কিছুদিন পূর্বে হযরত যোবায়ের (রাঃ) একটি বাণিজ্যিক কাফেলার সঙ্গে সিরিয়া গমন করেন। হুজুরের (সাঃ) হিজরতের সফরের সময় তিনি সিরিয়া থেকে ফিরে আসছিলেন। পথিমধ্যে কোন একস্থানে রাসূলে আকরাম (সাঃ) এবং হযরত আবুবকর সিদ্দিকের (রাঃ) সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়ে গেল। তিনি হুজুর (সাঃ) এবং হযরত আবুবকরের (নিজের শ্বশুর) খিদমতে তোহফা হিসেবে কিছু সাদা কাপড় পেশ করলেন এবং তাঁরা এই কাপড় পরিধান করেই মদীনা মুনাওয়ারা প্রবেশ করেছিলেন। মক্কা পৌঁছে হযরত যোবায়ের (রাঃ) হিজরতের প্রস্তুতি নিলেন এবং নিজের মা হযরত ছুফিয়াকে (রাঃ) সঙ্গে নিয়ে মদীনা চলে এলেন। কথিত আছে যে, তাঁরা কুবায় স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন এবং সেখানেই হযরত আসমাকেও (রাঃ) মদীনা শহর থেকে নিয়ে আসেন।

হিজরতের পর ঘটনাক্রমে কিছুদিন যাবত কোন মুহাজিরের গৃহে সন্তান জন্মগ্রহণ করেনি। এতে মদীনার ইহুদীরা রটিয়ে দিল যে, তারা মুসলমানদের ওপর জাদু করেছে এবং তাদের বংশধারা বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে। এমনি সময়ে প্রথম হিজরীতে হযরত আসমার (রাঃ) গর্ভে থেকে হযরত আব্দুল্লাহ বিন যোবায়ের (রাঃ) জন্মগ্রহণ করেন। হিজরতের পর সম্ভবত তিনিই ছিলেন মুসলমানদের নবজাতক। (কতিপয় রাওয়ায়েতে হযরত আব্দুল্লাহ বিন যোবায়েরের (রাঃ) জন্ম সাল দ্বিতীয় হিজরী বলে বর্ণনা করা হয়েছে এবং এও বলা হয়েছে যে, তাঁর জন্মের ৬ মাস পূর্বে হযরত বশির (রাঃ) বিন সা'দ আনসারীর গৃহে হযরত নুমান (রাঃ) বিন বশির (রাঃ) জন্মগ্রহণ করেন। এই রাওয়ায়েত ঠিক হলেও হযরত আব্দুল্লাহ বিন যোবায়ের (রাঃ) মুহাজিরদের প্রথম নবজাতকই ছিলেন)। হযরত আব্দুল্লাহর (রাঃ) জন্মগ্রহণে মুসলমানরা এত খুশী হয়েছিলেন যে, তাঁদের নারায়ে তাকবির ধ্বনিতে পাহাড় ও প্রান্তর গর্জে উঠেছিল। এতে ইহুদীরা অত্যন্ত লজ্জিত হয়েছিল। কারণ, তাদের মিথ্যা রটনার মুখোশ উন্মোচিত হয়ে গিয়েছিল।

www.bjilibrary.com

হযরত আসমা (রাঃ) শিশুকে (আব্দুল্লাহ) কোলে নিয়ে হুজুরের খিদমতে হাজির হলেন। তিনি (সাঃ) শিশুকে কোলে তুলে নিলেন। একটি খেজুর পবিত্র মুখে দিয়ে চিবুলেন এবং তা নিজের লালার সঙ্গে মিশিয়ে শিশু আব্দুল্লাহর মুখে দিলেন। তারপর তার শুভ ও কল্যাণ কামনা করে দোয়া করলেন। উম্মুল মুমিনিন হযরত আয়েশা সিদ্দিকাহ (রাঃ) নিজের এই ভাগিনেয়র নামানুসারে নিজের কুনিয়ত রেখেছিলেন " উম্মে আব্দুল্লাহ।"

মদীনা মুনাওয়ারা'র কুবায় অবস্থানকালে প্রথম কয়েক বছর হযরত আসমা (রাঃ) অত্যন্ত দারিদ্রতার মধ্য দিয়ে কাটান। সে সময় তাঁর স্বামী হযরত যোবায়ের (রাঃ) অত্যন্ত গরীব হয়ে পড়েছিলেন। সমগ্র ধন–সম্পদের মধ্যে ছিল মাত্র একটি ঘোড়া এবং একটি উট। হুজুর (সাঃ) বনু নজিরের খেজুরের বাগানের কিছু জমি জায়গীর হিসেবে তাঁকে দিয়েছিলেন। সুতরাং প্রথমদিকে তিনি সেই জমিতে চাষ করে জীবিকা নির্বাহ করতেন। মদীনা থেকে এই জমি বেশ দূরে ছিল। হযরত আসমা (রাঃ) প্রত্যেক দিন সেখান থেকে খেজুরের আঁটি একত্রিত করে আনতেন। তা কুটে উটকে খাওয়াতেন। ঘোড়ার জন্য ঘাস জোগাড় করতেন। পানি তুলতেন। মশক ফেঠে গেলে তা সেলাই করতেন। এইসব কাজ ছাড়া গৃহের অন্যসব কাজও নিজেই আঞ্জাম দিতেন। তিনি ভালোভাবে রুটি তৈরী করতে পারতেন না। কয়েকজন আনসার মহিলা প্রতিবেশী ছিলেন। তাঁরা অত্যন্ত আগ্রহ, ভালোবাসা ও নিষ্ঠার সঙ্গে রুটি তৈরী করে দিতেন।

সহিহ বুখারীতে স্বয়ং হযরত আসমা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছেঃ "যোবায়ের (রাঃ) আমাকে বিয়ে করলো। সে সময় তার জমিও ছিল না, গোলামও ছিল না। ছিল শুধুমাত্র একটি উট এবং একটি ঘোড়া। আমি তার ঘোড়ার খাবার খাওয়াতাম। পানি তুলতাম। বালতি ভরতাম। আটা পিষতাম। প্রতিবেশী কতিপয় মহিলা আনসার রুটি পাকিয়ে দিত। তারা খুব মুখলিস ছিল। রাসূল (সাঃ) প্রদত্ত যোবায়েরের (রাঃ) জমি থেকে আমি মাথায় করে খেজুরের আঁটির বস্তা নিয়ে আসতাম। এই জমি আমার ঘর থেকে তিন ফারসাখ দূরে ছিল।"

হাফিজ ইবনে হাজার আসকালানী (রঃ) এবং তিবরানী (রঃ) হযরত আসমার (রাঃ) দারিদ্রতার যুগের এক মনোমুগ্ধকর বর্ণনা করেছেন। হযরত আসমা (রাঃ) স্বয়ং এই কাহিনী বর্ণনা করে বলেছেন, "একবার আমি হযরত আবু সালমা (রাঃ) ও হযরত যোবায়েরকে (রাঃ) রাসূল প্রদত্ত সেই জমিতে ছিলাম যাকে বনি নজিরের জমি বলা হতো। একদিন যোবায়ের (রাঃ) রাসূলের (সাঃ) সঙ্গে বাইরে গিয়েছিলেন। আমাদের একজন ইহুদী প্রতিবেশী ছিলো। সে একটি বকরী জবেহ

www.bjilibrary.com

করলো এবং তা ভুনলো। এই রান্নার খোশবু যখন আমার নাকে পৌছলো তখন আমি খুব ক্ষুধার্ত হয়ে পড়লাম। সে সময় আমার পেটে ছিল কন্যা খাদিজা। আমার আর তর সইল না। আমি ইহুদী মহিলার নিকট আগুন আনার বাহানায় গেলাম। ধারণা ছিল যে, সম্ভবত সে আমাকে খাওয়ার কথা বলবে। নচেত আমার আগুনের কোন প্রয়োজন ছিল না। সেখানে পৌছে সুঘ্রানে আমার ক্ষুধা আরো বেড়ে গেল। কিন্তু ইহুদী মহিলাটি খাওয়ার কোন কথাই বললো না। আমি আগুন নিয়ে ঘরে ফিরে এলাম এবং কিছুক্ষণ পর আবার ইহুদীর বাড়ী গেলাম। এবারও সে খাওয়ার কথা বললোনা। তৃতীয়বার আমি তার গৃহে গেলাম। কিন্তু কেউই কিছু বললো না। অতঃপর আমি আমার ঘরে বসে কাঁদতে লাগলাম এবং আল্লাহর নিকট দোয়া করলাম। আল্লাহর নিকট বললাম, হে আল্লাহ! তুমি আমার ক্ষুধা নিবারণের ব্যবস্থা করে দাও। ইত্যবসরে সেই মহিলা ইহুদীর স্বামী ঘরে ফিরলো এবং এসেই জিজ্ঞেস করলো, তোমার নিকট কি কেউ এসেছিল? মহিলা ইহুদীটি বললো, হাঁ, প্রতিবেশী আরব মহিলাটি এসেছিল। ইহুদী বললো, এই গোশ্‌ত থেকে তুমি যদি তার নিকট কিছু না পাঠাও তাহলে আমি কক্ষণই তা খাব না (কেননা তার ভয় ছিল যে, এতে নজর লেগে থাকবে)। সুতরাং সে আমার নিকট গোশ্‌তের একটি পেয়ালা দিল। (সেই যুগে) আমার জন্য সেই স্থানে এর থেকে পছন্দনীয় এবং আশ্চর্য ধরনের কোন খাবার ছিল না।"

এই বর্ণনা হযরত আসমার (রাঃ) স্পষ্টবাদিতার কথা প্রমাণ করে। এতে তিনি নিজের একটি মানবিক দুর্বলতার কথা স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন।

সেই যুগেই একদিন হযরত আসমা (রাঃ) খেজুরের আঁটির বস্তা মাথায় নিয়ে আসছিলেন। পথিমধ্যে কতিপয় সাহাবীসহ রাসূলে করিমের (সাঃ) সঙ্গে দেখা হলো। হুজুর (সাঃ) নিজের উট বসালেন এবং আসমা (রাঃ) তাতে সওয়ার হোক তা চাইলেন। কিন্তু লজ্জায় হযরত আসমা (রাঃ) উটে বসলেন না এবং ঘরে পৌছে হযরত যোবায়েরকে (রাঃ) সকল ঘটনা বললেন। তিনি বললেন, "সুবহান আল্লাহ! মাথায় বোঝা উঠাতে শরম হয় না, অথচ রাসূলের (সাঃ) উটের ওপর বসতে লজ্জা হলো!"

কিছুদিন পর হযরত আবুবকর সিদ্দিক (রাঃ) হযরত যোবায়ের (রাঃ) এবং আসমাকে (রাঃ) একটি গোলাম প্রদান করলেন। এই গোলাম ঘোড়া ও উট দেখাশুনা করতে লাগলো। ফলে হযরত আসমার (রাঃ) কষ্ট কমে গেল।

প্রথমদিকে দারিদ্রতার কারণে হযরত আসমা (রাঃ) প্রত্যেক জিনিসই মেপে জুখে খরচ করতেন। রাসূলে করিম (সাঃ) এ কথা জানতে পেরে হযরত আসমাকে

www.bjilibrary.com

(রাঃ) বললেনঃ "আসমা! মেপে জুখে খরচ করো না। তাহলে আল্লাহও মেপে জুখে রুজীদেবেন।"

হযরত আসমা (রাঃ) হুজুরের ইরশাদকে জীবনের মূলমন্ত্র বানিয়ে নিলেন এবং উদার হস্তে খরচ করতে লাগলেন। খোদার কুদরতে সেই সময় থেকেই হযরত যোবায়েরের (রাঃ) আয় বৃদ্ধি পেতে থাকলো এবং কিছুদিনের মধ্যেই তাঁর গৃহে সম্পদের ছড়াছড়ি হয়ে গেল।

দারিদ্রতা ঘুচে যাওয়ার পরও হযরত আসমা (রাঃ) সহজ সরল জীবন পরিত্যাগ করেননি। সব সময়ই তিনি শুকনো রুটি দিয়ে উদর পূর্তি করতেন এবং মোটা কাপড় পরিধান করতেন। অবশ্য ধন-সম্পদ দান -খয়রাত প্রশ্নে অবারিতভাবে খরচ করতেন। যখনই কোন অসুস্থতায় পড়তেন তখনই সকল গোলাম আযাদ করে দিতেন। সন্তানদেরকে সব সময় হেদায়াত করতেন যে, সম্পদ জমা করার বস্তু নয়। বরং অভাবগ্রস্তদের সাহায্য করার জন্যই তা দেয়া হয়। যদি তোমরা বখিলী করো তাহলে আল্লাহও তোমাদেরকে তাঁর ফজল করম থেকে মাহরুম রাখবেন। হাঁ, যা সাদকা করবে এবং আল্লাহর রাস্তায় খরচ করবে তা তোমাদের কাজে আসবে। এই সঞ্চয় নষ্ট হওয়ার কোন আশংকা নেই।

হযরত আসমা (রাঃ) জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত সহজ সরল জীবন কাটান। আল্লামা ইবনে সাদ (রঃ) 'তাবকাতে' লিখেছেন, জীবনের শেষ পর্যায়ে তাঁর পুত্র মানযার বিন যোবায়ের (রাঃ) ইরাক বিজয়ের পর লড়াইয়ের ময়দান থেকে ফিরে এলেন। এ সময় তাঁর গনিমতের মালের মধ্যে কিছু মূল্যবান মহিলাদের কাপড়ও ছিল। এই কাপড় নিয়ে তিনি মায়ের খিদমতে হাজির হলেন। কিন্তু হযরত আসমা (রাঃ) এই কাপড় গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানালেন এবং বললেন, " বেটা! আমিতো মোটা কাপড় পছন্দ করি।" সুতরাং মানযার (রাঃ) তাঁরজন্য মোটা কাপড় আনলেন। তিনি তা হৃষ্টচিত্তে কবুল করলেন এবং বললেন, " পুত্র! আমাকে এই ধরনের কাপড়ইদিও।"

হযরত আব্দুল্লাহ বিন যোবায়েরের (রাঃ) বর্ণনা মতে তিনি তাঁর মায়ের থেকে বেশী দানশীল মানুষ দেখননি। অন্য এক রাওয়ায়েতে তিনি বলেছেন, খালা আয়েশা (রাঃ) এবং মা আসমা (রাঃ) থেকে বেশী দানশীল এবং শরীফ ব্যক্তি আর তিনি দেখেননি। উভয়ের মধ্যে পার্থক্য এই ছিল যে, হযরত আয়েশা (রাঃ) অল্প অল্প করে জমা করে যা হতো তা আল্লাহর পথে বিলিয়ে দিতেন। অন্যদিকে হযরত আসমা (রাঃ) যখন যা পেতেন তখনই তা বন্টন করে দিতেন।

www.bjilibrary.com

হযরত আসমা (রা) হযরত আয়েশার (রা) মিরাসী সম্পদের মধ্য থেকে সম্পত্তি পেয়েছিলেন। তিনি তা এক লাখ দিরহামের বিনিময়ে বিক্রি করে দেন এবং সকল অর্থ কাসেম (রা) বিন মুহাম্মাদ এবং ইবনে আতিককে (তাঁরা তাঁর আত্মীয় ছিলেন) দিয়ে দেন। কেননা তাঁরা অভাবগ্রস্ত ছিলেন। এটা হযরত আয়েশার (রা) মৃত্যুর পরের ঘটনা.

উদারতা এবং দানশীলতা সত্ত্বেও হযরত আসমা (রা) অত্যন্ত দিয়ানাতদারীর সাথে স্বামীর ঘরবাড়ী হেফাজত করতেন। একবার হযরত যোবায়েরের (রা) অনুপস্থিতিতে একজন সওদাগর এলেন এবং ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে বাড়ীর প্রাচীরের ছায়ায় মাল বিক্রয়ের অনুমতি প্রার্থনা করলেন। এতে তিনি বললেন ঃ "আমি যদি অনুমতি প্রদান করি, আর যোবায়ের (রা) যদি তা অস্বীকার করে তাহলে ব্যাপারটি খুব জটিল হয়ে যাবে। বরং তুমি যোবায়েরের (রা) উপস্থিতিতে এসে অনুমতি প্রার্থনা করো।"

হযরত যোবায়ের (রা) ঘরে এল সওদাগরটি পুনরায় এলো এবং দরজায় দাঁড়িয়ে নিবেদন জানালো ঃ "উম্মে আবদুল্লাহ্! আমি মিসকিন মানুষ। আপনার প্রাচীরের ছায়ায় দাঁড়িয়ে কিছু পণ্য বিক্রি করতে চাই। অনুমতি দিন।"

তিনি বললেন ঃ "আমার গৃহ ছাড়া কি তুমি মদীনায় আর কোন ঘর পেলে না ?"

হযরত যোবায়ের (রা) বললেন ঃ "তোমার কি ক্ষতি হবে যে, একজন মিসকিনকে ক্রয়-বিক্রয়ে বাধা দিচ্ছ ?"

হযরত আসমা (রা) তৎক্ষণাৎ তাকে অনুমতি দিয়ে দিলেন। কেননা তাঁর মনের আকাংখাও তাই ছিল।

হযরত আসমার (রা) দানের হাত অত্যন্ত প্রশস্ত ছিল। কিন্তু হযরত যোবায়েরের (রা) মেযাজ একটু রুক্ষ ছিল। হযরত আসমা (রা) একদিন প্রিয় নবীকে (সাঃ) জিজ্ঞাসা করলেন ঃ "হে আল্লাহর রাসূল! স্বামীর সম্পদ থেকে তাঁর অনুমতি ছাড়া কি আমি ইয়াতিম–মিসকিনদেরকে কিছু দিতে পারি?"

হুজুর (সাঃ) বললেন ঃ "হাঁ, দিতে পার।"

একবার রহমতে আলম (সাঃ) মুসলমানদেরকে আল্লাহর পথে বেশী বেশী সম্পদ সাদকাহ্ করার নির্দেশ দিলেন। সকল সাহাবা (রা) প্রতিযোগিতামূলকভাবে

www.bjilibrary.com

নবীর (সাঃ) নির্দেশ পালন করলেন। মহিলা সাহাবীরা (রাঃ) গায়ের গহনা পর্যন্ত খুলে দিলেন। হযরত আসমার (রাঃ) নিকট একটি দাসী ছিল। তিনি তা বিক্রি করে অর্থ নিয়ে বসে গেলেন। হযরত যোবায়ের (রাঃ) গৃহে ফিরে হযরত আসমার (রাঃ) নিকট অর্থ চাইলেন। তিনি বললেন, "আমি সাদকাহ করে দিয়েছি।"

হযরত যোবায়ের (রাঃ) চুপ হয়ে গেলেন। কেননা তিনিও আল্লাহ এবং রাসূলের (সাঃ) সন্তুষ্টি কামনা করতেন।

হযরত আসমা (রাঃ) অত্যন্ত দৃঢ়চেতা মুসলমান ছিলেন। কিন্তু তাঁর মা কুতাইলাহ বিনতে আবদুল উজ্জাহ ইসলাম গ্রহণের সৌভাগ্য লাভ করেননি। এজন্য হযরত আবুবকর সিদ্দিক (রাঃ) হিজরতের পূর্বে তাঁকে তালাক দিয়েছিলেন। (এক রাওয়ায়েত অনুযায়ী তালাকের পর তাঁর অন্য কারো সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল)। সহিহ বুখারীতে বর্ণিত আছে যে, একবার কুতাইলাহ মদীনা এলেন এবং হযরত আসমার (রাঃ) নিকট কিছু অর্থ চাইলেন। হযরত আসমা (রাঃ) তাঁকে সাহায্য করার ব্যাপারে আগ্রহী ছিলেন। কিন্তু মুশরিক হওয়ার কারণে অর্থ দেয়ার প্রশ্নে চিন্তায় পড়ে গেলেন এবং রাসূলকে (সাঃ) জিজ্ঞেস করলেন, "হে আল্লাহর রাসূল! আমার মা মুশরিক এবং সে আমার নিকট অর্থ চায়। আমি কি তাকে সাহায্য করতে পারি এবং তার চাহিদা পূরণ করতে পারি?"

হুজুর (সাঃ) বললেন, "হাঁ।" (অর্থাৎ নিজের মায়ের সঙ্গে সেলায়ে রেহেমী কর)।

অন্য এক রাওয়ায়েত অনুযায়ী নবী করিম (সাঃ) বললেন, "আল্লাহ পাক সেলায়ে রেহেমী করা নিষেধ করেন না।" তাবকাতে ইবনে সা'দ এবং মুসনাদে আহমদ বিন হাম্বলে বর্ণিত রাওয়ায়েতে আছে যে, একবার হযরত আসমার (রাঃ) মা কুতাইলাহ তাঁর জন্য কিছু তোহফা নিয়ে সাক্ষাৎ করতে এলেন। হযরত আসমার (রাঃ) দ্বীনি মর্যাদাবোধ তা সহ্য করতে পারলো না। তিনি সেই তোহফা গ্রহণ করবেন কিনা অথবা তাঁকে বাড়ীতে স্থান দেবেন কিনা এ ব্যাপারে চিন্তায় পড়ে গেলেন। বস্তুত তিনি হযরত আয়েশার (রাঃ) মাধ্যমে রাসূলের (সাঃ) নিকট এই পর্যায়ে তাঁর জন্য কি নির্দেশ রয়েছে তা জানতে চাইলেন। হুজুর (সাঃ) তাঁর তোহফা গ্রহণ এবং তাঁকে গৃহে মেহমান হিসেবে রাখার নির্দেশ দিলেন।

হুজুরের (সাঃ) অনুমতি প্রাপ্তির পর তিনি মাকে নিজের গৃহে থাকার অনুমতি দিলেন এবং তাঁর তোহফা কবুল করলেন।

www.bjilibrary.com

হযরত আসমা (রাঃ) পূর্ণ দরজার আবেদ এবং যাহেদ ছিলেন। আবেদ হিসেবে তিনি মশহুর হয়ে গিছেছিলেন। বিভিন্ন ধরনের অসুস্থ লোক তাঁর নিকট দোয়ার জন্য আসতো। যদি কোন জ্বরের রোগী তাঁর নিকট আগমন করতো তাহলে তিনি তার জন্য দোয়া করতেন এবং তার বুকের ওপর পানি ছিটিয়ে দিতেন। আল্লাহ পাক সেই রোগীকে সুস্থতা দিতেন। তিনি বলতেন, "আমি রাসূল (সাঃ) থেকে শুনেছি যে, জ্বর জাহান্নামের আগুনের তাপ। পানি দিয়ে ঠাণ্ডা কর।"

হযরত রাসূলে করিমের (সাঃ) একটি জুব্বাহ উম্মুল মুমিনিন হযরত আয়েশা সিদ্দিকাহর (রাঃ) নিকট ছিল। যখন তাঁর মৃত্যুকাল ঘনিয়ে এলো তখন তিনি তা হযরত আসমার (রাঃ) নিকট হস্তান্তর করলেন। তিনি তা অত্যন্ত যত্ন সহকারে রক্ষণাবেক্ষণ করতেন এবং যতদিন জীবিত ছিলেন ততদিন তা মর্যাদাসহ রেখেছিলেন। ঘরে যদি কেউ অসুস্থ হয়ে পড়তো তাহলে তিনি তা ধুয়ে তার পানি রোগীকে পান করিয়ে দিতেন। তার বরকতে রোগী সুস্থ হয়ে যেতে। স্বয়ং হযরত আসমার (রাঃ) যদি কোন সময় মাথা ব্যথা হতো তাহলে হাত দিয়ে মাথা ধরে বলতেন, "হে আল্লাহ! যদিও আমি গুনাহগার কিন্তু তুমি অসীম রহমতের মালিক।" আল্লাহ তাঁর মাথার ব্যথা দূর করে দিতেন।

একবার রাসূলে আকরাম (সাঃ) সূর্য গ্রহণের নামায পড়াচ্ছিলেন। হযরত আসমাসহ (রাঃ) অনেক মহিলা সাহাবী রাসূলের (সাঃ) ইকতেদায় নামায পড়ছিলেন। হুজুর (সাঃ) নামায কয়েক ঘন্টা দীর্ঘ করলেন। হযরত আসমার (রাঃ) শরীর কিছুটা দুর্বল ছিল। তিনি খুব ক্লান্ত হয়ে পড়লেন। কিন্তু অত্যন্ত ধৈর্যের সঙ্গে দাঁড়িয়ে রইলেন। নামায শেষ হলে তিনি মূর্ছা গেলেন। মুখ এবং মাথায় পানি ছিটানোর পর সংজ্ঞা ফিরে এলো।

সহিহ বুখারীতে হযরত আসমা (রাঃ) নিজে বর্ণনা করেছেনঃ "একবার সূর্যের গ্রহণ লাগলো। আমি আয়েশার (রাঃ) স্বামী নবীর (সাঃ) গৃহে গেলাম। সেখানে দেখলাম যে, লোকজন নামায পড়ছে এবং আয়েশাও (রাঃ) নামাযে মশগুল রয়েছে। আমি তাঁদেরকে জিজ্ঞেস করলাম, লোকদের কি হয়েছে? তারা আসমানের দিকে ইঙ্গিত করলো এবং বললো, সুবহান আল্লাহ। আমি জিজ্ঞেস করলাম, এটা কি খোদার কোন নির্দেশ? তাঁরা ইঙ্গিতে ইতিবাচক জবাব দিলেন। সুতরাং আমিও নামাযে দাঁড়িয়ে গেলাম। নামায এত লম্বা হলো যে, ক্লান্তিতে আমি মূর্ছা গেলাম এবং পরে আমি আমার মাথায় পানি নিলাম। নামাযের পর রাসূলুল্লাহ (সাঃ) আল্লাহ'র হামদের পর বললেন, আমি এখন যা দেখেছি এর আগে তা কখনো দেখিনি। এমনকি

www.bjilibrary.com

দোযখ এবং জান্নাতও আমি প্রত্যক্ষ করেছি। আমাকে বলা হয়েছে যে, তোমাদেরকে কবরে পরীক্ষায় নিক্ষেপ করা হবে। যেমন দাজ্জালের ফিতনার সময় তোমাদের পরীক্ষা হবে। ফেরেশতা তোমাদের প্রত্যেকের নিকটই আগমন করবেন এবং (আমার ছবি দেখিয়ে) জিজ্ঞেস করবেন, তুমি কি তাঁকে চিন? মুমিন জবাব দেবে, তিনি হলেন মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সাঃ)। তিনি স্পষ্ট এবং হক হেদায়াতসহ আমাদের নিকট এসেছিলেন। আমরা তাঁর ওপর ঈমান এনেছি এবং তাঁর আনুগত্য করেছি। অতঃপর ফেরেশতা তাকে বলবেন এখন তুমি শান্তির সঙ্গে ঘুমিয়ে যাও। কেননা আমরা জানতে পেরেছি যে, তুমি মুমিন। পক্ষান্তরে একজন মুনাফিক অথবা সন্দেহ পোষণকারী ব্যক্তি জবাব দেবে যে, আমার জানা নেই। কিন্তু আমি লোকদেরকে কিছু বলতে শুনেছি এবং আমিও (তাদের দেখাদেখি) তেমনি বলে দিয়েছি (অতঃপর সে ফেরেশতাদের শাস্তির পাল্লায় এসে পড়বে)।"

হযরত আসমা (রাঃ) জীবনে কয়েকবার হজ্ব করেছিলেন। বুখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত আছে যে, বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মাদ মুস্তাফার (সাঃ) সঙ্গে তিনি প্রথম হজ্ব করেছিলেন। এই হজ্বের কথা তাঁর কিছু কিছু স্মরণ ছিল। হুজুরের (সাঃ) ইন্তেকালের পর একবার হজ্বের জন্য গমন করেন এবং মুযদালিফায় অবস্থান করেন। রাতে সেখানে নামায পড়েন। চাঁদ ডুবে যাওয়ার পর পাথর নিক্ষেপের জন্য গমন করেন। অতঃপর ফজরের নামায আদায় করেন। সঙ্গে অবস্থানরত গোলম বললো, আপনি খুব জলদি করেছেন। এতে তিনি বললেন, হুজুর (সাঃ) পর্দানশীনদের জন্য এর অনুমতি দিয়েছেন। যখন জাহন অতিক্রম করতেন তখন বলতেন যে, আমরা রাসূলের (সাঃ) যুগে এখানে অবস্থান করতাম। সে সময় আমাদের নিকট খুব কম সামান ছিল। আমি, আয়েশা (রাঃ) এবং যোবায়ের (রাঃ) ওমরাহ করেছিলাম।

হযরত আসমা (রাঃ) অত্যন্ত নির্ভীক বাহাদুর ছিলেন। এক রাওয়ায়েতে আছে, রাসূলের (সাঃ) ইন্তেকালের পর তিনি স্বামী ও পুত্রের সঙ্গে সিরিয়ার জিহাদের ময়দানে গমন করেন এবং অন্যান্য কতিপয় মহিলার মত ইয়ারমূকের ভয়ংকর যুদ্ধের খিদমত আঞ্জাম দেন।

হযরত সাঈদ (রাঃ) বিন আছের ইমারতকালে মদীনায় চরম বিশৃংখলা দেখা দেয় এবং ব্যাপক আকারে চুরি সংঘটিত হতে থাকে। সে যুগে হযরত আসমা (রাঃ) সিথানে খঞ্জর রেখে ঘুমাতেন। লোকজন জিজ্ঞেস করলো, আপনি এ কাজ কেন করেন? জবাবে তিনি জানান, যদি কোন চোর অথবা ডাকাত আমার ঘরে ঢোকে তাহলে এই খঞ্জর দিয়ে তার পেট চিরে দেব।

www.bjilibrary.com

আল্লাহ পাক হযরত আসমাকে (রাঃ) অত্যন্ত মুখস্থ শক্তি দান করেছিলেন। তিনি কখনো কখনো শৈশব ও যৌবনকালের ঘটনাবলী খুব সঠিকভাবে বর্ণনা করতেন। "হাতীর ঘটনা" ইতিহাসের একটি বিখ্যাত ঘটনা এবং কুরআন মজিদেও তার উল্লেখ রয়েছে। এই ঘটনায় ইয়েমেনের হাবশী শাসক আবরাহা মক্কা মুয়াজ্জমায় সৈন্য প্রেরণ করে। এই বাহিনীতে " মাহমুদ" নামক এক দৈত্যের মত এবং আরো কতিপয় হাতী ছিল (সাত-আট অথবা ১২)। সেই বাহিনীর ওপর আল্লাহ পাক ঝাঁকে ঝাঁকে আবাবিল পাখী প্রেরণ করেন এবং এই পাখীরা " আসহাবে ফিলের" ওপর পাথর নিক্ষেপ করতে থাকে ও মুহূর্তের মধ্যে তাদেরকে জন্তু-জানোয়ারের ভক্ষণ করা ভূষির মত করে ফেলে। এ সময় আল্লাহর কুদরতে দু'টি হাতী কেমন করে যেন বেঁচে যায়। কিন্তু তাদের জীবন মৃতদের থেকেও খারাব প্রকৃতির ছিল। একটি হাতী অন্ধ হয়ে গিয়েছিল এবং অপরটি খোঁড়া হয়ে গিয়েছিল। ধারণা করা হয় যে, আল্লাহ পাক তাদেরকে শিক্ষা গ্রহণের প্রতীক হিসেবে জীবিত রেখেছিলেন। হযরত আসমা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, তিনি এই হাতী দু'টিকে ইছাফ এবং নায়েলাহ নামক মূর্তির পাশে বসে ভিক্ষা চাইতে দেখেছেন।

সাইয়েদেনা হযরত ওমর ফারুকের (রাঃ) চাচাতো ভাই যায়েদ বিন আমর বিন নুফাইলুল আদাবীউল কারাশী ছিলেন একজন দৃঢ়চেতা মানুষ। কুফর ও শিরকের তমসাচ্ছন্ন যুগে তিনি ছিলেন তাওহীদের ঝান্ডাবাহী। হুজুরের (সাঃ) নবুয়ত প্রাপ্তির পাঁচ বছর পূর্বে লাখম নামক শহরে কেউ তাঁকে হত্যা করে ফেলে। রাসূলের (সাঃ) সঙ্গে একবার তাঁর সাক্ষাৎও হয়েছিল এবং তিনি তাঁর তাওহীদের প্রতি বিশ্বাস ও উন্নত চরিত্রের প্রশংসাকারী ছিলেন।

হযরত সাঈদ (রাঃ) বিন মুসাইয়্যির থেকে বর্ণিত আছে যে, একবার হযরত ওমর ফারুক (রাঃ), যায়েদের (রাঃ) পুত্র হযরত সাঈদের (রাঃ) সঙ্গে (তিনি আসহাবে আশারাহ মুবাশশিরাহ) হুজুরের (সাঃ) খিদমতে হাজির হয়ে আরজ করেনঃ" হে আল্লাহর রাসুল। যায়েদের চিন্তা- চেতনা সম্পর্কে আপনি অবহিত আছেন। আমরা কি তার জন্য মাগফিরাত কামনা করবো?"

হুজুর (সাঃ) বললেনঃ "আল্লাহ যায়েদ বিন আমরকে মাগফিরাত দিন এবং তাঁর ওপর রহম করুন। তিনি দ্বীনে ইবরাহিমের ওপর মৃত্যুবরণ করেছেন।"

অন্য এক রাওয়ায়েতে যায়েদের (রাঃ) ব্যাপারে প্রিয় নবীর (সাঃ) এই ইরশাদ নকল করা হয়েছে যে, তিনি কিয়ামতের দিন পৃথক এক উম্মত হিসেবে উঠবেন।

www.bjilibrary.com

হযরত আসমা (রাঃ) শৈশবকালে যায়েদকে দেখেছিলেন এবং তাঁর উন্নত চরিত্র ভালোভাবে প্রত্যক্ষ করেছিলেন। সহিহ্ বুখারীতে আসমা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি যায়েদ বিন আমর বিন নুফায়েলকে কাবার প্রাচীর ধরে দাঁড়িয়ে বলতে শুনেছেন," হে কোরেশরা! আল্লাহর শপথ, আমি ব্যতীত তোমাদের মধ্যে কেউই দ্বীনে ইবরাহীমের ওপর নেই। " যখন কোন ব্যক্তি নিজের কন্যাকে হত্যা করতে চাইত তখন তাকে তিনি তা করতে নিষেধ করতেন এবং বলতেন, আমিই তার বোঝা বহন করবো। একথা বলে তিনি তাকে নিয়ে যেতেন। যখন সেই মেয়ে বয়োপ্রাপ্ত হতো তখন তার পিতাকে বলতেন, তুমি চাইলে তাকে নিয়ে যেতে পারো। নচেত আমার নিকট থাকতে দাও। আমি তার যাবতীয় ব্যয় বহন করবো।

দীর্ঘদিনের পারিবারিক জীবনের পর হযরত আসমার (রাঃ) জীবনে এক দুঃখজনক ঘটনা ঘটে গেল। অর্থাৎ হযরত যোবায়ের (রাঃ) বিনুল আওয়াম তাঁকে তালাক দিয়ে দিলেন। ঐতিহাসিকরা তালাকের বিভিন্ন কারণ বর্ণনা করেছেন। কিন্তু আসল কারণ আল্লাহই ভালো জানেন। এটাই ধারণা হয় যে, হযরত যোবায়ের (রাঃ) এবং হযরত আসমার (রাঃ) মধ্যে কিছু পারিবারিক ব্যাপারে মতবিরোধের ফলে জটিলতা সৃষ্টি হয়েছিল। হযরত যোবায়েরের (রাঃ) মেযাজ কিছুটা রুক্ষ ছিল। একদিন কোন কথায় রেগে তিনি হযরত আসমাকে (রাঃ) মারতে চাইলেন। তাঁর বড় পুত্র ঘটনাক্রমে সে সময় গৃহে উপস্থিত ছিলেন। হযরত আসমা (রাঃ) তাঁর নিকট সাহায্য চাইলেন। হযরত যোবায়ের (রাঃ) আবদুল্লাহকে (রাঃ) হস্তক্ষেপে নিষেধ করলেন এবং বললেন, যদি তুমি তোমার মাকে সমর্থন কর তাহলে সে তালাক হয়ে যাবে। হযরত আব্দুল্লাহর (রাঃ) সহ্য হলো না। তিনি এগিয়ে গিয়ে তাঁর বাহু হযরত যোবায়েরের (রাঃ) হাত থেকে ছাড়িয়ে নিলেন। এরপর হযরত যোবায়ের (রাঃ) এবং হযরত আসমার (রাঃ) মধ্যেকার সম্পর্ক চিরকালের জন্য বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল এবং হযরত আসমা (রাঃ) স্থায়ীভাবে বড় পুত্র হযরত আবদুল্লাহর (রাঃ) সঙ্গে থাকতে লাগলেন। তিনি তাঁর মার সীমাহীন খিদমতগুজার ছিলেন এবং জীবনের শেষ মূহূর্ত পর্যন্ত দায়িত্ব বহন করেছিলেন।

হযরত আসমা (রাঃ) অত্যন্ত উদার এবং নেক অন্তরের মহিলা ছিলেন। হযরত যোবায়েরের (রাঃ) থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার পরও তিনি সব সময় তাঁকে ইজ্জতের সাথে স্মরণ করতেন এবং তাঁর উত্তম গুণাবলীর প্রশংসা করতেন।

৩৬ হিজরীতে হযরত আয়েশা সিদ্দিকাহ (রাঃ) এবং হযরত আলী কাররামাল্লাহু ওয়াজহাহুর মধ্যে " উষ্ট্রের যুদ্ধের" মত দুঃখজনক ঘটনা সংঘটিত

www.bjilibrary.com

হয়েছিল। হযরত যোবায়ের (রাঃ) এই যুদ্ধে হযরত আয়েশা'র (রাঃ) উৎসাহী সমর্থক ছিলেন। কিন্তু লড়াই শুরু হওয়ার পূর্বে যখন হযরত আলী কাররামাল্লাহু ওয়াজহাহু তাঁকে রাসূলে করিমের (সাঃ) একটি ইরশাদ স্মরণ করালেন তখন তিনি যুদ্ধের ময়দান থেকে সরে পড়লেন। ফেরার পথে 'সিবা' প্রান্তরে পৌছলেন এবং নামাযে আল্লাহর দরবারে সিজদানত হলেন। এ সময় আমর বিন জারমুয নামক এক ব্যক্তি তাঁকে শহীদ করে ফেললো। হযরত আসমা (রাঃ) তাঁর শাহাদাতের খবর শুনে খুবই দুঃখিত হলেন। কতিপয় রাওয়ায়েতে আছে, এ সময় তিনি এই কবিতা পাঠ করেছিলেন। কবিতাটির অনুবাদ নিম্নরূপঃ

"ইবনে জারমুয লড়াইয়ের দিনে এক বুলন্দ হিম্মত অশ্বারোহীর সঙ্গে ধোঁকাবাজি করেছে। কেননা সে সরঞ্জামহীন ছিল। হে আমর। তুমি যদি তোমার ইচ্ছার কথা পূর্বেই যোবায়েরকে অবহিত করতে তাহলে তুমি তাকে ভীতিহীন মানুষ হিসেবে পেতে। খোদা তোমাকে ধ্বংস করুক। তুমি এক মুসলমানকে নাহক হত্যা করেছ। খোদার আযাব তোমার ওপর অবশ্যই নাযিল হবে।"

এই কবিতা দুররুল মানসুরে হযরত আসমার (রাঃ) সঙ্গে সংশ্লিষ্ট করা হয়েছে। কিন্তু আল্লামা ইবনে আছির (রঃ) লিখেছেন, এই কবিতা হযরত যোবায়েরের (রাঃ) অন্য স্ত্রী হযরত আতেকা (রাঃ) বিনতে যায়েদ বিন আমর বিন নুফায়েল বর্ণনা করেছেন। তিনি কাব্য ও কবিতায় ব্যুৎপত্তি রাখতেন। পক্ষান্তরে কাব্য চর্চায় হযরত আসমার (রাঃ) ব্যুৎপত্তির কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। যাহোক, এ ব্যাপারে সকল ঐতিহাসিকই একমত যে, হযরত যোবায়েরের (রাঃ) শাহাদাতে হযরত আসমা (রাঃ) গভীর শোক প্রকাশ করেছিলেন।

হযরত আসমার (রাঃ) পুত্র হযরত আব্দুল্লাহ বিন যোবায়ের (রাঃ) ইসলামের ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত। ইমাম হোসাইনের (রাঃ) মর্মান্তিক শাহাদাতের পর তিনি বনু উমাইয়ার নির্দয় শক্তির বিরুদ্ধে যে দৃঢ়তা ও বাহাদূরীর সঙ্গে মুকাবিলা করেছিলেন তা নজিরবিহীন। বাস্তব কথা হলো, হযরত আব্দুল্লাহ বিন যোবায়ের (রাঃ) যদি ইমাম হোসাইনের (রাঃ) মত কতিপয় সঙ্গী পেতেন তাহলে বনি উমাইয়ার সিংহাসন উল্টে দিতেন এবং খিলাফতে রাশেদার নমুনা কায়েম করতেন। হযরত আব্দুল্লাহ বিন যোবায়েরের (রাঃ) শাহাদাত ইতিহাসের এক করুণ অধ্যায়। এ সময় হযরত আসমা (রাঃ) যে সত্যনিষ্ঠা, ভীতিহীনতা, ধৈর্য ও সন্তুষ্টি এবং ঈমানী শক্তির প্রমাণ দিয়েছেন তা তাঁর জীবন ইতিহাসে প্রোজ্জ্বল হয়ে থাকবে। ৩০ অথবা ৩১ হিজরীতে হযরত আসমা (রাঃ) স্বামী থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার পর স্থায়ীভাবে হযরত আবদুল্লাহ বিন যোবায়েরের (রাঃ) নিকট থাকতেন। হযরত

www.bjilibrary.com

আবদুল্লাহ (রাঃ) তাঁকে সীমাহীন শ্রদ্ধা ও খিদমত করতেন এবং ৭৩ হিজরীতে নিজের শাহাদাত পর্যন্ত অব্যাহতভাবে বৃদ্ধা মার আনুগত্য ও সন্তুষ্টি অর্জনের চেষ্টা চালিয়ে গেছেন। হযরত আসমাও (রাঃ) ভাগ্যবান পুত্রের জন্য সব সময় দোয়া করতেন। তাঁর প্রশিক্ষণের ফলশ্রুতিতেই হযরত আব্দুল্লাহ বিন যোবায়ের (রাঃ) জ্ঞান, ফজিলত, জুহদ ও তাকওয়া, সত্য কথন, বাহাদুরী এবং নির্ভীকতার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত ছিলেন। ইমাম হোসাইনের (রাঃ) মত তিনিও মৃত্যু পর্যন্ত ইয়াযিদের বাইয়াত করেননি এবং তার মৃত্যুর পরও তার উত্তরাধিকারদের মুকাবিলা অব্যাহত রাখেন। ৬৬ হিজরীতে ইরাক ও হিজাজ প্রভৃতি এলাকার জনগণ তাঁকে একমত হয়ে খলিফা নির্বাচন করে। ৭৩ হিজরী পর্যন্ত তিনি মক্কা মুয়াজ্জমায় খিলাফতের ঝান্ডা সমুন্নত রেখেছিলেন। এই ৬ বছর তাঁকে একই সঙ্গে দু' ফ্রন্টে যুদ্ধ করতে হয়। একদিকে ছিল মুখতার বিন আবি উবায়েদ ছাকাফির শক্তিশালী দল, আর অন্য ফ্রন্টে ছিল বনু উমাইয়ার নির্দয় শক্তি। তিনি অত্যন্ত দৃঢ়তা ও সাহসের সঙ্গে উল্লিখিত দুই ফ্রন্টে লড়াই করেন। আবদুল মালিক বিন মারওয়ান ক্ষমতায় বসেই আব্দুল্লাহ বিন যোবায়েরের (রাঃ) খিলাফত খতম করার দৃঢ় সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে। এই লক্ষ্য হাসিলের জন্য সে এক অভিজ্ঞ জেনারেল হাজ্জাজ বিন ইউসুফ ছাকাফীকে নিয়োগ করে।

হাজ্জাজ বিন ইউসুফ এক বিরাট বাহিনীসহ ৭২ হিজরীর ১লা জিলহজ্ব মক্কা মুয়াজ্জমা অবরোধ করে। হযরত আবদুল্লাহ বিন যোবায়ের (রাঃ) নজিরবিহীন দৃঢ়তা প্রদর্শন করলেন এবং ৬ মাস পর্যন্ত উমাইয়া বাহিনীর মক্কা দখল ঠেকিয়ে রাখলেন। হাজ্জাজ এত কঠোর অবরোধ আরোপ করেছিলো যে, মক্কায় দানা পরিমাণ খাদ্যশস্যও পৌছতো না। সে বাইতুল্লাহর মান–মর্যাদার তোয়াক্কা না করে বুকাবিস পাহাড়ে কামান বসিয়ে তা দ্বারা কা'বা শরীফের ওপর অব্যাহতভাবে পাথর বর্ষণ করে। হযরত আব্দুল্লাহ বিন যোবায়ের (রাঃ) পাথর বর্ষণের মধ্যেও এত একাগ্রতার সাথে নামায পড়তেন যে, কবুতর তাঁর কাঁধ এবং মাথার ওপর এসে বসতো। অবরোধের কঠোরতা এবং খাদ্যের শূন্যতায় অস্থির হয়ে তাঁর অধিকাংশ সঙ্গী তাঁকে পরিত্যাগ করে হাজ্জাজ বিন ইউসুফের সঙ্গে যোগ দেয়। এমনকি তাঁর পুত্ররা পর্যন্ত বিশ্বাসঘাতকতা করে এবং হাজ্জাজের নিকট গিয়ে নিরাপত্তা প্রার্থনা করেছিল। কিন্তু ৭২ বছরের এই বৃদ্ধ বাঘ বনু উমাইয়ার কর্তৃত্ব মেনে না নেয়ার শপথ করে রেখেছিলেন। অবরোধকালে একদিন হযরত আসমার (রাঃ) অবস্থা জানার জন্য তাঁর খিদমতে হাজির হলেন। তিনি কিছুটা অসুস্থ ছিলেন। কথা প্রসঙ্গে হযরত আব্দুল্লাহ (রাঃ) বললেন, " মৃত্যুতে বড় শান্তি।" জবাবে তিনি বললেন, "সম্ভবত তুমি আমার মত্যু কামনা করছো (যাতে বার্ধক্যের দুঃখ থেকে পরিত্রাণ পাই)। কিন্তু আমি

www.bjilibrary.com

তোমার পরিণাম দেখে মরতে চাই। তুমি যদি শহীদ হও তাহলে নিজের হাতে তোমার কাফন দাফন করবো। আর যদি বিজয়ী হও তাহলে আমার দিল ঠান্ডা হবে।"

এই ঘটনার ১০ দিন পর যখন হাতে গোনা মাত্র কয়েকজন সঙ্গী রয়ে গেলেন তখন তিনি শেষবার হযরত আসমার (রাঃ) খিদমতে উপস্থিত হয়ে আরজ করলেনঃ

"আম্মাজান। আমার সাথীরা আমার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। বর্তমানে শুধুমাত্র কতিপয় ব্যক্তি ছাড়া কেউই আমাকে সহযোগিতা করতে প্রস্তুত নয়। যদি অস্ত্র সমর্পণ করি তাহলে আমার এবং আমার সঙ্গীদের নিরাপত্তা পাওয়া যেতে পারে। এ ব্যাপারে আপনার মত কি?"

হযরত আসমা (রাঃ) জবাব দিয়েছিলেনঃ "হে আমার পুত্র। যদি তুমি হকের ওপর থাকো তাহলে পুরুষের মত লড়াই করে শাহাদাতের মর্যাদা অর্জন কর এবং কোন ধরনের জিল্লতি বা অপমান বরদাশত করবে না। আর যদি তুমি এসব দুনিয়া অর্জনের জন্য করে থাকো তাহলে তোমার চেয়ে খারাব ব্যক্তি আর নেই। এভাবে তুমি নিজের পরিণামও খারাব করেছো এবং অন্যদেরকেও ধ্বংসে নিক্ষেপ করেছো।"

অন্য এক রাওয়ায়েতে হযরত আসমার (রাঃ) সঙ্গে এই বাক্যাবলী সংশ্লিষ্ট করা হয়েছেঃ "পুত্র। হত্যার ভয়ে কখনোই এমন কোন শর্ত কবুল করবে না যাতে তোমাকে জিল্লতী বরদাশত করতে হয়। খোদার কসম, ইজ্জতের সঙ্গে তরবারীর আঘাতে মৃত্যু জিল্লতীর সঙ্গে বেত্রাঘাত খাওয়ার চেয়ে অনেক উত্তম।"

আব্দুল্লাহ বিন যোবায়ের (রাঃ) জবাব দিলেন, "আম্মাজান। আমি হক এবং মৃত্যুর জন্য লড়াই করেছি এবং এজন্যই সঙ্গীদেরকে দিয়েও যুদ্ধ করিয়েছি। এখন আপনার নিকট থেকে বিদায় নিতে এসেছি।"

হযরত আসমা (রাঃ) বললেনঃ " পুত্র। যদি তুমি হকের ওপর থেকে থাকো, তাহলে পরিস্থিতির প্রতিকূলতা এবং সঙ্গীদের বিশ্বাসঘাতকতার কারণে শত্রুর সামনে মাথা নত করা শরীফ এবং দ্বীনদারদের কাজ নয়।"

ইবনে যোবায়ের (রাঃ) আরজ করলেনঃ " আম্মাজান। আমি মৃত্যুকে ভয় করি না। শুধুমাত্র এই ধারণা করি যে, মৃত্যুর পর শত্রু আমার লাশ বিকৃত করবে এবং শূলে চড়াবে। এতে আপনি খুব কষ্ট পাবেন।"

সিদ্দিকে আকবরের (রাঃ) জালিলুল কদর কন্যা বললেনঃ " পুত্র। বকরী যখন জবেহ করে ফেলা হয় তখন তার চামড়া ছাড়িয়ে ফেলা হোক অথবা তার শরীর

www.bjilibrary.com

টুকরা টুকরা করা হোক, তাতে পরোয়া কিসের? তুমি আল্লাহর ওপর ভরসা করে নিজের কাজ চালিয়ে যাও। হক পথে তরবারীর কিমা হওয়া গুমরাহীর গোলামী থেকে হাজার গুণ উত্তম। মৃত্যুর ভয়ে গোলামীর জিল্লতী কখনো কবুল করোনা।"

মহান মাতার এই অভয় বাণী শুনে হযরত আব্দুল্লাহ (রাঃ) আবেগাপ্লুত হয়ে উঠলেন এবং শ্রদ্ধা ও ভালোবাসায় তিনি তাঁর আম্মার মাথা চুম্বন করলেন। অতঃপর আরজ করলেনঃ আম্মাজান! হক পথে বীরের মত লড়াই করে জীবন দান করাই আমারও ইচ্ছে ছিল। কিন্তু আপনার সঙ্গে পরামর্শ করা জরুরী মনে করেছি। যাতে আমার মৃত্যুর পর আপনি দুঃখিত না হন। আলহামদুলিল্লাহ! আপনাকে আমি আমার চেয়েও অটল ও সন্তুষ্ট পেয়েছি। আপনার কথা আমার ঈমান তাজা করেছে। আজ আমি অবশ্যই নিহত হবো। আমার বিশ্বাস, নিহত হওয়ার পর আপনি ধৈর্য এবং শোকরের সঙ্গে কাজ করবেন। খোদার কসম! আমি সত্যভাবে বলছি, আজ পর্যন্ত যা কিছু করেছি তা সবই হকের উজ্জীবনের জন্যই করেছি। আমি কখনো খারাবকে পছন্দ করিনি, কোন মুসলমানের ওপর জুলুম করিনি, কখনো প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করিনি, কখনো আমানতের খেয়ানত করিনি, আমলাদেরকে কড়া সমালোচনা করেছি, নিজের খেলাফত কালে যতদূর সম্ভব ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করেছি, মানুষদের দিয়ে খোদা এবং রাসূলের (সাঃ) নির্দেশাবলী কার্যকর করিয়েছি এবং তাদেরকে খারাব কাজে বাধা দিয়েছি। আল্লাহ্র শপথ! আমি দ্বীনের আগে দুনিয়াকে সত্য জেনেছি। আল্লাহ্র সন্তুষ্টি ছাড়া আমার আর কোন উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য নেই।"

অতঃপর আসমানের দিকে তাকালেন এবং বললেন: ''আল্লাহ্! এইসব কথা আমি অহংকার করে বলিনি। বরং শুধুমাত্র শ্রদ্ধেয় মায়ের প্রশান্তি এবং ইত্মিনানের জন্যবলেছি।"

হযরত আসমা (রাঃ) তাঁকে দোয়া করলেন এবং বললেন:"পুত্র! তুমি আল্লাহ্র রাস্তায় জীবন দাও। ইনশাআল্লাহ আমি সাবের এবং শাকের থাকবো। এখন কাছে এসো। তোমাকে সর্বশেষ আদর করি।"

আব্দুল্লাহ (রাঃ) কাছে গেলেন। বৃদ্ধা মা নিজের কলিজার টুকরাকে গলায় মিলালেন এবং তাঁর মুখ ও মাথায় চুম্বন দিলেন। এসময় হযরত আব্দুল্লাহ (রাঃ) যিরাহ পরিধান করেছিলেন। হযরত আসমার (রাঃ) হাত তাঁর যিরাহ্র (বর্ম) ওপর পড়লে জিজ্ঞেস করলেন," পুত্র! তোমার শরীরের ওপর এটা কি?"

আরজ করলেন, "যিরাহ। যাতে দুশমনের আঘাত থেকে পরিত্রাণ পেতে পারি।"

www.bjilibrary.com

হযরত আসমা (রাঃ) বললেনঃ "পুত্র! আল্লাহর পথে শহীদ হওয়ার জন্য বের হও আর এইসব ক্ষণস্থায়ী জিনিসের সাহায্য নিয়ে থাকো।"

হযরত আব্দুল্লাহ (রাঃ) তৎক্ষণাৎ যিরাহ খুলে ফেলে দিলেন। মাথায় সাদা রুমাল বাঁধলেন এবং মাকে বললেন,"আম্মাজান! এখন আমার শরীরে সাধারণ পোশাকরয়েছে।"

হযরত আসমা (রাঃ) বললেন: " পুত্র, আমি এখন খুশী। যাও,আল্লাহর রাস্তায় লড়াই কর এবং তাঁর নিকট এই পোশাক পরিধান করেই গমন কর।"

হযরত আব্দুল্লাহ (রাঃ) তরবারী হাতে নিলেন এবং বীরত্ব গাথা পড়তে পড়তে শত্রুর ব্যূহে ঢুকে পড়লেন। বহুক্ষণ ধরে বীরত্বের সঙ্গে লড়াই করে আঘাতে আঘাতে জর্জরিত হয়ে সিদ্দিকে আকবরের (রাঃ) এই মহান নাতি এবং হযরত আসমার (রাঃ) কলিজার টুকরা প্রকৃত মালিকের সঙ্গে মিলিত হলেন।

ইবনে যোবায়েরের (রাঃ) শাহাদাতের খবর শুনে হাজ্জাজ বিন ইউসুফ খুব খুশী হলো এবং তাঁর লাশ হাজুন নামক স্থানে শূলে চড়িয়ে দেয়ার নির্দেশ দিলো। হযরত আসমা (রাঃ) হাজ্জাজের এই তৎপরতার কথা অবহিত হলেন এবং এক বার্তায় হাজ্জাজকে বলে পাঠালেন, আল্লাহ তোমাকে ধবংস করুক। তুমি আমার কলিজার টুকরার লাশকে শূলে কেন চড়িয়েছ?

জবাবে হাজ্জাজ বলে পাঠালো, "আমি ইবনে যোবায়েরের (রাঃ) পরিণামের মাধ্যমে লোকদেরকে শিক্ষা দিতে চাই।"

হযরত আসমা (রাঃ) দাফন–কাফনের জন্য পুত্রের লাশ ফেরত দানের জন্য পুনরায় তাকে বলে পাঠান।

প্রস্তরবৎ কঠিন অন্তরের অধিকারী হাজ্জাজ লাশ প্রদানে স্পষ্ট অস্বীকৃতি জানালো।

ইবনে যোবায়েরের (রাঃ) শাহাদাতের এক দুই দিন পর হযরত আব্দুল্লাহ (রাঃ) বিন ওমর (রাঃ) হাজুনের নিকট দিয়ে অতিক্রম করছিলেন। এ সময় তাঁর লাশ শূলের ওপর দেখে মর্মাহত হলেন এবং তার নীচে দাঁড়িয়ে বললেন:

"হে ইবনে যোবায়ের! আসসালামু আলাইকা। আমি তোমাকে (রাজনীতিতে) জড়িয়ে পড়তে নিষেধ করেছিলাম। তুমি নামায পড়তে, রোযা রাখতে এবং আত্মীয়ের হক আদায় করতে।"

www.bjilibrary.com

শাহাদাতের তৃতীয় দিনে হযরত আসমা (রাঃ) এক দাসীর সহযোগিতায় হাজুনে উপস্থিত হলেন। ঘটনাক্রমে সে সময় হাজ্জাজও সেখানে ঘোরা-ফিরা করছিল। লোকজন হযরত আসমাকে (রাঃ) হাজ্জাজের উপস্থিতির খবর দিলো। তিনি বললেন: "এই সওয়ারের নামার সময় কি এখনো হয়নি?"

হাজ্জাজ বললো," সে মুলহিদ ছিল। এটাই ছিল তার প্রাপ্য শাস্তি।"

হযরত আসমা (রাঃ) তড়পে উঠলেন এবং বললেন ঃ "খোদার কসম! সে খোদাদ্রোহী বা মুলহিদ ছিল না। বরং নামাযী, রোযাদার এবং মুত্তাকী ছিল।"

হাজ্জাজ ঝাঁঝালো কণ্ঠে বললো, "এই বুড়ি, এখান থেকে চলে যাও। তোমার জ্ঞান লোপ পেয়েছে।"

হযরত আসমা (রাঃ) অত্যন্ত নির্ভীকতার সঙ্গে জবাব দিলেন, "আমার জ্ঞান লোপ পায়নি। খোদার কসম! আমি রাসূলকে (সাঃ) বলতে শুনেছি যে, বনু ছাকিফে এক কাজ্জাব বা মিথ্যাবাদী এবং জালেম জন্মগ্রহণ করবে। মিথ্যাবাদীকে (অর্থাৎ মুখতার বিন আবু উবায়েদ ছাকাফী) তো আমরা দেখেছি। আর তুমি হলে সেই জালেম।"

অন্য এক রাওয়ায়েতে আছে, হাজ্জাজ যখন শুনলো যে ইবনে ওমর (রাঃ) ইবনে যোবায়েরের (রাঃ) লাশের নীচে দাঁড়িয়ে তাঁর প্রশংসা করেছেন, তখন সে লাশ নামিয়ে ইহুদীদের কবরস্থানে নিক্ষেপ করলো এবং হযরত আসমাকে (রাঃ)ডেকে পাঠালো। তিনি লাশের নিকট যেতে অস্বীকৃতি জানালেন। হাজ্জাজ বলে পাঠালো যে, আমার হুকুম তামিল কর নচেত চুলের ঝুঁটি ধরে মাটিতে টানা হবে।

হযরত আসমা (রাঃ) জবাবে বলে পাঠালেন: আল্লাহর কসম! চুলের ঝুঁটি ধরে না টানা পর্যন্ত আমি যাবোনা।"

এতে হাজ্জাজ বাধ্য হয়ে হযরত আসমা (রাঃ)'র নিকট গেলো এবং বলতে লাগলো , "হে জাতুন নিতাকাইন! সত্যি করে বলতো, খোদার শত্রুর পরিণাম কেমন হয়েছে?"

হযরত আসমা (রাঃ) বললেন: "হ্যাঁ, তুই আমার পুত্রের দুনিয়া খারাব করেছিস। কিন্তু সে তোর আখিরাত বরবাদ করে দিয়েছে। আমি শুনেছি, তুই আমার পুত্রকে ব্যঙ্গ করে ইবনে জাতুন নিতাকাইন বলছিস। খোদার কসম! আমি জাতুন নিতাকাইন। আমি রাসূল (সাঃ) ও হযরত আবুবকরের (রাঃ) খাদ্যের পাত্রের মুখ

www.bjilibrary.com

আমার নিতাক দিয়ে বেঁধেছিলাম। কিন্তু আমি স্বয়ং হুজুর (সাঃ) থেকে শুনেছি, বনি ছাকিফে একজন কাজ্জাব ও সাফফাক হবে। কাজ্জাব বা মিথ্যাবাদীকে আমরা দেখেছি। সাফফাক বা জালেমকে দেখার বাকী ছিল। সেই জালেম তুই।"

হাজ্জাজ হযরত আসমার (রাঃ) নির্ভীক কথা শুনে চুপ করে গেল এবং কানে হাত দিয়ে সেখান থেকে চলে গেল।

হযরত আসমা (রাঃ) যখন হাজ্জাজ বিন ইউসুফের নিকট নিরাশ হলেন এবং বুঝতে পারলেন যে, সে কলিজার টুকরার লাশ তাঁর কাছে দেবে না, তখন তিনি কারোর মাধ্যমে আব্দুল মালিকের নিকট দামেস্কে পয়গাম প্রেরণ করলেন।

এক রাওয়ায়েতে আছে, ইবনে যোবায়েরের (রাঃ) সহোদর উরওয়াহ বিন যোবায়ের (রঃ) মক্কা অবরোধকালে শেষ পর্যন্ত তাঁর সঙ্গে ছিলেন। যখন আব্দুল্লাহ বিন যোবায়ের (রাঃ) শহীদ হয়ে গেলেন এবং হাজ্জাজ তাঁর লাশ শূলে চড়ালো, তখন তিনি গোপনভাবে মক্কা থেকে আব্দুল মালিকের নিকট দামেস্ক পৌছলেন। তিনি উরওয়াহর সঙ্গে অত্যন্ত ভালোবাসা এবং সম্মানজনক ব্যবহার করলেন এবং সিংহাসনে নিজের পাশে স্থান দিলেন। উরওয়াহ তাঁকে মক্কার সকল অবস্থা বর্ণনা করলেন এবং ইবনে যোবায়েরের (রাঃ) লাশ হযরত আসমার (রাঃ) নিকট প্রত্যর্পণের লক্ষ্যে হাজ্জাজকে নির্দেশ দানের আবেদন জানালেন। আব্দুল মালেক তৎক্ষণাৎ হাজ্জাজকে ক্রোধমিশ্রিত একটি পত্র লিখলেন। পত্রে তিনি তার এই তৎপরতাকে খুবই জঘন্য বলে আখ্যায়িত করলেন এবং হযরত ইবনে যোবায়েরের (রাঃ) লাশ কালবিলম্ব না করে হযরত আসমার (রাঃ) নিকট হস্তান্তরের নির্দেশ দিলেন। আব্দুল মালিকের চিঠি পৌছার পর হাজ্জাজ ইবনে যোবায়েরের (রাঃ) লাশ হযরত আসমার (রাঃ) হাওয়ালা করলো।

ইবনে আবি মালিকাহ (রঃ) নামক একজন প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ হলো, তিনিই সর্বপ্রথম হযরত আসমাকে (রাঃ) ইবনে যোবায়েরের (রাঃ) লাশ তাঁর হাওয়ালা করার সুখবর দিয়েছিলেন। তিনি তাঁকে লাশ গোসল দেয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন। লাশ ছিন্নভিন্ন হয়ে পড়েছিল। শরীরের এক এক অংশ গোসল দিয়ে কাফনের কাপড়ে রাখা হয়েছিল। যখন শরীরের সমগ্র অংশ গোসল দেয়া হলো তখন হযরত আসমা(রাঃ) কলিজার টুকরার মাগফিরাত কামনা করে দোয়া করলেন। অতঃপর সকলে মিলে জানাযা পড়ে ইবনে যোবায়েরকে (রাঃ) হাজুন নামক স্থানে দাফন করা হলো। এর পূর্বে হযরত আসমা (রাঃ) বলেছিলেন যে, হে আল্লাহ! আমাকে পুত্রের লাশ কাফন দাফন পর্যন্ত জীবিত রেখো। এই ঘটনার সাত দিন পর (

www.bjilibrary.com

অথবা কতিপয় রাওয়ায়েত অনুযায়ী ২০ দিন অথবা একুশ দিন) হযরত আসমাও (রাঃ) পরপারে যাত্রা করেন। মৃত্যুর সময় তাঁর বয়স হয়েছিল প্রায় একশ বছর। কিন্তু দাঁতগুলো সুন্দর এবং জ্ঞানও সম্পূর্ণ সঠিক ছিল।

কতিপয় রাওয়ায়েতে আছে যে, শেষ বয়সে দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ হয়ে এসেছিল। এজন্য আব্দুল্লাহ বিন যোবায়েরের (রাঃ) শাহাদাতের ঘটনা স্বচক্ষে দেখতে পাননি। বরং শুনে শুনে সব জানতে পেরেছিলেন।

হযরত যোবায়েরসহ (রাঃ) হযরত আসমাকে (রাঃ) আল্লাহ পাক পাঁচ পুত্র এবং তিন কন্যা দান করেছিলেন। তাঁরা হলেনঃ আব্দুল্লাহ (রাঃ), উরওয়াহ (রঃ), মানযার (রঃ), মুহাজির (রঃ), আছেম (রঃ), খাদিজাতুল কোবরা (রাঃ), উম্মিল হাসান (রাঃ) এবং আয়েশা (রাঃ)। তাঁদের মধ্যে হযরত আব্দুল্লাহ (রাঃ) এবং উরওয়াহ (রঃ) ইতিহাসে অবিস্মরণীয় খ্যাতি লাভ করেন।

হযরত আসমা (রাঃ) ইলম ও ফজিলতের দিক দিয়ে অত্যন্ত উঁচু স্থানে সমাসীন ছিলেন। তাঁর থেকে ৫৬টি হাদিস বর্ণিত আছে।

হযরত আসমা (রাঃ) দীর্ঘ জীবনে কালের অসংখ্য উত্থান-পতন প্রত্যক্ষ করেছেন। তিনি ইসলামের ইতিহাসের অন্যতম ব্যক্তিত্ব যাঁরা জাহেলিয়াতের যামানাও দেখেছেন এবং সমগ্র রিসালাতের কাল ও খোলাফায়ে রাশেদীনের স্বর্ণ যুগও দেখেছেন। নিজের মহান পুত্রের উত্থান যুগও দেখেছেন এবং তাঁর মর্মান্তিক শাহাদাতের দৃশ্যও প্রত্যক্ষ করেছেন। বিভিন্ন সময় তাঁর ওপর মুসিবতের পাহাড় আপতিত হয়েছে কিন্তু তিনি সব সময় সীমাহীন দৃঢ়তা, অটলতা, ধৈর্য এবং ঈমানী সাহসিকতা দেখিয়েছেন। নিঃসন্দেহে তিনি ইসলামের ইতিহাসে একজন মহান ব্যক্তিত্ব এবং তাঁর কর্মময় জীবন মুসলমানদের জন্য এক আলোকবর্তিকা হিসেবে কাজকরবে।

www.bjilibrary.com

হযরত ফাতিমা (রাঃ) বিনতে খাত্তাব

রহমতে আলমের (সাঃ) নবুয়ত প্রাপ্তির প্রথম যুগের কথা। একদিন হুজুর (সাঃ) হযরত আবুবকর সিদ্দিক (রাঃ) ও অন্যান্য কতিপয় জীবন উৎসর্গকারী সাহাবী সমভিব্যাহারে কাবা শরীফে তাশরীক নিলেন। সে সময় সেখানে কোরেশের অনেক নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ) হুজুরের (সাঃ) অনুমতিক্রমে তাঁদের সামনে এক হৃদয়গ্রাহী ভাষণ দিলেন। এই ভাষণে তিনি কুফর ও শিরকের সমালোচনা করলেন এবং দ্বীনে হক কবুল করার দাওয়াত দিলেন। মুশরিকরাতো তাওহীদের দাওয়াত কবুল করলোইনা বরং তাদের ওপর উল্টো প্রতিক্রিয়া হলো। ভাষণ শেষ না হতেই হকের দুশমনরা অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে উঠলো। চারদিক থেকে একত্রিত হয়ে মুসলমানদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো এবং অত্যন্ত নির্দয়ভাবে তাঁদেরকে প্রহার করতে শুরু করলো। তাদের প্রধান লক্ষ্য ছিল হযরত আবুবকর সিদ্দিক (রাঃ)। অন্যতম কোরেশ সরদার উতবাহ বিন রবিয়াহ ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে সিদ্দিকে আকবরের (রাঃ) পবিত্র মুখের ওপর জুতো দিয়ে প্রচন্ডভাবে আঘাত হানলো। অতঃপর তাঁর পেটের ওপর চড়ে লাফাতে লাগলো। এই নির্যাতনে সিদ্দিকে আকবর (রাঃ) গুরুতরভাবে আহত হলেন। আঘাতের তীব্রতায় তাঁর পবিত্র চেহারা চেনাই যাচ্ছিলো না। সে সময় সারওয়ারে আলমও (সাঃ) সেখানে উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু মুশরিকরা তাঁকে পিছে হটিয়ে দেয়া ছাড়া আর কিছু বললোনা। বনু হাশিম সরদার হযরত আবু তালিবের মান-মর্যাদা ও হযরত খাদিজাতুল কুবরার (রাঃ) স্বামী হওয়ার কারণে তিনি রেহাই পেয়ে গেলেন। ওদিকে হযরত আবুবকর সিদ্দিকের (রাঃ) গোত্র বনু তাইমের লোকেরা খবর পেল যে, কতিপয় ব্যক্তি হযরত আবুবকরকে (রাঃ) মেরে ফেলছে। এই খবর পেয়ে তাঁরা দৌড়াতে দৌড়াতে মসজিদে হারামে পৌছলো এবং হযরত আবুবকর সিদ্দিককে (রাঃ) মুশরিকদের নির্যাতনের পাঞ্জা থেকে ছাড়িয়ে নিল। সে সময় সিদ্দিকে আকবর (রাঃ) অজ্ঞান ও এমন গুরুতর আহত ছিলেন যে তাঁর জীবিত থাকাটা খুব কঠিন মনে হচ্ছিল। তাঁর অবস্থা দেখে বনু তাইম গোত্রের লোকেরা অগ্নিশর্মা হয়ে উচ্চৈস্বরে বলতে লাগলো, আবুবকরের মৃত্যু হলে তারা তার প্রতিশোধ নেবে এবং উতবাহ বিন রবিয়াহকেও জীবিত রাখবে না। এরপর তারা হযরত আবুবকর সিদ্দিককে (রাঃ) এক খন্ড কাপড়ে জড়িয়ে তাঁর বাড়ী

www.bjilibrary.com

নিয়ে গেল। এ সময় সিদ্দিকে আকবরের (রাঃ) পিতা আবু কাহাফাহ এবং বনু তাইমের লোকজন তাঁকে অব্যাহতভাবে ডাকতে শুরু করলো, কিন্তু তিনি কোন জবাব দিতে পারছিলেননা। আসরের পর জ্ঞান ফিরলে কথা বলার উপযোগী হলে সর্বপ্রথম তাঁর মুখ দিয়ে উচ্চারিত হলোঃ "রাসূলের (সাঃ) কি আবস্থা?"

একথা শুনে বনু তাইমের লোকজন বিরক্ত হয়ে ভর্ৎসনা দিয়ে বললো, তুমি এই অবস্থাতেও মুহাম্মাদের (সাঃ) চিন্তা ছাড়তে পারলে না! অতঃপর তারা হযরত আবুবকর সিদ্দিকের (রাঃ) মা উম্মুল খায়েরকে বললো, তুমি নিজেই তার দেখাশুনা ও সেবা-শুশ্রূষা কর। যদি কিছু খেতে চায় তাহলে খাইয়ে দাও। একথা বলে যখন তারা চলে গেল তখন উম্মুল খায়ের হযরত আবুবকর সিদ্দিককে (রাঃ) কিছু খানা-পিনার জন্য পীড়াপীড়ি করলেন। কিন্তু তিনি কিছুই খানা-পিনা করলেন না এবং একই কথা জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) কেমন আছেন। উম্মুল খায়ের (তখনো ইসলাম গ্রহণ করেননি) প্রত্যেকবারই জবাবে বললেন যে, খোদার কসম, তিনি তাঁর সাথীর ব্যাপারে কিছুই জানেন না। অবশেষে হযরত আবুবকর সিদ্দিক (রাঃ) তাঁকে উম্মে জামিলের নিকট গিয়ে রাসূলের (সাঃ) অবস্থা জেনে আসার কথা বললেন। উম্মুল খায়ের তৎক্ষণাৎ উম্মে জামিলের নিকট পৌছলেন এবং বললেন আবুবকর গুরুতর আহত হয়ে চরম অবস্থায় আছে এবং সে তোমার নিকট মুহাম্মাদ (সাঃ) বিন আবদুল্লাহর অবস্থা জানতে চেয়েছে। উম্মে জামিল তাঁকে কিছুই বললেন না। বরং তিনি বললেন, তুমি চাইলে আমি তোমার সঙ্গে আবুবকরের (রাঃ) নিকট যেতে পারি। উম্মুল খায়ের বললেন, ঠিক আছে, চলো।

উম্মে জামিল সিদ্দিকে আকবরের (রাঃ) গৃহে পৌছে তাঁর অবস্থা দেখে অত্যন্ত বেকারার হয়ে বললেন, "খোদার কসম! যারা আপনার সঙ্গে এই আচরণ করেছে তারা নিঃসন্দেহে কাফির এবং ফাসিক। আমি আশা করি, আল্লাহ পাক অবশ্যই তাদের বিরুদ্ধে আপনার প্রতিশোধ নেবেন।" অতঃপর তিনিও হযরত আবুবকরের (রাঃ) নিকট কিছু খানা-পিনার জন্য অনুরোধ করলেন। কিন্তু সিদ্দিকে আকবর (রাঃ) একই জবাব দিলেন যে, প্রথমে রাসূলুল্লাহর (সাঃ) অবস্থা বলো। উম্মে জামিল (রাঃ) বললেন, এর জবাব আপনার আম্মা শুনাবেন।

সিদ্দিকে আকবর (রাঃ) বললেন, "তুমি তাঁকে ভয় করো না।" উম্মে জামিল (রাঃ) বললেন, আলহামদুলিল্লাহ, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) সহিহ সালামতে আছেন। আপনি কোন চিন্তা করবেন না। হযরত আবুবকর সিদ্দিক (রাঃ) জিজ্ঞাসা করলেন, এখন তিনি কোথায় আছেন? উম্মে জামিল (রাঃ) জবাব দিলেন, তিনি দারে আরকামে আছেন।

www.bjilibrary.com

হযরত আবুবকর সিদ্দিক (রাঃ) বললেন, খোদার কসম! রাসূলকে (সাঃ) না দেখা পর্যন্ত আমি কিছু খাবোও না এবং পানও করবো না।

সে সময় লোকজন হযরত আবুবকরের (রাঃ) খবর নেয়ার জন্য সেখানে যাতায়াত করছিলো। যখন তাদের গমনাগমন শেষ হলো তখন উম্মে জামিল এবং উম্মুল খায়ের হযরত আবুবকরকে (রাঃ) ধরে দারে আরকামে বা আরকাম গৃহে রাসূলের (সাঃ) খিদমতে নিয়ে গেলেন। হুজুর (সাঃ) হযরত আবুবকর সিদ্দিককে দেখে অশ্রুসিক্ত হয়ে পড়লেন এবং এগিয়ে গিয়ে কপালে চুমু দিলেন। এই অবস্থা প্রত্যক্ষ করে অন্যান্য মুসলমানও রোরুদ্যমান হয়ে পড়লেন। যে দুই মহিলা হযরত আবুবকর সিদ্দিককে (রাঃ) সহায়তা দিয়ে হুজুরের (সাঃ) খিদমতে উপস্থিত করেছিলেন তাঁদের মধ্যে হযরত উম্মে জামিল (রাঃ) প্রথমেই হুজুরের (সাঃ) প্রতি জীবন উৎসর্গকারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিলেন। অবশ্য উম্মুল খায়ের তখনো ইসলাম গ্রহণের সৌভাগ্য লাভ করেননি। এ সময় হযরত আবুবকর সিদ্দিক (রাঃ) রহমতে আলমের (সাঃ) খিদমতে আরজ করলেনঃ "হে আল্লাহর রাসূল ! আমার মুহসিনাহ মাতার হেদায়াতের জন্য দোয়া করুন।"

হুজুর (সাঃ) সে সময়ই তাঁর জন্য দোয়া করলেন এবং তিনিও ঈমানের নিয়ামতে পূর্ণ হয়ে গেলেন।

উম্মে জামিল (রাঃ) নামক কুনিয়তের এই মহিলা নবীর (সাঃ) নবুয়ত প্রাপ্তির প্রথম যুগেই ইসলাম গ্রহণের সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন। তাঁর ওপর সাইয়েদুল মুরসালিন (সাঃ) ও হযরত আবুবকর সিদ্দিকের (রাঃ) সীমাহীন আস্থা ছিল। আর তিনি ছিলেন হযরত সাইয়েদেনা ওমর ফারুকের (রাঃ) বোন ফাতিমা (রাঃ) বিনতে খাত্তাব।

হযরত উম্মে জামিল ফাতিমা (রাঃ) বিনতে খাত্তাব অন্যতম জালিলুল কদর মহিলা সাহাবী হিসেবে পরিগণিত। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার হলো যে, চরিত গ্রন্থে তাঁর জীবনী সম্পর্কে খুব কমই জানা যায়। বংশধারা সম্পর্কে শুধু এতটুকুন বলাই যথেষ্ট যে, তিনি কোরেশের বনু আদি বংশোদ্ভুত ছিলেন এবং সাইয়েদেনা ফারুকে আযমের (রাঃ) বোন ছিলেন।

নসবনামা নিম্নরূপঃ ফাতিমা (রাঃ) বিনতে খাত্তাব বিন নুফাইল বিন আব্দুল উজ্জা বিন রাবাহ বিন আব্দুল্লাহ বিন কুরত বিন যাররাহ বিন আদি বিন ক'াব বিন লুব্বী বিন ফাহার বিন মালিক। কাব বিন লুব্বীর সঙ্গে হযরত ফাতিমার (রাঃ) বংশ ধারা হুজুরের (সাঃ) বংশের সাথে মিলে যায়।

www.bjilibrary.com

হযরত ফাতিমার (রাঃ) বিয়ে হযরত সাঈদ (রাঃ) বিন যায়েদের (বিন আমর বিন নুফায়েল) সঙ্গে সুসম্পন্ন হয়। তিনি আসহাবে আশারায়ে মুবাশশারাহর অন্যতম ছিলেন। স্বামী–স্ত্রী উভয়কেই আল্লাহ তায়ালা সুন্দর স্বভাব দান করেছিলেন। প্রিয় নবী (সাঃ) নবুয়ত প্রাপ্তির পর যেই হকের দাওয়াত প্রদান শুরু করলেন,অমনি হযরত সাঈদ (রাঃ) এবং ফাতিমা (রাঃ) নিশ্চিন্তায় অগ্রসর হলেন এবং দ্বীনে হক গ্রহণ করে ফেললেন। এর পূর্বে শুধুমাত্র হাতে গোনা কয়েকজন সৌভাগ্যবান সাহাবী ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। কতিপয় রাওয়ায়েতে আছে, হযরত ফাতিমা (রাঃ) বিনতে খাত্তাবের পূর্বে শুধুমাত্র ২৬ ব্যক্তি ঈমান এনেছিলেন । হযরত ফাতিমা (রাঃ) ২৭তম এবং হযরত সাঈদ (রাঃ) ২৮তম মুসলমান ছিলেন। এমনিভাবে স্বামী–স্ত্রী উভয়ই আস–সাবিকুনাল আওয়ালুনদের মধ্যেও বিশেষ বৈশিষ্ট্যের আধিকারী ।

যে যুগে হযরত ফাতিমা (রাঃ) ইসলাম গ্রহণ করেন সে যুগে তাঁর নামযাদা ভাই ওমর (রাঃ) বিনুল খাত্তাব দ্বীনে হক বিরোধীদের সামনের কাতারভুক্ত ছিলেন। দ্বীনের প্রতি হযরত ফাতিমার (রাঃ) নিষ্ঠার কারণেই একদিন ওমর বিনুল খাত্তাবকে ফারুকে আযম বানিয়ে দিয়েছিল। এটা হযরত ফাতিমার (রাঃ) জীবনের এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় এবং অধিকাংশ নেতৃস্থানীয় চরিতকার ঐতিহাসিক একে অত্যন্ত বিশদভাবে বর্ণনা করেছেন। তাছাড়া এমন কিছু রাওয়ায়েতও আছে যাতে হযরত ওমর ফারুকের (রাঃ) ইসলাম গ্রহণের ঘটনাকে অন্যভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। তাতে হযরত ফাতিমার (রাঃ) উল্লেখ নেই। কিন্তু ইবনে ইসহাক, আবুই য়া'লা, বায্‌যার, তিবরানী, বাইহাকী, দারেকুতনী এবং আরো কতিপয় ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতার সঙ্গে সেই মশহুর রাওয়ায়েতই বর্ণনা করেছেন। তবে বিশ্লেষণে অল্প বিস্তর পার্থক্য রয়েছে। কিন্তু ঘটনা প্রায় একই। তার সারমর্ম হলোঃ রাসুলের (সাঃ) নবুয়ত প্রাপ্তির ৬ষ্ঠ বছর পর একদিন হযরত ওমর (রাঃ) সাত সকালে হাতে নাঙ্গা তরবারী নিয়ে বের হলেন। উদ্দেশ্য রাসুলে করিমকে (সাঃ) চিরতরে খতম করে দেয়া। তাঁর এই উদ্দেশ্যের কারণ কি ছিল? কেউ কেউ লিখেছেন, হযরত ওমর (রাঃ) পাঁচ বছর পর্যন্ত হকপন্থীদের ওপর সব ধরনের নির্যাতন চালানোর পরও যখন তাঁদের কেউই ইসলাম থেকে পিছটান দিলেন না তখন তিনি বাধ্য হয়ে সেই রাসুল প্রদীপকেই নির্বাপিত করার সংকল্প করে বসলেন। কেউ কেউ এ ধারণাও করেছেন যে, দৈনন্দিন ইসলামের উন্নতি দেখে হযরত ওমর (রাঃ) মারাত্মক ধরনের মানসিক দ্বন্দ্বে নিপতিত হয়েছিলেন। যখন তিনি কিছু আত্মীয়–স্বজনকে ইসলামের খাতিরে ঘর–বাড়ী ছেড়ে হাবশার দিকে হিযরত করতে দেখলেন তখন মানসিক দ্বন্দ্ব আরো বৃদ্ধি পেল এবং তিনি ইসলামের মহান দায়ীকে (সাঃ)শহীদ করার সংকল্প করলেন।

www.bjilibrary.com

এক রাওয়ায়েতে আছে, রাসূলের (সাঃ) বাহাদুর চাচা হযরত হামযাহ (রাঃ) বিন আবদুল মুত্তালিব যখন ঈমান আনলেন তখন কোরেশ মুশরিকদের ওপর এক কঠিন আঘাত লাগল। তারা উত্তেজিত হয়ে এক সাধারণ সমাবেশ ডাকলো। এই সমাবেশে আবু জেহেল ঘোষণা দিল যে, যে ব্যক্তি মুহাম্মাদকে (সাঃ) হত্যা করবে তাকে একশতটি লাল উট (যা অত্যন্ত মূল্যবান) এবং ৪০ হাজার দিরহাম নগদ পুরস্কার হিসেবেদেবো।

হযরত ওমরও (রাঃ) এই সমাবেশে উপস্থিত ছিলেন। তিনিতো পুরস্কারের জন্য লালায়িত ছিলেন না। কিন্তু নিজের শক্তির ওপর অত্যন্ত গর্ব এবং অহংকার ছিল। আবু জেহেলের উত্তেজনাময় বক্তৃতা শুনে আবেগময় কণ্ঠে বললেন: "হে আবা হিকম! লাত ও উজ্জার কসম, যতক্ষণ আমি মুহাম্মাদকে (সাঃ) হত্যা না করবো ততক্ষণ মাটিতেবসবোনা।"

তিরমিজি শরীফে আছে যে, হযরত হামযা (রাঃ) ইসলাম গ্রহণের পর রাসূলের (সাঃ) অন্তরে আকাংখা জাগলো যে আল্লাহ যদি কোরেশের দুই স্তম্ভ আমর বিন হিশাম (আবু জেহেল) এবং ওমর বিনুল খাত্তাবের মধ্য থেকে কোন একজনকে ইসলামে অভিষিক্ত করতেন! বস্তুত তিনি দোয়া করলেন, اللهم اعزالاسلام باحد الرجلين اما ابن هشام واما عمر بن الخطاب "হে আল্লাহ! ইবনে হিশাম অথবা ওমর বিনুল খাত্তাবকে তুমি ইসলাম গ্রহণের সুযোগ দাও।"

এই দোয়া তাৎক্ষণিকভাবেই কবূল হলো এবং আল্লাহ পাক হযরত ওমর (রাঃ) বিন খাত্তাবকে ইসলামের সহযোগী বাহু হিসেবে বাছাই করলেন। এই ঘটনার (অর্থাৎ হুজুরের (সাঃ) দোয়ার) দ্বিতীয় দিনেই হযরত ওমর (রাঃ) হুজুরকে (সাঃ) শহীদ করার সংকল্প নিয়ে ঘর থেকে বের হলেন। পথিমধ্যে ঘটনাক্রমে তাঁর গোত্র বনু আদির হযরত নুয়াইম (রাঃ) বিন আব্দুল্লাহ আলখাম নামক ব্যক্তির সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হলো। গোপনভাবে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন:" ওমর! আজ হাতে তরবারী নিয়ে কোন দিকে যাচ্ছ?"

হযরত ওমর (রাঃ)ঃ আজ নিজের দ্বীন থেকে বিপথগামী সেই ব্যক্তিকে হত্যা করতে চলেছি যে কোরেশের একতাকে ভেঙ্গে খান খান করে ফেলেছে। আমাদের সবাইকেই আহমক বানিয়েছে। আমাদের মাবুদগুলোকে গালাগালি দিয়েছে এবং আমাদের দ্বীনকে অপবিত্র করেছে।

হযরত নুয়াইম (রাঃ)ঃ ওমর, এটা বড় ভয়ানক কাজ। খোদার কসম, তুমি ভুল ধারণায় নিয়োজিত আছ। যদি তুমি মুহাম্মাদকে (সাঃ) হত্যায় সফল হও

www.bjilibrary.com

তাহলে বনু আবদি মান্নাফ কি তোমাকে এই ধারাধামে চলাফেরার জন্য জীবিত রাখবে?

হযরত ওমর (রাঃ)ঃ আমি কারোর পরোয়া করিনা। মনে হয় যে, তুমিও নিজের পিতৃপুরুষের ধর্ম পরিত্যাগ করে মুহাম্মাদের (সাঃ) দ্বীন গ্রহণ করেছ। তোমাকেই না হয় প্রথমে তার স্বাদ চাখিয়ে দিই।

হযরত নুয়াইম (রাঃ)ঃ আমাকে না হয় পরেই তুমি স্বাদ চাখিও। প্রথমে নিজের ঘরের খবর নাও।

হযরত ওমর (রাঃ)ঃ আমার কোন ঘরওয়ালা?

হযরত নুয়াইম (রাঃ)ঃ তোমার বোন ফাতিমা (রাঃ) এবং ভগ্নিপতি সাঈদ (রাঃ) বিন যায়েদ। তাঁরা উভয়েই ইসলাম গ্রহণ করেছেন। আমার চেয়ে তাঁদের ওপরই তোমার হক বেশী।

হযরত ওমর (রাঃ) এই কথা শুনে ক্রোধে ফেটে পড়লেন। উল্টো হযরত ফাতিমার (রাঃ) গৃহে পৌছলেন। তখন সেখানে হযরত খাব্বাব (রাঃ) বিন আলাতও উপস্থিত ছিলেন। তাঁর নিকট একটি সহিফাহ ছিলো। তাতে সূরায়ে তাহা লিখিত ছিল। তিনি ভেতর থেকে দরজা বন্ধ করে হযরত ফাতিমা (রাঃ) এবং তাঁর স্বামী হযরত সাঈদকে (রাঃ) তা শিক্ষা দিচ্ছিলেন। হযরত ওমর (রাঃ) তাঁদের আওয়াজ শুনলেন এবং খুব জোরে দরজা খটখটালেন। হযরত ফাতিমা (রাঃ) বুঝে ফেললেন যে, লোকটি ওমর (রাঃ)। তাঁরা হযরত খাব্বাবকে (রাঃ) ঘরের পেছনের দিকে ঠেলে দিলেন এবং কুরআনে পাকের অংশকে তাড়াতাড়ি কোথাও লুকিয়ে দরজা খুলে দিলেন।

হযরত ওমর (রাঃ) গৃহে প্রবেশ করেই জিজ্ঞেস করলেনঃ "এটা কি ধরনের শব্দ ছিল, যা এক্ষণে আমি শুনতে পেলাম?"

হযরত ফাতিমা (রাঃ) এবং হযরত সাঈদ (রাঃ) বললেনঃ "তুমি কিছু শোননি।"

হযরত ওমর (রাঃ) অগ্নিশর্মা হয়ে বললেন ঃ "না, আমি শুনেছি। খোদার কসম! আমি শুনেছি যে তোমরা উভয়েই মুহাম্মাদের (সাঃ) দ্বীন গ্রহণ করেছ।"

একথা বলেই তিনি ভগ্নিপতিকে (হযরত সাঈদ (রাঃ) বিন যায়েদ) জাপ্টে ধরলেন। তাঁর লম্বা চুল ধরে মাটিতে ফেলে দিলেন এবং বেদম প্রহার শুরু করলেন।

www.bjilibrary.com

হযরত ফাতিমা (রাঃ) স্বামীকে বাঁচানোর জন্য উঠলেন। তাঁকেও তিনি মারলেন। অতঃপর হযরত সাঈদের (রাঃ) ওপর লাঠি দিয়ে বারি দিলেন। হযরত ফাতিমা (রাঃ) এগিয়ে এলেন। আর লাঠির বারি গিয়ে পড়লো তাঁর মাথায়। এতে রক্তের ফোয়ারা ছুটলো। এই অবস্থায় তিনি স্বামীর সঙ্গে একবাক্যে বললেনঃ "হাঁ, আমরা ইসলাম গ্রহণ করেছি। আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসুলের ওপর ঈমান এনেছি। তুমি যা ইচ্ছা তাই কর। আমরা কখনো দ্বীন পরিত্যাগ করবো না।"

অন্য এক রাওয়ায়েতে হযরত ফাতিমার (রাঃ) সঙ্গে এই কথা সংশ্লিষ্ট করা হয়েছেঃ "ভাই। বোনকে বিধবা কেন করছো। অবশ্যই আমাকে আগে শেষ করো। কিন্তু এখন দ্বীনে হক থেকে বের হতে পারবো না। বের হতে পারবো না। বের হতে পারবো না। দ্বীনে মুহাম্মাদের (সাঃ) ওপরই আমরা শেষ হবো।"

রক্তাক্ত বোনের মুখে এই কথা শুনে হযরত ওমর (রাঃ) হতভম্ব হয়ে পড়লেন এবং তাঁর ক্রোধ লজ্জায় পরিণত হলো। আরবের এই নামকরা সন্তান যিনি ভবিষ্যতে ফারুকে আযম হবেন তাঁকে ফাতিমা (রাঃ) বিনতে খাত্তাব অন্য পথে নিক্ষেপ করলেন। কিছু সময় চুপচাপ বসে থেকে বললেনঃ "আচ্ছা, যা তোমরা পড়ছিলে তা আমাকেও দেখাও।" হযরত ফাতিমা (রাঃ) বললেনঃ " আমরা ভয় পাই যে, তুমি তা নষ্ট করে ফেলবে।"

হযরত ওমর (রাঃ) নিজের মাবুদ সমূহের কসম খেয়ে বললেন, "তোমরা কোন সন্দেহ করো না। আমি তা পড়ে ফিরিয়ে দেব।"

হযরত ফাতিমার (রাঃ) অন্তরে এতক্ষণে ধারণা জন্মালো যে, সম্ভবত ভাইয়ের অন্তরে আল্লাহর কালামের প্রভাব পড়তে পারে। তিনি বললেনঃ "আমরা আল্লাহর কালাম পাঠ করছিলাম। এই সহিফায় আল্লাহর কালাম লিপিবদ্ধ রয়েছে। তা শুধু পবিত্র মানুষই স্পর্শ করতে পারে। যতক্ষণ পর্যন্ত তুমি গোসল না করে শরীর পবিত্র কর ততক্ষণ তা স্পর্শ করতে পারবে না।"

হযরত ওমর (রাঃ) উঠে গোসল করলেন এবং হযরত ফাতিমা (রাঃ) তাঁর হাতে পবিত্র সহিফাহ প্রদান করলেন। সূরায়ে তাহা'র প্রাথমিক অংশ পড়তেই তাঁর শরীরে কাঁপুনি এসে গেল। অন্তর থেকে কুফর ও শিরকের মরিচা দূর হতে লাগলো। যতই তিনি তিলাওয়াত করতে লাগলেন ততই কুরআনে করিমের শব্দের শওকাত, বর্ণনাভঙ্গী এবং ভাষার বিশুদ্ধতা তাঁকে গ্রাস করতে লাগলো। যখন তিনি এই আয়াতে পৌঁছলেনঃ

www.bjilibrary.com

اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ لَهُ الْاَسْمَآءُ الْحُسْنٰى অর্থাৎ" আল্লাহ (তিনিই) ছাড়া কেউই ইবাদতের যোগ্য নয়। তাঁর অত্যন্ত সুন্দর নাম রয়েছে।" এই আয়াত তিলাওয়াত করতেই তিনি আবেশাচ্ছন্ন হয়ে পড়লেন এবং অযাচিতভাবে বলে উঠলেন, "মা আহসানাল কালাম"–কত সুন্দর ও প্রিয় এই কালাম। হযরত ওমরের (রাঃ) মুখ দিয়ে যেই এই বাক্য উচ্চারিত হলো, সেই হযরত খাব্বাব (রাঃ) গৃহের পিছনের দিক থেকে বের হয়ে বাইরে এসে পড়লেন এবং খুশীর আবেগে হযরত ওমরকে (রাঃ) সম্বোধন করে বললেনঃ " হে ওমর! মুবারকবাদ। রাসূলের (সাঃ) দোয়া তোমার জন্য কবুল হয়েছে। হুজুর (সাঃ) কালই দোয়া করেছিলেন যে, হে আল্লাহ! আমর বিন হিশাম এবং ওমর (রাঃ) বিন খাত্তাবের মধ্যে থেকে যাকে তুমি চাও ইসলামে প্রবেশ করিয়ে দাও।"

কতিপয় রাওয়ায়েতে আছে, হযরত ফাতিমা (রাঃ) আহত হওয়ার পর হযরত ওমর (রাঃ) তাঁকে বলেছিলেন, তুমি যা পড়ছিলে তা আমাকে পড়ে শোনাও।

হযরত ফাতিমা (রাঃ) নিজের শরীর থেকে রক্ত পরিষ্কার করলেন। ওজু করে আল্লাহর কালামের পাতা বের করলেন। অতঃপর অত্যন্ত আবেগের সঙ্গে সূরায়ে তাহা তিলাওয়াত শুরু করলেন।

طٰهٰ ۚ مَآ اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْاٰنَ لِتَشْقٰٓى ۙ اِلَّا تَذْكِرَةً لِّمَنْ يَّخْشٰى ۙ تَنْزِيْلًا مِّمَّنْ خَلَقَ الْاَرْضَ وَالسَّمٰوٰتِ الْعُلٰى ۙ اَلرَّحْمٰنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوٰى ۝

যতই পড়তে লাগলেন হযরত ওমরের (রাঃ) অন্তর ততই আপ্লুত হতে থাকলো।

যখন তিনি

لَهٗ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرٰى ۝

পড়লেন তখন আর নিজেকে ধরে রাখতে পারলেন না। বলে উঠলেনঃ

"হে ফাতিমা । যা কিছু আসমানে এবং যমিনের নীচে রয়েছে তা সবই কি তোমাদের খোদার?"

হযরত ফাতিমা (রাঃ) জবাব দিলেন: "নিঃসন্দেহে, ভাই! আমাদের আল্লাহ বড় শান এবং কুদরতওয়ালা।"

www.bjilibrary.com

হযরত ওমর (রাঃ) বললেন, "আমাকেও এই পাতা দাও।"

হযরত ফাতিমা (রাঃ) জবাব দিলেন, "ভাই ! আমাদের আল্লাহর নির্দেশ হলো কেউ পাক-পবিত্র না হওয়া পর্যন্ত আল্লাহর কালাম স্পর্শ করতে পারবে না। আপনি প্রথমে গোসল করুন । তারপর আগ্রহের সঙ্গে পবিত্র পাতাসমূহ দেখুন।"

সুতরাং হযরত ওমর (রাঃ) উঠে গোসল করলেন এবং অত্যন্ত আগ্রহের সাথে আল্লাহর কালাম দেখতে শুরু করলেন। তার প্রভাব তাকে পরাজিত করে ফেলে... কিন্তু যখন তিনি

إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي

এই আয়াত পড়লেন তখন পরাভূত হয়ে পড়লেন এবং কেঁদে যার যার হতে লাগলেন। এমনকি সকল দাড়িই অশ্রুতে ভিজে গেল। অতঃপর ভগ্নিপতি এবং বোনকে সম্বোধন করে বললেনঃ "খোদার জন্য আমার বাড়াবাড়ি মাফ করে দাও এবং সাক্ষী থেকো যে, আমি সাচ্চা অন্তরে মুহাম্মাদের (সাঃ) ওপর ঈমান আনয়ন করছি।"

এরপর তিনি হযরত খাব্বাবের (রাঃ) প্রতি তাঁকে হুজুরের (সাঃ) নিকট নিয়ে যাওয়ার আবেদন জানালেন। যাতে তাঁর হাতে ইসলাম গ্রহণের সৌভাগ্য অর্জন করতে পারেন।

হযরত খাব্বাব (রাঃ) তাঁকে বললেন, হুজুর (সাঃ) এখন কতিপয় সাহাবীসহ দারে আরকামে অবস্থান করছেন। হযরত ওমর (রাঃ) কোমরে তরবারী বেঁধে আরকাম গৃহের দিকে রওয়ানা হলেন। সেখানে পৌছে দরজা নক করলেন। উপস্থিত সাহাবায়ে কিরাম দরজা খুলতে ইতস্তত করছিলেন। এ সময় হযরত হামযা (রাঃ) বললেন, দরজা খুলে দাও। ওমর যদি নেক ইচ্ছা নিয়ে এসে থাকে তাহলে ভালো। তা না হলে তার তরবারী দিয়েই তার মাথা উড়িয়ে দেব।"

দরজা খুলতেই হযরত ওমর (রাঃ) অস্থিরভাবে ঘরে প্রবেশ করলেন। হুজুর (সাঃ) তাঁর চাদর আপন মুঠোয় নিয়ে জোরের সঙ্গে টানলেন এবং বললেন, "ইবনে খাত্তাব। কোন নিয়তে এখানে এসেছ?"

নবুয়তের জালাল হযরত ওমরকে (রাঃ) কম্পিত করে তুললো। অবনত মস্তকে অত্যন্ত আদবের সঙ্গে আরজ করলেনঃ "ইয়া রাসূলাল্লাহ। আমি আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের (সাঃ) ওপর ঈমান আনয়নের উদ্দেশ্যে উপস্থিত হয়েছি।" এতে হুজুর

www.bjilibrary.com

(সাঃ) জোরের সঙ্গে আল্লাহ আকবার বলে উঠলেন। সকল সাহাবা (রাঃ) বুঝে ফেললেন যে, ওমর (রাঃ) মুসলমান হয়ে গেছেন। তাঁরা খুশীর আবেগে এত জোরে নারায়ে তাকবীর উচ্চারণ করলেন যে, মক্কার সকল পাহাড় গুঞ্জরিত হয়ে উঠলো।

হযরত ওমর (রাঃ) ইবনুল খাত্তাবের ইসলাম গ্রহণ ইতিহাসের এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। তিনি বাহাদুরী, বীরত্ব, নির্ভীকতা, দ্বীনের প্রতি মর্যাদাবোধ, তীক্ষ্নবুদ্ধি ও দূরদর্শিতার মাধ্যমে নিজেকে ইসলামের এক মহান স্তম্ভ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। ফারুকে আযমের (রাঃ) ইসলাম গ্রহণের ব্যাপারে হযরত ফাতিমা (রাঃ) বিনতে খাত্তাবের বিরাট অবদান রয়েছে। এটা তাঁর অটলতা এবং দ্বীনের প্রতি নিষ্ঠার ফলশ্রুতি ছিল। তাঁর কারণেই লৌহ মানবের অন্তরও বিগলিত হয়েছিল এবং হকের চির শত্রুর কাতার থেকে বের হয়ে তিনি হকের ঝান্ডাবাহীর কাতারে শামিল হয়েছিলেন।

হযরত ওমরের (রাঃ) ইসলাম গ্রহণের প্রশ্নে ওপরে বর্ণিত মশহুর রাওয়ায়েত থেকে জানা যায় যে, তিনি প্রথম হযরত নুয়াইমের (রাঃ) মুখে হযরত ফাতিমা এবং হযরত সাঈদ (রাঃ) বিন যায়েদের মুসলমান হওয়ার কথা জানতে পেরেছিলেন। কিন্তু সহিহ বুখারীর এক রাওয়ায়েত থেকে প্রতিষ্ঠিত হয় যে, হযরত ওমর (রাঃ) তাঁদের ইসলাম গ্রহণের ব্যাপারে প্রথম থেকেই অবহিত ছিলেন এবং ইসলাম গ্রহণের অপরাধে তাঁদেরকে বেঁধে রাখতেন। কিতাবুল মানাকিবে (সহিহ বুখারী) উল্লেখ রয়েছে যে, মজলুম অবস্থায় হযরত ওসমান জুন্নুরাইন (রাঃ) শহীদ হলে হযরত সাঈদ (রাঃ) বিন যায়েদ খুব দুঃখ পেলেন। সে সময় তিনি কুফায় অবস্থান করছিলেন। তিনি কুফার মসজিদে লোকদেরকে সম্বোধন করে বললেনঃ

"হে মানুষেরা। খোদার কসম, ইসলাম গ্রহণের অপরাধে ওমর (রাঃ) আমাকে এবং তাঁর বোনকে বেঁধে রাখতেন। সে সময় তিনি ইসলাম গ্রহণ করেননি। আর তোমরা ওসমানের (রাঃ) সঙ্গে যে দুর্ব্যবহার এবং বাড়াবাড়ি করেছ তাতে যদি ওহোদ পাহাড় ফেটে যায় তাহলে তা হবে যথার্থ।"

এই রাওয়ায়েতের শব্দাবলীতে স্পষ্ট হয় যে, হযরত ওমর (রাঃ) নিজের ইসলাম গ্রহণের পূর্বেই বোন এবং ভগ্নিপতির ওপর ইসলাম গ্রহণের অপরাধে কখনো কখনো নির্যাতন চালাতেন। কিন্তু এই নির্যাতন শুধু বাঁধা পর্যন্তই সীমাবদ্ধ ছিল। যেদিন তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন সেইদিন এই নির্যাতন সীমা ছাড়িয়ে যায় এবং তাঁর হাতে বোন গুরুতরভাবে আহত হন। সম্ভবত কুদরতের এইটিই মঞ্জুর ছিল যে, বোনের মাথা থেকে রক্ত প্রবাহিত হতে দেখে তাঁর পাষাণ হৃদয় নরম হবে।

www.bjilibrary.com

নবুয়তের ত্রয়োদশ বছরে প্রিয় নবী (সাঃ) সাহাবায়ে কিরামকে (রাঃ) মদীনায় হিজরতের অনুমতি দিলেন। এ সময় হযরত ফাতিমা (রাঃ) এবং তাঁর স্বামী হযরত সাঈদ (রাঃ) বিন যায়েদও প্রথম মুহাজিরদের সঙ্গে মদীনা পৌছলেন এবং হযরত আবু লুবাবাহ আনসারীর (রাঃ) গৃহে অবস্থান করেন। দুররে মানসুরের এক রাওয়ায়েত অনুযায়ী হযরত ফাতিমা (রাঃ) হযরত ওমর ফারুকের (রাঃ) খিলাফতকালে ওফাত পান। কিন্তু ইতিহাসবিদরা তাঁর ওফাতকাল সম্পর্কে অজ্ঞতা প্রকাশকরেছেন।

ইবনে আছির বর্ণনা করেছেন, হযরত ফাতিমা (রাঃ) একটি ছেলে রেখে গিয়েছিলেন। তাঁর নাম ছিল আবদুর রহমান। কিন্তু হাফিজ ইবনে আব্দুল বার (রঃ) লিখেছেন, তাঁর চার পুত্র ছিল। তাঁদের নাম হলোঃ আব্দুল্লাহ, আবদুর রহমান, যায়েদ এবংআসওয়াদ।

কতিপয় চরিতকার লিখেছেন, ইলম ও ফজিলতের দিক দিয়ে হযরত ফাতিমা (রাঃ) অত্যন্ত উঁচু মর্যাদার মানুষ ছিলেন। তিনি অত্যন্ত আকলমন্দ ছিলেন। সব সময় ভালো কাজে অগ্রসর থাকতেন। খারাব কাজ অপছন্দ করতেন এবং সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজ থেকে বিরত থাকার নির্দেশ পালন করে চলতেন।

www.bjilibrary.com

হযরত আসমা (রাঃ) বিনতে উমায়েস

খায়বারের যুদ্ধের (সপ্তম হিজরীর মুহাররাম) কিছু দিন পরের কথা। হযরত ওমর ফারুক (রাঃ) আপন তনয়া উম্মুল মুমিনিন হযরত হাফছার (রাঃ) সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য তাঁর গৃহে গমন করলেন। সে সময় সেখানে এক অপরিচিত মহিলা হযরত হাফছার (রাঃ) সঙ্গে আলোচনারত ছিলেন।

হযরত ওমর (রাঃ) জিজ্ঞেস করলেনঃ "এই মহিলা কে?"

হযরত হাফছা (রাঃ) জবাব দিলেনঃ "ইনি হলেন আসমা বিনতে উমায়েস। জাফর (রাঃ) বিন আবি তালিবের স্ত্রী।"

হযরত ওমর (রাঃ) বললেন, "সেই হাবশাওয়ালা এবং সমুদ্রওয়ালী?"

হযরত হাফছাা (রাঃ) বললেন; "হাঁ, তিনিই।"

হযরত ওমর ফারুক (রাঃ) সম্ভবত প্রফুল্লচিত্ততার কারণে বললেনঃ" আমরা তোমাদের পূর্বে মদীনা মুনাওয়ারাহ হিজরত করেছি। এজন্য তোমাদের থেকে আমরা রাসূলের (সাঃ) বেশী হকদার।"

একথা শুনে হযরত আসমা (রাঃ) ক্রোধান্বিত হয়ে বললেনঃ" জ্বী হা। আপনি ঠিকই বলেছেন। কিন্তু বাস্তব অবস্থা হলো, আপনারা রাসূলের (সাঃ) সঙ্গে থাকতেন। হুজুর (সাঃ) ক্ষুধাতুরদেরকে খাবার খাওয়াতেন এবং অজ্ঞদেরকে জ্ঞান দান করতেন। আর আমরা হাবশার দূরবর্তী স্থানে হিজরতের কঠোর অবস্থায় দিনাতিপাত করছিলাম। আমাদেরকে কষ্ট দেয়া হতো। আমরা ভীত থাকতাম। এসবই ছিল আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসূলের (সাঃ) সন্তুষ্টির লক্ষ্যে। খোদার কসম, আপনি যা বলেছেন তা রাসূলের (সাঃ) নিকট উল্লেখ না করা পর্যন্ত খানা-পিনা করবো না। খোদার কসম। কোন ধরনের মিথ্যা বলবো না, বাঁকা পথ অবলম্বন করবো না এবং এই ঘটনায় বাড়তি কিছু বলবো না।"

www.bjilibrary.com

এই আলোচনা চলাকালে সারওয়ারে আলমও (সাঃ) এসে উপস্থিত হলেন। হযরত আসমা (রাঃ) আরজ করলেনঃ "ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার পিতা–মাতা আপনার ওপর কুরবান হোক। ওমর এই কথা বলে।"

হুজুর (সাঃ) জিজ্ঞেস করলেন, " তা তুমি তাকে কি জবাব দিয়েছ ?"

হযরত আসমা (রাঃ) বললেনঃ" ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি তাঁকে এই এই বলেছি।"

হুজুর (সাঃ) ফরমালেন, "সে তোমার থেকে বেশী আমার মুসতাহিক নয়। ওমর এবং তাঁর সঙ্গীদের শুধুমাত্র একটি হিজরত। আর তোমরা নৌকাওয়ালাদের দুই হিজরত। " (অর্থাৎ মক্কা থেকে হাবশায় এবং হাবশা থেকে মদীনায়)।

হুজুরের (সাঃ) এই মুবারক ইরশাদে হযরত আসমা (রাঃ) এত খুশী হলেন যে, তাঁর মুখ দিয়ে তাকবির উচ্চারিত হলো। যখন এই আলোচনার কথা চর্চা হতে লাগলো তখন হাবশার মুহাজিররা অত্যন্ত উৎসাহ–উদ্দীপনার সঙ্গে হযরত আসমার (রাঃ) নিকট আসতেন। তাঁর নিকট ঘটনার বিস্তারিত্ব শুনতেন এবং খুশী হতেন। হযরত আসমা (রাঃ) বলতেন, হাবশার মুহাজিরদের জন্য দুনিয়ায় রাসূলের (সাঃ) এই মুবারক ইরশাদের চেয়ে বেশী উৎসাহযোগ্য ও খুশীর বস্তু আর কিছু ছিল না।

এই হলেন সেই আসমা (রাঃ) বিনতে উমায়েস, যাঁর মর্যাদার সত্যতা দুই হিজরতকারী হওয়ার কারণে স্বয়ং সাইয়েদুল আনাম ফখরে মওজুদাত (সাঃ) বর্ণনা করেছেন। তিনি ছিলেন খাছয়াম গোত্রের প্রদীপ । তিনি সেইসব জালিলুল কদর মহিলার অন্যতম ছিলেন, যাঁরা হক দাওয়াতের সম্পূর্ণ প্রথম যুগে কঠিন অবস্থায় এবং ভীতিকর পরিস্থিতিতে বেপরওয়া হয়ে ইসলাম গ্রহণের সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন। হযরত আসমার (রাঃ) পিতা উমায়েসের নসবনামা প্রশ্নে ইতিহাসবিদদের মধ্যে প্রচন্ড মতবিরোধ রয়েছে। কেউ কেউ উমায়েসের পিতার নাম মা'বাদ বিন তামিম লিখেছেন। আবার কেউবা লিখেছেন ম'বাদ বিন হারিছ। সর্বসম্মত মতে মা'র নাম ছিল হিন্দ (খাওলাহ) বিনতে আওফ। উম্মুল মুমিনিন হযরত মাইমুনা (রাঃ) বিনতে হারিছও তাঁর গর্ভেই জন্ম নিয়েছিলেন। এই সম্পর্কে হযরত আসমা (রাঃ) বিনতে উমায়েস হযরত মাইমুনার (রাঃ) সৎ বোন ছিলেন।

আল্লামা ইবনে সা'দ (রঃ) এবং ইবনে হিশাম বর্ণনা করেছেন, যে যুগে হযরত আসমা (রাঃ) বিনতে উমায়েস ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন, তখন শুধুমাত্র তিরিশ ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণের সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন। রাসূলে করিম (সাঃ) তখনো

www.bjilibrary.com

আরকাম গৃহে অবস্থান নেননি। এইদিক থেকে হযরত আসমার (রাঃ) "আস-সাবিকুনাল আউয়ালুন"দের পবিত্র জামায়াতেও বিশেষ স্থান রয়েছে। এছাড়া ইসলামের ইতিহাসে তিনি আরেকভাবে মশহুর হয়েছিলেন। তিন মহান ব্যক্তির সঙ্গে পর পর তাঁর বিয়ে হয়েছিল। এই তিন ব্যক্তি ইসলাম প্রাসাদের মহান স্তম্ভ এবং মানবতার পথ প্রদর্শক প্রিয় নবীর (সাঃ) অত্যন্ত প্রিয় ছিলেন। হযরত আসমার (রাঃ) প্রথম বিয়ে হয়েছিল হুজুরের চাচাতো ভাই হযরত জাফর তাইয়ার (রাঃ) বিন আবি তালিবের সঙ্গে। তাঁর শাহাদাতের পর দ্বিতীয়বার বিয়ে হয়েছিল হযরত আবুবকর সিদ্দিকের (রাঃ) সঙ্গে। তাঁর ওফাতের পর তৃতীয়বার বিয়ে হয়েছিল খোদার শের ও খায়বার বিজেতা হযরত আলী কাররামাল্লাহু ওয়াজহাহুর সঙ্গে। হযরত আসমা (রাঃ) এবং তাঁর প্রথম স্বামী হযরত জাফর (রাঃ) বিন আবি তালিব একই যুগে ইসলাম গ্রহণ করেন।

নবুয়ত প্রাপ্তির চতুর্থ বছরের প্রথমদিকে যখন রহমতে আলম (সাঃ) প্রকাশ্যে জনগণকে হকের প্রতি দাওয়াত প্রদান শুরু করলেন তখন মক্কার মুশরিকরা ক্রোধে পাগল প্রায় হয়ে গেল এবং হকপন্থীদের ওপর সীমাহীন নির্যাতন চালানো শুরু করলো। যখন এই নির্যাতন সহ্যের বাইরে চলে গেল তখন নবুয়ত প্রাপ্তির পঞ্চম বছর পর হুজুর (সাঃ) মুসলমানদেরকে হাবশায় (ইথিওপিয়া) হিজরত করার অনুমতি প্রদান করেন। এ সময় হাবশার বাদশাহ ছিলেন এক নেকদিল এবং ইনসাফ পছন্দ খৃষ্টান। বস্তুত প্রথমবার ১১ জন পুরুষ এবং চারজন মহিলার কাফেলাটি শায়িবাহ বন্দর থেকে জাহাজযোগে হাবশা রওয়ানা হলো। নবুয়তের ৬ষ্ঠ বছরের শুরুতে ৮০ জনের বেশী পুরুষ এবং ১৯ জন মহিলার সমন্বয়ে গঠিত অন্য একটি কাফেলা মক্কা থেকে বের হয়ে হাবশা অভিমুখে রওয়ানা দিল। এই কাফেলায় হযরত আসমা (রাঃ) বিনতে উমায়েস এবং তাঁর স্বামী হযরত জাফর (রাঃ) বিন আবি তালিবও শামিল ছিলেন। এমন লোকও এই কাফেলায় ছিলেন যাঁরা প্রথম হিজরতের পর হাবশা থেকে মক্কা চলে এসেছিলেন। কিন্তু এখানকার অবস্থা যথাযথ প্রতিকূল পেয়ে দ্বিতীয়বার হিজরতের জন্য অগ্রসর হয়েছিলেন।

মক্কার কোরেশরা তাঁদেরকে সমুদ্র পর্যন্ত পিছু ধাওয়া করেছিল। কিন্তু পৌছার আগেই তাঁরা কিশতিতে চড়ে রওয়ানা হয়ে গিয়েছিলেন। হাবশায় পৌছে তাঁরা নিরাপদ জীবন যাপন করতে লাগলেন। কিন্তু বিদেশ বিদেশই। মুহাজিররা বিভিন্ন ধরনের মুসিবতের সম্মুখীন হতে লাগলেন (অসুখ-বিসুখ ও দারিদ্রতা)। তবে তাঁরা তা ধৈর্য এবং অটলতার সঙ্গে বরদাশত করতে লাগলেন। এতদূরে থেকেও মক্কার কোরেশরা মুসলমানদের শান্তি সহ্য করতে পারছিল না। তারা হাবশার বাদশাহ

www.bjilibrary.com

নাজ্জাশীর নিকট উপঢৌকনসহ একটি প্রতিনিধি দল প্রেরণ করলো। বাদশাহকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করার লক্ষ্যেই এই প্রতিনিধিদল প্রেরণ করা হয়েছিল। এমনকি মুসলমানদেরকে যাতে তিনি হাবশা থেকে বের করে দেন সে ব্যবস্থাও নেয়া হয়। এই প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব করেছিল আমর বিনুল আছ এবং আবদুল্লাহ বিন রবিয়াহ। তারা উভয়েই ছিল প্রখ্যাত রাজনীতিবিদ। হাবশা পৌছেই তারা নাজ্জাশীর দরবারের আমলাদেরকে তোহফা দিয়ে বাগিয়ে ফেললো। আমলারা ওয়াদা করলো যে, বাদশাহর সামনে তারা কোরেশ প্রতিনিধি দলের সমর্থন জানাবে। এরপর তারা নাজ্জাশীর খিদমতে উপস্থিত হয়ে উপঢৌকন পেশ করে আরজ করলো, আমাদের কতিপয় সাদাসিধে মানুষ এক নতুন ধর্মের ফাঁদে পড়েছে। এই ধর্ম আমাদের এবং আপনাদের ধর্মের বিরোধী। এজন্য আমাদের নিবেদন, যারা আমাদের নিকট থেকে পালিয়ে এসে আপনার দেশে গোমরাহী ছড়াচ্ছে তাদেরকে আমাদের হাওয়ালা করে দিন। দরবারের আমলারা কোরেশ প্রতিনিধি দলের দাবীর প্রতি জোরেশোরে সমর্থন জানালো। কিন্তু নাজ্জাশী ছিলেন একজন ইনসাফপ্রিয় এবং রহমদিল বাদশাহ। তিনি বললেন, যতক্ষণ পর্যন্ত আমি স্বয়ং তাদেরকে ডেকে অবস্থা যাচাই না করবো ততক্ষণ তাদেরকে তোমাদের নিকট হস্তান্তর করতে পারি না। সুতরাং তিনি সকল মুহাজিরকে নিজের দরবারে ডেকে পাঠালেন।

পরের দিন সকল মুসলমান নাজ্জাশীর দরবারে হাজির হলেন। তাঁরা সকলেই হযরত আসমার (রাঃ) স্বামী হযরত জাফর (রাঃ) বিন আবি তালিবকে নিজেদের মুখপাত্র বানালেন। নাজ্জাশী তাঁদেরকে জিজ্ঞেস করলেনঃ "হে লোকেরা! সেটা কোন্ ধর্ম যার জন্য তোমরা নিজেদের বাপ-দাদার ধর্ম পরিত্যাগ করেছ?"

হযরত জাফর (রাঃ) মুসলমানদের তরফ থেকে জবাব দিলেনঃ "হে বাদশাহ! আমরা কঠোর জাহেলীতে নিমজ্জিত ছিলাম। মূর্তি পূজা করতাম। মৃতের গোশত খেতাম। নিজের কন্যাকে জীবিত মাটিতে দাফন করতাম। আত্মীয় ও প্রতিবেশীদেরকে কষ্ট দিতাম। মানবতা শূন্য ছিলাম। কোন নিয়ম-কানুন ছিল না। এই অবস্থায় আল্লাহ স্বয়ং আমাদের মধ্য থেকে এক ব্যক্তিকে নিজের রাসূল বানিয়েছেন। তাঁর হসব-নসব, সত্যতা, শরাফত, দিয়ানতদারী সম্পর্কে আমরা সম্যক ওয়াকিফহাল ছিলাম। তিনি আমাদেরকে তাওহীদের দাওয়াত দিয়েছেন। সত্য কথা বলা, ওয়াদা পূরণ করা, আমানতে খিয়ানত না করা, মূর্তিপূজা ত্যাগ করা, খারাব কাজ ও ধোঁকা থেকে দূরে থাকা, প্রতিবেশীর সঙ্গে সুন্দর আচরণ করা, নামায পড়া, রোযা রাখা এবং যাকাত প্রদানের শিক্ষা দিয়েছেন। আমরা তাঁর (সাঃ) শিক্ষার ওপর চলি, এক খোদার ইবাদাত করি, হালালকে হালাল এবং হারামকে

www.bjilibrary.com

হারাম মনে করি। এতে আমাদের কওম আমাদের ওপর বিগড়ে গেছে। আমাদের ওপর বিভিন্ন ধরনের নির্যাতন চালিয়ে পুনরায় মূর্তিপূজা ও খারাব কাজে লিপ্ত করতে চেয়েছিল। তাদের জুলুম–নির্যাতনে অতিষ্ঠ হয়ে আমরা আপনার দেশে চলে এসেছি।"

নাজ্জাশী এই বক্তৃতা শুনে খুব প্রভাবিত হলো। সে হযরত জাফরকে (রাঃ) বললোঃ "তোমাদের নবীর ওপর যে কিতাব নাযিল হয়েছে তার কিছু অংশ আমাকে শোনাও।"

হযরত জাফর (রাঃ) অত্যন্ত বুদ্ধিমান মানুষ ছিলেন। তিনি জানতেন যে, নাজ্জাশী আহলে কিতাব এবং খৃষ্টান ধর্মাবলম্বী। তিনি সূরায়ে মরিয়মের সেই প্রথম অংশ শুনালেন যা হযরত ইয়াহইয়া ও ঈসা (আঃ) সম্পর্কিত ছিল। তা শুনে নাজ্জাশী ভাবাবেশে নিমগ্ন হলো এবং এতো রোদন করলো যে দাড়ি ভিজে গেল। অতঃপর সে বলে উঠলোঃ

"খোদার কসম! তোমাদের নবীর কিতাব এবং পবিত্র ইঞ্জিল একই আলোর কিরণমালা। আমি তোমাদেরকে কখনো ঐসব লোকদের হাওয়ালা করবো না।"

তারপর সে কোরেশ প্রতিনিধি দলের প্রতি সম্বোধন করে বললোঃ "আল্লাহর কসম! আমি তাদেরকে কখনো আমার দেশ থেকে বহিষ্কার করবো না এবং তোমাদের নিকটও হস্তান্তর করবো না।"

কোরেশ প্রতিনিধিদল আরেকবার বাদশাহর অন্তর মুসলমানদের বিরুদ্ধে খেপিয়ে দেয়ার চেষ্টা করলো। বস্তুত দ্বিতীয় দিন তারা দরবারে গেল এবং বাদশাহকে বললো: "হে বাদশাহ! এরা আপনার নবী ঈসা (আঃ) ইবনে মরিয়ম সম্পর্কে খারাপ ধারণা পোষণ করে। আপনি কি এই ধরনের লোকদেরকে আশ্রয় দেবেন?"

নাজ্জাশী মুসলমানদেরকে দ্বিতীয়বার দরবারে তলব করলো এবং জিজ্ঞাসা করলোঃ " ঈসা বিন মরিয়ম সম্পর্কে তোমাদের ধারণা বা আকিদা কি?"

হযরত জাফর জবাব দিলেন, "হে বাদশাহ! আমরা ঈসা (আঃ) ইবনে মরিয়মকে (আঃ) খোদার নবী এবং রুহুল্লাহ হিসেবে বিশ্বাস করি।

নাজ্জাশী মাটি থেকে খড়কুটা উঠিয়ে বললোঃ "আল্লাহর কসম! ইসা (আঃ) ইবনে মরিয়ম (আঃ) সম্পর্কে তুমি যা বলেছ তা এই খড়কুটার সমান। তা থেকে বেশী নয়।" মোট কথা কোরেশ প্রতিনিধি দল ব্যর্থ হয়ে ফিরে গেল।

www.bjilibrary.com

হযরত জাফর (রাঃ) বিন আবি তালিব থেকে বর্ণিত আছে, যে মজলিসে আমরা নাজ্জাশীর সামনে হযরত ইসার (আঃ) ব্যাপারে নিজেদের আকিদা বর্ণনা করেছিলাম সেই মজলিসেই নাজ্জাশী সওয়াল-জওয়াবের পর আমাদেরকে জিজ্ঞাসা করলোঃ "আমার দেশে কেউ কি তোমাদের কষ্ট দিয়ে থাকে?" অমরা বললামঃ "হাঁ, এখানকার মানুষ আমাদেরকে কষ্ট দেয়।" এতে বাদশাহ্ ঢোল শহরত করে দিল যে, "যে ব্যক্তি তাদের কাউকে কষ্ট দেবে তাকে চার দিরহাম জরিমানা করা হবে।" অতঃপর নাজ্জাশী আমাদেরকে জিজ্ঞেস করলোঃ "এই জরিমানা কি যথেষ্ট?" আমরা বললাম, "না।" এতে সে জরিমানা দ্বিগুণ করে দিল। (ইবনে আসাকির (রঃ) ও তিবরানী (রঃ))।

এই রাওয়ায়েত থেকে জানা যায় যে, এই প্রতিনিধি দল আগমনের পূর্বে হাবশার মুহাজিররা সম্পূর্ণ নিরাপদ ও মাহফুজ ছিলেন না এবং হাবশার লোকেরা তাঁদের ওপর নির্যাতন চালাতো।

হযরত আসমা (রাঃ) বিনতে উমায়েস, তাঁর স্বামী জাফর (রাঃ) বিন আবি তালিব এবং অন্যান্য অনেক মুহাজির হাবশায় চৌদ্দ বছর বিদেশী হিসেবে কাল কাটাতে থাকেন। ইত্যবসরে প্রিয় নবী (সাঃ) মক্কা থেকে হিজরত করে মদীনা তাশরীফ নেন এবং বদর, ওহোদ, খন্দক ও খায়বারের যুদ্ধও শেষ হয়। সপ্তম হিজরীর মহররম মাসে খায়বার বিজিত হয়। এসময় হাবশার সকল মুসলমান হাবশা থেকে মদীনা মুনাওয়ারা চলে আসেন। তাঁদের মধ্যে হযরত আসমা (রাঃ) এবং হযরত জাফর (রাঃ) ছিলেন। খায়বার বিজয়ে মুসলমানরা আগে থেকেই খুশী ছিল। ঐ সকল ভাইয়ের আগমনে তাদের খুশী দ্বিগুণ হয়ে গেল। রহমতে আলম (সাঃ) হযরত জাফরকে (রাঃ) আলিঙ্গন করলেন। তাঁর কপালে চুমু দিলেন এবং বললেনঃ "জানিনা জাফরের আগমনে আমি বেশী খুশী হয়েছি, না খায়বার বিজয়ে।"

সেই যুগেই একদিন হযরত আসমা (রাঃ) বিনতে উমায়েস উম্মুল মুমিনিন হযরত হাফছার (রাঃ) সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য তাঁর গৃহে গমন করেন এবং সেখানে সেই ঘটনা সংঘটিত হয় যার বিস্তারিত ওপরে আলোচিত হয়েছে। এই সময় কতিপয় সাহাবীর (রাঃ) ধারণা ছিল যে, প্রকৃত প্রথম মুহাজির তাঁরা যারা মক্কা থেকে মদীনা মুনাওয়ারাহ হিজরত করেন। কিন্তু হুজুর (সাঃ) স্পষ্ট করে বলেন যে, যাঁরা প্রথম হাবশায় হিজরত করেন এবং অতঃপর হাবশা থেকে মদীনা হিজরত করেন তাঁরা দুই হিজরতের মর্যাদা লাভ করেছেন। আর এইদিক থেকে মদীনার মুহাজিরদেরকে হাবশার মুহাজিরদের ওপর ফজিলত দেয়া যায় না। বস্তুত এই ব্যাখ্যা হুজুর (সাঃ)

www.bjilibrary.com

হযরত আসমার (রাঃ) প্রশ্নের জবাবে দিয়েছিলেন। এজন্য হাবশার মুহাজিররা বার বার তাঁর নিকট আসতেন এবং এই হাদিস শুনে খুশী হতেন।

হযরত আসমা (রাঃ) এবং তাঁর স্বামী এক বছর হলো মদীনা এসেছেন। ইত্যবসরে তাঁরা আরেকবার পরীক্ষার সম্মুখীন হলেন। ৮ম হিজরীতে সিরিয়ার একটি ছোট শহর মাওতায় সরদার সুরাহবিল বিন আমর গাসসানি রাসূলে আকরামের (সাঃ) দূত হযরত হারিস (রাঃ) বিন উমায়ের ইযদিকে শহীদ করে ফেললো। হযরত হারিস (রাঃ) রাসূলের (সাঃ) পত্র নিয়ে বসরার শাসক হারিস বিন সামার গাসসানির নিকট যাচ্ছিলেন। সুরাহবিলের এই আচরণ নবী করিম (সাঃ) কোনক্রমেই মেনে নিতে পারলেন না। তিনি হারিস (রাঃ) বিন উমায়েরের হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণার্থে তিন হাজার মুজাহিদের একটি বাহিনী মাওতার দিকে প্রেরণ করলেন। হযরত যায়েদ (রাঃ) বিন হারিসা এই বাহিনীর নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন এবং হযরত জাফরও (রাঃ) তাতে শামিল ছিলেন। হুজুর (সাঃ) বিদায় করার সময় হযরত যায়েদকে (রাঃ) বললেনঃ

"এই যুদ্ধে যদি যায়েদ (রাঃ) শহীদ হয়ে যান, তাহলে জাফর (রাঃ) আমীর হবেন। যদি জাফরও (রাঃ) শহীদ হয়ে যান তাহলে আব্দুল্লাহ (রাঃ) বিন রাওয়াহা তাঁর স্থলাভিষিক্ত হবেন।"

ঘটনাক্রমে সে সময় মাওতায় রোমের বাদশাহ হিরাক্লিয়াসের আগমন ঘটেছিল এবং বলকায় অবস্থান করছিলো। সুরাবিল তার নিকট সাহায্য চেয়ে পাঠালো। হিরাক্লিয়াস একটি বিরাট বাহিনী তার সাহায্যে প্রেরণ করলো। কায়েস, জাযাম, লাখাম প্রমুখ যুদ্ধবাজ খৃষ্টান গোত্রও সুরাহবিলের ঝান্ডাতলে সমবেত হলো। এমনিভাবে তিন হাজার মুসলমানের মুকাবিলায় শত্রু সংখ্যা দাঁড়ালো এক লাখেরও বেশী। মাওতা মদীনা থেকে অনেক দূরে ছিল। এজন্য অতিরিক্ত যুদ্ধ সাহায্য চেয়ে পাঠানো ছিল অসম্ভব ব্যাপার। অন্যদিকে পিছু হটাও ছিল লজ্জাকর ব্যাপার। মুসলমানরা আল্লাহর ওপর ভরসা করে যুদ্ধ শুরু করলেন এবং মাওতার ময়দানে রক্তাক্ত যুদ্ধ সংঘটিত হলো। সেনাবাহিনী প্রধান হযরত যায়েদ (রাঃ) বিন হারিসা অমিত বিক্রমে লড়াই করতে করতে শহীদ হয়ে গেলেন। এ সময় হযরত জাফর (রাঃ) সেনাবাহিনীর ঝান্ডা হাতে নিলেন এবং নজীরবিহীন বীরত্বের সঙ্গে লড়াই করলেন। তাঁর শরীরে প্রায় ৯০ টি আঘাত লেগেছিল। আর এই আঘাতের কোনটিই পেছনের দিকে ছিল না। এক হাত বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলে অন্য হাত দিয়ে ঝান্ডা ধরলেন। দ্বিতীয় হাত শহীদ হয়ে গেলে দাঁত দিয়ে ঝান্ডা তুলে ধরলেন। দুশমনরা চারদিক থেকে হামলা করছিলো। তীর এবং তরবারীর আঘাত বর্ষণ হচ্ছিলো। অবশেষে

www.bjilibrary.com

রাসূলে আকরামের (সাঃ) এই শক্তিশালী হাত এবং দ্বীনে হকের সাচ্চা ঝান্ডাবাহী শহীদ হয়ে গেলেন। এক্ষণে ঝান্ডা হযরত আব্দুলাহ (রাঃ) বিন রাওয়াহা আনসারী হাতে তুলে নিলেন। তিনিও প্রচন্ড বাহাদুরীর সঙ্গে লড়াই করে শাহাদাত বরণ করলেন। এসময় হযরত খালিদ (রাঃ) বিন ওয়ালিদ ঝান্ডা হাতে নিলেন এবং মুসলমানদেরকে আহবান জানিয়ে বললেনঃ

"হে দ্বীনের গাজীরা! জান্নাতুল ফিরদাউস তোমাদের জন্য ইনতেজার করছে এবং যারা পিছু হটবে তাদের জন্য জাহান্নামের আগুন টগবগ করছে। সামনে অগ্রসর হও এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন কর।"

মুসলমানরা এবার শক্তি সঞ্চয় করে উঠে দাঁড়ালেন এবং নতুন উৎসাহ–উদ্দীপনার সঙ্গে হামলা শুরু করলেন। যুদ্ধ করতে করতে হযরত খালিদের (রাঃ) ৯ টি তলোয়ার ভেঙ্গে গেল এবং অবশেষে দ্বীনের গাজীদের অসীম বীরত্ব প্রদর্শনের ফলে নিজেদের থেকে ৪০ গুণ বেশী শত্রুকে পিছু হটে যেতে বাধ্য করলেন। শত্রু সৈন্য পিছু হটে যাবার পর হযরত খালিদ (রাঃ) ইসলামী বাহিনীকে অত্যন্ত মর্যাদার সঙ্গে বাঁচিয়ে ফিরিয়ে আনলেন।

যে সময় লড়াইয়ের আগুন প্রচন্ডভাবে জ্বলছিল তখন আল্লাহ পাক যুদ্ধের ময়দানের চিত্র হুজুরের (সাঃ) সামনে সমুপস্থিত করলেন। তিনি মসজিদে নববীতে উপস্থিত ছিলেন এবং সাহাবায়ে কিরামকে (রাঃ) লড়াইয়ের অবস্থা এমনভাবে বর্ণনা করছিলেন যেন তা তাঁর সামনেই সংঘটিত হচ্ছে। যখন হযরত জাফরের (রাঃ) দুই বাহুই শহীদ হয়ে গেল এবং তিনি শাহাদাতের পেয়ালা পান করলেন তখন হুজুরের (সাঃ) চক্ষুদ্বয় অশ্রুপূর্ণ হয়ে উঠলো এবং তিনি বললেনঃ " আমি জাফরকে (রাঃ) জান্নাতে নতুন দুই বাহুসহ উড়তে দেখছি।" হুজুরের (সাঃ) এই ইরশাদ অনুযায়ী হযরত জাফর (রাঃ) "তাইয়ার" এবং "জুল জানাহাইন" (দুই বাহু বিশিষ্ট) উপাধিতে খ্যাতি লাভ করেন। তারপর যখন হযরত খালিদ (রাঃ) ঝান্ডা হাতে নিলেন তখন হুজুর (সাঃ) বললেনঃ "এখন আল্লাহর এক অন্যতম তরবারী ঝান্ডা ধরেছেন।" বস্তুত সেদিন থেকেই হযরত খালিদ (রাঃ) সাইফুল্লাহ উপাধিতে বিভূষিত হয়েছিলেন।

এই ঘটনার পর হুজুর (সাঃ) হযরত আসমার (রাঃ) গৃহে গমন করলেন। তিনি সে সময় যাঁতায় আটা ভাঙ্গা শেষ করে বাচ্চাদের গোসল করিয়ে কাপড় পরিধান করাচ্ছিলেন। হুজুর (সাঃ) দুঃখ ভারাক্রান্ত কণ্ঠে বললেন, জাফরের সন্তানদেরকে আমার নিকট আনো। হযরত আসমা (রাঃ) শিশুদেরকে রাসুলের (সাঃ) নিকট আনলেন। তিনি অত্যন্ত দুশ্চিন্তাগ্রস্ত অবস্থায় শিশুদেরকে বুকে তুলে নিলেন

www.bjilibrary.com

এবং তাদের কপালে চুমু দিলেন। রাসূলকে (সাঃ) দুশ্চিন্তাগ্রস্ত দেখে হযরত আসমা (রাঃ) পেরেশান হয়ে পড়লেন এবং জিজ্ঞাসা করলেনঃ

"ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার মাতা-পিতা আপনার ওপর কুরবান হোক। আপনি চিন্তাযুক্ত কেন, জাফরের ব্যাপারে কোন খবর এসেছে কি?"

হুজুর (সাঃ) ফরমালেনঃ "হা, সে শহীদ হয়ে গেছে।"

এই হৃদয়বিদারক খবর শুনেই হযরত আসমা (রাঃ) চীৎকার দিয়ে উঠলেন। তাঁর কান্না শুনে আশপাশের মহিলা প্রতিবেশীরা এসে পড়লো। প্রিয় নবী (সাঃ) ফিরে গেলেন এবং উম্মুল মুমিনিনদেরকে জাফরের স্ত্রীর প্রতি খেয়াল রাখার নির্দেশ দিলেন। তিনি তখন প্রকৃতিস্থ ছিলেন না এবং তাঁকে চেঁচিয়ে কাঁদতে নিষেধ করতে বললেন।

সাইয়েদাতুন নিসা হযরত ফাতিমাতুজ জোহরাও (রাঃ) বীর চাচার শাহাদাতে প্রচন্ড দুঃখ পেলেন এবং তিনি "চাচা, চাচা" বলে কাঁদতে কাঁদতে নবীর (সাঃ) নিকট পৌছলেন। হুজুর (সাঃ) বললেনঃ" নিঃসন্দেহে জাফরের মত ব্যক্তির ব্যাপারে ক্রন্দনকারিনীদের কাঁদা উচিত।" এরপর তিনি নিজের কলিজার টুকরাকে বললেন: " ফাতিমা! জাফরের শিশু সন্তানদের জন্য খাবার তৈরী কর। কেননা আসমা (রাঃ) আজ অত্যন্ত দুশ্চিন্তাগ্রস্ত" ।

তৃতীয় দিনে রহমতে আলম (সাঃ) পুনরায় হযরত আসমার (রাঃ) গৃহে গমন করলেন এবং তাঁকে ধৈর্য ধারণের উপদেশ দিলেন।

হযরত জাফর তাইয়ারের (রাঃ) শাহাদাতের ৬ মাস পর ৮ম হিজরীতে (হুনাইনের যুদ্ধের সময়) হুজুর (সাঃ) হযরত আসমা (রাঃ) বিনতে উমায়েসের নিকাহ নিজের প্রিয় বন্ধু হযরত আবুবকর সিদ্দিকের (রাঃ) সঙ্গে পড়িয়ে দিলেন। দু'বছর পর হযরত আবুবকর সিদ্দিকের (রাঃ) ঔরসে মুহাম্মদ বিন আবি বকর (রাঃ) জন্ম নেন। হযরত আসমা (রাঃ) হজ্বের জন্য মক্কা এসেছিলেন। এমন সময় জুল হালিফায় মুহাম্মদ বিন আবি বকর (রাঃ) জন্মগ্রহণ করেন। হযরত আসমা (রাঃ) হুজুরের নিকট জিজ্ঞাসা করলেন: " ইয়া রাসূলাল্লাহ! এখন আমি কি করবো।"

তিনি বললেন: "গোসল করে ইহরাম বাঁধো।"

১১ হিজরীতে রহমতে আলমের (সাঃ) ইন্তেকাল হয়। এতে হযরত আসমার (রাঃ) ওপর শোক ও দুঃখের পাহাড় ভেঙ্গে পড়ে। তাঁর চেয়েও বেশী দুঃখ পান সাইয়েদা ফাতিমাতুজ জোহরা। হযরত আসমা (রাঃ) অত্যন্ত ধৈর্য অবলম্বন করেন

www.bjilibrary.com

এবং নিজের সময়ের বেশীর ভাগই সাইয়েদা ফাতিমাতুজ জোহরাকে (রাঃ) সান্ত্বনা দেয়ার জন্য ব্যয় করেন। কিছুদিন পরই সাইয়েদাতুন নিসারও (রাঃ) শেষ সময় এসে পৌছলো। আল্লামা ইবনে আসির " উসুদুল গাব্বাহ" গ্রন্থে লিখেছেন, মৃত্যুর পূর্বে সাইয়েদা ফাতিমা (রাঃ) হযরত আসমা (রাঃ) বিনতে উমায়েসকে ডেকে পাঠালেন এবং বললেনঃ "আমার জানাযা নিয়ে যাওয়ার সময় ও দাফনকালে পর্দার পূর্ণ ব্যবস্থা রাখতে হবে এবং গোসলে আপনি ও আমার স্বামী (হযরত আলী (রাঃ) ছাড়া কারোর সাহায্য নেবেন না।"

হযরত আসমা (রাঃ) বললেন:" হে রাসূলের কন্যা! আমি হাবশায় জানাযার ওপর গাছের ডাল বেঁধে ডুলির মত বানাতে এবং তার ওপর পর্দা দিতে দেখেছি।" অতঃপর তিনি খেজুর বৃক্ষের কয়েকটি ডাল আনালেন। তা জোড়া দিলেন এবং তাতে কাপড় বেঁধে হযরত ফাতিমাকে (রাঃ) দেখালেন। তিনি তা পছন্দ করলেন এবং ওফাতের পর তাঁর জানাযা এইভাবেই বহন করা হয়।

মুহাদ্দীস ইবনে জাওযী এবং অন্যান্য আলেম লিখেছেন, সাইয়েদা ফতিমাতুজ জোহরার লাশকে হযরত আলী (রাঃ), হযরত আসমা (রাঃ) বিনতে উমায়েস এবং সালমা উম্মে রাফে গোসল দিয়েদিলেন।

ত্রয়োদশ হিজরীতে হযরত আবুবকর সিদ্দিক (রাঃ) মৃত্যু শয্যায় শায়িত হলেন। মৃত্যুর পূর্বে তিনি ওসিয়ত করলেন যে, আসমা তাঁর লাশকে গোসল দেবে। সুতরাং হযরত আসমা (রাঃ) সে অনুযায়ী কাজ করলেন। সিদ্দিকে আকবরের (রাঃ) ওফাতের পর হযরত আলীর (রাঃ) সঙ্গে হযরত আসমার (রাঃ) নিকাহ হয়। মুহাম্মাদ বিন আবি বকরের (রাঃ) বয়স সে সময় তিন বছর ছিল। সেও তাঁর মার সঙ্গে এলো এবং হযরত আলীর (রাঃ) স্নেহ ছায়ায় লালিত-পালিত হয়।

একদিন এক কৌতুককর ঘটনা ঘটলো। মুহাম্মাদ বিন জাফর (রাঃ) এবং মুহাম্মাদ বিন আবি বকর (রাঃ) দু'জনে ঝগড়া বাঁধিয়ে বসলেন। ঝগড়ার বিষয়বস্তু ছিল দু'জনের পিতার মধ্যে কে আফজাল এবং বেশী সম্মানিত ছিলেন। হযরত আলী (রাঃ) দুই শিশুর চিত্তাকর্ষক তর্ক শুনলেন। হযরত আসমাকে (রাঃ) বললেনঃ " তুমি এই ঝগড়ার মীমাংসা করে দাও।"

হযরত আসমা (রাঃ) বললেনঃ "আরব যুবকদের মধ্যে জাফর (রাঃ) থেকে বেশী উন্নত চরিত্রের কাউকেই আমি পাইনি এবং বৃদ্ধদের মধ্যে আবুবকর (রাঃ) থেকে কাউকে ভালো দেখিনি।"

www.bjilibrary.com

হযরত আলী কাররামাল্লাহু ওয়াজহাহু মুচকি হেসে বললেন:" তুমি আমার জন্যতো কিছুই রাখলে না!"

হযরত আসমার (রাঃ) গর্ভে হযরত আলীর (রাঃ) ঔরসে ইয়াহিয়া নামের এক পুত্র জন্মগ্রহণ করেন।

৩৮ হিজরীতে হযরত আসমার (রাঃ) জওয়ান পুত্র মুহাম্মাদ বিন আবি বকর (রাঃ) মিসরে নিহত হন। বিরোধীরা তাঁর লাশ গাধার চামড়ায় জড়িয়ে জ্বালিয়ে দেয়। হযরত আসমা (রাঃ) এই মর্মবিদারক খবর শুনে মূর্ছা গেলেন। কিন্তু অত্যন্ত ধৈর্য এবং শোকরের সঙ্গে রইলেন। জায়নামায বিছিয়ে ইবাদতে মশগুল হয়ে পড়লেন।

৪০ হিজরীতে হযরত আলী কাররামাল্লাহু ওয়াজহাহু শহীদ হন। তাঁর সামান্য কিছুদিন পরেই হযরত আসমা (রাঃ) পরপারের ডাকে সাড়া দিলেন। মৃত্যুকালে তিনি চার পুত্র রেখে যান। আব্দুল্লাহ, মুহাম্মাদ এবং আওন হযরত জাফরের (রাঃ) ঔরসে এবং ইয়াহিয়া হযরত আলী মুরতাজার ঔরসে। কতিপয় চরিতকার লিখেছেন, হযরত জাফরের (রাঃ) ঔরসে তাঁর দুটি মেয়েও হয়েছিল। হযরত আবদুল্লাহ বিন জাফর (রাঃ) নিজের দানশীলতার জন্য ইতিহাসে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন। প্রিয় নবী (সাঃ) তাঁকে খুব ভালোবাসতেন। একবার তিনি বলেন: "ইলাহী! আব্দুল্লাহকে জাফরের গৃহে সঠিক স্থলাভিষিক্ত বানাও। তাঁর বাইয়াতে বরকত দাও এবং আমি দুনিয়া ও আখিরাত উভয় স্থানেই জাফর পরিবারের অভিভাবক।" অতঃপর তাঁর হাত ধরে বললেন: "সুরত এবং সিরতে আব্দুল্লাহ আমার মত।"

হযরত আসমা (রাঃ) বিনতে উমায়েস অন্যতম জালিলুল কদর মহিলা সাহাবী ছিলেন। তিনি অত্যন্ত সুন্দর স্বভাব ও বুদ্ধিমতী ছিলেন। দাওয়াতে হকের প্রথম যুগে যখন মক্কার কাফেরদের ক্রোধ ও গোস্বার বিদ্যুৎ মুসলমানদের ওপর আপতিত হচ্ছিল সে সময় তিনি হকের ঝান্ডা সমুন্নত করতে কোন দ্বিধাই করেননি এবং ইসলামের সেই পবিত্র কাতারে শামিল হন যাকে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন খোলাখুলিভাবে নিজের সন্তুষ্টির সুসংবাদ দিয়েছিলেন। সুন্দর চরিত্রের অধিকারিনী হওয়ার কারণেই রহমতে আলমের (সাঃ) মুরুব্বী চাচা বনু হাসিমের সরদার জনাব আবি তালিব তাঁকে পুত্রবধূ বানিয়েছিলেন। তিনি হযরত জাফর (রাঃ) বিন আবি তালিবের স্ত্রী হওয়ার জন্য প্রিয় নবীর (সাঃ) ভাবী হতেন এবং উম্মুল মুমিনিন হযরত মাইমুনার (রাঃ) সৎ বোন হওয়ার সম্পর্কে শালীও হতেন। রহমতে আলম (সাঃ) তাঁকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন এবং তিনিও হুজুরকে (সাঃ) সীমাহীন

www.bjilibrary.com

ভালোবাসতেন। তিনি শুধুমাত্র আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূলের (সাঃ) সন্তুষ্টির জন্য চৌদ্দ বছর পর্যন্ত হাবশায় উদ্বাস্তু বা মুহাজিরের জীবন কাটান।

মুসনাদে আহমদ বিন হাম্বলে বর্ণিত আছে যে, হযরত আসমা (রাঃ) সরাসরি হুজুরের (সাঃ) নিকট থেকে ফয়েজ হাসিল করেন। একবার হুজুর (সাঃ) তাঁকে একটি দোয়ার কথা বলে বললেন যে, মুসিবত এবং কষ্টের সময় তা পড়ো।

সারওয়ারে আলম (সাঃ) হযরত আসমার (রাঃ) সন্তানদেরকে খুব ভালোবাসতেন। ইমাম হাকিম (রঃ) মুসতাদরাকে লিখেছেন, একবার তাঁর শিশু পুত্র হযরত আব্দুল্লাহ বিন জাফর (রাঃ) সমবয়সীদের সাথে খেলছিল। হুজুর (সাঃ) সেই পথ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তাকে উঠিয়ে নিজের সওয়ারীর ওপর বসিয়ে নিলেন।

সহিহ মুসলিমে বর্ণিত আছে যে, একবার হুজুর (সাঃ) হযরত আসমার (রাঃ) সন্তানদেরকে (হযরত জাফরের সন্তান) ক্ষীণকায় দেখতে পেয়ে হযরত আসমাকে (রাঃ) জিজ্ঞেস করলেন, এরা এত দুর্বল কেন? তিনি আরজ করলেনঃ " ইয়া রাসূলাল্লাহ! তাদের খুব নজর লাগে।" হুজুর (সাঃ) বললেনঃ" তাদের ওপর ফুঁ দাও।"

হযরত আসমা (রাঃ) একটি বিশেষ কালাম পড়ে রাসূলকে (সাঃ) শুনালেন এবং জিজ্ঞেস করলেনঃ " হে আল্লাহর রাসূল! নজর লাগার প্রশ্নে একে উপকারী বলা হয়ে থাকে। আমি কি তা পড়বো?" বস্তুত সেই কালামে শিরকের মিশ্রণ ছিল না। এজন্য হুজুর (সাঃ)ফরমালেনঃ "ঠিক আছে, তাই পড়।"

ইমাম বুখারী (রঃ) এবং আল্লামা ইবনে সা'দ (রঃ) বর্ণনা করেছেন, হুজুরের (সাঃ) ওফাতের একদিন পূর্বে হযরত উম্মে সালমা (রাঃ) এবং হযরত আসমা (রাঃ) তাঁর রোগ নির্ধারণ করলেন এবং ওষুধ খাওয়াতে চাইলেন। হুজুর (সাঃ) ওষুধ সেবনে অভ্যস্ত ছিলেন না। এজন্য ওষুধ খেতে অস্বীকার করলেন। ইতিমধ্যে রাসূল (সাঃ) সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়লেন। তাঁরা উভয়ে রাসূলের (সাঃ) পবিত্র মুখ খুলে ওষুধ খাইয়ে দিলেন। কিছু সময় পর হুজুরের (সাঃ) সংজ্ঞাহীনতা দূর হলে বললেনঃ "আসমাই এই তদবিরের কথা বলে থাকবে। সে হাবশা থেকে এই হিকমত আনয়ন করেছে। আব্বাস (রাঃ) ছাড়া সবাইকেই এই ওষুধ খাওয়াতে হবে। " সুতরাং সকল আযওয়াজে মুতাহহিরাত এবং আসমাকে (রাঃ) এই ওষুধ খাওয়ানো হলো।

হাফিজ ইবনে হাজার (রঃ) ইসাবাহতে লিখেছেন, হযরত আসমা (রাঃ) স্বপ্নের তাবিরেও নিপুণতা রাখতেন। বস্তুত হযরত ওমর (রাঃ) তাঁর নিকট প্রায়ই স্বপ্নের তাবির জিজ্ঞাসা করতেন।

www.bjilibrary.com

হযরত আসমা (রাঃ) থেকে ৬০টি হাদিস বর্ণিত আছে। তাঁর হাদিসের রাবীর মধ্যে হযরত ওমর ফারুক (রাঃ), হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রাঃ) এবং হযরত আবু মুসা আশয়ারীর (রাঃ) মত জালিলুল কদর সাহাবী ও কয়েকজন উঁচু মর্যাদার তাবেয়ীছিলেন।

হযরত শাফা' (রাঃ) বিনতে আব্দুল্লাহ

খায়বারের যুদ্ধের কিছুদিন পরের ঘটনা। একদিন এক সম্রান্ত মহিলা রাসূলের (সাঃ) নিকট উপস্থিত হলেন এবং নিজের প্রয়োজন বর্ণনা করে নগদ অর্থ অথবা জিনিস দিয়ে সাহায্য করার আবেদন জানালেন। ঘটনাক্রমে সে সময় হুজুরের (সাঃ) কাছে কিছুই ছিল না। এজন্য তিনি ক্ষমা চাইলেন। কিন্তু মহিলাটি পীড়াপীড়ি করে বললেন যে তাঁর আবেদন মঞ্জুর করা হোক। ইতিমধ্যে আযানের আওয়াজ এলো এবং হুজুর (সাঃ) নামাযের জন্য মসজিদে চলে গেলেন। মহিলাটিও উঠে দাঁড়ালেন এবং নিকটেই নিজের কন্যার গৃহে গেলেন। কন্যাটি ছিলেন জালিলুল কদর সাহাবী হযরত সুরাহবিল (রাঃ) বিন হাসানার স্ত্রী। সেখানে তিনি দেখলেন যে, জামাই হযরত সুরাহবিল (রাঃ) তহবন্দ পরিধান করে ঘরেই বসে রয়েছেন। নামাযের জন্য মসজিদে গমন করেননি। মহিলাটি জামাইকে ঘরে বসে থাকতে দেখে খুব মনোকষ্ট পেলেন এবং ক্রোধ মিশ্রিত স্বরে তাঁকে গালাগালি শুরু করলেন। তিনি বললেন, নামাযের সময় হয়ে গেছে, আর তুমি ঘরে বসে রয়েছ! হযরত সুরাহবিল (রাঃ) বললেন, খালাজান। আমাকে গালি দিবেন না। ব্যাপার হলো , আমার নিকট একটি কামিসই ছিলো। তাতে তালি দিয়ে রেখেছিলাম। হুজুর (সাঃ) তা ধার স্বরূপ আমার নিকট থেকে নিয়ে গেছেন। আমি খালি গায়ে মসজিদে যেতে চাই না। এতে লোকজন আমাকে কারণ জিজ্ঞেস করলে হুজুর (সাঃ) তা ধার নিয়েছেন বলে বলতে হবে।

মহিলাটি জামাইয়ের কথা শুনে মূর্ছা যাওয়ার উপক্রম হলেন এবং বললেন, আমার মাতা-পিতা রাসূলুল্লাহর (সাঃ) ওপর কুরবান হোক। আমিতো জানতাম না যে বর্তমানে রাসূলের (সাঃ) এই অবস্থা । আমি আমার আবেদনের ব্যাপারে পীড়াপীড়ি করে অহেতুক তাঁকে কষ্ট দিয়েছি।

এই মহিলার নাম ছিল হযরত শাফা' (রাঃ) বিনতে আব্দুল্লাহ।

www.bjilibrary.com

হযরত শাফা' (রাঃ) বিনতে আবদুল্লাহ অন্যতম জালিলুল কদর মহিলা সাহাবী হিসেবে পরিগণিত। কোরেশের আদি বংশের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ছিল। তাঁর নসবনামা হলোঃ শাফা' বিনতে আব্দুল্লাহ বিন আবদি শামস বিন খালাফ বিন ছাদদাদ বিন আব্দুল্লাহ বিন কুরত বিন যারাহ বিন আদি বিন কা'ব বিন লুয়ী।

আদির অপর ভাই মুররাহ রাসূলে আকরামের (সাঃ) পিতামহভুক্ত ছিলেন। এইদিক থেকে হযরত শাফা'র (রাঃ) নসব অষ্টম ধাপে গিয়ে রাসূলের (সাঃ) বংশের সঙ্গে মিলে যায়। এমনিভাবে পঞ্চম ধাপে গিয়ে (আবদুল্লাহ বিন কুরত) হযরত শাফা'র নসব হযরত ওমর ফারুকের (রাঃ) বংশের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়।

মাতার সম্পর্ক ছিল বনু মাখজুমের সঙ্গে। তাঁর নাম ছিল ফাতিমা বিনতে ওয়াহাব (বিন আমর বিন আয়েজ বিন ওমর বিন মাখজুম)।

আবু হাছমা বিন হুজাইফা আদবীর সঙ্গে হযরত শাফা'র (রাঃ) বিয়ে হয়েছিল। তাঁর জীবন বৃত্তান্ত কোন পুস্তকে পাওয়া যায় না। চরিতগ্রন্থে হযরত শাফা'র (রাঃ) ইসলাম গ্রহণের সাল নির্দিষ্ট করে বলা হয়নি। কিন্তু সকলেই এ ব্যাপারে একমত যে, হিজরতের পূর্বে চরম প্রতিকূল অবস্থায় তিনি ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। অতঃপর রাসূলে করিম (সাঃ) যখন সাহাবীদেরকে (রাঃ) মদীনায় হিজরতের অনুমতি প্রদান করেছিলেন তখন তিনিও হিজরত করেন। হাফিজ ইবনে হাজার (রঃ) "ইছাবাহ"তে লিখেছেন, তিনি সেই কতিপয় মহিলার অন্যতম ছিলেন যাঁরা সর্বপ্রথম নবীর নির্দেশ মাথা পেতে নিয়েছিলেন এবং চিরতরের জন্য মক্কা ত্যাগ করে মদীনার স্থায়ী বাসিন্দা হয়েগিয়েছিলেন।

রহমতে আলম (সাঃ) মদীনায় তাশরীফ আনার কিছুদিন পর হযরত শাফা'কে (রাঃ) একটি বাড়ী দিয়েছিলেন। এই বাড়ীতে তিনি পুত্র সোলায়মানের (রাঃ) সঙ্গে আজীবনবাসকরেছিলেন।

হযরত শাফা'(রাঃ) কোরেশের আঙ্গুলে গোনা কতিপয় সেই মহিলার অন্যতম ছিলেন যারা লেখা-পড়া জানতেন। কয়েক ধরনের রোগের রুগী তাঁর নিকট আসতো এবং তিনি ঝাড় -ফুঁক অর্থাৎ মন্ত্র-টোটকা দিয়ে তাদের চিকিৎসা করতেন। চরিতকাররা তাঁর পিঁপড়ায় কামড়ানোর মন্ত্রের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন।

তৃতীয় হিজরীতে সারওয়ারে আলম (সাঃ) হযরত হাফছা (রাঃ) বিনতে হযরত ওমর ফারুককে (রাঃ) বিয়ে করেন। এ সময় তিনি একবার হযরত শাফা'র

www.bjilibrary.com

(রাঃ) প্রতি হযরত হাফছাকে (রাঃ) লিখা শিখিয়ে দেয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন। হযরত শাফা' (রাঃ) নবীর (সাঃ) নির্দেশ তামিল করেন এবং হযরত হাফছাকে (রাঃ) লিখা শিখিয়েদেন।

একবার হযরত শাফা' (রাঃ) হুজুরের (সাঃ) খিদমতে হাজির হয়ে আরজ করলেন, হে আল্লাহর রাসূল। জাহেলী যুগে আমি ঝাড়–ফুঁক করতাম এবং পিঁপড়া কামড়ালে মন্ত্র পড়তাম। এখনো কি আমার তা করার অনুমতি আছে? সেই মন্ত্রে শিরকের নামগন্ধ ছিলনা। এজন্য হুজুর (সাঃ) তাঁকে অনুমতি প্রদান করেন এবং এই মন্ত্র হাফছাকে (রাঃ) শিখিয়ে দেয়ারও ফরমায়েশ করেন।

হাফিজ ইবনে হাজার (রঃ) বর্ণনা করেছেন, এসময় হুজুর (সাঃ) বলেছিলেনঃ হাফছাকেও পিঁপড়ার মন্ত্র শিখিয়ে দাও যেমন তুমি তাকে লিখা শিখিয়েছ। সুতরাং তিনি হযরত হাফছাকে (রাঃ) লিখা ছাড়াও পিঁপড়া কামড়ানোর মন্ত্র শিখিয়ে দিয়েছিলেন। এইদিক থেকে তিনি উম্মুল মুমিনিন হযরত হাফছার (রাঃ) শিক্ষিকা। নেতৃস্থানীয় চরিতকাররা লিখেছেন, হযরত শাফা' (রাঃ) খুব বুদ্ধিমতী ছিলেন এবং হুজুরকে (সাঃ) চূড়ান্ত পর্যায়ের মুহাব্বাত করতেন। হুজুরও (সাঃ) তাঁকে অত্যধিক স্নেহ করতেন এবং মাঝে মধ্যেই তাঁর গৃহে তাশরীফ রাখতেন। হাফিজ ইবনে হাজার (রঃ) বর্ণনা করেছেন, কখনো কখনো হুজুর (সাঃ) হযরত শাফা'র (রাঃ) ঘরে আরাম করতেন। তিনি একটি তহবন্দ এবং বিছানা হুজুরের (সাঃ) ব্যবহারের জন্য পৃথক করে রেখেছিলেন। কেননা এইসব বস্তুর সঙ্গে প্রিয় নবীর (সাঃ) মুবারক শরীরের ছোঁয়া লেগেছিল। সেজন্য তা হযরত শাফা'র (রাঃ) নিকট অত্যন্ত পবিত্র ছিল। সুতরাং তিনি এই পবিত্র দুটি জিনিসকে আজীবন নিজের সঙ্গে রেখেছিলেন। ওফাতের পর তাঁর সন্তানরাও সেই বরকতের বস্তুদ্বয়কে অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে সংরক্ষণ করেছিলেন। কিন্তু উমাইয়া শাসক মারওয়ান বিনুল হাকাম তাঁদের নিকট থেকে তা নিয়ে নেয়। এমনিভাবে হযরত শাফা'র (রাঃ) বংশধররা এই বরকত থেকে মাহরুম হন।

হযরত শাফা' (রাঃ) নবীর (সাঃ) যে নৈকট্য লাভ করেছিলেন তার ভিত্তিতে সকল সাহাবী (রাঃ) তাঁকে অত্যন্ত তাজিম ও সম্মান করতেন। হযরত ওমর ফারুক (রাঃ) তাঁর প্রতি এত শ্রদ্ধাশীল ছিলেন যে, যখন তিনি খিলাফতের আসনে আসীন হলেন তখন কখনো কখনো কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে তাঁর সঙ্গে পরামর্শ করে নিতেন এবং তাঁর মতের খুব প্রশংসা করতেন। হাফিজ ইবনে হাজার (রঃ) ইবনে সাদের উদ্ধৃতি দিয়ে লিখেছেন, হযরত শাফা'র (রাঃ) মর্যাদা ও মতের প্রতি হযরত ওমরের (রাঃ) অত্যন্ত সম্ভ্রম ছিলো এবং তাঁকে বাজারের ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব অর্পণ করতেন।

www.bjilibrary.com

এই রাওয়ায়েত থেকে জানা যায় যে, হযরত শাফা' (রাঃ) সঠিক রায়ের অধিকারিনী ছিলেন। সেই সঙ্গে তিনি ব্যবস্থাপনার যোগ্যতাও রাখতেন। আল্লামা ইবনে আছির (রঃ) "উসুদুল গাব্বায়" লিখেছেন,একবার হযরত ওমর ফারুক (রাঃ) নিজের খিলাফতকালে হযরত শাফা'কে (রাঃ) ডেকে পাঠালেন। যখন তিনি হযরত ওমরের (রাঃ) নিকট পৌছলেন তখন ঘটনাক্রমে আতিকাহ (রাঃ) বিনতে উসায়েদও সেখানে উপস্থিত হলেন। হযরত ওমর (রাঃ) উভয়কেই একটি করে চাদর প্রদান করলেন। হযরত আতিকাহকে (রাঃ) যে চাদর দেয়া হয়েছিল তা হযরত শাফা'র চাদর থেকে উত্তম ছিল। এতে হযরত শাফা' খুব মনোকষ্ট পেলেন। তিনি অসন্তুষ্টির স্বরে হযরত ওমরকে (রাঃ) সম্বোধন করে বললেনঃ

"তোমার হাতে মাটি লাগুক। আমি আতিকাহ (রাঃ) থেকে প্রবীণ মুসলমান। আমি তোমার চাচার কন্যাও। উপরন্তু তুমি আমাকে ডেকে পাঠিয়েছ। কিন্তু এতসব সত্ত্বেও তুমি আতিকাহকে আমার চেয়ে ভালো চাদর দিয়েছ। অথচ সে ডাকা ছাড়াই ঘটনাক্রমে এখানে উপস্থিত হয়েছে।"

হযরত ওমর (রাঃ) বললেনঃ "আল্লাহর কসম। এই চাদর তোমার জন্যই ছিল। কিন্তু যখন আতিকাহ এসে গেলেন তখন আমাকে তাঁর প্রতি সমীহ করতে হলো। কেননা বংশের দিক থেকে তিনি রাসূলের (সাঃ) বেশী নিকটের ছিলেন।"

হযরত শাফা' (রাঃ) কবে ওফাত পেয়েছিলেন এ ব্যাপারে সকল চরিতগ্রন্থই নিশ্চুপ। ধারণা করা হয় যে, তিনি হযরত ওমরের (রাঃ) খিলাফতের শেষ যুগে অথবা হযরত ওসমান জুন্নুরাইনের (রাঃ) খিলাফতকালের কোন এক সময় পরপারের ডাকে সাড়া দিয়েছিলেন। হযরত শাফা'র (রাঃ) সন্তানদের মধ্যে শুধুমাত্র এক পুত্র সোলায়মান (রাঃ) এবং এক কন্যার সন্ধান পাওয়া যায়। দু'জনই সাহাবীর মর্যাদায় অভিষিক্ত ছিলেন। মশহুর সাহাবী হযরত সুরাহবিল বিন হাসানার (রাঃ) সঙ্গে কন্যার বিয়েহয়েছিল।

হযরত শাফা' (রাঃ) রাসূলে করিম (সাঃ) ও হযরত ওমর ফারুকের (রাঃ) নিকট থেকে কতিপয় হাদিস রাওয়ায়েত করেন। রাবীদের মধ্যে তাঁর পুত্র সোলায়মান (রাঃ) এবং পৌত্র আবুবকর (রাঃ) এবং ওসমান, উম্মুল মুমিনিন হযরত হাফছা (রাঃ), আবু সালমা (রঃ) এবং আবু ইসহাক অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।

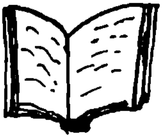

www.bjilibrary.com

হযরত উম্মুল ফজল লুবাবাতুল কুবরা (রাঃ)

বদরের যুদ্ধে (দ্বিতীয় হিজরীর রমযান মাসে) কোরেশদের অপমানজনক পরাজয়ের খবর মক্কা পৌঁছলো। এ সময় সেখানকার ঘরে ঘরে মাতম পড়ে গেল। বদবখত আবু লাহাবের অবস্থা ছিল করুণ। বেদনায় সে নীল হয়ে গিয়েছিল। হাঁটতে গিয়ে পা কাঁপছিলো এই অবস্থায় পা ঘসতে ঘসতে যুদ্ধের খবর জানার জন্য সে সহোদর আব্বাস বিন আব্দুল মুত্তালিবের গৃহে পৌঁছলো। আব্বাস মুশরিকদের সঙ্গে মুসলমানদের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য গিয়েছিলেন এবং যুদ্ধে পরাজিত হওয়ার পর মুসলমানদের হাতে বন্দী হয়েছিলেন। সে আব্বাস-গৃহে পৌছে তাঁর গোলাম আবু রাফের (রাঃ) নিকট বসলো। যুদ্ধে আবু রাফে (রাঃ) তীরন্দাজের কাজ করেন। ইত্যবসরে একজন বললো, "আবু সুফিয়ান বিন হারিছ (হুজুরের চাচাতো ভাই এবং আবু লাহাবের ভ্রাতুষ্পুত্র। তখনও তিনি ইসলাম গ্রহণ করেননি) বদর থেকে এখনই ফিরে এসেছেন। তাঁর নিকট থেকে যুদ্ধের অবস্থা জানা উচিত।" আবু লাহাব তাঁকে ডাকলো, "ভ্রাতুষ্পুত্র! একটু আমার কাছে এসো।" তিনি এলে আবু লাহাব জিজ্ঞেস করলো, "ভাতিজা! বলো সেখানে কি ঘটেছে ?

আবু সুফিয়ান বলতে লাগলেনঃ "আল্লাহর কসম! মুসলমানদের সামনে আমরা এত অসহায় ছিলাম যেমন মুরদাহ গোসলদানকারীর নিকট অসহায় থাকে। তাঁরা যাকে ইচ্ছা তাকেই তীর দিয়ে ধরাশায়ী করেছে এবং যাকে ইচ্ছা তাকেই গ্রেফতার করেছে। এক আশ্চর্য ধরনের দৃশ্য আমরা অবলোকন করেছি। ঘোড়ার ওপর সওয়ার সাদা পোশাকধারী মানুষেরা মেরে মেরে আমাদেরকে ভর্তা বানিয়ে দিয়েছে। তাঁরা কারা তা জানি না।

আবু রাফে' (রাঃ) তৎক্ষণাৎ বললেনঃ "তারা ফেরেশতা ছিল।"

একথা শুনে আবু লাহাব অগ্নিশর্মা হয়ে উঠলো এবং আবু রাফে'র (রাঃ) মুখের ওপর প্রচন্ড জোরে এক থাপ্পড় কষলো। আবু রাফে'ও (রাঃ) নিজেকে শামলে নিয়ে তার সঙ্গে মল্লযুদ্ধে অবতীর্ণ হলেন। কিন্তু তিনি ছিলেন দুর্বল। আবু লাহাব তাঁকে মাটির ওপর ফেলে দিয়ে বেধড়ক মারা শুরু করলো। নিকটেই একজন মহিলা

www.bjilibrary.com

বসেছিলেন। তিনি এই দৃশ্য সহ্য করতে পারলেন না। তৎক্ষণাৎ উঠে দাঁড়ালেন এবং একটা মোটা ধরনের লাঠি নিয়ে এতে জোরে আবু লাহাবকে মারলেন যে, তার মাথা থেকে ফিনকি দিয়ে রক্ত বইতে লাগলো। অতপর কড়া ভাষায় বললেন ঃ

বেশরম ! তার মালিক এখানে উপস্থিত নেই। আর তুই তাকে দুর্বল মনে করে মারছিস !"

এই মহিলাকে মুকাবিলা করার মতো সাহস আবু লাহাবের ছিলো না এবং সে কানের ওপর হাত দিয়ে সেখান থেকে চলে গেলো।

এই মর্যাদাবান এবং বাহাদুর মহিলা, যিনি আবু লাহাবের মত ইসলামের এবং খোদার শত্রুকে চরমভাবে অপমানিত করেছিলেন, তিনি ছিলেন আব্বাসের (রাঃ) স্ত্রী (এবং আবু লাহাবের ভাবী) হযরত লুবাবাতুল কুবরা (রাঃ)। কতিপয় রাওয়ায়েতে বর্ণিত আছে যে, এ ঘটনা যমযম কূপের চার প্রাচীরের অভ্যন্তরে সংঘটিত হয়েছিলো। এর কাছেই হযরত আব্বাসের (রাঃ) গৃহ ছিলো।

হযরত লুবাবাহ (রাঃ) বিনতে হারিস সাধারণত "উম্মুল ফজল" কুনিয়তে মশহুর ছিলেন। তিনি অন্যতম জালিলুল কদর মহিলা সাহাবীতে পরিগণিত হয়ে থাকেন। কুবরা ছিলো তাঁর লকব। এজন্য ঐতিহাসিকরা তাঁর নাম লুবাবাতুল কুবরাও লিখেছেন। তিনি বনু হেলালের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত ছিলেন।

তাঁর নসবনামা হলো ঃ উম্মুল ফজল লুবাবাহ বিনতে হারিস বিন হাযান বিন বুজায়ের বিনুল হারাম বিন রাওবিয়া বিন আবদুল্লাহ বিন হিলাল বিন আমের বিন ছায়ছায়াহ। মার নাম ছিলো হিন্দ (অথবা খাওলাহ) বিনতে আওফ। তিনি বনু কিনানাহ অথবা হুমায়ের গোত্রের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত ছিলেন।

রাসূলের (সাঃ) পিতৃব্য আব্বাস (রাঃ) বিন আবদুল মুত্তালিবের সঙ্গে হযরত উম্মুল ফজল লুবাবাহর (রাঃ) বিয়ে হয়েছিলো। এ সম্পর্কে তিনি হুজুরের (রাঃ) চাচী ছিলেন। তাঁর সহোদরা হযরত মাইমুনা (রাঃ) বিনতে হারিস উম্মুল মু'মিনীন হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন। এভাবে হযরত উম্মুল ফজল (রাঃ) হুজুরের (সাঃ) শ্যালিকাও হন।

হযরত উম্মুল ফজলের (রাঃ) এক সৎ বোন হযরত আসমা (রাঃ) বিনতে উমায়েসের বিয়ে হযরত জাফর (তাইয়ার) বিন আবি তালিবের (হুজুরের

www.bjilibrary.com

চাচাতো ভাই) সঙ্গে হয়েছিলো। তৃতীয় আরেক বোন সালমার বিয়ে হয়েছিলো হুজুরের (সাঃ) অন্য চাচা হযরত হামযাহ (রাঃ) বিন আবদুল মুত্তালিবের সঙ্গে। লোকজন হযরত উম্মুল ফজলের মাতা হিন্দ বিনতে আওফকে ঈর্ষা করতো।

মহিলাদের মধ্যে রাসূলের (সাঃ) ওপর সর্বপ্রথম ঈমান এনেছিলেন হযরত খাদিজাতুল কুবরা। বিশ্বস্ত রাওয়ায়েত অনুযায়ী তাঁর পর হযরত উম্মুল ফজল লুবাবা (রাঃ) এ সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন। এদিক থেকে তিনি আসসাবিকুনাল আউয়ালুনের মধ্যে উঁচু মর্যাদার অধিকারিনী। স্বামী হযরত আব্বাসের (রাঃ) প্রকাশ্য ইসলাম গ্রহণের পর হযরত উম্মুল ফজল (রাঃ) মদীনায় হিজরত করেন। মক্কা বিজয়ের কিছুদিন পূর্বে এ হিজরত সংঘটিত হয়।

হযরত উম্মুল ফজল (রাঃ) অত্যন্ত বাহাদুর এবং মর্যাদাসম্পন্ন মহিলা ছিলেন। বস্তুত একবার তিনি লাঠি দিয়ে আবু লাহাবের মাথা ফাটিয়ে দিয়েছিলেন। রাসূলে আকরামকে (সাঃ) তিনি সীমাহীন ভালোবাসতেন এবং শ্রদ্ধা করতেন। হুজুরও (সাঃ) তাঁকে খুবই ভালো জানতেন। প্রায়ই তিনি তাঁর গৃহে গমন করতেন। দ্বিপ্রহরের সময় হলে সেখানেই আরাম করতেন। হযরত উম্মুল ফজল (রাঃ) হুজুরের (সাঃ) পবিত্র মাথা কোলের ওপর রেখে চুল থেকে ময়লা দূর করে দিতেন এবং চিরুনী করতেন।

হযরত উম্মুল ফজল অত্যন্ত পরহেজগার এবং ইবাদাত গুজার ছিলেন। কতিপয় রাওয়ায়েতে আছে যে, তিনি প্রতি সোম ও বৃহস্পতিবার আবশ্যিকভাবে রোযা রাখতেন। আল্লামা ইবনে আবদুল বার (রঃ) "ইসতিয়াব"–এ লিখেছেন, হুজুর (সাঃ) বলতেন, উম্মুল ফজল (রাঃ), মাইমুনা (রাঃ), সালমা (রাঃ) এবং আসমা (রাঃ) চারজন মুমিনাহ বোন।

একবার হযরত উম্মুল ফজল (রাঃ) স্বপ্নে দেখলেন যে, রাসূলে আকরামের (সাঃ) পবিত্র শরীরের কোনো অংশ তাঁর ঘরে রয়েছে। তিনি এ স্বপ্নের কথা হুজুরের (সাঃ) কাছে বর্ণনা করলেন। তিনি বললেন ঃ "এর তাবির এই মনে হয় যে, আল্লাহ পাক আমার কলিজার টুকরা ফাতেমাকে (রাঃ) পুত্র দান করবেন। আর তুমি তাকে নিজের দুধ পান করাবে।"

কিছুদিন পর হযরত ফাতিমাতুজ জোহরার (রাঃ) পুত্র হযরত হোসাইন (রাঃ) জন্মগ্রহণ করেন। হযরত উম্মুল ফজল (রাঃ) তাঁকে নিজের দুধ পান করান এবং তাঁর জামিন হয়ে যান। এজন্য নবীর (সাঃ) খান্দান হযরত উম্মুল ফজলকে (রাঃ) অত্যন্ত সম্মান করতেন। একদিন হযরত উম্মুল ফজল (রাঃ)

www.bjilibrary.com

হযরত হোসাইনকে (রাঃ) কোলে নিয়ে হুজুরের (সাঃ) খেদমতে হাজির হলেন। তিনি প্রিয় নাতিকে তাঁর কোল থেকে নিলেন এবং আদর করতে লাগলেন। শিশু হোসাইন (রাঃ) হুজুরের (সাঃ) কোলে পেশাব করে দিলেন। হযরত উম্মুল ফজল (রাঃ) তৎক্ষণাৎ তাঁকে হুজুরের (সাঃ) কোল থেকে নিয়ে নিলেন এবং ধমক দিয়ে বললেন ঃ "আরে এটা তুমি কি করলে ! রাসূলের (সাঃ) কোলে পেশাব করে দিলে !" রাসূলে কারীম (সাঃ) উম্মুল ফজলের (রাঃ) এ ধমকও সহ্য করতে পারলেন না। তিনি বললেন ঃ

"উম্মুল ফজল ! তুমি হোসাইনকে যে ধমক দিয়েছো তাতে আমার খুব কষ্ট লেগেছে। এরপর তিনি পানি আনিয়ে পবিত্র পোশাকের পেশাব লাগা অংশ ধুয়ে ফেলেন।"

বিদায় হজ্জের সময় হযরত উম্মুল ফজল (রাঃ) প্রিয় নবীর সফর সঙ্গী ছিলেন। সহীহ আল বুখারীতে বর্ণিত আছে, আরাফাতের দিন কতিপয় লোক ধারণা করলো যে, হুজুর (সাঃ) রোযা আছেন। হযরত উম্মুল ফজল (রাঃ) একথা জানতে পেরে এক পেয়ালা ধুধ হুজুরের (সাঃ) খেদমতে প্রেরণ করলেন। তিনি সেই দুধ পান করলেন। এতে লোকদের সন্দেহ দূর হলো।

হযরত উম্মুল ফজল (রাঃ) হযরত ওসমান জুন্নুরাইনের (রাঃ) খেলাফতকালে স্বামী হযরত আব্বাসের (রাঃ) সামনেই ওফাত পান। হযরত ওসমান (রাঃ) তাঁর নামাযে জানাযা পড়ান।

হযরত উম্মুল ফজলের গর্ভে হযরত আব্বাসের (রাঃ) সাতটি সন্তান জন্ম নিয়েছিলো। তাঁদের মধ্যে ৬টি ছিলো পুত্র এবং ১টি কন্যা। পুত্ররা হলেন, ফজল (রাঃ), আবদুল্লাহ (রাঃ), উবায়েদুল্লাহ (রাঃ), মাবাদ (রাঃ), কাসাম (রাঃ) এবং আবদুর রহমান (রাঃ)। কন্যার নাম ছিলো উম্মে হাবিবাহ। নেতৃস্থানীয় চরিতকাররা লিখেছেন, এসব সন্তান অত্যন্ত যোগ্যতাসম্পন্ন ছিলেন। বিশেষ করে হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) এবং হযরত উবায়েদুল্লাহ (রাঃ) ইলম ও ফজলের দিক থেকে এত উঁচু মর্যাদা লাভ করেছিলেন যে, তাঁরা উম্মাহর স্তম্ভ হিসেবে পরিগণিত হতেন।

হযরত উম্মুল ফজল (রাঃ) থেকে ৩০টি হাদীস বর্ণিত আছে। এসব হাদীসের রাবীদের মধ্যে হযরত আবদুল্লাহ এবং হযরত আব্বাসের (রাঃ) অন্যান্য পুত্র ও হযরত আনাস (রাঃ) বিন মালিকের মত জালিলুল কদর সাহাবীও অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।

www.bjilibrary.com

হযরত উম্মে শুরাইক দাওসিয়া (রাঃ)

হযরত উম্মে শুরাইক দাওসিয়া অত্যন্ত মর্যাদা সম্পন্ন মহিলা সাহাবীদের মধ্যে পরিগণিত হয়ে থাকেন। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার হলো, যে পরিমাণ খ্যাতি রয়েছে সে পরিমাণ তথ্য তাঁর ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবন সম্পর্কে পাওয়া যায় না। ঐতিহাসিকরা তাঁর আসল নাম ও নসবনামা বর্ণনা করেননি। শুধু এতটুকুন লিখেছেন যে, দাওস গোত্রের সঙ্গে তিনি সংশ্লিষ্ট। ইয়েমেনের এক প্রত্যন্ত অঞ্চলে এই গোত্র বসবাস করতো। উম্মে শুরাইক (রাঃ) মক্কায় কবে এবং কি কারণে এসেছিলেন তা জানা যায় না। অবশ্য অনেক ঐতিহাসিক লিখেছেন যে, রহমতে আলম (সাঃ) নবুয়াত প্রাপ্তির পর যখন হকের দাওয়াত দিতে শুরু করেন তখন তিনি মক্কায় ছিলেন। আল্লাহ্ পাক তাঁকে অত্যন্ত সুন্দর স্বভাব দান করেছিলেন। তিনি নির্দ্বিধায় এবং চিন্তা-ভাবনা ছাড়াই তাওহীদের ডাকে সাড়া দিয়েছিলেন। আর এমনিভাবে তিনি "আসসাবিকুনাল আউয়ালূনের" পবিত্র দলের সদস্য হয়ে গিয়েছিলেন।

আল্লামা ইবনে সা'দ (রঃ) তাবকাতে লিখেছেন, হযরত উম্মে শুরাইক (রাঃ) ইসলাম গ্রহণ করলে মুশরিক আত্মীয়-স্বজনরা তাঁকে খর রোদে দাঁড় করিয়ে দিলো। এভাবেই তারা রুটির সঙ্গে তাঁকে মধু খাওয়াতো। ফলে তাঁর শরীর খুবই গরম হতো। তাঁকে পানি দেয়া হতো না। এমনিভাবে তিনদিন অতিবাহিত হওয়ার পর মুশরিকরা তাঁকে নতুন দ্বীন পরিত্যাগের কথা বললো। তিনদিন ও রাতের নির্যাতনে তিনি অনেকটা জ্ঞানহীন হয়ে পড়েছিলেন। মুশরিকদের কথার অর্থ তিনি বুঝতে পারলেন না। যখন তারা আসমানের দিকে ইঙ্গিত করলো তখন তিনি বুঝতে সক্ষম হলেন যে, তারা তাওহীদ অস্বীকার করার কথা বলছে। তৎক্ষণাৎ তিনি বলে উঠলেন ঃ "আল্লাহর কসম ! আমিতো ঐ আকিদার ওপরই কায়েম রয়েছি।"

হযরত উম্মে শুরাইক (রাঃ) নিজে ইসলাম গ্রহণ করেই চুপচাপ বসে থাকলেন না। বরং অত্যন্ত তৎপরতার সঙ্গে কোরেশ মহিলাদেরকেও ইসলামের দাওয়াত প্রদান শুরু করলেন। আল্লামা ইবনে আসির (রঃ) "উসুদুল গাব্বাহ"তে লিখেছেন, ইসলামের প্রথম যুগে উম্মে শুরাইক (রাঃ) কোরেশ মহিলাদের মধ্যে ইসলামের তাবলিক করতেন। মক্কার কুরাইশরা যখন তাঁর গোপন তৎপরতা সম্পর্কে অবহিত হলো তখন তাঁকে মক্কা থেকে বের করে দিলো।

www.bjilibrary.com

ঐতিহাসিকরা হযরত উম্মে শুরাইকের (রাঃ) হিজরতকাল সম্পর্কে কোনো ব্যাখ্যা দেননি। কিন্তু এটা প্রমাণিত যে, তিনি হিজরত এবং মদীনা মুনাওয়ারাতে স্থায়ীভাবে বসবাস করেছিলেন। সুনানে নাসাঈতে আছে, হযরত উম্মে শুরাইক (রাঃ) অত্যন্ত দানশীলা ছিলেন এবং অন্তর খুলে লোকদের খাবার খাওয়াতেন। তিনি নিজের বাড়ীকে অনেকটা সাধারণ মেহমানখানায় পরিণত করেছিলেন। এজন্য বাহির থেকে রাসূলের (সাঃ) খেদমতে যেসব মেহমান আসতেন তাঁদের অধিকাংশই হযরত উম্মে শুরাইকের (রাঃ) বাড়ীতে অবস্থান করতেন। সহীহ মুসলিমের এক রাওয়ায়েতে জানা যায়, হিজরতের পূর্বেও হযরত উম্মে শুরাইক (রাঃ) বাড়ীতে নও-মুসলিমদের দেখা-শুনা করতেন। তাবাকাতে ইবনে সা'দে আছে, দশম হিজরীতে মশহুর মহিলা সাহাবী হযরত ফাতেমা (রাঃ) বিনতে কায়েসকে স্বামী আবু আমর হিফস (রাঃ) বিন মুগিরা তালাক দিয়ে দেন। এ সময় হুজুর (সাঃ) ইদ্দতের সময় পর্যন্ত তাঁকে উম্মে শুরাইকের (রাঃ) বাড়ীতে অবস্থানের নির্দেশ দিলেন। কিন্তু পরে হুজুর (সাঃ) বললেন, উম্মে শুরাইকের (রাঃ) বাড়ীতে অধিক সংখ্যক মেহমানের গমনাগমন থাকে এবং তাঁর আত্মীয়-স্বজনও তাঁর সঙ্গে অবস্থান করে। এজন্য সেখানে পর্দার ব্যবস্থা হবে না। সুতরাং তুমি ইদ্দতকালে অন্ধ ইবনে উম্মে মাকতুমের (রাঃ) গৃহে অবস্থান করো।

রাসূলে আকরামের (সাঃ) প্রতি হযরত উম্মে শুরাইকের (রাঃ) অগাধ ভক্তি-শ্রদ্ধা ছিলো। আল্লামা ইবনে সা'দ বলেছেন, তাঁর কাছে তেল রাখার একটি ছোট পাত্র ছিলো। এ পাত্রে করে তিনি হুজুরের (সাঃ) জন্য হাদিয়া হিসেবে ঘি প্রেরণ করতেন। খোদার কি কুদরত ! সেই পাত্রের ঘি কখনো শেষ হতে চাইতো না। তিনি সেই পাত্রের ঘি নিজের শিশু সন্তানদেরকেও দিতেন। একদিন তিনি পাত্রটি উল্টিয়ে দেখতে চাইলেন যে, তাতে কি পরিমাণ ঘি অবশিষ্ট রয়েছে। সেদিন থেকেই সেই পাত্র ঘি শূন্য হয়ে গেলো। হযরত উম্মে শুরাইক (রাঃ) হুজুরের খেদমতে হাজির হয়ে এ ঘটনা শুনালেন। ঘটনা শুনে রাসূল কারীম (সাঃ) বললেন ঃ "যদি তুমি পাত্রটি না উল্টাতে তাহলে তাতে দীর্ঘদিন যাবত ঘি অবশিষ্ট থাকতো।"

হযরত উম্মে শুরাইকের (রাঃ) ওফাতের সাল এবং বিস্তারিত অবস্থা জানা যায়নি।

www.bjilibrary.com

হযরত ছা'বা (রাঃ) বিনতিল হাজরামি

তিনি ছিলেন সাইয়েদেনা হযরত তালহা (রাঃ) বিন উবায়েদুল্লাহর মা। তাঁর নসবনামা হলো ঃ ছা'বা (রাঃ) বিনতে আবদুল্লাহ হাজরামি বিন জামাদ বিন সালমা বিন আকবার।

বংশগত দিক থেকে তিনি ছিলেন হাজরামি এবং দেশগত দিক থেকে ছিলেন ইয়েমেনী। তাঁর পিতা হারব বিন উমাইয়ার মিত্র হিসেবে মক্কার স্থায়ী বাসিন্দা হয়ে যান। হক দাওয়াতের একদম প্রথম যুগে পুত্রের সঙ্গে ইসলাম গ্রহণ করেন। সে সময় তাঁর স্বামী উবায়েদুল্লাহ বিন ওসমান মারা গিয়েছিলেন। কিছুদিন পর পুত্রের সঙ্গে হিজরত করে মদীনা গমন করেন।

হযরত ছা'বা দীর্ঘ জীবন পেয়েছিলেন। ইমাম বুখারী (রঃ) তারিখুল সগিরে এই বর্ণনা উল্লেখ করেছেন যে, তিনি তৃতীয় খলিফা হযরত ওসমান জুন্নুরাইনের (রাঃ) অবরুদ্ধ হওয়া পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। যখন তিনি আমিরুল মু'মিনীনের অবরুদ্ধ হওয়ার খবর পেলেন তখন অস্থির হয়ে ঘর থেকে বের হয়ে স্বীয় পুত্র হযরত তালহার কাছে ইচ্ছা প্রকাশ করলেন যে, সে যেন নিজের প্রভাব-প্রতিপত্তি খাটিয়ে বিদ্রোহীদেরকে ফিরে যেতে উদ্বুদ্ধ করে।

ধারণা করা হয় যে, হযরত ছা'বা (রাঃ) ৮০ বছরেরও বেশী জীবিত ছিলেন। মশহুর সাহাবী হযরত আলা বিনুল হাজরামী (রাঃ) তাঁর সহোদর ছিলেন।

www.bjilibrary.com

হযরত শিফা' (রাঃ) বিনতে আওফ

তিনি বনু যাহ্‌রার সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিলেন। নসবনামা হলো ঃ শিফা' (রাঃ) বিনতে আওফ বিন আব্দ বিন হারিস বিন যাহ্‌রাহ।

আওফ বিন আবদি জাওফ যাহ্‌রীর সঙ্গে বিয়ে হয়েছিলো। তাঁরই ঔরসে হযরত আবদুর রহমান (রাঃ) বিন আওফ জন্মগ্রহণ করেন। তিনি আশারায়ে মুবাশশিরার অন্যতম ব্যক্তিত্ব ছিলেন। হযরত শিফা' (রাঃ) নবুয়াতের পর প্রথম তিন বছরের কোনো এক সময় ইসলাম গ্রহণ করেন। এমনিভাবে তিনি সাবিকুনাল আউয়ালুনার পবিত্র দলের মধ্যে বিশেষ মর্যাদার অধিকারিনী ছিলেন।

এক রাওয়ায়েত থেকে সম্পষ্ট হয় যে, প্রিয় নবী (সাঃ) ভূমিষ্ঠ হওয়ার সময় অন্যান্য মহিলা ছাড়া তিনিও হযরত আমেনার পাশে ছিলেন। এছাড়া তাঁর সম্পর্কে আর বিস্তারিত কিছু জানা যায়নি।

হযরত রামলাহ (রাঃ) বিনতে আবি আওফ সাহ্‌মিয়াহ

তাঁর সম্পর্ক ছিলো বনু সাহাম গোত্রের সঙ্গে। হযরত আবদুর রহমান (রাঃ) বিন আওফের চাচাতো ভাই হযরত মুত্তালিব (রাঃ) আজহার যাহ্‌রীর সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়। স্বামী-স্ত্রী উভয়েই দাওয়াতে হকের প্রথম যুগেই ঈমান আনেন। হাবশায় দ্বিতীয় হিজরতকালে (নবুয়াত প্রাপ্তির ৬ বছর পর) হযরত রামলাহ (রাঃ) এবং তাঁর স্বামী উভয়েই হক পথে নিজের ঘর-বাড়ী ছেড়ে উদ্বাস্তুর জীবন গ্রহণ করেন। সেখানেই তাঁদের পুত্র আবদুল্লাহ বিন মুত্তালিব (রাঃ) জন্মগ্রহণ করেন। হযরত মুত্তালিব (রাঃ) বিন আযহার হাবশাতেই ওফাত পান এবং হযরত রামলার (রাঃ) ওপর উদ্বাস্তুর জীবন ছাড়া বৈধব্যের মুসিবতও এসে উপস্থিত হয়। কিন্তু তিনি অত্যন্ত ধৈর্য এবং অটলতার সাথে সময় কাটান।

www.bjilibrary.com

খায়বার যুদ্ধের সময় পুত্র আবদুল্লাহ (রাঃ) এবং অন্য ৫৭জন মুহাজিরসহ হাবশা থেকে মদীনা মুনাওয়ারাহ চলে আসেন এবং বাকী জীবন সেখানেই কাটান। তাঁর জীবনী সম্পর্কে শুধু এতটুকুনই জানা গেছে।

হযরত যিন্নিরাহ (রাঃ) রুমিয়াহ

হযরত যিন্নিরাহ (রাঃ) কোরেশের বনু মাখজুম বংশের দাসী ছিলেন। দাওয়াতে হকের প্রথম যুগে ইসলাম গ্রহণ করেন এই "অপরাধে" মুশরিকদের যুলুম-নির্যাতনের শিকার হন। আবু জেহেল তাঁর ওপর নিত্য-নতুন যুলুম চালাতো এবং তাঁকে শিরকে বাধ্য করতো। তিনি জীবন দান করতে রাজি ছিলেন, কিন্তু আল্লাহর একত্ববাদ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিতে কোনোক্রমেই সম্মত ছিলেন না।

আল্লামা বালাজুরী (রঃ) বর্ণনা করেছেন, হক পথে সীমাহীন যুলুম সইতে সইতে তাঁর চোখের জ্যোতি কমে যেতে বসেছিলো। এতে আবু জেহেল বিদ্রূপ করে বলেছিলো, লাত এবং উজ্জা তোকে অন্ধ করে দিয়েছে। তিনি বেধড়ক জবাব দিয়েছিলেন, লাত এবং উজ্জাতো পাথরের মূর্তি। সে কি করে জানবে যে, কে তাকে পূজা করছে আর কে করছে না। আমার চোখের জ্যোতি যদি শেষ হয়ে গিয়ে থাকে তাহলে এ মুসিবত আমার আল্লাহর তরফ থেকে এসেছে। তিনি চাইলে আমার চোখের জ্যোতি ফিরিয়েও দিতে পারেন। তাঁর এ ধৈর্য আল্লাহর এত পসন্দ হয়েছিলো যে, পরের দিন যখন তিনি ঘুম থেকে উঠলেন তখন চোখের জ্যোতি ফিরে পেয়েছেন।

আল্লামা ইবনে হিশাম (রঃ) এ রাওয়ায়েতকে একটু ভিন্নভাবে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, হযরত যিন্নিরাহ (রাঃ) সেই সহায়-সম্বলহীনদের মধ্যে ছিলেন যাঁদের ওপর মুশরিকরা কঠোর নির্যাতন চালাতো। হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ) তাঁকে ক্রয় করে আযাদ করে দেন। খোদার কুদরত, আযাদী লাভের পর তিনি অন্ধ হয়ে যান। এতে মুশরিকরা বলতে শুরু করে যে, লাত ও উজ্জা যিন্নিরাহকে অন্ধ করে দিয়েছে। একথা শুনতেই তিনি বলেন ঃ "বাইতুল্লাহর কসম ! এরা মিথ্যুক। লাত ও উজ্জা কারোর ক্ষতি এবং উপকার করতে পারে না।" এরপর আল্লাহ তায়ালা তাঁর চোখের জ্যোতি পুনরায় ফিরিয়ে দেন।

www.bjilibrary.com

ইবনে আসিরের (রঃ) বর্ণনা অনুযায়ী হযরত যিন্নিরাহ (রাঃ) বনু আদি গোত্রের দাসী ছিলেন এবং হযরত ওমর (রাঃ) বিন খাত্তাব (ইসলাম গ্রহণের পূর্বে) তাঁর ওপর নির্যাতন চালাতেন। আল্লামা ইবনে হিশাম লিখেছেন, হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ) ক্রয় করে তাঁকে আযাদ করে দেন। কতিপয় রাওয়ায়েতে তাঁর নাম যানবারাহ হিসেবেও উল্লেখ করা হয়েছে।

হযরত লুবাইনাহ (রাঃ)

কোরেশ খান্দানের বনু আদির শাখা বনু মুয়াক্কালের দাসী ছিলেন। নবীর (সাঃ) নবুয়ত প্রাপ্তির প্রথম যুগেই ইসলাম গ্রহণ করে ভাগ্যবতী হন। এতে হযরত ওমর (রাঃ) বিন খাত্তাব (কুফরীকালে) এতো ক্রোধান্বিত হয়েছিলেন যে, প্রতিদিন তাঁর ওপর নির্যাতন চালাতেন। মারতে মারতে যখন ক্লান্ত হয়ে পড়তেন তখন বলতেন, আমি ক্লান্ত হয়ে তোকে ছেড়ে দিয়েছি। এখনো চাইলে এ নতুন দ্বীন ইসলাম ছেড়ে দে।

তিনি জবাবে বলতেন, "কক্ষণই নয়, তুমি যত ইচ্ছা যুলুম চালিয়ে নাও। আমি একথাই বলবো। আল্লাহ তায়ালা তোমার সঙ্গেও এমনি করবেন।"

অবশেষে হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ) তাঁকে ক্রয় করে আযাদ করে দেন। কেউ কেউ তাঁর নাম লুবিয়াহ লিখেছেন। এবং তাঁর মালিকের নাম মুয়াক্কিল বিন হাবিব বলে বর্ণনা করেছেন।

www.bjilibrary.com

উম্মে উবাইস (রাঃ)

বালাজুরীর (রঃ) বর্ণনা অনুযায়ী কোরেশের বনু যাহরাহ বংশের দাসী ছিলেন। দাওয়াতে হক গ্রহণকারী প্রাথমিক মুসলমানদের অন্যতম ছিলেন। হকপন্থী হওয়ার অপরাধে মক্কার মশহুর মুশরিক সরদার আসওয়াদ বিন আবদি ইয়াগুছ তাঁর ওপর অকথ্য যুলুম চালাতো। কিন্তু তিনি কোনোক্রমেই ইসলাম থেকে পিছু হটে যাননি। হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ) তাঁকে ক্রয় করে স্বাধীন করে দেন। যুবাইর বিন বাক্কার বলেছেন, তিনি বনি তাইম বিন মুররাহর দাসী ছিলেন।

হযরত হুমামাহ (রাঃ)

তিনি ছিলেন সাইয়েদেনা হযরত বেলাল হাবশীর (রাঃ) মা। হাফিজ ইবনে আবদুল বার (রঃ) "ইসতিয়াবে" লিখেছেন, তিনিও পুত্রের মত দাওয়াতে হকের প্রথম যুগে ইসলাম গ্রহণ করেন। মুশরিকরা যেভাবে তাঁর পুত্রের ওপর লোমহর্ষক নির্যাতন চালিয়েছিলো তেমনি তাঁর ওপরও বিভিন্ন ধরনের নির্যাতন করেছিলো। কিন্তু তিনি ইসলামের ওপর অটল ছিলেন। মা ও পুত্র উভয়কেই হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ) কিনে স্বাধীন করে দেন।

হযরত নাহাদিয়া (রাঃ) এবং তাঁর কন্যা

এই দুই সৌভাগ্যবতী মহিলা বনু আবদিদ্‌দারের এক মহিলার দাসী ছিলেন। ইসলামের প্রথম যুগেই উভয়ে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। এতে তাঁদের মালিক উভয়ের ওপরই কঠোর যুলুম চালায়। অবশেষে হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ) তাঁদেরকে খরিদ করে মুক্ত করে দেন।

www.bjilibrary.com

হযরত উম্মে মা'বাদ খুযায়িয়াহ (রাঃ)

যুগটি ছিলো ইসলাম সূর্য উদিত হওয়ার যুগ। মক্কা থেকে মদীনা যাওয়ার পথে মরুভূমির সঙ্গে কুদাইদ নামক একটি ছোট্ট বস্তি ছিলো। তাতে একটি ছোট গরীব পরিবার বাস করতো। পরিবারটির সকল মাল-সামান মিলে ছিলো একটি তাঁবু, একটি ছাগলের দল, হাতে গোনা কয়েকটি বরতন এবং মশক। পরিবারের প্রধান ছিলেন একজন উদ্যমশীল গ্রামবাসী তামিম বিন আবদুল উজ্জা খাযায়ী। তাঁর বেশীর ভাগ সময়ই বকরী চরিয়ে কাটতো। তামিমের স্ত্রী ছিলেন চাচাতো বোন আতিকাহ বিনতে খালিদ (বিন খালিফ বিন মানকাজ বিন রবিয়াহ বিন আহরাম বিন খুবাইস বিন হারাম বিন হাবছিয়াহ বিন সুলুল বিন কা'ব বিন আমর)। বনু খাযায়ার শাখা বনু কাবের সঙ্গে উভয়েরই সম্পর্ক ছিলো। আতিকাহ একজন পবিত্র, মর্যাদাবান এবং সাহসী মহিলা ছিলেন এবং 'উম্মে মা'বাদ' কুনিয়তে মশহুর ছিলেন। তিনি আরবের প্রথাগত মেহমান নওয়াজির ব্যাপারে বিশেষভাবে পরিচিত ছিলেন। আল্লাহ পাক তাঁর অন্তরে ত্যাগ ও খেদমতে খালকের আবেগ পূর্ণভাবে ভরে দিয়েছিলেন। দারিদ্রতা সত্ত্বেও তিনি কুদাইদ অতিক্রমকারী মুসাফিরদেরকে অত্যন্ত হৃষ্টচিত্তে মেজবানী করতেন এবং সেবা ও আতিথেয়তায় কোনোক্রমেই কমতি করতেন না। পানি, দুধ, খেজুর, গোশত যাকিছু জুটতো মেহমানদের সামনে পেশ করতেন। যখন কোনো মুসাফির তাঁর তাঁবুতে বিশ্রাম গ্রহণ করে রওয়ানা হতো তখন তাঁর মুখে উম্মে মা'বাদের প্রশংসা গুণ কীর্তন এবং শুধু দোয়াই উচ্চারিত হতো। এভাবে উম্মে মা'বাদের নাম মুসাফিরদের মাধ্যমে দূর-দূরান্ত পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছিলো এবং লোকজন তাঁর শরাফতীর তারিফ করতে কখনো পরিশ্রান্ত হতো না।

নবুয়ত প্রাপ্তির ১৩ বছর পর্যন্ত উম্মে মা'বাদ খোদার সৃষ্টির সেবা করতে করতে কাটিয়ে দিয়েছিলেন এবং যৌবনের পর্যায় শেষ করে মযবুত বয়সে পৌঁছেছিলেন। সে সময় রহমতে আলম (সাঃ) আরবের মরুবাসীদের মধ্যে 'সাহিবে কোরেশ'-এর উপাধীতে মশহুর ছিলেন। তামিম এবং উম্মে মা'বাদের কানেও 'সাহিবে কোরেশ' এবং তাঁর দাওয়াতের কথা উঠেছিলো। এ সত্ত্বেও তাঁরা সাধারণ নিয়মেই জীবন ধারা অব্যাহত রেখেছিলেন। এ গরীব এবং সহজ স্বভাবের গ্রামবাসীর পক্ষে নবুয়াতের প্রশ্নটি পরীক্ষা-নীরিক্ষা করার জন্য দূর-দূরান্ত গমন ছিলো অসম্ভব। কিন্তু তিনি কি জানতেন যে, একদিন তাঁরই

www.bjilibrary.com

মরু গৃহ সেই 'সাহিবে কোরেশের' পদধূলিতে প্রোজ্জ্বল হয়ে উঠবে, আর সৃষ্টির সকলেই তাঁর প্রতি ঈর্ষা পোষণ করবে।

নবুয়াত প্রাপ্তির ত্রয়োদশ বছরের রবিউল আউয়াল মাসে রহমতে আলম (সাঃ) মক্কাকে বিদায় জানান এবং তিন রাত ছুর গুহায় কাটিয়ে মদীনা রওয়ানা হন। সে সময় হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ) এবং হযরত আমের (রাঃ) বিন ফাহিরাহ তাঁর সহযাত্রী ছিলেন। হুজুর (সাঃ) একটি উটনীর ওপর সওয়ার ছিলেন এবং তাঁরা দু'জন অন্য উটনীর ওপর ছিলেন। এই পবিত্র কাফেলার আগে আগে আবদুর রহমান বিন উরাইকিত লাইছী পায়ে হেঁটে চলছিলেন। তিনি অমুসলিম হওয়া সত্বেও একজন বিশ্বস্ত মানুষ এবং মক্কা থেকে মদীনা যাওয়ার সকল রাস্তা সম্পর্কে জ্ঞাত ছিলেন। এজন্য হুজুর (সাঃ) তাঁকে রাস্তা দেখানোর উদ্দেশ্যে মজুরী দিয়ে নিজের সঙ্গে নিয়েছিলেন।

অন্য এক রাওয়ায়েতে আছে, নবী করীম (সাঃ) এবং হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ) একটি উটনীর ওপর সওয়ার ছিলেন। অন্য উটনীর ওপর ছিলেন হযরত আমের (রাঃ) বিন ফাহিরাহ ও আবদুল্লাহ বিন উরাইকিত। এই ছোট কাফেলা কুদাইদ পৌঁছলো। এ সময় হযরত আসমা (রাঃ) জাতুন নিতাকাইন বিনতে সিদ্দিকে আকবার (রাঃ) গুহা থেকে রওয়ানার সময় যে খাবার সঙ্গে দিয়েছিলেন তা শেষ হয়ে গিয়েছিলো এবং প্রিয় নবী (সাঃ) ও তাঁর সঙ্গীরা ক্ষুধা ও পিপাসা অনুভব করছিলেন। হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ) উম্মে মা'বাদের খ্যাতি শুনেছিলেন এবং তাঁর আস্থা ছিলো যে, মা'বাদের বাসস্থানে খানা-পিনার কিছু না কিছু ব্যবস্থা হবেই। সুতরাং এ পবিত্র কাফেলা উম্মে মা'বাদের তাঁবুতে গিয়ে থেমে গেল। তিনি সে সময় তাঁবুর আঙ্গিনায় বসেছিলেন। সে সময় প্রচণ্ড খরায় এলাকায় কিয়ামতের অবস্থা বিরাজ করছিলো। উম্মে মা'বাদের পরিবার তখন অত্যন্ত দারিদ্রতার মধ্য দিয়ে দুঃখ-কষ্টে অতিবাহিত করছিলো। হুজুর (সাঃ) উম্মে মা'বাদকে বললেন, 'দুধ, গোশত, খেজুর অথবা খাবার কোনো বস্তু যদি তোমার কাছে থাকে তাহলে তা আমাদেরকে দাও। আমরা তার মূল্য আদায় করবো।"

উম্মে মা'বাদ দুঃখ ভারাক্রান্ত কণ্ঠে বললেন, "খোদার কসম ! আপনাকে দেয়ার মতো কোনো বস্তু এখন আমাদের ঘরে নেই। যদি থাকতো তাহলে তৎক্ষণাৎ উপস্থিত করতাম।"

ইত্যবসরে রাসূলের (সাঃ) নজর একটি জীর্ণ-শীর্ণ বকরীর ওপর পড়লো। বকরীটি তাঁবুর একপাশে দাঁড়িয়েছিলো। তিনি (সাঃ) বললেন, 'মা'বাদের মা ! যদি অনুমতি দাও তাহলে এ বকরীর দুধ-দুইতে পারি।"

www.bjilibrary.com

উম্মে মা'বাদ বললেন, "আপনি অত্যন্ত উৎসাহের সঙ্গে দুধ দুইয়ে নিন। কিন্তু সে যে এক ফোঁটা দুধও দিতে পারবে সে আশা আমি করি না।"

এরপর হুজুরের (সাঃ) সামনে সেই বকরী আনা হলো। প্রথমে তিনি তার পা বাঁধলেন এবং পিঠের ওপর হাত রেখে দোয়া করলেন, "হে আল্লাহ ! এ মহিলার বকরীতে বরকত দাও।"

এরপর এক আশ্চার্য ধরনের দৃশ্য পরিদৃশ্য হলো ! সাইয়েদুল মুরসালিন ফখরে মওজুদাত (সাঃ) বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহীম পড়ে যেই বকরীর দুধের বাঁট স্পর্শ করলেন তৎক্ষণাৎ তা দুধে ভরে গেলো এবং বকরী পা ছড়িয়ে দাঁড়িয়ে গেলো। হুজুর (সাঃ) একটি বড় পাত্র চেয়ে নিয়ে দুধ দোহা শুরু করলেন। এই পাত্র খুব শিগগির ভরে গেলো। তিনি প্রথমে এই দুধ উম্মে মা'বাদকে পান করালেন। তিনি খুব আসুদাহ হয়ে পান করলেন। অতপর তিনি নিজের সঙ্গীদেরকে পান করালেন। তাঁরাও আসুদাহ হয়ে পান করার পর শেষে তিনি স্বয়ং পান করলেন এবং বললেন, ছাকিউল কাওমি আখিরুহুম (লোকদের পান করানেওয়ালা স্বয়ং শেষে পান করে থাকে)। তারপর হুজুর (সাঃ) দ্বিতীয়বার দুধ দোহা শুরু করলেন। তা আবার কানায় কানায় ভরে গেলো। রহমতে আলম (সাঃ) এই দুধ উম্মে মা'বাদকে দিয়ে রওয়ানা হয়ে গেলেন।

উম্মে মা'বাদ বর্ণনা করেছেন, বিশ্বনবী (সাঃ) যে বকরীর দুধ দুইয়েছিলেন তা হযরত ওমর ফারুকের (রাঃ) শাসনকাল পর্যন্ত আমাদের কাছে ছিলো। আমরা সকাল-সন্ধ্যা তার দুধ দুইতাম এবং ভালোভাবে প্রয়োজন পূরণ করতাম।

তাবাকাতে ইবনে সা'দের এক রাওয়ায়েতে আছে, সে সময় উম্মে মা'বাদ একটি বকরী যবেহ করে নবী করীম (সাঃ) এবং তাঁর সঙ্গীদেরকে খানা খাইয়েছিলেন। নাশতাও সঙ্গে দিয়েছিলেন। কিন্তু অন্য ঐতিহাসিকরা বকরী যবেহ করার কথা উল্লেখ করেননি।

রহমতে আলমের (সাঃ) চলে যাওয়ার কিছুক্ষণ পর উম্মে মা'বাদের স্বামী বকরীর পাল নিয়ে জঙ্গল থেকে ফিরে এলেন। তাঁবুতে দুধে ভরা পাত্র দেখে আশ্চর্য হয়ে গেলেন। স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করলেন, "মা'বাদের মা ! এই দুধ কোত্থেকে এলো ?"

উম্মে মা'বাদ জবাব দিলেন ঃ "খোদার কসম ! একজন বাবরকত সম্মানিত মেহমানের এখানে আগমন ঘটেছিলো। তিনি বকরী দোহন করেন। তিনি

www.bjilibrary.com

নিজে ও সঙ্গীদেরসহ আসুদাহ হয়ে সেই দুধ পান করেন এবং এ দুধ আমাদের জন্য রেখে গেছেন।"

অতপর তিনি বিস্তারিতভাবে সকল ঘটনা বর্ণনা করলেন।

আবু মা'বাদ তামিম বললেন ঃ "তাঁর অবয়বের সামান্য বর্ণনা দাও তো।"

উম্মে মা'বাদ স্বতস্ফূর্তভাবে সাইয়েদুল বাশারের (সাঃ) যে হুলিয়া মুবারক বর্ণনা করেন, তা ইতিহাস নিজের পাতায় সংরক্ষিত করে রেখেছে। তিনি বলেন ঃ

"পবিত্র সুরত, হাসিন ও জামিল, রওশন চেহারা, স্বাস্থ্য মোটাও নয় আবার পাতলাও নয়, শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গসমূহ ভারসাম্যপূর্ণ, খুবসুরত চোখ, চুল ঘন এবং লম্বা, সোজা গর্দান, চোখের মনি আলোকিত, কাজল চোখ, ক্ষীণ সংযুক্ত ভ্রূ, কালো ঝাকড়া চুল, চুপ থাকলে অত্যন্ত ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মনে হয়। অন্তর জয়কারী কথাবার্তা। দূর থেকে দেখলে অত্যন্ত সুন্দর এবং মনোমুগ্ধকারী, কাছ থেকে অত্যন্ত মিষ্টি এবং সুশ্রী। মিষ্টি কথা, স্পষ্ট বাক্য। কথাবার্তা শব্দের কমবেশী থেকে মুক্ত। মতির মালার মত সব আলাপ-আলোচনা। মধ্যমদেহী -বেঁটে নন আবার এমন লম্বাও নন যে, দেখে ভয় লাগে। তাঁর সঙ্গীরা এমন যেসব সময় চারপাশে থাকেন। যখন তিনি কিছু বলেন তাঁরা তা মনোযোগ সহকারে শোনেন এবং যখন তিনি নির্দেশ দেন তখন তা পালনের জন্য এগিয়ে আসেন।"

আবু মা'বাদ এই ছিফাত শুনে বলে উঠলেন, খোদার কসম ! ইনিতো সেই সাহিবে কোরেশ যাঁর কথা আমরা শুনে আসছি। আমি অবশ্যই তাঁর সঙ্গে মুলাকাত করবো।

হযরত উম্মে মা'বাদের (রাঃ) ইসলাম গ্রহণ সম্পর্কে দুই ধরনের রাওয়ায়েত রয়েছে। একটি রাওয়ায়েতে বলা হয়েছে যে, তাঁর কানে 'সাহিবে কোরেশে'র কথা আগেই এসেছিলো। বস্তুত যখন প্রথম প্রথম তাঁর দৃষ্টি প্রিয় নবীর (সাঃ) ওপর পড়েছিলো তখনই তাঁর অন্তর সাক্ষ্য দিয়েছিলো যে, ইনিই সেই সাহিবে কোরেশ যিনি তাওহীদের আহ্বানকারী এবং নেকী ও হেদায়াতের প্রস্রবণ। বরকীর ঘটনা দেখে তাঁর পূর্ণ আস্থা জন্মালো যে, মহান মেহমান আল্লাহর সত্য রাসূল। সুতরাং তিনি তৎক্ষণাৎ সত্য অন্তরে মুসলমান হয়ে গেলেন এবং হুজুর (সাঃ) তাঁর জন্য দোয়া করলেন।

www.bjilibrary.com

দ্বিতীয় রাওয়ায়েত হলো, হুজুর (সাঃ) মদীনা মুনাওয়ারায় তাশরীফ নেয়ার পর আবু মা'বাদ (রাঃ) ও উম্মে মা'বাদ স্বামী-স্ত্রী দু'জনেই হিজরত করে মদীনা পৌছেন এবং রহমতে আলমের (সাঃ) খেদমতে হাজির হয়ে ঈমান আনয়নের সৌভাগ্য লাভ করেন।

হযরত উম্মে মা'বাদের জীবনের আর বিস্তারিত তথ্য ইতিহাসে পাওয়া যায় না। এ সত্ত্বেও ওপরে বর্ণিত একটি ঘটনাই তাঁকে প্রখ্যাত করে রেখেছে। তিনি অত্যন্ত মর্যাদাশালী ছিলেন।

হযরত খানছা (রাঃ) বিনতে আমর

সাইয়েদেনা হযরত ওমর ফারুকের (রাঃ) শাসনকালে কাদেসিয়ার যুদ্ধ সংঘটিত হয়। কাদেসিয়া আরবের ইরাক ভূখণ্ডে অবস্থিত। এ যুদ্ধ ছিলো অত্যন্ত ভয়াবহ এবং সিদ্ধান্তপূর্ণ। ইরানের রাজা এ যুদ্ধে মুসলমানদের বিরুদ্ধে দু' লাখ অভিজ্ঞ যোদ্ধা এবং তিনশ' হাতীর সমাবেশ ঘটিয়েছিলো। পক্ষান্তরে ইসলামের মুজাহিদদের সর্বমোট সংখ্যা ছিলো মাত্র ত্রিশ থেকে ৪০ হাজারের মধ্যে। বেশ কিছু মুজাহিদের সঙ্গে তাঁদের পরিবার-পরিজনও যুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য কাদেসিয়া এসেছিলেন। এ সময় এক বৃদ্ধা মহিলাও জিহাদের আবেগে উদ্বেলিত হয়ে নিজের চার পুত্রের সঙ্গে যুদ্ধের ময়দানে উপস্থিত ছিলেন। রাতের প্রথম প্রহরে যখন প্রত্যেক মুজাহিদ পরবর্তী সকালের ভয়াবহ দৃশ্য সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করছিলেন ঠিক তখন সেই মহিলা চার পুত্রকে নিজের কাছে ডাকলেন এবং তাঁদেরকে সম্বোধন করে বললেন ঃ

"হে আমার সন্তানেরা ! তোমরা স্বেচ্ছায় ইসলাম গ্রহণ করেছ এবং স্বেচ্ছায় হিজরত করেছ। সেই চিরঞ্জীব সত্যের শপথ যিনি ছাড়া কোনো মাবুদ নেই। যেমন তোমরা এক মা'র পেট থেকে জন্ম নিয়েছ তেমনি তোমাদের পিতাও এক। আমি তোমাদের পিতার সঙ্গে খেয়ানত করিনি। তোমাদের বংশ আয়েবহীন এবং কুল কলংকহীন। ভালোভাবে জেনে নাও, জিহাদ ফি সাবিল্লিাহর চেয়ে বড় কোনো সওয়াবের কাজ নেই। আখেরাতের স্থায়ী জীবন দুনিয়ার নশ্বর জীবনের চেয়ে অনেক উত্তম। আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন ঃ

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱصْبِرُوا۟ وَصَابِرُوا۟ وَرَابِطُوا۟ قف وَٱتَّقُوا ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ

تُفْلِحُونَ ـ(ال عمران : ٢٠٠)

www.bjilibrary.com

"হে ঈমানদাররা ! ধৈর্যধারণ করো এবং অটল থাকো এবং পরস্পর মিলেমিশে থাকো এবং আল্লাহকে ভয় করো যাতে তোমরা কল্যাণ লাভ করতে পারো।"–(সূরা আলে ইমরান ঃ ২০)

আগামীকাল আল্লাহ চাইলে এবং তোমরা যদি ভালোভাবে সকাল করতে পার তাহলে অভিজ্ঞতাসহ এবং আল্লাহর সাহায্য চেয়ে শত্রুর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে। তোমরা যখন দেখবে যুদ্ধের ময়দান খুব উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে এবং তার স্ফূলিঙ্গ ছড়িয়ে পড়ছে তোমরা যুদ্ধের আগুনে ঢুকে পড়বে এবং হক পথে প্রচণ্ড শক্তি নিয়ে তরবারী চালাবে। শত্রু সেনাপতি হলেও তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে। যুদ্ধে যদি তোমরা জয়ী হও তাহলে উত্তম। আর যদি শাহাদাত নসিব হয় তাহলে তার থেকেও উত্তম। তাতে আখেরাতের মর্যাদাবান হবে।

চার পুত্রই এক বাক্যে বললেন ঃ "হে শ্রদ্ধেয় মা ! ইনশাআল্লাহ আমরা আপনার আশা পূরণ করবো এবং আপনি আমাদেরকে অটল পাবেন।"

সকালে যখন যুদ্ধের ময়দান উত্তপ্ত হয়ে উঠলো তখন সেই মহিলার চার পুত্র ঘোড়ার বাগডোর হাতে নিলেন এবং যুদ্ধ গাথা উচ্চারণ করতে করতে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। সম্মানিত মহিলার চেহারায় আশ্চর্য ধরনের মহিমা পরিস্ফূটিত ছিলো। নিজের পুত্রদেরকে যুদ্ধের ময়দানে পাঠিয়ে দিয়ে আল্লাহর দরবারে আরজ করলেন ঃ

"হে আল্লাহ ! আমার প্রিয় সম্পদ বলতে যাকিছু ছিলো তা তোমার হাতে ন্যস্ত করলাম।"

মায়ের বক্তৃতা শুনে রাত থেকেই এ যুবকদের অন্তরে শাহাদাতের আকাংখা টগবগ করছিলো। এখন যেই যুদ্ধের সুযোগ এলো তাঁরা প্রচণ্ড বাহাদুরীর সঙ্গে যুদ্ধে অবতীর্ণ হলেন। তাঁরা যেদিকেই অগ্রসর হচ্ছিলেন সেদিকই সাফ হয়ে যাচ্ছিলো। অবশেষে অসংখ্য শত্রু সেনা তাঁদেরকে ঘিরে ফেললো। এ অবস্থাতেও তাঁরা দমিত হলেন না। শত্রু পক্ষের ২০জন সৈন্যকে যমের গৃহে পাঠিয়ে তাঁরাও শাহাদাতের মর্যাদায় অভিষিক্ত হলেন।

www.bjilibrary.com

যখন সেই মহিলা নিজের পুত্রদের শাহাদাতের খবর পেলেন তখন কোন ফরিয়াদ না করে আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জতের সামনে সিজদা অবনত হয়ে গেলেন এবং তাঁর মুখ দিয়ে উচ্চারিত হলোঃ

"সেই আল্লাহর শোকর যিনি আমার পুত্রদেরকে শাহাদাতের সুযোগ দিয়েছেন। আশা করি, আল্লাহ পাক কিয়ামতের দিন আমাকে এই সন্তানদের সঙ্গে রহমতের সুশীতল ছায়ায় স্থান দেবেন।"

এই বৃদ্ধ মহিলা, যিনি আনুগত্য ও সন্তুষ্টি এবং ধৈর্য ও স্থৈর্যের এমন নিদর্শন পেশ করেছেন যা বিশ্ব কখনো অবলোকন করেনি, তিনি ছিলেন আরবের মহান মরসিয়া রচয়িতা হযরত খানসা (রাঃ) বিনতে আমর।

হযরত খানসা (আল-আনসা) অন্যতম মহান মহিলা সাহাবী ছিলেন। নাজদের বনু সুলাইম গোত্রের সঙ্গে তিনি সম্পর্কযুক্ত ছিলেন। এই গোত্রটি ছিল বনু কায়েস বিন আইলানের একটি শাখা। গোত্রটি শরাফত, উদারতা ও দানশীলতা এবং সাহস ও বীরত্বের দিক থেকে আরব গোত্রসমূহের মধ্যে বিশেষ মর্যাদার অধিকারী ছিল। এমনকি একবার স্বয়ং রহমতে আলম (সাঃ) এই গোত্রের প্রশংসা এই ভাষায় করেছিলেনঃ

"নিঃসন্দেহে প্রত্যেক জাতির একটি আশ্রয়স্থল থাকে এবং আরবের আশ্রয়স্থল হলো কায়েস বিন আইলান।"

হযরত খানসার (রাঃ) আসল নাম ছিল তুমাদির। তাঁর বংশনামা হলোঃ তুমাদির বিনতে আমর (বিনুল হারিস) বিন আশশরীদ বিন রিবাহ বিন ইয়াকজাহ বিন আসিয়াতা বিন খাফাফ বিন ইমরাউল কায়েস বিন বাহছা বিন সুলাইম বিন মানসুর বিন আকরামা বিন হাফছা (আফসা) বিন কায়েস বিন আইলান বিন মুদির।

তুমাদির যেহেতু অত্যন্ত চোসত, হুশিয়ার এবং সুন্দরী ছিলেন এজন্য খানসা উপাধিতে মশহুর হন। খানসার অর্থ হলো হরিণী।

ঐতিহাসিকরা হযরত খানসার (রাঃ) জন্ম সাল সম্পর্কে ব্যাখ্যা দেননি। কিন্তু বিভিন্ন কার্যকারণে জানা যায় যে, তিনি নবীর (সাঃ) হিজরতের ৫০ বছর পূর্বে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা আমর বনু সুলাইমের নেতা ছিলেন এবং সুশ্রী ও প্রাচুর্যের ভিত্তিতে অত্যন্ত প্রবাভশালী ছিলেন। সন্তানদেরকে (খানসা এবং তাঁর ভাই মাবিয়া ও সাখার) তিনি অত্যন্ত প্রাচুর্যের মাধ্যমে লালন-পালন করেন। এতে তাঁরা বড় হয়েও উন্নত চরিত্রের অধিকারী হন। স্রষ্টা খানসা'র (রাঃ) প্রকৃতিতেই কবিত্বের

www.bjilibrary.com

গুণ আমানত রেখেছিলেন। সুতরাং তিনি শৈশবকালেই কখনো কখনো দু'চার ছত্র কবিতা রচনা করে ফেলতেন। ধীরে ধীরে জ্ঞান পরিপক্ক হওয়ার সাথে সাথে তাঁর কাব্যিক যোগ্যতাও বৃদ্ধি পেতে থাকে। এমনকি পরবর্তীতে তিনি একজন প্রখ্যাত মরসিয়া রচনাকারী মহিলা কবির মর্যাদায় ভূষিত হন। যৌবন প্রাপ্তির আগেই হযরত খানসার (রাঃ) পিতা মারা যান। খানসা'র (রাঃ) জন্য এটা ছিল অসহনীয় বেদনার ব্যাপার। কিন্তু দুই সহোদর মাবিয়া এবং সাখার এমন আন্তরিকতা ও স্নেহের সঙ্গে তাঁর অভিভাবকত্ব করেন যে, তিনি পিতার বিয়োগ ব্যথা ভুলে যান। এখন তাঁর ভালোবাসার কেন্দ্রবিন্দু হয় দুই সহোদর। তিনি তাঁদেরকে প্রাণ খুলে ভালোবাসতেন এবং তাঁদের দেখেই জীবিত থাকতেন। সেই যুগে বনু হওয়াযেনের প্রখ্যাত অশ্বারোহী, কবি এবং সরদার দুরাইদ বিন আস সিম্মাহ খানসাকে (রাঃ) তাঁর ভাই মাবিয়ার মাধ্যমে বিয়ের পয়গাম প্রেরণ করেন। খানসা (রাঃ) কতিপয় কারণে এই পয়গাম গ্রহণে অস্বীকৃতি জানান। কয়েকজন ঐতিহাসিক লিখেছেন যে, দুরাইদ ছিল বয়স্ক মানুষ এবং তার চেহারা-সুরতও পছন্দনীয় ছিল না। এজন্য খানসা (রাঃ) তাকে দেখে পছন্দ করেননি এবং তার ওপর কিছু কবিতাও বলেন। এই কবিতাতে দুরাইদ ও তার গোত্রের উল্লেখ বিদ্রুপাত্মক ভাষায় করা হয়েছে।

এরপর নিজের গোত্রের এক যুবক আব্দুল উজ্জাকে (অন্য বর্ণনা অনুযায়ী ইবনে কুতাইবা রাওয়াহা বিন আব্দুল উজ্জা) বিয়ে করেন। তাঁর ঔরসে হযরত খানসার (রাঃ) এক পুত্র আবু শাজারাহ জন্মগ্রহণ করে। আব্দুল উজ্জা খুব শিগগির মারা যান। তারপর খানসা (রাঃ) বনু সুলাইমের অপর ব্যক্তি মিরদাস বিন আবি আমেরকে বিয়ে করেন। তাঁর ঔরসে তিন পুত্র আমর, যায়েদ এবং মাবিয়া (অথবা ইবনে হাযামের মত অনুযায়ী হাবিয়াহ, জাযা এবং মাবিয়া) জন্ম নেয় এবং তাদের পর উমরাহ নাম্নী একটি মেয়েও জন্মগ্রহণ করে। মিরদাস ছিলেন একজন সাহসী ও বাহাদুর মানুষ। তিনি কতিপয় সাথীর সহযোগিতায় একটি পুকুরের সংযুক্ত জলাভূমিকে কৃষিযোগ্য করে তৈরীর প্রচেষ্টা চালান। সেখানকার স্যাঁতসেঁতে আবহাওয়া তাঁর স্বাস্থ্যের ওপর বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে এবং জ্বরে আক্রান্ত হয়ে মারাযান।

অতঃপর খানসা (রাঃ) সারা জীবন বৈধব্যের জীবন কাটান। তাঁর সহোদর মাবিয়া এবং সাখার বিধবা বোনের যত্ন নেয়ার প্রশ্নে কোন ত্রুটি করেননি। তিনি ঐকান্তিক আন্তরিকতার সঙ্গে সন্তানদের লালন-পালন ও প্রশিক্ষণে ব্যস্ত থাকেন। সে যুগে তিনি কাব্য চর্চাও করতে থাকেন। কিন্তু তাঁর খ্যাতি খুবই সীমিত ছিল। যে ঘটনা তাঁর জীবনের ধারা পাল্টে দেয় এবং কবিতায় প্রভাব সৃষ্টি করে তা ছিল তাঁর

www.bjilibrary.com

দুই মুরুব্বী সহোদরের একের পর এক মৃত্যু। ঐতিহাসিকরা এই ঘটনা এইভাবে বর্ণনা করেছেনঃ খানসার (রাঃ) ভাই মাবিয়া উকাজের মেলায় বনু মাররার জনৈক ব্যক্তি হাশিম বিন হারমালার সঙ্গে ঝগড়া করেন। তিনি হাশিমের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য ১৮ জন সঙ্গী নিয়ে মাররাহ গোত্রের ওপর হামলা করে বসেন। সংঘর্ষে হাশিমের ভাই দুরাইদের হাতে তিনি নিহত হন।

এরপর সাখার সহোদরের (মাবিয়া) হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণের শপথ নিল। বস্তুত সুযোগ পেয়ে সে দুরাইদকে হত্যা করলো এবং তার সঙ্গী সুলাইমা দুরাইদের ভাই হাশিম বিন হারমালাকে মৃত্যুর ঘরে পাঠিয়ে দিল। কিন্তু তাতেও সাখারের প্রতিশোধ স্পৃহা দমেনি এবং সে বনু মাররাহর ওপর অব্যাহতভাবে হামলা করতে থাকে। এই দ্বন্দ্বে বনু মাররার মিত্র বনু আসাদের ফাকিয়াস নামক জনৈক ব্যক্তি সাখারকে মারাত্মকভাবে আহত করে। আহত হয়ে সে কয়েক মাস তাঁবুতে অর্ধমৃত অবস্থায় পড়ে রইলো। হযরত খানসা (রাঃ) প্রিয় ভাইয়ের খুব সেবা-শুশ্রূষা করলেন। কিন্তু সে আর সুস্থ হলো না। সাখার ছিল বীর, জ্ঞানী এবং সুদর্শন যুবক। তার মৃত্যুতে খানসার (রাঃ) খুব দুঃখ হলো। তাঁর মন মস্তিষ্কে এক আগুন প্রজ্জ্বোলিত হয়ে উঠলো যা অত্যন্ত ব্যথা-বেদনা এবং সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে মরসিয়ার ভাষায় প্রকাশ পেল। তিনি সাখারের বিচ্ছিন্নতায় এমন মর্মস্পর্শী মরসিয়া বললেন যে, তা যে শুনতো সেই না কেঁদে পারতো না। এই মরসিয়া তাঁকে সমগ্র আরবে মশহুর করে দেয়। শুধু সাধারণ মানুষই নয় বরং তাঁর সমকালীন কবিরাও তাঁর কাব্যের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে ওঠে।

জাহেলী যুগে আরববাসীরা রবিউল আউয়াল থেকে জিলকদ মাস পর্যন্ত বিভিন্ন স্থানে খুব ধূম-ধামের সঙ্গে মেলা বসাতো। উকাজ বাজারের মেলা সে সময় সবচেয়ে বেশী প্রসিদ্ধ ছিল। এই মেলায় আরব গোত্রসমূহের সকল সরদার এবং সকল বিষয়ের বিজ্ঞ ও অভিজ্ঞ ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত হতেন। এই মেলায় গোত্রসমূহের নতুন সরদার নির্বাচন এবং পারস্পরিক ঝগড়া-ঝাটির মীমাংসা করা হতো। মোট কথা, এই মেলা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং কেন্দ্রীয় চরিত্রের ছিল। আরবের প্রতিটি স্থান থেকে ছোট বড় সকল কবি তাতে অংশ নিত এবং কাব্য শুনাতো। হযরত খানসাও (রাঃ) উকাজের বাজারের এই সম্মিলনে প্রত্যেক বছর যোগ দিতেন। যখন তাঁর আগমন ঘটতো তখন মানুষ তাঁর দিকে ঝাঁপিয়ে পড়তো এবং তাঁর উটের চারপাশে ঘিরে দাঁড়িয়ে মরসিয়া শুনানোর জন্য পীড়াপীড়ি করতো। যখন তিনি নিজের মরসিয়ার কতিপয় কবিতা শুনাতেন তখন শ্রোতারা দুঃখ বেদনায় কাঁদতো। এই শ্রোতারা কারা ছিল? তারা হলো পাথরবৎ অন্তর এবং ভয়ানক যুদ্ধপ্রিয় মরুচারি বেদুঈন। হত্যা ও

www.bjilibrary.com

ধ্বংস তাদের নিকট খেলনার বস্তু ছিল। খানসার (রাঃ) কবিতা শুনে তাদের অন্তর গলে যেত এবং চক্ষু দিয়ে অশ্রু বয়ে পড়তো। এই অশ্রু তাদের মধ্যে মানবতার আবেগ সৃষ্টির মাধ্যম হতো।

নিজের ভাষা ও ব্যাকরণের (নাহু ও ছারফ) ওপর হযরত খানসার (রাঃ) অসাধারণ ব্যুৎপত্তি ছিল। সাহিত্যের সকল শাখাতেই তিনি পারদর্শিতা রাখতেন। কিন্তু মরসিয়াতে তিনি ছিলেন তুলনাহীন। উকাজ বাজারে তাঁর তাঁবুর দরজার সামনে একটি ঝাণ্ডা টাঙানো হতো। এই ঝাণ্ডার ওপর লিখা থাকতো, "আলখানসায়-আরসিউল আরব" (অর্থাৎ আরবের সবচেয়ে বড় মরসিয়া রচনাকারী খানসা)।

উকাজের বাজারে আরবের অন্যতম মহান কবি নাবিগাহ জুবিয়ানীও আসতেন। তাঁর জন্য লাল রং-এর তাঁবু টাঙানো হতো। মেলায় এটা হতো ভিন্ন ধরনের তাঁবু। কেননা সমকালীন যুগের কবিদের মধ্যে তাঁকে সর্বজনস্বীকৃত শ্রেষ্ঠ কবি হিসেবে মানা হতো এবং বড় বড় নাম করা কবিরা তাঁকে কবিতা শুনিয়ে নিজেদেরকে গৌরবান্বিত মনে করতো। খানসা (রাঃ) যখন প্রথমবার উকাজের বাজারে এসেছিলেন এবং নিজের কবিতা নাবিগাহকে শুনিয়েছিলেন তখন তিনি নির্দ্বিধায়বলেছিলেনঃ

''বাস্তবিকই তুমি মহিলাদের মধ্যে বড় কবি। আমি যদি এর পূর্বে আবু বুসায়েরের (আ'শা) কবিতা না শুনতাম তাহলে তোমাকে এ যুগের সকল কবির ওপর মর্যাদা দান করতাম এবং বলে দিতাম তুমিই জ্বিন ও ইনসানের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম মহিলা কবি।''

ধীরে ধীরে খানসার (রাঃ) মহান কবিত্বের কথা সমগ্র আরবে ছড়িয়ে পড়লো। সমকালীনই নয় বরং তার পরেও আরবের শিরোমণি কবিরা তাঁর শ্রেষ্ঠত্বের কথা স্বীকার করেছেন। হযরত খানসার (রাঃ) কবিতার বর্ণনা ভঙ্গী ছিল সাদামাটা। কিন্তু তা ছিল অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী এবং প্রভাবশালী। বাস্তবত গৌরবমূলক কবিতা ও মরসিয়াতে তাঁর সমকক্ষ হওয়ার দাবী কেউই করতে পারতো না। আল্লামা ইবনে আছির (রঃ) বলেনঃ

''কাব্য ও ভাষার সকল পণ্ডিত এ ব্যাপারে একমত যে, আগে বা পরে কোন মহিলাই কাব্যে খানসার (রাঃ) সমতুল্য নন'' (উসুদুল গাব্বাহ)।

লাইলিয়ায়ে আখিলিয়াকে তার যুগের সবচেয়ে বড় আরব মহিলা কবি হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে। কিন্তু ইবনে কুতাইবা তাকে খানসার (রাঃ) ওপর শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করেননি। তিনি নিজের পুস্তক ''তাবকাতুশ শুয়ারাতে'' লিখেছেনঃ

www.bjilibrary.com

"লাইলিয়ায়ে আখিলিয়া মহিলাদের মধ্যে সবচেয়ে বড় কবি। তারচেয়ে বড় কবি আর কেউ নেই। তবে, এর ব্যতিক্রম হলো খানসা (রাঃ)।"

বনু উমাইয়া যুগের প্রখ্যাত কবি জারিরকে (১১০ হিজরীতে মৃত্যু) একবার লোকেরা জিজ্ঞেস করেছিল, সবচেয়ে বড় কবি কে? তিনি জবাব দিয়েছিলেন, যদি খানসা না হতো তাহলে আমিই সবচেয়ে বড় কবি ছিলাম।

বাশার বিন বারদ শুধু একজন বড় কবিই ছিলেন না, বরং একজন উঁচু স্তরের ভাষাবিদও ছিলেন। তিনি বলতেন, আমি যখন মহিলাদের কবিতা চর্চা করি তখন তাতে কোন না কোন ত্রুটি অবশ্যই পরিলক্ষিত হয়। একবার লোকজন তাকে জিজ্ঞেস করলো, খানসার (রাঃ) কবিতাও কি ত্রুটিমুক্ত নয়? তিনি জবাব দিলেনঃ সে তো পুরুষদেরকেও পেছনে ফেলে দিয়েছে।"

হাফিজ ইবনে হাজার (রঃ) ইছাবাহ'তে লিখেছেন, বনি উমাইয়াহ কালের মশহুর কবি আখতাল (কবিত্বের যোগ্যতার বদৌলতে নাবেগা জুবিয়ানীর সমমর্যাদার মনে করা হয়) একবার আব্দুল মালিক বিন মারওয়ানের দরবারে গেলেন এবং একটি প্রশংসাসূচক কাসিদাহ পেশ করার অনুমতি চাইলেন। আব্দুল মালেক একজন জ্ঞানী ও ভাষাবিদ ছিলেন। তিনি জবাবে বললেন, তুমি যদি আমাকে বাঘ অথবা সাপের সঙ্গে তুলনা করতে চাও তাহলে আমি তোমার কবিতা শুনবো না। হ্যাঁ, যদি খানসা'র (রাঃ) কতিবার মত কবিতা পেশ করতে চাও তাহলে পেশ করতে পার।

হযরত খানসার (রাঃ) বয়স বার্ধক্যের দিকে ঢলে পড়ছিলো। ঠিক এমনি সময় ফারান পর্বতের চূড়া শীর্ষ দিয়ে নবুয়ত সূর্য উদিত হলো এবং আরবের প্রতিটি স্থানে তার আলো ছড়িয়ে পড়লো। কিন্তু দুর্ভাগ্য যে অধিকাংশ মক্কাবাসীই এই হেদায়াতের নূর থেকে চক্ষু বন্ধ করে রাখলো এবং ফুৎকারে হকের প্রদীপ নিভিয়ে দেয়ার সকল প্রচেষ্টাই চালালো। এই প্রদীপ যাকে স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা প্রজ্বলিত করেছিলেন তা কি করে নিভতে পারে! অবশ্য নিজেদের কৃতকর্মের কারণে মক্কাবাসীরা সাময়িকভাবে তার বরকত ও আলো থেকে মাহরুম রয়ে গেল। পক্ষান্তরে দু' শ' মাইল দূরের ইয়াসরাববাসীর কিসমতে মহান সৌভাগ্য লিখা ছিল। তাঁরা এই অমূল্য সম্পদের জন্য তন–মন–ধন নিয়োজিত করলেন এবং এসব কিছু মক্কার ইয়াতিম নবীর (সাঃ) পদতলে এনে রেখে দিলেন। বস্তুত হুজুরের (সাঃ) মদীনায় শুভাগমনের পর ইয়াসরেব মদীনাতুন নবী (সাঃ) নামে আখ্যায়িত হলো। ফলে ইসলাম একটি কেন্দ্রভূমিও পেল এবং আস্তে আস্তে হকের পয়গাম আরবের প্রত্যন্ত অঞ্চলে বিস্তারিত হতে লাগলো। হযরত খানসার (রাঃ) কানেও এই পয়গামের

আওয়াজ গেল। আল্লাহ্ তায়ালা তাঁকে সুন্দর স্বভাব দান করেছিলেন। এই পয়গাম শুনতেই তাঁর দিল–দিমাগের দুনিয়া পরিবর্তিত হয়ে গেল। স্বগোত্রের কতিপয় লোককে সঙ্গে নিয়ে মঞ্জিলের পর মঞ্জিল অতিক্রম করে মদীনা মুনাওয়ারাহ পৌছলেন এবং রহমতে আলমের (সাঃ) খিদমতে উপস্থিত হয়ে ইসলামের স্থায়ী সম্পদে পূর্ণ হয়ে গেলেন। আল্লামা ইবনে আছির (রঃ) এবং হাফিজ ইবনে হাজার আসকালানী (রঃ) লিখেছেন, এই সময় প্রিয় নবী (সাঃ) দীর্ঘক্ষণ পর্যন্ত তাঁর কাব্য শুনেছিলেন। তিনি শুনাচ্ছিলেন আর হুজুর (সাঃ) বলছিলেন, ''হে খানসা! শাবাস!

ইসলাম গ্রহণের পর তিনি নিজের কবিলায় ফিরে গেলেন এবং লোকদেরকে রাসূলের (সাঃ) পয়গাম শুনিয়ে ইসলাম গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করতে লাগলেন। তাঁর ভাষায় অত্যন্ত প্রভাব ছিল। সেজন্য অসংখ্য মানুষ তাঁর তাবলিগে প্রভাবিত হয়ে ইসলাম গ্রহণ করলেন। এরপর তিনি প্রায়ই মদীনা আসতেন এবং রহমতে আলমের (সাঃ) খিদমতে হাজির হয়ে পুরোপুরি ফয়েজ হাসিল করতেন।

ইসলাম গ্রহণের পর হযরত খানসার (রাঃ) অন্তর থেকে প্রিয় সহোদরদের বিশেষ করে সাখারের কথা মুছে যায়নি। তিনি জাহেলী যুগের নিয়ম অনুযায়ী সাখারের শোকে সব সময় মাথার চুলের একটি গোছা বেঁধেই রাখতেন। আল্লামা ইবনে আছির (রঃ) বর্ণনা করেছেন, ''একবার হযরত ওমর ফারুক (রাঃ) দেখলেন যে হযরত খানসা (রাঃ) কাবা শরীফ তাওয়াফ করছেন এবং শোকের চিহ্ন হিসেবে মাথায় এক গোছা চুল বেঁধে রেখেছেন। হযরত ওমর (রাঃ) তাঁকে ডেকে বললেন, ইসলাম এ ধরনের শোকের অনুমতি দেয় না।

তিনি আরজ করলেনঃ ''আমিরুল মুমিনিন, কোন মহিলার ওপর এমন দুঃখের পাহাড় কখনো আপতিত হয়নি। আমি কিভাবে তা বরদাশত করবো!''

হযরত ওমর (রাঃ) তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেনঃ "এই বিশ্বে মানুষ তার থেকেও বেশী দুঃখ–কষ্টে নিপতিত হয়ে থাকে। একটু তাদের অন্তরের দিকে তাকিয়ে দেখোতো। ইসলাম যে বস্তু নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে তা করা পাপ।''

এরপর হযরত খানসা (রাঃ) শোকের প্রতীক পরিত্যাগ করলেন। কিন্তু সাখারকে ভুলে যাওয়া তাঁর সাধ্যের অতীত ব্যাপার ছিল। তার স্মরণে তিনি সব সময়ই অশ্রু ভাসাতেন। কিন্তু এই কান্না ভিন্ন পথ অবলম্বন করলো। বলা হয়ে থাকে যে, ইসলাম গ্রহণের পর তিনি এ ধরনের কবিতা আবৃত্তি করতেনঃ

''প্রথমতো আমি প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য সাখারকে স্মরণ করে কাঁদতাম। আর এখন কাঁদি এজন্য যে সে নিহত হয়েছে এবং ইসলাম গ্রহণ করতে পারেনি।''

www.bjilibrary.com

হাফিজ ইবনে হাজার (রঃ) এই প্রসঙ্গে এই রাওয়ায়েতও উল্লেখ করেছেন যে, হযরত খানসা (রাঃ) কখনো কখনো হযরত আয়েশা সিদ্দিকাহর (রাঃ) খিদমতেও হাজির হতেন। সব সময় তাঁর মাথার ওপর চুলের একটি গোছা বাঁধা থাকতো। আরবে এটা ছিল শোকের চূড়ান্ত নিদর্শন। একবার হযরত আয়েশা (রাঃ) বললেন, এ ধরনের মাথায় চুল বেঁধে শোক পালন করা ইসলামে নিষিদ্ধ।

হযরত খানসা (রাঃ) জবাব দিলেনঃ ''উম্মুল মুমিনিন! এই মাথা বাঁধার একটি বিশেষ কারণ রয়েছে।

হযরত আয়েশা (রাঃ) জিজ্ঞেস করলেন, ''কারণটা কি?''

হযরত খানসা (রাঃ) বললেনঃ ''উম্মুল মুমিনিন! আমার স্বামী খুব অপচয়কারী এবং জুয়াড়ু ছিল। জুয়ায় সে নিজের সব ধন–সম্পদ হারায় এবং আমরা নিঃস্ব হয়ে পড়ি। আমার ভাই সাখার যখন আমাদের অবস্থা জানতে পেলো তখন সে তার সর্বোত্তম সম্পদের অর্ধেক আমাকে দিয়ে দিল। আমার স্বামী যখন তাও নষ্ট করলো তখন আমার ভাই অবশিষ্ট সর্বোত্তম সম্পদও আমাকে দিয়ে দিলো। সাখারের স্ত্রী এর প্রতিবাদ করলো। সে বললো, তুমি তোমার সর্বোত্তম সম্পদের অংশ নিজের বোনকে দিচ্ছ আর তার স্বামী তা জুয়া খেলে নষ্ট করছে। এই অবস্থা আর কতদিন চলবে! আমার ভাই জবাব দিল, খোদার কসম! আমি আমার সম্পদের খারাব অংশ আমার বোনকে দিব না। সে পবিত্র। আমি তার ক্ষুধা ও বিবস্ত্র হওয়া সম্পর্কে খবর রাখবো, এটাই আমার জন্য যথেষ্ট। আমি মরে গেলে সে আমার শোকে নিজের ওড়না ছিঁড়ে ফেলবে এবং মাথায় চুলের গোছা বাঁধবে।''

সুতরাং আমি চুলের গোছা বাহাদুর ও দাদা ভাইয়ের স্মরণে বেঁধে থাকি।

যাই হোক, হযরত ওমর ফারুক (রাঃ) অথবা হযরত আয়েশা সিদ্দিকাহর (রাঃ) সতর্ক করার পর তিনি এই চুলের গোছা বাঁধা ছেড়ে দিয়েছিলেন এবং আল্লাহর সন্তুষ্টির ওপর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছিলেন।

হযরত খানসার (রাঃ) জীবনের সবচেয়ে স্মরণীয় ঘটনা ছিল চার পুত্রসহ কাদেসিয়ার যুদ্ধে অংশগ্রহণ। তার বিস্তারিত বিবরণ ওপরে বর্ণনা করা হয়েছে। এই চার পুত্র তাঁর বার্ধক্যের যষ্ঠি ছিল। কিন্তু যখন তাঁদের শাহাদাতের খবর শুনলেন তখন হাহুতাশ না করে তাঁর মুখ দিয়ে বেরিয়ে এলোঃ ''সেই আল্লাহর শোকর,যিনি আমাকে তাদের (আল্লাহর পথে) নিহত হওয়ার মর্যাদা দান করেছেন।'' এই বাক্য তাঁর মজবুত ঈমান ও ধৈর্য এবং সন্তুষ্টির প্রমাণ বহন করে।

www.bjilibrary.com

হযরত খানসার (রাঃ) এই চার পুত্র কাদেসিয়ার যুদ্ধের পূর্বেও কয়েকটি যুদ্ধে বীরত্ব প্রদর্শন করেছিলেন এবং সরকারের পক্ষ থেকে প্রত্যেকের জন্য বার্ষিক দু'শ' দিরহাম বৃত্তি ধার্য ছিল। তাঁদের শাহাদাতের পর হযরত ওমর (রাঃ) এই বৃত্তি হযরত খানসার (রাঃ) নামে পরিবর্তন করে দেন।

এক রাওয়ায়েত অনুযায়ী ইসলামের এই জালিলুল কদর মহিলা কাদেসিয়ার যুদ্ধের সাত–আট বছর পর ২৪ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন। অন্য এক রাওয়ায়েত অনুযায়ী তিনি আমীরে মাবিয়ার শাসনামলে কোন মরুভূমিতে ইন্তেকাল করেন।

মওলানা সাঈদ আনসারী মরহুম সিয়রুস সাহাবিয়াত গ্রন্থে লিখেছেন, হযরত খানসার (রাঃ) বিরাট দিওয়ান টিকাসহ ১৮৮৮ সালে বৈরুত থেকে প্রকাশিত হয়। তাতে হযরত খানসা (রাঃ) ছাড়া অন্য ৬০ জন মহিলার মরসিয়াও স্থান পেয়েছে। ১৮৮৯ সালে তার ফরাসী অনুবাদ হয় এবং তার দ্বিতীয় মুদ্রণ প্রকাশিত হয়।

মওলানা মুহাম্মদ নঈম নদভী সিদ্দিকী (আজমগড়) এক নিবন্ধে লিখেছেন, হযরত খানসার (রাঃ) দিওয়ানের টিকা এক খৃষ্টান লিখেন এবং ১৮৯৬ সালে বৈরুত থেকে তা প্রকাশিত হয়। এই দিওয়ানে খানসার (রাঃ) স্বহস্তে লিখিত ৬টি পান্ডুলিপি সুষ্ঠুভাবে স্থান দেয়া হয়েছে। শুরুতে একটি ভূমিকাও রয়েছে। ভূমিকা বিশেষ স্থানের অধিকারী।

যদিও হযরত খানসা (রাঃ) থেকে কোন হাদিস বর্ণিত নেই। তবুও তিনি অন্যতম জালিলুল কদর মহিলা সাহাবী ছিলেন। মোট কথা, যাঁর কাব্য সম্পর্কে স্বয়ং সাঈয়েদুল মুরসালিন (সাঃ) প্রশংসা করেছেন, তাঁর মর্যাদা সম্পর্কে কি কোন সন্দেহ থাকতে পারে।

www.bjilibrary.com

হযরত উমাইয়া গিফারিয়া (রাঃ)

তাঁর সম্পর্ক ছিল বনু গিফার গোত্রের সঙ্গে। মাদারিজুন নবুয়াত গ্রন্থে আছে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) যখন খায়বার যুদ্ধে রওয়ানা হচ্ছিলেন তখন তিনি কতিপয় মহিলাসহ হুজুরের (সাঃ) পবিত্র খিদমতে হাজির হয়ে আরজ করলেনঃ

"ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা আপনার সঙ্গে জিহাদের ময়দানে যেতে চাই। আহতদের চিকিৎসা ও সেবা এবং সামর্থ অনুযায়ী মুজাহিদদের সাহায্য করতে চাই।"

হুজুর (সাঃ) তাঁর প্রস্তাব মঞ্জুর করলেন এবং অনেক মহিলা তাঁর তৎপরতায় জিহাদে শরীক হলেন।

হযরত লায়লা (রাঃ) বিনতে আবি হাছমা

হযরত উম্মে আব্দুল্লাহ লায়লা (রাঃ) বিনতে আবি হাছমার সম্পর্ক ছিল কোরেশের বনু আদি বংশের সঙ্গে। তাঁর নসবনামা হলোঃ লায়লা (রাঃ) বিনতে আবি হাছমা বিন হোজায়ফা বিন গানিম বিন আমের বিন আব্দুল্লাহ বিন উবায়েদ বিন আবিজ বিন আদি বিন কা'ব বিন লুব্বী।

হযরত আমের (রাঃ) বিন রাবিয়াতুল আনযির সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়েছিল। তিনি বনি আনয বিন ওয়ালের সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিলেন এবং বনু আদির মিত্র ছিলেন। হযরত ওমর ফারুকের (রাঃ) পিতা খাত্তাব স্নেহের আধিক্যে তাঁকে পুত্র বানিয়ে রেখেছিলেন।

www.bjilibrary.com

স্বামী–স্ত্রী উভয়কেই আল্লাহ তায়ালা সুন্দর স্বভাব দান করেছিলেন। তাঁরা হক দাওয়াতের প্রাথমিক যুগেই ইসলাম গ্রহণ করেন এবং মুশরিকদের জুলুম–নির্যাতনের শিকার হন। মক্কার কাফেরদের জুলুম–নির্যাতন যখন সীমা ছাড়িয়ে গেল তখন রাসূলের (সাঃ) ইঙ্গিতে স্বামী–স্ত্রী উভয়েই নবুয়ত প্রাপ্তির ৫ বছর পর হাবশায় হিজরতের জন্য রওয়ানা হলেন। হযরত লায়লা (রাঃ) উটের ওপর সওয়ার হচ্ছিলেন (অথবা হয়েছিলেন) ঠিক সেই সময় হযরত ওমর (রাঃ) সেখানে এসে উপস্থিত। তিনি তখন পর্যন্ত কুফর ও শিরকের ভুল পথে চলছিলেন। তিনি হযরত লায়লাকে (রাঃ) জিজ্ঞেস করলেন, "উম্মে আব্দুল্লাহ! কোথায় যাওয়ার প্রস্তুতি নেয়া হচ্ছে!" তিনি জবাব দিলেন, তোমরা আমাদেরকে অনেক কষ্ট দিয়েছ। এজন্য আমরা ঘর–বাড়ী ত্যাগ করে চলে যাচ্ছি। খোদার বিশ্ব সংকীর্ণ নয়। যেখানে স্থান হবে সেখানেই চলে যাবো এবং যতদিন পর্যন্ত আল্লাহ তায়ালা মুসলমানদের নিষ্কৃতির কোন ব্যবস্থা না করেন ততদিন দেশ থেকে দূরেই থাকবো।

তাঁর প্রতি হযরত ওমরের (রাঃ) খুব দয়া হলো এবং বললেন, "আল্লাহ তোমাদের সঙ্গে থাকুন।" যখন তিনি চলে গেলেন তখন হযরত লায়লার (রাঃ) স্বামী আমের (রাঃ) বিন রবিয়াও এসে পৌঁছলেন। হযরত লায়লা (রাঃ) তাঁকে এই ঘটনা শুনালেন। তিনি বললেন, "খাত্তাবের গাধা ঈমান না আনা পর্যন্ত ওমর মুসলমান হবে না।" সম্ভবত তিনি গাধার ইসলাম গ্রহণ যেমন অসম্ভব মনে করেছিলেন, তেমনি হযরত ওমরের (রাঃ) ঈমান আনয়নও অসম্ভই ভেবেছিলেন। কিন্তু হযরত লায়লা (রাঃ) বললেন, " আমাকে দেখে ওমরের (রাঃ) মনে খুবই সহানুভূতি সৃষ্টি হলো। আল্লাহ তাঁর অন্তর ফিরিয়েও দিতে পারেন।"

হযরত আমের (রাঃ) বললেন, ওমর (রাঃ) ঈমান আনুক, তা কি তুমি চাও? হযরত লায়লা (রাঃ) বললেন, "হাঁ।"

এই ঘটনা কম-বেশী শব্দের হেরফেরে অনেক ঐতিহাসিকই বর্ণনা করেছেন। আল্লাহ তায়ালা হযরত লায়লার (রাঃ) মনোবাঞ্ছা পূরণ করেন। পরবর্তী বছরেই হযরত ওমর (রাঃ) ঈমান আনার সৌভাগ্য অর্জন করেন এবং ইসলামের শক্তিশালী বাহুতে পরিণত হন।

হযরত লায়লা (রাঃ) এবং হযরত আমের (রাঃ) কেবলমাত্র তিন মাস হাবশায় হিজরত করেছিলেন।। ইত্যবসরে একটি গুজব ছড়িয়ে পড়ে। গুজবটি ছিল যে, প্রিয় নবী (সাঃ) ও মুশরিকদের মধ্যে আপোস বা সন্ধি হয়ে গেছে। হাবশার মুহাজিররা এই খবর শুনলেন। তাঁদের একটি দল নবুয়ত প্রাপ্তির ৫ম বছরের শওয়াল

www.bjilibrary.com

মাসে মক্কা ফিরে এলেন। এই দলে হযরত লায়লা (রাঃ) এবং হযরত আমেরও (রাঃ) অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। মক্কার নিকট পৌছে প্রত্যাগমনকারী সাহাবীরা জানতে পেলেন যে, খবরটি সঠিক নয় কিন্তু তাঁরা তৎক্ষণাৎ উল্টে ফিরে যাওয়াটাও ঠিক মনে করলেন না এবং কোরেশের কোন না কোন সরদারের আশ্রয় নিয়ে মক্কা প্রবেশ করলেন। হযরত আমের (রাঃ) বিন রবিয়াহ এবং হযরত লায়লা (রাঃ) আছ বিন ওয়ায়েল সাহমীর আশ্রয় গ্রহণ করেন। এই ঘটনার পর মুসলমানদের ওপর মুশরিকদের জুলুম-নির্যাতনের মাত্রা আরো বেড়ে গেল। ফলে হুজুর (সাঃ) মজলুমদেরকে পুনরায় হাবশা হিজরতের নির্দেশ দিলেন। সুতরাং নবুয়ত প্রাপ্তির ৬ষ্ঠ বছরের শুরুতে প্রায় একশ' মজলুমের একটি কাফেলা হাবশা যাত্রা করলেন। হাবশায় দ্বিতীয় হিজরতের মুহাজিরদের তালিকাতেও সকল ঐতিহাসিক হযরত আমের (রাঃ) এবং হযরত লায়লার (রাঃ) নাম বিস্তারিতভাবেই উল্লেখ করেছেন। কয়েক বছর হাবশায় উদ্বাস্তুর জীবন অতিবাহিত করার পর হযরত আমের (রাঃ) এবং হযরত লায়লা (রাঃ) অন্য কয়েকজন মুসলমানসহ হুজুরের (সাঃ) মদীনা হিজরতের কিছুদিন পূর্বে মক্কা ফিরে আসেন। কিছুদিন পর পুনরায় হুজুরের (সাঃ) অনুমতি পেয়ে মদীনায় স্থায়ীভাবে হিজরত করেন। আল্লামা ইবনে সা'দ কাতিবিল ওয়াকেদী বলেছেন, মদীনায় হিজরতকারী মহিলাদের মধ্যে হযরত লায়লা (রাঃ) বিনতে আবি হাছমার প্রথমত্বের মর্যাদা রয়েছে।

ঐতিহাসিক ইবনে আছির (রঃ) হযরত লায়লার (রাঃ) এই বৈশিষ্ট্যের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন, প্রাচীন ইসলাম গ্রহণকারী হিসেবে তিনি প্রথম কিবলার (বাইতুল মুকাদ্দাস) দিকে মুখ করে নামায পড়ার সৌভাগ্যও লাভ করেছিলেন (বাস্তবত এই বৈশিষ্ট্য সকল প্রাচীনদের ভাগ্যেই জুটেছিল)।

এক রাওয়ায়েতে আছে, একবার হযরত লায়লা (রাঃ) বিনতে আবি হাছমা রাসূলে আকরামের (সাঃ) সামনে ছোট্ট পুত্রকে বললেন," এখানে এসো, তোমাকে কিছুদেবো।'

হুজুর (সাঃ) জিজ্ঞেস করলেনঃ "তুমি তাকে কি দিতে চাও।" তিনি বললেন " খেজুর।"

হুজুর (সাঃ) বললেনঃ "তুমি যদি তাকে কিছু না দিতে, তাহলে আমি তোমাকে মিথ্যাবাদী মনে করতাম।"

তাঁর ওফাতের সাল এবং জীবনের অন্যান্য অবস্থার বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায়নি।

www.bjilibrary.com

হযরত ফাতিমা (রাঃ) বিনতে সাফওয়ান

হযরত ফাতিমা (রাঃ) বিনতে সাফওয়ান বনি কিনানাহর সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত ছিলেন। হযরত আমর (রাঃ) বিন সাঈদুল আছ উমুব্বীর সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়েছিল। স্বামী-স্ত্রী উভয়েই নবীর (সাঃ) নবুয়ত প্রাপ্তির প্রথম বছরগুলোতেই ইসলাম গ্রহণ করেন এবং সাবিকুনাল আউয়ালুনদের মধ্যে পরিগণিত হন। যদিও হযরত আমর (রাঃ) বিন সাঈদ বনু উমাইয়ার মর্যাদার লোকদের অন্যতম ছিলেন, তবুও মুশরিকরা তাঁকেও ইসলাম গ্রহণের অপরাধে মক্কায় শান্তির সঙ্গে থাকতে দিল না এবং তিনি স্ত্রীসহ নবুয়তের ৬ষ্ঠ বছরে হাবশায় হিজরত করেন। হযরত ফাতিমা (রাঃ) হাবশায় অবস্থানকালেই ওফাত পান এবং হাবশাতেই তাঁকে দাফন করা হয়।

হযরত ফাতিমা (রাঃ) বিনতে মুজাল্লালি আমেরিয়াহ

হযরত ফাতিমা (রাঃ) বিনতে মুজাল্লালি আমেরিয়াহ অন্যতম জালিলুল কদর মহিলা সাহাবী ছিলেন। তিনি নবুয়ত প্রাপ্তির প্রথম তিন বছরের মধ্যেই ইসলাম গ্রহণ করেন। তাঁর বিয়ে হয়েছিল হযরত হাতিব (রাঃ) বিন হারিছ জামহির সঙ্গে। তিনিও তাঁর মতই প্রথম ইসলাম গ্রহণকারীদের মধ্যে ছিলেন। মক্কার কাফিররা যখন তাঁদের ওপর চরম নির্যাতন চালানো শুরু করলো তখন স্বামী-স্ত্রী উভয়েই দু'পুত্র মুহাম্মাদ (রাঃ) বিন হাতিব (রাঃ) এবং হারিছ (রাঃ) বিন হাতিবকে (রাঃ) সঙ্গে নিয়ে অন্যান্য মজলুম মুসলমানের সাথে হাবশায় দ্বিতীয় হিজরতে গমন করেন। হাবশায় অবস্থানকালে হযরত হাতিব (রাঃ) বিন হারিছ মৃত্যুবরণ করেন এবং সেখানেই তাঁকে দাফন করা হয়। হযরত ফাতিমা (রাঃ) সপ্তম হিজরীতে দু'পুত্রসহ মদীনা ফিরেযান।

তাঁর জীবনী সম্পর্কে বিস্তারিত আর কিছু কোন পুস্তকেই পাওয়া যায়নি।

www.bjilibrary.com

হযরত আমরাহ (রাঃ) বিনতে আস-সাদি

কতিপয় রাওয়ায়েতে তাঁর নাম উমাইরাহ এবং উমরাহ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। উম্মুল মুমিনিন হযরত সাওদাহ (রাঃ) বিনতে যামায়াহর সহোদর হযরত মালিক (রাঃ) বিন যামায়াহর সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়। স্বামী-স্ত্রী উভয়েই সাবিকিনাল আউয়ালিনের মধ্যে পরিগণিত। দু' জনেই নবুয়তের ৬ষ্ঠ বছরে হাবশায় হিজরত করেন। ইবনে হিশামের বর্ণনা অনুযায়ী হযরত আমরাহ (রাঃ) স্বামী হযরত মালিক (রাঃ) বিন যামায়াহর সঙ্গে খায়বারের যুদ্ধের সময় হাবশা থেকে মদীনা মুনাওয়ারা চলে যান। এছাড়া বিস্তারিত আর কিছু জানা যায়নি।

হযরত যয়নব (রাঃ) বিনতে মাজউন

তাঁর সম্পর্ক ছিল বনু জামুহর সঙ্গে। ইবনে আছির (রঃ) নসবনামা এভাবে লিখেছেনঃ

যয়নব (রাঃ) বিনতে মাজউন বিন হাবিব বিন ওয়াহাব বিন হুজাফাহ বিন জামুহ বিন আমর বিন হাছহাছ বিন কা'ব বিন লুয়ী বিন গালিব।

কা'ব বিন লুয়ী পর্যন্ত তাঁর নসবনামা রাসুলে আকরামের (সাঃ) নসবনামার সঙ্গে একীভূত হয়ে যায়।

সাইয়েদেনা হযরত ওমর (রাঃ) বিন খাত্তাবের সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়েছিল এবং সম্ভবত তাঁর সাথেই সঙ্গীহীন অবস্থায় ইসলাম গ্রহণ করেন।

জালিলুল কদর স্বামীর সঙ্গে নবুয়তের ১৩তম বছরে মদীনা মুনাওয়ারায় হিজরত করেন। হযরত ওমর ফারুকের (রাঃ) বর্ণনাতেই এ কথার প্রমাণ পাওয়া

www.bjilibrary.com

যায়। তিনি পুত্র হযরত আব্দুল্লাহ (রাঃ) সম্পর্কে বলেন, তাকেতো তাদের মাতা-পিতা সঙ্গে নিয়ে হিজরত করেছিল।”

ইসলামের ফকিহ হযরত আব্দুল্লাহ বিন ওমর (রাঃ) এবং উম্মুল মুমিনিন হযরত হাফছাহ (রাঃ) বিনতে ওমর (রাঃ) হযরত যয়নব (রাঃ) বিনতে মাজউনের গর্ভেই জন্ম নিয়েছিলেন। তাঁর তিন ভাই হযরত ওসমান (রাঃ) বিন মাজউন, হযরত আব্দুল্লাহ (রাঃ) বিন মাজউন এবং হযরত কুদামাহ (রাঃ) বিন মাজউন মহান সাহাবীদের মধ্যে পরিগণিত। তিনজনই সাবিকিনাল আউয়ালুন এবং বদরী সাহাবী ছিলেন।

হযরত যয়নব (রাঃ) বিনতে মাজউনের ওফাতের সাল সম্পর্কে কোন তথ্য পাওয়া যায়নি। এক রাওয়ায়েতে আছে, ওফাতের সময় তিনি মক্কা মুয়াজ্জমায় ছিলেন।

হযরত রাইতাহ (রাঃ) বিনতিল হারিছ

বনু তাইম গোত্রের সঙ্গে তিনি সম্পর্কযুক্ত ছিলেন। হযরত আবুবকর সিদ্দিকের (রাঃ) মামাতো ভাই হারিছ (রাঃ) বিন খালিদ তাইমীর সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল। স্বামী-স্ত্রী উভয়েই দাওয়াতে হকের প্রারম্ভিক যুগে ইসলাম গ্রহণ করেন এবং আসসাবিকুনাল আওয়ালুনের মধ্যে পরিগণিত হন।

ইসলাম গ্রহণের অপরাধে কোরেশ মুশরিকরা যখন মুসলমানদেরকে জীবিত থাকা কঠিন করে ফেললো তখন রাসূলের (সাঃ) ইঙ্গিতে মুসলমানরা হাবশার দিকে হিজরত করা শুরু করলেন। হযরত রাইতাহ এবং তাঁর স্বামী হযরত হারিছ (রাঃ) বিন খালিদও হাবশার দ্বিতীয় হিজরতে সেখানে চলে যান। হাবশায় হযরত রাইতাহর গর্ভে হযরত হারিছের এক পুত্র মুসা এবং তিন কন্যা আয়েশা, যয়নব এবং ফাতিমা জন্মগ্রহণ করেন। হুজুরের (সাঃ) মদীনা হিজরতের কিছুদিন পর হযরত হারিছ (রাঃ) বিন খালিদও নিজের পরিবার-পরিজনসহ হাবশা থেকে মদীনা রওয়ানা হলেন। পথিমধ্যে এক স্থানে পরিবারের সকলেই পানি পান করলেন। পানিতে বিষ ছিল। হযরত রাইতাহ (রাঃ) এবং তাঁর চার সন্তান বিষের প্রভাবে মৃত্যুবরণ করলেন।

www.bjilibrary.com

অবশ্য হারিছ (রাঃ) বেঁচে গেলেন এবং খোদার রাস্তায় সকলকে দাফন করে একা একা মদীনা পৌছলেন এবং প্রিয় নবীর (সাঃ) খিদমতে হাজির হয়ে নিজের দুঃখের কাহিনী বর্ণনা করলেন। এই কাহিনী শুনে হুজুর (সাঃ) তাঁকে ধৈর্য ধারণের নির্দেশ দিলেন এবং অন্য এক স্থানে তাঁর বিয়ে দিয়ে দিলেন।

হযরত হাসানাহ (রাঃ)

তাঁর হসব-নসব ও বংশ সম্পর্কে ইতিহাস পুস্তকগুলো নীরব। শুধু এতটুকুনই সন্ধান পাওয়া যায় যে, তিনি জালিলুল কদর সাহাবী হযরত শুরাহবিল বিন হাসানার (রাঃ) মাতা ছিলেন এবং নিজেও মহান মর্যাদাসম্পন্ন মহিলা সাহাবীদের মধ্যে পরিগণিত হতেন। জাহেলী যুগে আব্দুল্লাহ বিন আমর বিন মাতা কিন্দীর সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়েছিল। তাঁর ঔরসে হযরত শুরাহবিল (রাঃ) জন্মগ্রহণ করেন। শুরাহবিল (রাঃ) যখন খুব ছোট তখনই আব্দুল্লাহ মারা যান। ধারণা করা হয় যে, সেই যুগেই হাসানাহ (রাঃ) এতিম শিশুকে সঙ্গে নিয়ে স্বদেশ ভূমি থেকে মক্কা আসেন এবং বনু জামুহ-এর সুফিয়ান বিন মা'মারের সঙ্গে নিকাহ বসেন। এটা নবুয়ত প্রাপ্তির ২৫-৩০ বছর পূর্বেকার ঘটনা। মক্কাবাসীরা হযরত শুরাহবিলের (রাঃ) বাপ-দাদা সম্পর্কে তেমন ওয়াকিবহাল না থাকার কারণে তাঁকে মা'র সঙ্গে সংশ্লিষ্ট করে " শুরাহবিল বিন হাসানাহ" বলে ডাকা শুরু করলো। হযরত সুফিয়ান বিন মা'মার জামুহির ঔরসে হযরত হাসানাহর (রাঃ) দুই পুত্র জাবের (রাঃ) এবং জানাদাহ (রাঃ) জন্মগ্রহণ করেন। তাঁদের সবাইকেই আল্লাহ পাক অত্যন্ত সুন্দর স্বভাব দান করেছিলেন। প্রিয় নবী (সাঃ) নবুয়ত প্রাপ্তির পর হকের দাওয়াত প্রদান শুরু করলেন। এ সময় হযরত সুফিয়ান (রাঃ), হযরত হাসানাহ (রাঃ), হযরত শুরাহবিল (রাঃ), হযরত জাবের (রাঃ) এবং হযরত জানাদাহ (রাঃ) কোন চিন্তা-ভাবনা ছাড়াই ইসলাম গ্রহণ করেন। পুরো পরিবারই ইসলামের মহান নিয়ামতে অভিষিক্ত হন। অনেক পরিবারই এই মর্যাদা পায়নি। কয়েক বছর পর হুজুর (সাঃ) সাহাবায়ে কিরামকে (রাঃ) মক্কার কাফেরদের জুলুম-নির্যাতন থেকে বাঁচার জন্য হাবশা গমনের পরামর্শ দিলেন। নবুয়তের ৬ষ্ঠ বছরের পর হযরত হাসানাও (রাঃ) নিজের স্বামী এবং পুত্রদেরসহ হাবশায় উদ্বাস্তুর জীবন গ্রহণ করেন। এভাবে সমগ্র পরিবার আল্লাহর পথে নিজের ঘর-বাড়ী পরিত্যাগ করেন। হযরত হাসানাহ (রাঃ)

www.bjilibrary.com

প্রায় ১৩ বছর হাবশা অবস্থান করেন এবং খায়বারের যুদ্ধের সময় সমগ্র পরিবার-পরিজনসহ মদীনা ফিরে আসেন। এছাড়া তাঁর সম্পর্কে আর বিস্তারিত কিছু জানা যায়নি।

হযরত উমাইনাহ (রাঃ) বিনতে খালফ আল খুযায়িয়াহ

কেউ তাঁর নাম লিখেছেন উমাইমাহ বলে। আবার কেউবা বলেছেন, হুমাইনাহ বলে। তাঁর সম্পর্ক ছিল বনু খাযায়ার সঙ্গে। জালিলুল কদর সাহাবী হযরত খালিদ (রাঃ) বিন সাঈদ বিন আছ উমুবীর সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়েছিল। স্বামী-স্ত্রী উভয়েই প্রথম ইসলাম গ্রহণকারীদের মধ্যে পরিগণিত।

হযরত উমাইনাহ (রাঃ) নবীর (সাঃ) নবুয়ত প্রাপ্তির ৬ষ্ঠ বছরে স্বামীর সঙ্গে হাবশা হিজরত করেন। সেখানেই পুত্র সাঈদ (রাঃ) এবং কন্যা উম্মে খালিদ (রাঃ) জন্মগ্রহণ করেন। পুত্র এবং কন্যাও সাহাবী ছিলেন।

হযরত উমাইনাহ (রাঃ) খায়বার যুদ্ধের সময় স্বামী ও সন্তানদেরসহ মদীনা যান এবং অবশিষ্ট জীবন সেখানেই কাটিয়ে দেন।

হযরত সাহলাহ (রাঃ) বিনতে সুহায়েল (রাঃ) বিন আমর

হযরত সাহলাহ (রাঃ) অন্যতম মহিয়ষী মহিলা সাহাবী ছিলেন। তিনি কোরেশের বনি আমের বিন লুয়ী বংশের মানুষ ছিলেন। তাঁর নসবনামা হলোঃ সাহলাহ (রাঃ) বিনতে সোহায়েল বিন আমর বিন আবদি শামস বিন আবদি দাদ বিন নাসর বিন মালিক বিন হাসাল বিন আমের বিন লুয়ী।

হযরত সাহলাহর (রাঃ) পিতা সুহায়েল (রাঃ) বিন আমর অন্যতম কোরেশ সরদার ছিলেন এবং ওজস্বী ভাষার জন্য কোরেশের খতিব হিসেবে মশহুর ছিলেন।

www.bjilibrary.com

তিনি সুন্দর এবং তেজস্বী ভাষায় বক্তৃতা দিয়ে বড় বড় জনসভার শ্রোতাদেরকে উত্তেজিত করে তুললেন। দুর্ভাগ্যবশত মক্কা বিজয় পর্যন্ত তাঁর নিপুণ বক্তৃতা ইসলামের বিরুদ্ধেই ব্যবহৃত হতে থাকে। খোদার কুদরত, সুহায়েল যেমন ইসলাম বিরোধী তৎপরতায় তৎপর ছিলেন তেমনি আবার তাঁর সন্তানরা ইসলামের একনিষ্ঠ সমর্থক ছিলেন। তাঁর দুই কন্যা সাহলাহ (রাঃ) এবং উম্মে কুলসুম (রাঃ) ও দুই পুত্র আবদুল্লাহ (রাঃ) এবং আবু জানদাল আস (রাঃ) ভাগ্যবান আত্মার অধিকারী। নবুয়তের একদম প্রাথমিক যুগে তারা তাওহীদের ডাকে সাড়া দেন। কোরেশ সরদার উতবাহ বিন রবিয়ার পুত্র আবু হুজাইফা হাশিমের (রাঃ) সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়েছিলো। তিনি সাবিকুনাল আউয়ালুনের পবিত্র দলের মধ্যে বিশেষ মর্যাদার অধিকারী ছিলেন। স্বামী-স্ত্রী উভয়েই কোরেশের নেতৃস্থানীয় বংশের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত হওয়া সত্ত্বেও কাফেরদের নির্যাতনের হাত থেকে রেহাই পাননি এবং নবুয়াতের পঞ্চম বছরে হুজুরের (সাঃ) ইশারায় হাবশায় হিজরত করেন। সেখানে তাঁরা কেবলমাত্র দু' তিন মাসই কাটিয়েছিলেন। এমন সময় তাঁরা রাসূলে আকরাম (সাঃ) এবং কোরেশ মুশরিকদের মধ্যে সন্ধি হওয়ার খবর পেলেন। এ খবর শুনে তাঁরা অন্য কতিপয় হাবশার মুহাজিরের সঙ্গে মক্কা রওয়ানা হয়ে এলেন। মক্কার রাস্তায় থাকতেই তাঁরা ভুল খবরের কথা জানতে পেলেন। কিন্তু তখন তারা ফিরে যাওয়া ঠিক মনে করলেন না এবং উমাইয়া বিন খালফের সমর্থন নিয়ে মক্কায় প্রবেশ করলেন।

আল্লামা তাবারী (রঃ) বর্ণনা করেছেন, এরপর হযরত সাহলাহ (রাঃ) এবং আবু হুজাইফাহ (রাঃ) মদীনায় হিজরাত পর্যন্ত মক্কাতেই অবস্থান করেন। কিন্তু ইবনে ইসহাক (রঃ) এবং অন্যান্য ঐতিহাসিক লিখেছেন, তাঁরা নবুয়াতের ৬ষ্ঠ বছরের পর দ্বিতীয়বার হিজরত করে হাবশা চলে যান। সেখানেই তাঁদের পুত্র মুহাম্মদ (রাঃ) এবং আবু হুজাইফাহ (রাঃ) জন্মগ্রহণ করেন।

হুজুরের (সাঃ) মদীনা হিজরাতের কিছুদিন পূর্বে ৩৩জন পুরুষ এবং ৮জন মহিলা সমন্বয়ে গঠিত একটি দল হাবশা থেকে মক্কা ফিরে আসেন। এই দলে হযরত সাহলাহ (রাঃ), হযরত আবু হুজাইফাহ (রাঃ) এবং তাঁদের পুত্র মুহাম্মাদও (রাঃ) ছিলেন। কিছুদিন পর হুজুর (সাঃ) যখন সাহাবায়ে কিরামকে (রাঃ) মদীনায় হিজরতের অনুমতি দিলেন তখন হযরত সাহলাহ (রাঃ) তাঁর স্বামী এবং পুত্র ও নিজের আযাদকৃত গোলাম হযরত সালেমকে (রাঃ) সঙ্গে নিয়ে মক্কা থেকে স্থায়ীভাবে হিজরত করে মদীনা চলে যান এবং সারা জীবন

www.bjilibrary.com

সেখানেই কাটিয়ে দেন। হযরত সালেম (রাঃ) আবি হুজাইফাহর (রাঃ) গোলাম নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন। প্রকৃতপক্ষে তিনি ছিলেন হযরত আবু হুজাইফাহর (রাঃ) অন্য আরেক স্ত্রী হযরত সাবিতা (রাঃ) বিনতে ইয়ায়ার আনসারিয়ার গোলাম। তিনিই তাঁকে আযাদ করে দেন। এ সময় হযরত আবু হুজাইফাহ (রাঃ) তাঁকে মুখে ডাকা পুত্র বানিয়ে নেন এবং তিনি জনসাধারণ্যে সালেম (রাঃ) বিন আবু হুজাইফাহ (রাঃ) নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। কিন্তু যখন 'মানুষদেরকে তাদের আসল পিতার সম্পর্কে ধরে ডাকো' এ আয়াত নাযিল হয় তখন লোকজন হযরত সালেমকে (রাঃ) আবু হুজাইফাহর (রাঃ) গোলাম বলে ডাকতে থাকে।

মুসনাদে আবু দাউদে আছে, এ হুকুম নাযিল হওয়ার পর আবু হুজাইফাহ (রাঃ) হযরত সালেম (রাঃ) তাঁর বাড়ীতে আসা-যাওয়া করুক তা সহ্য করতে পারছিলেন না। বস্তুত হযরত সাহলাহ (রাঃ) সারওয়ারে আলমের (সাঃ) খেদমতে হাজির হয়ে আরজ করলেন ঃ "ইয়া রাসূলাল্লাহ ! সালেমকে আমরা নিজের পুত্র মনে করতাম এবং শৈশবকাল থেকেই আমাদের গৃহে গমনাগমন করতো। কিন্তু হুজাইফাহ এখন আমাদের গৃহে তার প্রবেশ সহ্য করতে পারছে না।" ইরশাদ হলো ঃ তাকে তোমার দুধ পান করিয়ে দাও। তাহলে সে তোমাদের জন্য মুহরিম হয়ে যাবে। মোটকথা, এমনিভাবে হযরত সালেম (রাঃ) হযরত আবু হুজাইফা এবং হযরত সাহলাহর (রাঃ) দুধ পুত্র হয়ে যান।

উম্মুল মু'মিনীন হযরত উম্মে সালমা (রাঃ) বলেন, এটা শুধু হযরত সালেমের (রাঃ) জন্য বিশেষ অনুমতি ছিলো। নচেত যৌবনকালে দুধ পান করে দুধ মা প্রতিষ্ঠিত হয় না।

হযরত আবু হুজাইফাহ (রাঃ) হযরত আবু বকর সিদ্দিকের (রাঃ) খেলাফতকালে ইয়ামামার যুদ্ধে শাহাদাত লাভ করেন। তাঁর শাহাদাতের কিছুদিন পর হযরত সাহলাহ (রাঃ) হযরত আবদুর রহমান (রাঃ) বিন আওফের সঙ্গে নিকাহর সম্বন্ধে আবদ্ধ হন।

www.bjilibrary.com

হযরত উম্মে কুলসুম (রাঃ) বিনতে সুহায়েল বিন আমর

হযরত উম্মে কুলসুম (রাঃ) বিনতে সুহায়েল (রাঃ) হযরত সাহলাহর (রাঃ) বিনতে সুহায়েলের (রাঃ) সহোদরা ছিলেন। তিনিও একজন জালিলুল কদর মহিলা সাহাবী ছিলেন। নবুয়াতের সম্পূর্ণ প্রাথমিক যুগে ইসলাম গ্রহণ করেন। হযরত আবু সাবরাহ (রাঃ) বিন আবি রুহমের সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়েছিলো। তিনি ছিলেন নবীয়ে আকরামের (সাঃ) ফুফু বাররাহ বিনতে আবদুল মুত্তালিবের পুত্র। তিনিও সাবিকিনাল আউয়ালিনার পবিত্র দলের একজন সম্মানিত সদস্য ছিলেন। সকল ঐতিহাসিকই প্রথম হাবশায় হিজরতকারী মুহাজিরদের তালিকায় হযরত আবু সাবরাহর (রাঃ) নাম বিস্তারিতভাবেই উল্লেখ করেছেন। অবশ্য হযরত উম্মে কুলসুমের (রাঃ) ব্যাপারে মতবিরোধ রয়েছে। কেউ কেউ বলেছেন, তিনি স্বামীসহ হাবশার প্রথম হিজরতেই চলে গিয়েছিলেন। আবার কেউ বলেছেন, না, তিনি হাবশার দ্বিতীয় হিজরতে গিয়েছিলেন। যুরকানী (রঃ) কতিপয় ঐতিহাসিকের উদ্বৃতি দিয়ে বলেছেন, তিনি হাবশার মুহাজিরদের প্রথম কাফেলায় শামিল ছিলেন। হযরত আবু সাবরাহ (রাঃ) তিন মাস পর হাবশা থেকে মক্কা ফিরে আসেন এবং আখনাস বিন শুরাইকের আশ্রয় গ্রহণ করেন। কিছুদিন পর মুহাজিরদের দ্বিতীয় কাফেলা হাবশা রওয়ানা হন। এ সময় হযরত আবু সাবরাহ (রাঃ) এবং হযরত উম্মে কুলসুমও (রাঃ) তাঁদের সঙ্গে দ্বিতীয়বার হাবশা চলে যান।

প্রায় ছ' বছর উদ্বাস্তু জীবনের মুসিবত সহ্য করে স্বামী-স্ত্রী উভয়েই হুজুরের (সাঃ) মদীনা হিজরতের আগে মক্কা ফিরে আসেন এবং পুনরায় হুজুরের (সাঃ) অনুমতি পেয়ে মদীনা হিজরাতের সৌভাগ্য লাভ করেন। হযরত আবু সাবরাহ (রাঃ) নবীর (সাঃ) যুগে মদীনাতেই অবস্থান করেন। হুজুরের (সাঃ) ওফাতের পর তিনি মদীনার অবস্থান ত্যাগ করে মক্কা চলে আসেন এবং বাকী জীবন এখানেই কাটান। এটা স্পষ্ট যে, হযরত উম্মে কুলসুমও (রাঃ) তাঁর সঙ্গেই ছিলেন। তবে তাঁর ওফাতের সাল সম্পর্কে কোনো তথ্য পাওয়া যায়নি।

www.bjilibrary.com

হযরত উম্মে যিয়াদ আশজায়িয়াহ্ (রাঃ)

বনু আশজা'র সঙ্গে তিনি সম্পর্কযুক্ত ছিলেন। সহীহ্ মুসলিম এবং মুসনাদে আবু দাউদে আছে, তিনি অন্য পাঁচজন মহিলার সঙ্গে খায়বারের যুদ্ধে মুসলমানদের সাহায্য করেছিলেন। তিনি ময়দান থেকে তীর উঠিয়ে আনতেন এবং মুজাহিদদেরকে ছাতু পান করাতেন।

আল্লামা ইবনে সা'দ বলেছেন, তিনি ডাক্তারী এবং অস্ত্র চিকিৎসায় পারদর্শিনী ছিলেন এবং আহতদের ব্যাণ্ডেজ করতেন। তাঁর সম্পর্কে এর চেয়ে বেশী আর কিছু জানা যায়নি।

হযরত উম্মে কায়েস (রাঃ) বিনতে মিহসান

তিনি বনু আসাদ বিন খোজায়মাহ বংশের লোক ছিলেন। তাঁর নসবনামা হলো ঃ উম্মে কায়েস হারসান বিন কায়েস বিন মাররাহ্ বিন কাবির বিন গানাম বিন দাওদান বিন আসাদ বিন খোজায়মাহ। হযরত উম্মে কায়েস (রাঃ) এবং তাঁর ভাই হযরত উক্কাশাহ (রাঃ) বিন মিহসান ও হযরত আমর (রাঃ) বিন মিহসান নবীর (সাঃ) হিজরাতের আগে ইসলাম গ্রহণ করেন। প্রিয় নবী (সাঃ) সাহাবায়ে কিরামকে (রাঃ) মদীনায় হিজরাতের অনুমতি দিলে হযরত উম্মে কায়েসও সহোদরদেরকে সঙ্গে নিয়ে অন্যান্য তাওহীদ পন্থীদের সাথে মদীনা পৌছেন।

হযরত উম্মে কায়েস (রাঃ) ২৪টি হাদীস বর্ণনা করেছেন।

www.bjilibrary.com

হযরত লায়লা গিফারিয়া (রাঃ)

তিনি বনু গিফারের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত ছিলেন। তিনি ছিলেন খুবই মুখলিস। চিকিৎসা ও অস্ত্র চিকিৎসাতে তিনি যোগ্যতা রাখতেন। তাবারানী (রঃ) স্বয়ং তাঁর থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি রাসূলের (সাঃ) সঙ্গে যুদ্ধে অংশ নিতেন এবং আহতদেরকে চিকিৎসা করতেন। প্রখ্যাত সাহাবী হযরত আবু যর গিফারীর (রাঃ) স্ত্রীর নামও ছিলো লায়লা। ঐতিহাসিকরা এটা ব্যাখ্যা করেননি যে, এই লায়লা তাঁর স্ত্রী ছিলেন অথবা তিনি অন্য কেউ ছিলেন।

হযরত দাবায়াহ (রাঃ) বিনতে যুবায়ের

তিনি বনু হাশিম বংশোদ্ভূত এবং রাসূলে কারীমের (সাঃ) চাচা যোবায়ের বিন আবদুল মুত্তালিবের কন্যা ছিলেন। মশহুর সাহাবী হযরত মিকদাদ (রাঃ) বিন আমর ওয়াল আসওয়াদের সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়। এ প্রসঙ্গে হাফিজ ইবনে হাজার (রঃ) 'ইসাবাহ' গ্রন্থে এক চিত্তাকর্ষক রাওয়ায়েত বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, হযরত আবদুর রহমান (রাঃ) বিন আওফ একবার হযরত মিকদাদকে (রাঃ) বললেন, তুমি বিয়ে করো না কেন? মিকদাদ অত্যন্ত সাদা-সিধে প্রকৃতির এবং স্পষ্টবাদী ছিলেন। তিনি সাদা-সিধেভাবে জবাব দিলেন, 'তুমি নিজের মেয়ের সঙ্গে বিয়ে দাও।' এতে হযরত আবদুর রহমান (রাঃ) খুব অসন্তুষ্ট হলেন এবং তাঁকে কঠোর ভাষায় গালি দিলেন। হযরত মিকদাদ (রাঃ) নবীর (সাঃ) দরবারে এ ব্যাপারে অভিযোগ করলেন। হুজুর (সাঃ) বললেন, যদি কেউ তার কন্যা তোমাকে না দিতে চায়, তাহলে না দিক। আমি তোমাকে আমার চাচার মেয়ের সঙ্গে বিয়ে দেব। সুতরাং হুজুর (সাঃ) হযরত দাবায়াহর (রাঃ) বিয়ে হযরত মিকদাদের (রাঃ) সঙ্গে দিয়ে দেন। তিনিও সাহাবী ছিলেন।

www.bjilibrary.com

হযরত উম্মে আইয়ুব আনসারিয়া (রাঃ)

আসল নাম জানা যায়নি। 'উম্মে আইয়ুব' কুনিয়তেই তিনি প্রসিদ্ধি লাভ করেন। রাসূলের (সাঃ) মেজবান হযরত আবু আইয়ূব আনসারীর (রাঃ) স্ত্রী ছিলেন। নবীর (সাঃ) হিজরতের পূর্বে স্বামীর সঙ্গে ইসলাম গ্রহণ করেন। প্রিয় নবী (সাঃ) মদীনা মুনাওয়ারাহ তাশরীফ.নেয়ার পর সাত মাস পর্যন্ত হযরত আবু আইয়ূবের (রাঃ) গৃহে অবস্থান করেন।

এ সময় হযরত উম্মে আইয়ূবই (রাঃ) হুজুরের (সাঃ) খানা তৈরি করতেন। প্রথমে হুজুর (সাঃ) হযরত আবু আইয়ূবের (রাঃ) ঘরের নীচের তলায় অবস্থান করতেন। হযরত আবু আইয়ূব (রাঃ) এবং উম্মে আইয়ূব (রাঃ) যদিও হুজুরের ইচ্ছা অনুযায়ী বালাখানায় স্থানান্তর হয়েছিলেন, তবুও স্বামী-স্ত্রী উভয়েই সবসময় বেকারার থাকতেন যে, তাঁরা ওপর তলায় রয়েছেন আর অহী বহনকারী রাসূল (সাঃ) নিচের তলায় অবস্থান করছেন।

ইবনে হিশাম (রঃ) বর্ণনা করেছেন, একদিন চিলেকোঠার ওপর পানি ভর্তি পাত্র ফেটে গেল। এতে স্বামী-স্ত্রী উভয়েই অস্থির হয়ে পড়লেন। তাঁদের ধারণা ছিলো যে, পানি বেয়ে নীচে যাবে এবং হুজুরের (সাঃ) কষ্ট হবে। ঘরে একটি কম্বল ছিলো। তাঁরা সঙ্গে সঙ্গে তা টেনে হিঁচড়ে পানির ওপর নিয়ে গেলেন। যাতে প্রবাহিত পানি কম্বল শোষণ করে নেয়। এভাবে পানি বেয়ে নীচে যাওয়ার সম্ভাবনা আর যখন রইলো না তখন স্বামী-স্ত্রী দু'জনেই স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়লেন।

একদিন ওপর তলায় থাকার অনুভূতি এত কঠিন আকার ধারণ করলো যে, স্বামী-স্ত্রী দু'জনেই ছাদের এক কোণে গুটিশুটি মেরে বসে রইলেন এবং সারারাত এভাবেই জেগে কাটিয়ে দিলেন। সকাল হলে হুজুরের (সাঃ) খেদমতে হাজির হয়ে আরজ করলেন ঃ 'ইয়া রাসূলাল্লাহ ! আমরা সারারাত ছাদের এক কোণায় বসে বসে কাটিয়ে দিয়েছি।'

হুজুর (সাঃ) এর কারণ জিজ্ঞেস করলে তাঁরা আরজ করলেন ঃ "আমাদের মাতা-পিতা আপনার ওপর কুরবান হোক ! সবসময় এ চিন্তায় কাটে যে, আপনি নীচের তলায় থাকেন। আর আমরা থাকি ওপর তলায়। হে আল্লাহর রাসূল ! আপনি ওপর তলায় চলুন। হুজুরের (সাঃ) গোলামরা আপনার পদতলে থাকাই সৌভাগ্যের ব্যাপার বলে মনে করে।"

www.bjilibrary.com

প্রিয় নবী (সাঃ) তাঁদের আবেদন কবুল করলেন এবং হযরত আবু আইয়ূব (রাঃ) এবং হযরত উম্মে আইয়ুব (রাঃ) খুশীর সঙ্গে নীচের তলায় অবস্থান গ্রহণ করলেন।

রাসূলে আকরাম (সাঃ) নিজস্ব বাড়ীতে স্থানান্তর হয়ে যাওয়ার পরও কখনো কখনো হযরত আবু আইয়ূবের (রাঃ) বাড়ীতে তাশরীফ রাখতেন। স্বামী-স্ত্রী উভয়েই হুজুরকে (সাঃ) আনন্দ চিত্তে স্বাগত জানাতেন এবং যাকিছু জুটতো তাই হুজুরের (সাঃ) খেদমতে পেশ করতেন। একদিন হুজুর (সাঃ) ক্ষুধাতুর অবস্থায় বাড়ী থেকে বেরুলেন। পথিমধ্যে হযরত আবু বকর (রাঃ) এবং হযরত ওমর ফারুকের (রাঃ) সঙ্গে সাক্ষাত হলো। প্রিয় নবী (সাঃ) দু'জনকে সঙ্গে নিয়েই হযরত আবু আইয়ূবের (রাঃ) বাড়ী গিয়ে উপস্থিত হলেন। সে সময় হযরত আবু আইয়ুব (রাঃ) বাড়ীর সঙ্গে লাগা খেজুরের বাগানে ছিলেন এবং ঘরে খাওয়ার কিছুই ছিলো না। হযরত উম্মে আইয়ূব (রাঃ) হুজুরকে (সাঃ) স্বাগত জানালেন। হুজুর (সাঃ) জিজ্ঞেস করলেন, "আবু আইয়ূব কোথায়?" হযরত আবু আইয়ূব (রাঃ) হুজুরের (সাঃ) কণ্ঠস্বর শুনতে পেয়ে খেজুরের একটি গোছা ছিঁড়ে নিয়ে দৌড়ে ঘরে এলেন এবং গোছাটি সম্মানিত মেহমানদের সামনে পেশ করলেন। সঙ্গে সঙ্গে একটি বকরীও যবেহ করলেন। হযরত উম্মে আইয়ূব (রাঃ) অর্ধেক গোশতের কারি বানালেন এবং অবশিষ্ট অর্ধেকের কাবাব বানিয়ে হুজুরের (সাঃ) খেদমতে খাবার পেশ করলেন। হুজুর (সাঃ) একটি রুটির ওপর কিছু গোশত রেখে বললেন, "এটুকু ফাতেমার কাছে পাঠিয়ে দাও। কয়েকদিন যাবত সে অভুক্ত রয়েছে।" হযরত আবু আইয়ুব (রাঃ) নির্দেশ পালন করলেন এবং হুজুর (সাঃ) সম্মানিত সঙ্গীদের নিয়ে খাবার খেলেন। ধারণা করা হয় যে, হযরত উম্মে আইয়ুব (রাঃ) আরো কয়েকবার হুজুরকে (সাঃ) এভাবে খেদমত করেছিলেন।

হযরত উম্মে আইয়ূবের (রাঃ) থেকে কতিপয় হাদীসও বর্ণিত আছে। তাঁর গর্ভে হযরত আবু আইয়ূবের (রাঃ) আইয়ূব, খালেদ ও মুহাম্মাদ নামের তিন পুত্র এবং উমরাহ নাম্নী এক কন্যা জন্মগ্রহণ করে।

হযরত উম্মে আইয়ূবের (রাঃ) মৃত্যু সাল সম্পর্কে ইতিহাস গ্রন্থগলো নীরব রয়েছে।

www.bjilibrary.com

হযরত উম্মে সালিত আনসারিয়া (রাঃ)

তাঁর নাম ও বংশনামা জানা যায়নি। সহীহ্ আল বুখারীতে আছে যে, তিনি ওহোদের যুদ্ধে হযরত উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা সিদ্দিকা (রাঃ) এবং অন্য মহিলাদের সঙ্গে মশক ভরে ভরে আহতদের পানি পান করিয়েছিলেন। হযরত ওমর ফারুক (রাঃ) তাঁর এ খেদমতের কথা দীর্ঘদিন স্মরণ রেখেছিলেন। নিজের শাসনামলে তিনি একবার মদীনার মহিলাদের মধ্যে চাদর বণ্টন করেছিলেন। একটি ভালো চাদর বেঁচে গিয়েছিলো। একজন বললো, চাদরটি আপনি আপনার স্ত্রী উম্মে কুলসুমকে (রাঃ) দিয়ে দিন। তিনি বললেন, "উম্মে সালিত এ চাদরের বেশী হকদার। তিনি আনসারদের সেই মহিলাদের অন্তর্ভুক্ত যাঁরা হুজুরের (সাঃ) কাছে বাইয়াত করেছিলেন। ওহোদের যুদ্ধে তিনি মশক ভরে ভরে পানি এনেছিলেন।"

এক রাওয়ায়েত অনুযায়ী হযরত যয়নব (রাঃ) বিনতে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ওফাত পেলে তাঁর গোসলের সময় অন্য মহিলাদের সঙ্গে তিনিও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। অন্য এক রাওয়ায়েতে তাঁর পিতার নাম উবায়েদ বিন যিয়াদ বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

হযরত ফাতেমা (রাঃ) বিনতে কায়েস

নাম হলো ফাতেমা। নসবনামা ঃ ফাতেমা (রাঃ) বিনতে কায়েস বিন খালিদে আকবার বিন ওয়াহাব বিন ছালাবাহ বিন ওয়ায়েলাহ বিন আমর বিন শাইবান বিন মাহারিব বিন ফাহার। মার নাম ছিলো উমাইমাহ বিনতে রবিয়াহ। তিনি বনি কানানাহ বংশোদ্ভূত ছিলেন। আবু আমর হাফছের (রাঃ) সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়েছিলো। তিনি দাওয়াতে হকের প্রথম যুগেই ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন এবং হিজরতের প্রথম পর্বেই অন্যান্য মহিলার সঙ্গে মদীনা হিজরত করেন।

দশম হিজরীতে হযরত আলী কাররামাল্লাহু ওয়াজহাহু (রাঃ) বিশ্বনবীর (সাঃ) নির্দেশ পালনার্থে একটি বাহিনী নিয়ে ইয়েমেন রওয়ানা হন। এ

www.bjilibrary.com

বাহিনীতে হযরত ফাতেমার (রাঃ) স্বামী আবু আমর হাফছও (রাঃ) শামিল ছিলেন। রওয়ানার আগে তিনি হযরত ফাতেমাকে (রাঃ) তালাক দিয়ে দেন। এটা ইতিহাসের মশহুর ঘটনা। বর্ণনা করা হয় যে, রওয়ানার কিছুদিন আগে আবু আমর হাফছ (রাঃ) হযরত ফাতেমাকে (রাঃ) দুই তালাক দিয়েছিলেন। শেষ তালাক হযরত আয়াশ (রাঃ) বিন রবিয়ার মাধ্যমে রওয়ানার সময় দেন এবং খরচ হিসেবে ৫ ছা' যব এবং ৫ ছা' খোরমা প্রেরণ করেন। হযরত ফাতেমা (রাঃ) আয়াশের (রাঃ) কাছে খাবার ও থাকার ঘর দাবী করলেন। এতে তিনি বললেন, আবু আমর হাফছ (রাঃ) শুধু এ যব ও খোরমাই দিয়েছেন। এছাড়া আর আমাদের কাছে কিছু নেই। যা দেয়া হয়েছে তাও ইহসান ও হামদরদী করে দেয়া হয়েছে। এতে হযরত ফাতেমা (রাঃ) ক্রোধান্বিত হলেন। তিনি নিজের কাপড় প্রভৃতি নিয়ে রাসূলের (সাঃ) কাছে উপস্থিত হলেন এবং সমগ্র ঘটনা বর্ণনা করলেন। হুজুর (সাঃ) জিজ্ঞেস করলেন ঃ আবু আমর তোমাকে কতবার তালাক দিয়েছে ? তিনি আরজ করলেন, তিনবার। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন, "এখন তোমার খরচ খরচা আবু আমরের ওপর ওয়াজিব নয়।"

অধিকাংশ ফকিহর সিদ্ধান্ত হলো, ইদ্দতকালে মহিলার খরচ-খরচা তালাক দানকারী পুরুষের ওপর বর্তায়। বস্তুত এ রাওয়ায়েতের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে ফিকাহর কিতাবসমূহে দীর্ঘ আলোচনা রয়েছে। তিনি হুজুরের (সাঃ) খেদমতে হাজির হলে বললেন, "ইদ্দতকালে তুমি উম্মে শুরাইকের (রাঃ) কাছে অতিবাহিত কর।" কিন্তু হযরত উম্মে শুরাইকের (রাঃ) গৃহে তাঁর আত্মীয়-স্বজন ছাড়াও অন্য অনেক মেহমানও আসা-যাওয়া করতো। এজন্য তিনি নিজের নির্দেশ সংশোধন করে হযরত ফাতেমাকে (রাঃ) পরামর্শ দিয়ে বললেন, ইদ্দতকালে চাচার পুত্র ইবনে উম্মে মাকতুমের (রাঃ) কাছে অতিবাহিত কর। তিনি নির্দেশ পালন করলেন। ইদ্দত শেষ হলে হযরত মাবিয়া (রাঃ) বিন আবু সুফিয়ান, হযরত আবু জাহাম (রাঃ) এবং হযরত উসামাহ (রাঃ) বিন যায়েদ (রাঃ) হযরত ফাতেমাকে (রাঃ) বিয়ে করার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। হযরত ফাতেমার (রাঃ) ধারণা ছিলো, প্রিয় নবীই (সাঃ) তাঁকে বিয়ে করবেন। কিন্তু আল্লাহর ইচ্ছা তা ছিলো না। বস্তুত হযরত ফাতেমা (রাঃ) নিজের দ্বিতীয় বিয়ের ব্যাপারে হুজুরের (সাঃ) সঙ্গে পরামর্শ করলেন। হুজুর (সাঃ) বললেন, "মাবিয়া (রাঃ) গরীব। আবু জাহাম (রাঃ) কঠোর প্রকৃতির মানুষ। তুমি উসামাহ (রাঃ) বিন যায়েদকে (রাঃ) বিয়ে করো।"

www.bjilibrary.com

হযরত ফাতেমা (রাঃ) কিছুটা চিন্তায় পড়ে গেলেন। হুজুর (সাঃ) বললেন, "তোমার ওযর কিসে ! আল্লাহ্ এবং আল্লাহ্র রাসূলের (সাঃ) আনুগত্য কর। তাতেই তোমার কল্যাণ রয়েছে।"

এরপর হযরত ফাতেমা (রাঃ) হুজুরের (সাঃ) নির্দেশ পালনে হযরত উসামাহ (রাঃ) বিন যায়েদকে (রাঃ) বিয়ে করলেন। তিনি একজন জালিলুল কদর সাহাবী ছিলেন এবং হুজুর (সাঃ) তাঁকে এতো ভালোবাসতেন যে, তিনি রাসূলের (সাঃ) মাহবুব বা প্রিয় উপাধিতে ভূষিত হয়েছিলেন। সহীহ্ মুসলিমে হযরত ফাতেমা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, উসামাহ (রাঃ) বিন যায়েদের (রাঃ) সঙ্গে বিয়ের পর আমি লোকদের ঈর্ষার পাত্রে পরিণত হই।

২৪ হিজরীতে হযরত ওমর ফারুক (রাঃ) শাহাদাত পান। এ সময় মজলিসে শূরার বৈঠক হযরত ফাতেমা (রাঃ) বিনতে কায়েসের গৃহেই অনুষ্ঠিত হতো। বস্তুত তিনি অত্যন্ত তীক্ষ্ণধী ও সঠিক রায়সম্পন্ন মহিলা ছিলেন। এজন্য মজলিসে শূরার সদস্যবৃন্দ তাঁর পরামর্শ গ্রহণ প্রয়োজন মনে করতেন। ৫৪ হিজরীতে হযরত উসামাহ (রাঃ) বিন যায়েদ (রাঃ) ইন্তেকাল করেন। তাতে হযরত ফাতেমা (রাঃ) খুব দুঃখ পান। তারপর তিনি আজীবন আর বিয়ে করেননি এবং সহোদর জাহ্হাক বিন কায়েসের কাছে থেকে যান। ইয়াযিদ বিন মাবিয়া (রাঃ) যখন তাঁকে ইরাকের গভর্নর নিয়োগ করেন তখন তিনি তাঁর কাছে চলে যান এবং সেখানেই স্থায়ীভাবে রয়ে যান।

সহীহ্ মুসলিমে হযরত ফাতেমা (রাঃ) প্রসঙ্গে এক বিশেষ ঘটনার বর্ণনা করা হয়েছে। ঘটনাটি হলো, মারওয়ান বিনুল হাকামের শাসনামলে হযরত সাঈদ (রাঃ) বিন যায়েদের (রাঃ) কন্যাকে তাঁর স্বামী আবদুল্লাহ্ বিন আমর বিন ওসমান তালাক দেন। আত্মীয়তার সূত্রে হযরত ফাতেমা (রাঃ) খালা হতেন। এজন্য তিনি তাঁর প্রতি সমবেদনা প্রকাশ করে তাঁর কাছে চলে আসার জন্য বলে পাঠান। মারওয়ান এটা জানতে পেরে কাবিছাহকে তাঁর কাছে প্রেরণ করেন এবং জানতে চান যে, আপনি একজন তালাক প্রাপ্তা মহিলাকে ইদ্দত শেষ হওয়ার আগে ঘর থেকে কেন বের করছেন ?

হযরত ফাতেমা (রাঃ) জবাব দিলেন যে, হুজুর (সাঃ) স্বয়ং আমাকে ইদ্দতকালে আমার চাচার পুত্র ইবনে উম্মে মাকতুমের (রাঃ) কাছে অতিবাহিত করার অনুমতি দিয়েছিলেন। এজন্য আমিও আমার ভাগিনীকে ইদ্দত শেষ হওয়ার পূর্বে আমার কাছে ডেকে পাঠিয়েছি।

www.bjilibrary.com

মারওয়ান তাঁর কথার কোনো গুরুত্বই দিলেন না এবং তালাকপ্রাপ্তা মহিলাকে নিজের গৃহেই ইদ্দত পালনের নির্দেশ দিলেন।

আল্লামা সাইয়েদ সুলায়মান নদভী (রঃ) 'সীরাতে আয়েশা' গ্রন্থে এ ঘটনা সম্পর্কে লিখেছেন, 'ইসলামের নির্দেশ হলো তালাকপ্রাপ্তা মহিলা ইদ্দতের সময় নিজের স্বামীর ঘরেই অবস্থান করবে। আর এ নির্দেশ বিরোধী সাক্ষ্য-প্রমাণ শুধুমাত্র ফাতেমা (রাঃ) বিনতে কায়েসের ঘটনাতেই রয়েছে। তাঁর স্বামী তাঁকে তালাক দেন এবং তিনি হুজুরের (সাঃ) নির্দেশে নিজের স্বামী গৃহ ছেড়ে অন্যের গৃহে গিয়ে অবস্থান করেছিলেন। ফাতেমা (রাঃ) এ ঘটনাকে স্বামী গৃহ থেকে অন্যের গৃহে গমনের দলিল হিসাবে বর্ণনা করতেন। হযরত আয়েশার (রাঃ) যুগে এ ঘটনাকে দলিল হিসাবে বর্ণনা করে একজন সম্মানিত পিতা নিজের তালাক প্রাপ্তা কন্যাকে স্বামী গৃহ থেকে ডেকে পাঠান। হযরত আয়েশা (রাঃ) ইসলামের এ সাধারণ নির্দেশের বিরোধিতার জন্য কঠোর প্রতিবাদ করেন। সে যুগে মারওয়ান মদীনার গভর্নর ছিলেন। তিনি তাঁকে বলে পাঠান যে, সরকারীভাবে তুমি এ ব্যাপারে হস্তপেক্ষ করো। সমস্যার ধরন সম্পর্কে তিনি বলেন যে, উক্ত ঘটনার মাধ্যমে সাধারণভাবে দলিল প্রদান জায়েয নয়। ঘটনাটি ছিলো যে, ফাতেমার (রাঃ) স্বামীর গৃহ শহরের এক প্রান্তে ছিলো এবং সেখানে রাতে হিংস্র প্রাণীর ভয় ছিলো। এ কারণে হুজুর (সাঃ) তাঁকে অনুমতি দিয়েছিলেন।

ঐতিহাসিকরা হযরত ফাতেমার (রাঃ) ওফাতের সাল সম্পর্কে কিছু বলেননি। অবশ্য কতিপয় রাওয়ায়েত থেকে জানা যায় যে, তিনি হযরত আবদুল্লাহ বিন যুবাইরের (রাঃ) মক্কার খেলাফতকাল পর্যন্ত জীবিত ছিলেন।

হযরত ফাতেমা (রাঃ) বিনতে কায়েস থেকে ৩৪টি হাদীস বর্ণিত আছে। তাঁর হাদীসের রাবীদের মধ্যে হযরত কাসিম বিন মুহাম্মাদ (রঃ), আবু সালমাহ (রঃ), সাঈদ বিন মুসাইয়্যিব (রঃ), উরওয়াহ বিন যুবাইর (রাঃ), সালমান বিন ইয়াসার (রঃ) এবং শা'বীর (রঃ) মতো শীর্ষস্থানীয় তাবেয়ী শামিল ছিলেন।

সহীহ মুসলিম ও আবু দাউদের এক হাদীস যা 'হাদীসে জাসসাসাহ' নামে খ্যাত, স্বয়ং হযরত ফাতেমা (রাঃ) এ হাদীসের রাবী, তিনি বলেন ঃ

"একবার আমি মসজিদে নববীতে গেলাম এবং রাসূলের (সাঃ) পেছনে নামায পড়লাম। হুজুর (সাঃ) নামায থেকে ফারেগ হয়ে মিম্বারে তাশরিফ রাখলেন এবং অভ্যাস অনুযায়ী মুচকি হেসে বললেন, সকলে নিজের স্থানে বসে

www.bjilibrary.com

থাকো। অতপর তিনি বললেন, তোমাদেরকে কেন একত্রিত করেছি তা কি জানো ! সাহাবীরা (রাঃ) আরজ করলেন, আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসূলই ভালো জানেন। ইরশাদ হলো; আমি তোমাদেরকে কোনো ব্যাপারে উদ্বুদ্ধকরণ অথবা ভীতি প্রদর্শনের জন্য একত্রিত করিনি। বরং একটি ঘটনা বর্ণনার জন্য একত্রিত করেছি। এ ঘটনা তামিমদারি (রাঃ) বর্ণনা করেছেন। তিনি প্রথমে খৃস্টান ছিলেন। আল্লাহ তাঁকে ইসলাম গ্রহণের সুযোগ দিয়েছেন। তিনি বলেন, আমি জাহাজ যোগে সমুদ্র সফর শুরু করলাম। আমার সঙ্গে জাযাম ও লাখাম গোত্রের ৩০ ব্যক্তিও ছিলেন। সফরকালে ঝড় শুরু হলো এবং এক মাস পর্যন্ত জাহাজ সামুদ্রিক ঢেউয়ে এদিক-ওদিক পথভ্রষ্ট হয়ে চলতে লাগলো। শেষে একটি দ্বীপের কূলে গিয়ে লাগলো। আমরা দ্বীপে নামলাম। সেখানে আজব ধরনের একজন মহিলা দেখলাম। তার চুল ছিলো লম্বা লম্বা। আমরা তাকে জিজ্ঞেস করলাম, তুই কে ! সে বললো, আমি জাস্‌সাস অর্থাৎ খবরদানকারী। দাজ্জালকে খবর পৌছাই। তোমরা সামনের মন্দিরে গেলে দাজ্জাল দেখতে পাবে। আমরা সেই মন্দিরে পৌছলে সেখানে অসাধারণ অবয়বের একজন মানুষ দেখলাম। সে ছিলো জিঞ্জিরাবদ্ধ। আমরা সেই পাহাড় আকৃতির লোকটিকে জিজ্ঞেস করলাম, তুমি কে ? সে বললো, "আগে তোমরা বলো, তোমরা কে এবং এখানে কিভাবে পৌছেছ ?"

আমরা ঃ আমরা আরবের বাসিন্দা। আমাদের জাহাজ সামুদ্রিক ঝড় কবলিত হয়ে এবং ঢেউয়ে এ দ্বীপের সঙ্গে এসে লাগে। এক আজব আকৃতির জাস্‌সাসা আমাদেরকে তোমার দিকে পাঠিয়ে দিয়েছে।

সে ঃ আচ্ছা বলতো, বিসানের খেজুর বাগানে ফল আসছে। অথবা আসছে না ?

আমরা ঃ বিসানের খেজুর বাগানে ফল আসছে।

সে ঃ স্মরণ রেখো, সে সময়ও আসছে যখন বিসানের খেজুর বৃক্ষ ফল দেবে না। আচ্ছা বলতো তাববিয়া সাগরে এখনো পানি আছে, না তা শুকিয়ে গেছে ?

আমরা ঃ তাতেতো অঢেল পানি রয়েছে।

সে ঃ এমন সময় আসবে যখন তার পানি শুকিয়ে যাবে। আচ্ছা বলতো, যাগার ঝরণা দিয়ে পানি আসছে কিনা এবং তা থেকে মানুষজন ক্ষেতে সেচ দিচ্ছে কিনা ?

আমরা ঃ হ্যাঁ, যাগার ঝরণার পানি আসছে এবং মানুষজন তা থেকে ক্ষেতে সেচ দিচ্ছে।

সে ঃ আচ্ছা বলতো, উম্মীদের নবী আত্মপ্রকাশ করে কি করেছে?

আমরা ঃ তিনি নিজের জাতির ওপর বিজয়ী হয়েছেন এবং লোকজন তাঁর আনুগত্য কবুল করে নিয়েছে।

সে ঃ হ্যাঁ, তাদের জন্য আনুগত্য কবুল করে নেয়াই উত্তম ছিলো। এখন আমার কথা শোন। আমি দাজ্জাল। শিগগিরই আমি এখান থেকে বের হবার অনুমতি পাবো। আমি সমগ্র বিশ্ব ঘুরবো এবং দুনিয়ায় এমন কোনো স্থান হবে না যেখানে আমি ৪০ দিনের মধ্যে পৌঁছতে পারবো না। অবশ্য মক্কা এবং তাইয়্যেবা এ দুই শহরে প্রবেশের অনুমতি আমার নেই। যখন আমি ঐ দুই শহরে প্রবেশের চেষ্টা করবো তখন তরবারী হাতে এক ফেরেশতা আমাকে বাধা দেবেন।

এ ঘটনা বর্ণনা করে হুজুর (সাঃ) নিজের পবিত্র লাঠি দিয়ে মিম্বারের ওপর তিনবার মারলেন এবং বললেন, এই সেই তাইয়্যেবা, এই সেই তাইয়্যেবা, এই সেই তাইয়্যেবা (অর্থাৎ মদীনা মুনাওয়ারাহ্)।"

হযরত উম্মে ফারদাহ (রাঃ)

তিনি কুরাইশের বনু তাইম বংশোদ্ভূত এবং হযরত আবু বকর সিদ্দিকের (রাঃ) সহোদরা ছিলেন। নসবনামা হলো ঃ উম্মে ফারদাহ (রাঃ) বিনতে আবু কাহাফাহ ওসমান (রাঃ) বিন আমর বিন কা'বা বিন সা'দ বিন তাইম বিন মাররাহ বিন কা'বলুব্বী।

চরিতকাররা তাঁর ইসলাম গ্রহণের সময় লিখেননি। কিন্তু তিনি যে সাহাবী ছিলেন এ ব্যাপারে সকলেই একমত। হযরত আশয়াছ (রাঃ) বিন কায়েসের সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়েছিলো। হাফিজ ইবনে হাজার (রাঃ) "ইসাবাহ" গ্রন্থে লিখেছেন, আশয়াছ (রাঃ) বিন কায়েস ইয়েমেনের কিন্দাহর শাসক ছিলেন। তিনি ১০ম হিজরীতে একটি প্রতিনিধি দলের সঙ্গে রাসূলের (সাঃ) খেদমতে হাজির হন এবং ইসলাম গ্রহণ করেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত প্রিয় নবীর (সাঃ) ইন্তেকালের পর ধর্মদ্রোহীর ফেতনায় অংশ নেন। অবশেষে তাঁকে গ্রেফতার

করে রাসূলের (সাঃ) খলিফা হযরত আবু বকর সিদ্দিকের (রাঃ) খেদমতে আনা হয়। তিনি সত্য অন্তরে খলিফাতুর রাসূলের কাছে তাওবা এবং নিজের পদস্খলনের জন্য লজ্জা প্রকাশ করেন। এতে সিদ্দিকে আকবার (রাঃ) তাঁকে শুধু ক্ষমাই করেননি বরং নিজের সহোদরা উম্মে ফারদাহকে (রাঃ) তাঁর সঙ্গে বিয়েও দেন। বিয়ের পর আশয়াছ (রাঃ) বাজারে গেলেন। বাজারে উট আসছিলো। তিনি তরবারী হাতে নিলেন এবং যে উটই সামনে পেলেন তাঁর কুনুই কেটে মাটিতে ফেলে দিতে লাগলেন। লোকজন আশ্চর্য হয়ে গেলো। আশয়াছ (রাঃ) বললেন, আমি যদি দেশে থাকতাম তাহলে আরো অনেক সম্পদ থাকতো। একথা বলেই তিনি উটগুলোর মূল্য আদায় করে দিলেন এবং মদীনাবাসীদেরকে বললেন ঃ আপনাদের দাওয়াত রইলো। এ বর্ণনার শব্দাবলী হলো ঃ

হযরত আশয়াছ (রাঃ) ২০টি উট মেরে মাটিতে ফেলে দিলেন। এতে বাজারে শোরগোল পড়ে গেল যে, আশয়াছ (রাঃ) কাফের হয়ে গেছে। আশয়াছ (রাঃ) এ কথা শুনে তরবারী একদিকে ফেলে দিয়ে বললেন ঃ "খোদার কসম ! আমি কাফের হইনি। বরং তিনি (আবু বকর সিদ্দিক) নিজের সহোদরাকে আমার সঙ্গে বিয়ে দিয়েছেন। আমি যদি আজ দেশে থাকতাম তাহলে এর চেয়েও উত্তম ওয়ালিমা করতাম। মদীনাবাসীরা ! এ গোশত নিয়ে যাও এবং খাও। আর উটের মালিকরা ! তোমরা আমার কাছ থেকে উটের মূল্য নিয়ে যাও।"

ইমাম আহমদ বিন হাম্বল, তিরমিযি এবং আবু দাউদ হযরত উম্মে ফারদাহর (রাঃ) কাছ থেকে এ হাদীস বর্ণনা করেছেন যে, নবীকে (সাঃ) জিজ্ঞেস করা হয়েছিলো, কোন্ কাজ সবচেয়ে উত্তম ? তিনি বলেছেন, প্রথম ওয়াক্তে নামায আদায় করা।

একজন ভাগ্যবতী সাহাবী (রাঃ)

মদীনা মুনাওয়ারার উপকণ্ঠে প্রিয় নবীর (সাঃ) এক মহিলা সাহাবী একবার কঠিন রোগে আক্রান্ত হলেন। এমনকি তাঁর জীবন সম্পর্কে সকলেই নিরাশ হয়ে পড়লেন। লোকদের ধারণা ছিলো যে, তিনি যে কোনো সময় মারা যাবেন। হুজুর (সাঃ) একথা জানতে পেরে লোকদেরকে বললেন, "সে

www.bjilibrary.com

ইন্তেকাল করলে আমাকে খবর দিও। আমি নিজে তার জানাযার নামায পড়াতে চাই। এরপর তার দাফন হবে।"

ঘটনাক্রমে সেই মহিলা সাহাবী রাতে ইন্তেকাল করলেন। লোকজন তাঁর জানাযা তৈরি করে এনে দেখলেন যে, প্রিয় নবী (সাঃ) ঘুমিয়ে পড়েছেন। সাহাবায়ে কিরাম (রাঃ) রাসূলকে (সাঃ) ঘুম থেকে জাগানো ঠিক মনে করলেন না এবং তাঁকে রাতেই দাফন করে ফেললেন। সকালে হুজুর (সাঃ) লোকদের কাছে তাঁর অবস্থা জানতে চাইলেন। তাঁরা ঘটনা বললেন। হুজুর (সাঃ) তা শুনে দাঁড়িয়ে গেলেন এবং সাহাবীদেরকে সঙ্গে নিয়ে মহিলা সাহাবীর কবরে তাশরীফ রাখলেন এবং দ্বিতীয়বার নামাযে জানাযা আদায় করলেন।

হযরত তামাদুর (রাঃ) বিনতিল আসবাগ (রাঃ)

কালাব গোত্রের সরদার আসবাগ বিন আমরুল কালবির কন্যা ছিলেন। এই সরদার ছিলেন খৃস্টান ধর্মাবলম্বী। ৬ষ্ঠ হিজরীর শাবান মাসে প্রিয় নবী (সাঃ) হযরত আবদুর রহমান বিন আওফকে (রাঃ) দাওমাতুল জান্দালের অভিযানে নিয়োগ করলেন। তিনি যখন অভিযানে রওয়ানা হচ্ছিলেন তখন তাঁকে নির্দেশ দিয়ে বললেন, দাওমাতুল জান্দাল পৌঁছে কালাব গোত্রকে ইসলামের দাওয়াত দেবে। তারা যদি দাওয়াত কবুল করে তাহলে তাদের সরদারের কন্যাকে বিয়ে করবে। হযরত আবদুর রহমান (রাঃ) হুজুরের নির্দেশ পালন করলেন। গোত্রের সরদার আসবাগ (রাঃ) এবং তাঁর কওমের অনেক মানুষ হৃষ্টচিত্তে ইসলাম গ্রহণ করলেন। হযরত আবদুর রহমান (রাঃ) নির্দেশ অনুযায়ী আসবাগের (রাঃ) কন্যা তামাদুরকে (রাঃ) বিয়ে করলেন এবং তাঁকে সঙ্গে নিয়ে মদীনা এলেন। জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তামাদুর (রাঃ) তাঁর জীবন সঙ্গিনী ছিলেন। কিন্তু একটি রাওয়ায়েতে আছে, হযরত আবদুর রহমান (রাঃ) মৃত্যু শয্যায় তাঁকে নিজের স্ত্রীত্ব থেকে স্বাধীন করে দিয়েছিলেন এবং তাঁর ইন্তেকালের পর তিনি হযরত যোবায়েরের (রাঃ) সঙ্গে বিয়ে বসেছিলেন। কিন্তু কিছুদিন পরই তিনি তাঁর থেকেও বিচ্ছিন্ন হয়ে যান।

কতিপয় রাওয়ায়েতে আছে, হযরত ওসমান জুন্নুরাইন (রাঃ) তাঁকে হযরত আবদুর রহমানের (রাঃ) ধন-সম্পদ থেকে অংশ দিয়েছিলেন। তাঁর গর্ভে হযরত আবদুর রহমানের পুত্র আবু সালমা (রাঃ) জন্মগ্রহণ করেন। নেতৃস্থানীয়

www.bjilibrary.com

ঐতিহাসিকরা তাঁর ওফাতের সাল সম্পর্কে বিস্তারিত কিছু লিখেননি। অবশ্য বিভিন্ন রাওয়ায়েত থেকে স্পষ্ট হয় যে, আমীরে মাবিয়ার (রাঃ) শাসনামল পর্যন্ত তিনি জীবিত ছিলেন।

হযরত যয়নব (রাঃ) বিনতে আবু সালমা (রাঃ)

উম্মুল মু'মিনীন হযরত উম্মে সালমার (রাঃ) কন্যা ছিলেন। প্রথম স্বামী হযরত আবু সালমা (রাঃ) বিন আবদুল আসাদ মাখজুমীর ঔরসে হযরত যয়নবের (রাঃ) জন্ম। তাঁর বংশ তালিকা নিম্নরূপ ঃ যয়নব (রাঃ) বিনতে আবু সালমা (রাঃ) বিন আবদুল আসাদ বিন হিলাল বিন আবদুল্লাহ বিন ওমর বিন মাখজুমুল কারাশী।

হযরত আবু সালমা (রাঃ) রাসূলে আকরামের (সাঃ) ফুফাতো ভাই ছিলেন এবং দুধ ভাইও। এদিক থেকে হযরত যয়নব (রাঃ) হুজুরের (সাঃ) ভাতিজীও হন। [বাররাহ বিনতে আবদুল মুত্তালিব হযরত যয়নবের (রাঃ) দাদী ছিলেন এবং হুজুরের (সাঃ) ফুফু]। তাঁর জন্মের ব্যাপারে পরস্পর বিরোধী রাওয়ায়েত রয়েছে। কতিপয় রাওয়ায়েতে আছে যে, তিনি হাবশায় জন্মগ্রহণ করেন। নবুয়াতের পঞ্চম বছর পর তাঁর মাতা-পিতা মক্কা থেকে হিজরত করার পর সেখানে অবস্থান করছিলেন। হযরত আবু সালমা (রাঃ) এবং উম্মে সালমা (রাঃ) হাবশায় কয়েক বছর অতিবাহিত করার পর মক্কা ফিরে আসেন এবং সেখান থেকে মদীনায় হিজরত করেন [হযরত আবু সালমা (রাঃ) নবুয়াতের ১২ বছর পর মদীনায় হিজরত করেন এবং হযরত উম্মে সালমা (রাঃ) নবুয়াতের ত্রয়োদশ বছর পর]। মাওলানা সাঈদ আনসারী মরহুম সিয়রুস সাহাবিয়াত গ্রন্থে লিখেছেন, হযরত যয়নব (রাঃ) মাতা-পিতার সঙ্গে হিজরত করেছিলেন। হযরত যয়নবের (রাঃ) জন্ম যদি হাবশায় হয়ে থাকে তাহলে তিনি 'মাতা-পিতার' সঙ্গে নয় বরং মাতার সঙ্গে হিজরত করে থাকবেন (স্বামী-স্ত্রী উভয়ের হিজরতের সালে এক বছর পার্থক্য রয়েছে)। সে সময় তাঁর বয়স কমপক্ষে তিন-চার বছর অবশ্যই ছিলো। কিন্তু কতিপয় ঐতিহাসিক লিখেছেন যে, হযরত আবু সালমা (রাঃ) চতুর্থ হিজরীতে ওফাত পান। সে সময় হযরত যয়নব (রাঃ) মায়ের দুধ খেতেন। হাফিজ ইবনে হাজার (রঃ) 'ইসাবাহ' গ্রন্থে লিখেছেন যে, হযরত আসমা (রাঃ) বিনতে আবি বকর (রাঃ) তাঁকে দুধ পান করিয়েছেন। ইদ্দত পালনের পর হযরত উম্মে সালমার (রাঃ) বিয়ে হয় বিশ্ব নবীর (সাঃ) সঙ্গে। এই

www.bjilibrary.com

সময় শিশু যয়নবও (রাঃ) হুজুরের প্রশিক্ষণাধীনে আসেন। তাঁর আসল নাম ছিল বাররাহ। হুজুর (সাঃ) তা পরিবর্তন করে যয়নব রাখেন।

কতিপয় রাওয়ায়েত থেকে স্পষ্ট হয় যে, তিনি তৃতীয় হিজরীতে পিতার (হজরত আবু সালমার) ওফাতের পর জন্মগ্রহণ করেন। আমাদের বিচার-বিশ্লেষণ মতে যেসব রাওয়ায়েতে হযরত যয়নবের (রাঃ) জন্ম হাবশায় বর্ণনা করা হয়েছে তা সহিহ নয়। কেননা ইবনে হিশাম মুহাম্মাদ বিন ইসহাকের উদ্ধৃতি দিয়ে স্বয়ং উম্মে সালমা (রাঃ) থেকে এই রাওয়ায়েত উল্লেখ করেন যে, যে সময় তিনি হিজরত করেন (নবুয়তের ১৩ বছর পর) তখন তাঁর কোলে একটি বাচ্চাই ছিল (সালমা (রাঃ) বিন আবু সালমা)। এই রাওয়ায়েত থেকে প্রতিষ্ঠিত হয় যে, হযরত যয়নব (রাঃ) মদীনায় হিজরতে নববীর পর জন্মগ্রহণ করেন। চতুর্থ হিজরীতে হযরত উম্মে সালমার (রাঃ) উম্মুল মুমিনিন হওয়ার সৌভাগ্য ঘটে। এ সময় হযরত যয়নব দুধের শিশু ছিলেন। এইদিক থেকে তাঁর জন্ম সাল ৩ হিজরী দাঁড়ায়। রাসূলের সঙ্গে হযরত উম্মে সালমার (রাঃ) বিয়ের সময় হযরত যয়নবের (রাঃ) দুধের শিশু হওয়ার সত্যতা মুসনাদে আহমদ (রঃ) বিন হাম্বল এবং তাবকাতে ইবনে সা'দের সেই রাওয়ায়েত থেকেও প্রতিষ্ঠিত হয় যে রাওয়ায়েতে বলা হয়েছে যে, হযরত উম্মে সালমা (রাঃ) অত্যন্ত লাজুক ছিলেন। হুজুরের (সাঃ) বিয়ের পর কিছুদিন পর্যন্ত তাঁর অবস্থা এমন ছিল যে, যখনই হুজুর (সাঃ) তাশরীফ অনতেন তখনই লজ্জায় অধোবদন হয়ে দুধের বাচ্চা যয়নবকে (রাঃ) কোলে নিয়ে দুধ পান করাতে লেগে যেতেন। হুজুর (সাঃ) এই দৃশ্য দেখে ফিরে যেতেন। হযরত আম্মার (রাঃ) বিন ইয়াসির (রাঃ) হযরত উম্মে সালমার (রাঃ) দুধ ভাই ছিলেন। তিনি এই কথা জানতে পেরে অসন্তুষ্ট হলেন এবং হযরত যয়নবকে (রাঃ) সাময়িকভাবে নিজের গৃহে নিয়ে গেলেন।

শিশু যয়নবকে রহমতে আলম (রাঃ) খুব ভালোবাসতেন। একদিকে তিনি যেমন রাসূলের (সাঃ) আশ্রয়ে ছিলেন তেমনি আবার ভাতিজীও হতেন। হুজুর (সাঃ) কখনো গোসল করতে থাকলে শিশু যয়নব (রাঃ) আস্তে আস্তে তাঁর নিকট চলে যেতেন। এ সময় প্রিয় নবী (সাঃ) স্নেহের সাথে তাঁর মুখে পানি ছিটিয়ে দিতেন। ঐতিহাসিকরা বিশ্বস্ততার সঙ্গে লিখেছেন যে, এই পানির বরকতে বার্ধক্যে হযরত যয়নবের (রাঃ) চেহারায় যৌবনের দীপ্তি বিদ্যমান ছিল।

হযরত যয়নব (রাঃ) বয়োপ্রাপ্তা হলে উম্মুল মুমিনিন হযরত উম্মে সালমা (রাঃ) নিজের ভাগিনেয় হযরত আব্দুল্লাহ (রাঃ) বিন যামায়ার (বিন আসওয়াদ বিন

www.bjilibrary.com

মুত্তালিব বিন আসাদ বিন আব্দুল উজ্জা বিন কুসাই) সঙ্গে বিয়ে দেন। তাঁর ঔরসে ৬ ছেলে এবং তিন মেয়ে জন্মগ্রহণ করেন।

৬৩ হিজরীতে হযরত যয়নব (রাঃ) মারাত্মক দুঃখ পান। তাঁর দুই পুত্র ইয়াযিদ বিন আব্দুল্লাহ (রাঃ) এবং ক..ের বিন আব্দুল্লাহ শহীদ হন। যখন তাঁদের লাশ হযরত যয়নবের (রাঃ) সামনে আনা হলো তখন ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন বলে বললেন, আমার ওপর বড় মুসিবত আপতিত হয়েছে। এক পুত্রতো যুদ্ধের ময়দানে লড়াই করে শহীদ হয়েছে কিন্তু অপরজন ঘরে ছিল। জালেমরা ঘরে প্রবেশ করে তাকে অন্যায়ভাবে হত্যা করে। তারপর অত্যন্ত সাহস ও ধৈর্যের সঙ্গে উভয় সন্তানের কাফন দাফনের ব্যবস্থা করলেন। এই ঘটনার ১০ বছর পর (৭৩ হিজরীতে) হযরত যয়নবও (রাঃ) পরপারের ডাকে সাড়া দেন। জান্নাতুল বাকীতে তাঁকে দাফন করা হয়। জানাযাতে উম্মাহর ফকিহ হযরত আব্দুল্লাহ (রাঃ) বিন ওমরও শরীক হন।

হযরত যয়নব (রাঃ) রহমতে আলমের (সাঃ) স্নেহ ছায়ায় লালিত-পালিত হয়েছিলেন। এজন্য অত্যন্ত উঁচু মর্যাদা পেয়েছিলেন। আল্লামা ইবনে আব্দুল বার (রঃ) "ইসতিয়াব" ও আল্লামা ইবনে আছির " উসুদুল গাব্বাহ" গ্রন্থে লিখেছেনঃ " তিনি সমকালীন সময়ে মহিলা ফকিহর মত ছিলেন।"

নেতৃস্থানীয় ঐতিহাসিকরা এ কথাও লিখেছেন যে, বড় বড় আলেম হযরত যয়নবের (রাঃ) নিকট মাসয়ালা জিজ্ঞেস করতেন। হাফিজ ইবনে হাজার (রঃ) "ইসাবাহ"-তে হযরত আবু রাফের (রাঃ) এই মন্তব্য উল্লেখ করেছেন, " আমি যখনই মদীনার কোন মহিলা ফকিহর কথা উল্লেখ করেছি তখনই যয়নব (রাঃ) বিনতে আবু সালমার (রাঃ) নাম অবশ্যই স্মরণ করেছি।"

হযরত যয়নব (রাঃ) থেকে কতিপয় হাদীসও বর্ণিত আছে। তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনাকারীদের মধ্যে রয়েছেন হযরত ইমাম যয়নুল আবেদীন (রঃ) এবং উরওয়াহ (রঃ) বিন যোবায়েরের মত মহান ব্যক্তিবর্গ।

www.bjilibrary.com

হযরত দুররাহ (রাঃ) বিনতে আবি সালমা (রাঃ)

হযরত যয়নব (রাঃ) বিনতে আবি সালমার (রাঃ) সহোদরা ছিলেন। পিতা হযরত আবু সালমার (রাঃ) ওফাতের পর তিনিও রাসূলের (সাঃ) স্নেহ ছায়ায় লালিত-পালিত হন। সহিহ্ বুখারীতে তার উল্লেখ রয়েছে। উম্মুল মুমিনিন হযরত উম্মে হাবিবাহ (রাঃ) একবার হুজুরকে (সাঃ) বললেন, আমরা শুনেছি যে আপনি নাকি দুররাহ'কে (রাঃ) বিয়ে করতে চান? তিনি বললেন,'' এটা কেমন করে হতে পারে? আমি যদি তাকে লালিত-পালিত নাও করতাম তাহলেও সে আমার জন্য কোনভাবেই বৈধ হতো না। কেননা সে আমার দুধ-ভাইয়ের কন্যা।

এক রাওয়ায়েতে তাঁর নাম রোকেয়া বলেও উল্লেখ করা হয়েছে।

হযরত হাবিবাহ (রাঃ) বিনতে উবায়েদুল্লাহ

উম্মুল মুমিনিন হযরত উম্মে হাবিবাহ (রাঃ) বিনতে আবু সুফিয়ানের (রাঃ) কন্যা ছিলেন। তিনি উম্মুল মুমিনিনের প্রথম স্বামী উবায়েদুল্লাহ বিন জাহাশের ঔরসজাত কন্যা। নসবনামাঃ হাবিবাহ (রাঃ) বিনতে উবায়েদুল্লাহ বিন জাহাশ বিন রিয়াব বিন ইয়ামার বিন সাবরাতা বিন মাররাহ বিন কাছির বিন গানাম বিন দাওদান বিন সা'দ বিন খোযায়মাহ।

তাঁর দাদী উমাইয়াহ বিনতে আবদুল মুত্তালিব প্রিয় নবীর (সাঃ) ফুফু ছিলেন। এইদিক থেকে তাঁর পিতা উবায়েদুল্লাহ হুজুরের (সাঃ) ফুফাতো ভাই এবং তিনি হুজুরেরভাতিজী।

www.bjilibrary.com

হযরত উম্মে হাবিবাহ (রাঃ) এবং উবায়েদুল্লাহ বিন জাহাশ উভয়েই নবুয়তের প্রথম যুগে ইসলাম গ্রহণ করেন এবং নবুয়তের ৬ষ্ঠ বছরে হিজরত করে হাবশা গমন করেন। হযরত হাবিবাহ (রাঃ) সেখানেই জন্মগ্রহণ করেন। দুর্ভাগ্যবশত উবায়েদুল্লাহ হাবশায় খারাব লোকদের পাল্লায় পড়ে যায় এবং ইসলাম ত্যাগ করে খৃষ্টান হয়ে যায়। সঙ্গে সঙ্গে বেশী বেশী মদ পান শুরু করে এবং এই অবস্থাতেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়। হযরত উম্মে হাবিবাহ (রাঃ) ছোট্ট কন্যাসহ বিদেশে বন্ধু-বান্ধব ও সহায়হীন অবস্থায় পড়ে যান। কিছুদিন পর হুজুর (সাঃ) তাঁকে বিয়ের পয়গাম প্রেরণ করেন। তিনি এই পয়গাম কবুল করেন এবং হাবশার বাদশাহ নাজ্জাশী গায়েবানাভাবে হুজুরের (সাঃ) সঙ্গে তাঁর বিয়ে দেন। হযরত উম্মে হাবিবাহ (রাঃ) খায়বারের যুদ্ধের সময় হাবশা থেকে মদীনা আসেন। এ সময় হুজুর (সাঃ) তাঁর কন্যা হাবিবাকেও (রাঃ) নিজের স্নেহ ছায়ায় গ্রহণ করেন এবং অত্যন্ত স্নেহের সাথে তাঁকে লালন-পালন করেন। বনু ছাকিফের সরদার দাউদ বিন উরওয়াহ (রাঃ) বিন মাসউদের সঙ্গে হযরত হাবিবার (রাঃ) বিয়ে হয়।

হযরত সালমা (রাঃ) রাসূলের (সাঃ) খাদেমাহ

হযরত সালমা (রাঃ) প্রিয় নবীর (সাঃ) দাসী ছিলেন। কিন্তু হুজুর (সাঃ) তাঁকে স্বাধীন করে নিজের আযাদকৃত গোলাম হযরত আবু রাফের (রাঃ) সঙ্গে বিয়ে দেন। তিনি এত ধৈর্যের সঙ্গে রাসূলের (সাঃ) খিদমত করেন যে, জনসাধারণ্যে তিনি হুজুরের খাদেমাহ হিসেবে মশহুর হন। হযরত মারিয়া কিবতিয়ার (রাঃ) গর্ভে হুজুরের (সাঃ) পুত্র ইবরাহিম (রাঃ) জন্ম নিলে দাইগিরির কাজ হযরত সালমাই (রাঃ) আঞ্জাম দেন। তাঁর স্বামী হযরত আবু রাফে (রাঃ) হুজুরের (সাঃ) নিকট ইবরাহীমের (রাঃ) জন্মের খবর দেন। এই খবর পেয়ে তিনি বিনিময়ে একটি গোলাম দান করলেন।

হুজুরের (সাঃ) ওফাতের পর একবার হযরত ইমাম হাসান (রাঃ) এবং হযরত আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস (রাঃ) হযরত সালমার (রাঃ) নিকট গেলেন এবং বললেন, আজ আমাদেরকে সেই খাবার তৈরী করে খাওয়ান যা রাসূলে করিমের (সাঃ) পছন্দনীয় ছিল। তিনি বললেন, তা কি তোমাদের পছন্দ হবে? তাঁরা

www.bjilibrary.com

পীড়াপীড়ি করলেন। ফলে হযরত সালমা (রাঃ) জবের আটা পিষে হাঁড়িতে চড়ালেন এবং তাতে কদুর তেল, জিরা এবং গুল মরিচ ফেলে দিলেন। রান্না হয়ে গেলে তা তাঁদের সামনে এনে দিলেন এবং বললেন যে, এটা হুজুরের (সাঃ) প্রিয় খাবার ছিল।

হযরত সালমার (রাঃ) ওফাতের বছর এবং তাঁর সম্পর্কে আর বিস্তারিত কিছু জানা যায়নি।

হযরত ফিদদাহ (রাঃ)

সারওয়ারে আলমের (সাঃ) কলিজার টুকরা সাইয়েদাতুন নিসা হযরত ফাতিমাতুজ জোহরার দাসী ছিলেন। তিনি হযরত ফাতিমার (রাঃ) জীবনের কোন পর্যায়ে দাসীগিরির কাজে এসেছিলেন, চরিতকাররা তার ব্যাখ্যা দেননি। যা হোক, বিভিন্ন রাওয়ায়েত থেকে এটা প্রতিষ্ঠিত যে, জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি নবীর (সাঃ) বংশের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত ছিলেন। তাঁর সাহাবী হওয়া সম্পর্কে সকলেই একমত। কতিপয় রাওয়ায়েতে আছে যে, তাঁর আসল নাম ছিল মাইমুনা। প্রিয় নবী (সাঃ) তাঁর নাম রাখেন ফিদদাহ। কতিপয় ঐতিহাসিক তাঁর বাড়ী হাবশা বলে বর্ণনা করেছেন এবং কয়েকটি রাওয়ায়েতে তাঁর নাম ''ফিদদাতুন নওবিয়া'' বলে উল্লেখ রয়েছে।

হযরত ফিদদাহ (রাঃ) শুধুমাত্র হযরত ফাতিমার (রাঃ) ঘরের কাজেই সাহায্য করতেন না বরং তাঁর প্রতিটি সুখ-দুঃখে অংশ নিতেন। জ্ঞানের দরজা হযরত আলী (রাঃ) এবং সাইয়েদাতুন নিসার (রাঃ) খিদমতে থাকার বদৌলতে তাঁর জ্ঞান এবং ফজিলতও অনেক উঁচু হয়ে গিয়েছিল। হযরত ফাতিমার (রাঃ) সঙ্গে তাঁর গভীর ভালোবাসার সম্পর্ক ছিল। আল্লামা তাবারী (রঃ) বর্ণনা করেছেন, হযরত ফাতিমাতুজ জোহরার ওফাতের পর তাঁর গোসল দানের সময় হযরত ফিদদাও (রাঃ) উপস্থিত ছিলেন।

যখন সাইয়েদার জানাযা তৈরী হলো তখন হযরত আলী (রাঃ) পরিবারের লোকদেরকে এইভাবে ডাকলেনঃ ''হে উম্মে কুলছুম, হে যয়নব, হে ফিদদাহ, হে হাসান, হে হোসাইন এসো এবং মাকে শেষবারের মতো দেখে নাও। সে এখন

www.bjilibrary.com

তোমাদের থেকে বিচ্ছিন্ন হচ্ছে। আবার জান্নাতেই মুলাকাত হবে।" হযরত আলীর (রাঃ) নিকট হযরত ফিদদাহও (রাঃ) তাঁর পরিবারেরই একজন সদস্য ছিলেন।

সাইয়েদাতুন নিসার (রাঃ) ওফাতের পর হযরত ফিদদা (রাঃ) সাইয়েদা যয়নব (রাঃ) বিনতে আলীর (রাঃ) দাসী হন এবং কারবালার মুসিবতের সময় তাঁর সঙ্গে ছিলেন। এক বর্ণনায় আছে যে, সাইয়েদাতুন নিসার মৃত্যুর পর হযরত আলী (রাঃ) হযরত ফিদদার (রাঃ) বিয়ে আবু ছা'লাবাহ হাবসীর সঙ্গে দিয়েছিলেন এবং সেখানে তাঁর একটি পুত্র জন্ম গ্রহণ করে। আবু ছা'লাবাহর ইন্তেকালের পর আবু সুলাইক গাতফানীর সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়। কতিপয় ঐতিহাসিক লিখেছেন, হযরত ফিদদার (রাঃ) একটি কন্যা (মিসকাহ) এবং পাঁচটি পুত্র ছিল। হযরত ফিদদার (রাঃ) ওফাতের সাল সম্পর্কে কোন বিশুদ্ধ রাওয়ায়েত পাওয়া যায় না। এসত্ত্বেও কেউ কেউ বলেছেন যে, তিনি হযরত যয়নব (রাঃ) বিনতে আলীর (রাঃ) ইন্তেকালের কয়েক বছর পর মারা যান এবং তাঁর কবর সিরিয়ায় হযরত যয়নবের কবরের সঙ্গে রয়েছে।

হযরত আতিকাহ (রাঃ) বিনতে যায়েদ

কোরেশের আদি বংশোদ্ভূত ছিলেন। নসবনামা হলোঃ আতিকাহ (রাঃ) বিনতে যায়েদ বিন আমর বিন নুফায়েল বিন আব্দুল উজ্জা বিন রিয়াহ বিন আব্দুল্লাহ বিন কুরজ বিন যাররাহ বিন আদি বিন কা'ব লুব্বী।

জালিলুল কদর সাহাবী হযরত সাঈদ (রাঃ) বিন যায়েদ (আশারায়ে মুবাশশারাহ) তাঁর সহোদর এবং হযরত ওমর (রাঃ) বিন খাত্তাব চাচাতো ভাই ছিলেন। মশহুর মহিলা সাহাবী হযরত ফাতিমা (রাঃ) বিনতে খাত্তাব ছিলেন তাঁর চাচাতো বোন এবং ভাবী।

হযরত আতিকাহর (রাঃ) পিতা যায়েদ জাহেলী যুগেই তাওহীদপন্থী ছিলেন। তাঁর ব্যাপারে হুজুর (সাঃ) বলেছিলেন, কিয়ামতের দিন তিনি একাকী এক উম্মতের মর্যাদায় উত্থিত হবেন। হুজুরের (সাঃ) নবুয়ত প্রাপ্তির কয়েক বছর আগে যায়েদকে কোন শত্রু হত্যা করে ফেলে এবং আতিকাহ এতিম হয়ে পড়েন। বয়োপ্রাপ্তা হওয়ার

www.bjilibrary.com

পর তিনি ইসলাম গ্রহণের সৌভাগ্য অর্জন করেন এবং সাহাবীও হন। হযরত আবুবকরের (রাঃ) পুত্র হযরত আব্দুল্লাহর (রাঃ) সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়। তিনি অত্যন্ত সুন্দরী, জ্ঞানী ও বিদুষী মহিলা ছিলেন। হযরত আব্দুল্লাহ (রাঃ) তাঁকে এতো ভালোবাসতেন যে, তাঁর প্রেমে মশগুল হয়ে জিহাদ ত্যাগ করেছিলেন। তিনিও স্বামীর জন্য জীবন দিতে প্রস্তুত ছিলেন এবং সব সময় স্বামীর আরামকে নিজের আরামের ওপর অগ্রাধিকার দিতেন। বস্তুত তিনি হযরত আব্দুল্লাহকে (রাঃ) জিহাদে যাওয়ার জন্য বাধ্য করেননি। এজন্য হযরত আবুবকর সিদ্দিক (রাঃ) হযরত আব্দুল্লাহকে আতিকাহকে (রাঃ) তালাক দেয়ার নির্দেশ দিলেন। প্রথমে তো তিনি বেশ কিছুদিন টালবাহানা করলেন কিন্তু যখন বুজর্গ পিতা এই প্রশ্নে পীড়াপীড়ি করলেন তখন তিনি হযরত আতিকাহকে (রাঃ) এক তালাক দিয়ে দিলেন। কিন্তু স্ত্রীর বিচ্ছিন্নতায় তিনি ক্লান্ত হয়ে পড়লেন এবং একটি কবিতা রচনা করে ফেললেন।

হযরত আবুবকর (রাঃ) অত্যন্ত নরম অন্তরের মানুষ ছিলেন। তাঁর কান পর্যন্ত এই কবিতা গেল। এতে তিনি হযরত আব্দুল্লাহকে আতিকাহকে (রাঃ) ফিরিয়ে নিতে বললেন। এরপর তিনি প্রত্যেক যুদ্ধেই শরীক হতে লাগলেন। তায়েফ অবরোধে একদিন তিনি শত্রুর পক্ষ থেকে আসা এক তীরের আঘাতে আহত হলেন। যদিও সে সময় জখম সেরে গেল। কিন্তু তীরের বিষ ভেতরে ভেতরে ক্রিয়া করছিল। রাসূলে করিমের (সাঃ) ওফাতের কিছু দিন পর (১১ হিজরীর শওয়াল মাসে) সেই ক্ষত পুনরায় দেখা দিল এবং সেই ব্যথায় হযরত আব্দুল্লাহ বিন আবি বকর (রাঃ) ওফাত পান। তাঁর ওফাতে হযরত আতিকাহ (রাঃ) শোকাভিভূত হয়ে পড়লেন। মরহুম স্বামীর মত তিনিও কাব্যে পারদর্শিতা রাখতেন। এসময় তিনি একটি দরদভরা মরসিয়া রচনা করেন।

কিছুদিন পর হযরত ওমর ফারুক (রাঃ) হযরত আতিকাহকে (রাঃ) নিকাহ করেন। ওয়ালিমার দাওয়াতে হযরত আলী কাররামাল্লাহু ওয়াজহাহুও শরীক ছিলেন। তিনি হযরত আতিকাহকে (রাঃ) পূর্বের মরসিয়ার প্রথম পংক্তি স্মরণ করালেন। তাতে তিনি কাঁদতে লাগলেন। এ সত্ত্বেও ওমর ফারুকের (রাঃ) সঙ্গে তাঁর গভীর ভালোবাসা ছিল। হযরত ওমর ফারুক (রাঃ) শাহাদাত লাভ করলে তখনো তিনি এক শোকপূর্ণ মরসিয়া রচনা করেন।

হযরত ওমর ফারুকের (রাঃ) শাহাদাতের পর হযরত আতিকাহ'র (রাঃ) নিকাহ হয়েছিল হযরত যোবায়ের (রাঃ) বিনুল আওয়ামের সঙ্গে। উষ্ট্রের যুদ্ধে তিনি ইবনে জারমুজের হাতে শাহাদাত প্রাপ্ত হলে হযরত আতিকাহ (রাঃ) শোকে দুঃখে দুর্বল হয়ে পড়লেন এবং তাঁর মুখ দিয়ে দরদ ভরা মরসিয়া উচ্চারিত হলো।

www.bjilibrary.com

হযরত সালমা (রাঃ) বিনতে উমায়েস

রাসূলের চাচা হযরত হামযার (রাঃ) স্ত্রী ছিলেন এবং খাছয়াম গোত্রের সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিলেন। নসবনামা হলোঃ সালমা বিনতে উমায়েস বিন সা'দ বিন হারিছ বিন তাইম বিন কা'ব বিন মালিক বিন কাহাফাহ বিন আমের বিন রবিয়াহ বিন আমের বিন মাবিয়া বিন যায়েদ বিন মালেক বিন বাশার বিন ওয়াহাব আল্লাহ বিন শাহরান বিন আফরাস বিন খালফ বিন আকবাল (খাছয়াম)।

মাতার নাম হলো হিন্দ (খাওলাহ) বিনতে আওফ। তিনি কিনানাহ গোত্রভুক্ত ছিলেন।

জালিলুল কদর সাহাবিয়াহ হযরত আসমা (রাঃ) বিনতে উমায়েস হযরত সালমার (রাঃ) সহোদরা ছিলেন। উম্মুল মুমিনিন হযরত মাইমুনা (রাঃ) বিনতে হারিছ এবং হযরত উম্মুল ফজল (রাঃ) (রাসূলের চাচা হযরত আব্বাসের স্ত্রী) তাঁর বৈপিত্রীয়বোনছিলেন।

হযরত উমামাহ (রাঃ) বিনতে হামযাহ (রাঃ) হযরত সালমার (রাঃ) গর্ভেই জন্মগ্রহণ করেন। হযরত হামযার (রাঃ) শাহাদাতের পর হযরত সালমার (রাঃ) নিকাহ হয়েছিল শাদ্দাদ বিন উসামাতুল হাদির সঙ্গে। তাঁর ঔরসে দুই পুত্র আব্দুল্লাহ এবং আবদুর রহমান জন্মগ্রহণ করেন।

হযরত উমামাহ (রাঃ) বিনতে হামযাহ (রাঃ)

রাসূলের (সাঃ) চাচা সাইয়েদুশ শুহাদা হযরত হামযা (রাঃ) বিন আব্দুল মুত্তালিবের কন্যা ছিলেন। তিনি সালমা (রাঃ) বিনতে উমায়েসের গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। হযরত হামযার (রাঃ) শাহাদাতের সময় তিনি খুবই ছোট ছিলেন।

www.bjilibrary.com

সহিহ্ বুখারীতে তাঁর সম্পর্কে একটি ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে। ঘটনায় বলা হয়, হুজুর (সাঃ) ৭ম হিজরীতে কাজা ওমরাহ্ পালনের জন্য মক্কা মুয়াজ্জমা তাশরীফ নেন। হুদাইবিয়ার সন্ধির শর্ত মুতাবেক তিন দিন অবস্থানের পর তিনি মক্কা থেকে রওয়ানা দিতে লাগলেন। এসময় উমামাহ্ (রাঃ) বিনতে হামযা (রাঃ) ''ইয়া আম'' ''ইয়া আম'' অর্থাৎ হে চাচা, হে চাচা বলে ডাকতে ডাকতে হুজুরের (সাঃ) দিকে দৌড়ে গেলেন। (অন্য এক রাওয়ায়েতে আছে সে সময় তিনি হে ভাই, হে ভাই বলছিলেন) বাস্তবত হুজুর (সাঃ) হযরত হামযার (রাঃ) দুধ ও খালাতো ভাই এবং ভাতিজাও ছিলেন। এইদিক থেকে তিনি উমামাহর (রাঃ) চাচাও হতেন। আবার ভাইও হতেন। হযরত আলী (রাঃ) তাঁকে কোলে তুলে নিলেন এবং নিজের সঙ্গে নিয়ে গিয়ে হযরত ফাতিমাতুজ জোহরার (রাঃ) নিকট দিয়ে বললেন, এ তোমার চাচার মেয়ে। হযরত আলীর (রাঃ) ভাই হযরত জাফর (রাঃ) বিন আবি তালিব এবং হিব্বুন্নবী হযরত যায়েদ (রাঃ) বিন হারিছাহ্ উমামাহকে নিজেদের লালন পালনে নেয়ার জন্য হুজুরের (সাঃ) নিকট পৃথক দাবী পেশ করেন। হযরত আলী (রাঃ) বললেন, উমামাহ্ আমার চাচার মেয়ে। এজন্য আমিই তার হকদার। হযরত জাফর (রাঃ) এই বলে নিজের অধিকার প্রকাশ করলেন যে, সে আমার চাচার মেয়ে এবং আমার স্ত্রী আসমা (রাঃ) বিনতে উমায়েসের আপন ভাগিনী। হযরত যায়েদ (রাঃ) বিন হারেছা বললেন, সে আমার দ্বীনী ভাই হযরত হামযার (রাঃ) কন্যা। বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সাঃ) এই ঝগড়ায় হযরত জাফরের (রাঃ) পক্ষে রায় দিলেন। কেননা তাঁর স্ত্রী আসমা বিনতে উমায়েস হযরত উমামাহর (রাঃ) আপন খালা ছিলেন এবং খালা মার বরাবর হয়ে থাকে।

হযরত উমামা (রাঃ) বয়োপ্রাপ্ত হলে হযরত সালমাহ্ অথবা অন্য এক রাওয়ায়েত অনুযায়ী ওমর (রাঃ) বিন আবি সালমাহর (রাঃ) সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়। হযরত সালমাহ্ (রাঃ) উম্মুল মুমিনিন হযরত উম্মে সালমার (রাঃ) পুত্র ছিলেন।

এরচেয়ে বেশী হযরত উমামাহ্ (রাঃ) বিনতে হামযা সম্পর্কে জানা যায়নি।

www.bjilibrary.com

হযরত উম্মুল ফজল (রাঃ) বিনতে হামযাহ (রাঃ)

কতিপয় ঐতিহাসিক হযরত উমামা (রাঃ) ছাড়া সাইয়েদুশ শুহাদা হযরত হামযার (রাঃ) আরো একটি কন্যার কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি হলেন উম্মুল ফজল। তাঁরা বলেছেন, তিনিও সাহাবী ছিলেন। আব্দুল্লাহ বিন শাদ্দাদ (রাঃ) তাঁর থেকে বর্ণনা করেছেন যে, আমাদের একটি আযাদকৃত গোলাম মরে গিয়েছিল। তার একটি কন্যা এবং একটি বোন ছিল। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) উভয়কে আধা আধা ওয়ারেশী দিয়েছিলেন।

হযরত উমরাহ (রাঃ) বিনতে হারিছ

খাযায়াহ গোত্রের বনু মুসতালিক বংশোদ্ভূত ছিলেন। নসবনামা হলোঃ উমরাহ বিনতে হারিছ বিন আবি জিরার বিন হাবিব বিন আয়েজ বিন মালিক বিন খোজায়মাহ (মুসতালিক)।

উম্মুল মুমিনিন হযরত জুয়াইরিয়া (রাঃ) বিনতে হারিছের বোন ছিলেন। তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন এবং সাহাবী হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেন। হাফিজ ইবনে আব্দুল বার (রঃ) আল ইসতিয়াব-এ লিখেছেন যে, হজরত উমরাহ (রাঃ) বিনতে হারিছ আদ দুনিয়া খাজরাতুন হুলওয়াতুন (দুনিয়া সবুজ মনে হয় এবং মিষ্টি লাগে) হাদীসটি বর্ণনা করেন। তাঁর সম্পর্কে আর বেশী কিছু জানা যায়নি।

www.bjilibrary.com

হযরত ফাতিমা (রাঃ) বিনতে ওয়ালিদ

কোরেশের বনু আবদি শামস বংশের ছিলেন। নসবনামা হলোঃ ফাতিমা (রাঃ) বিনতে ওয়ালিদ বিন উত্‌বা বিন রবিয়াহ্ বিন আবদি শামস বিন আবদি মান্নাফ বিনকুশাই।

হযরত ফাতিমার (রাঃ) দাদা উত্‌বা বিন রবিয়াহ কোরেশের নামকরা সরদার এবং পিতাও কোরেশের বড় বাহাদুর হিসেবে স্বীকৃত ছিলেন। দাদা এবং পিতা উভয়েই কুফরীর ভুল পথে পরিচালিত হন এবং বদরের যুদ্ধে মুসলমানদের হাতে নিহত হন। অবশ্য চাচা হযরত আবু হোজায়ফা (রাঃ) বিন উত্‌বাহ্ এবং স্বয়ং হযরত ফাতিমাকে (রাঃ) আল্লাহ পাক হক কবুলের তাওফিক দেন এবং উভয়েই সাহাবী হওয়ার গৌরব লাভ করেন। হযরত আবু হোজায়ফা ভাগ্যবতী ভাতিজার বিয়ে দিয়েছিলেন নিজের মুখে ডাকা পুত্র এবং আযাদকৃত গোলাম হযরত সালেমের (রাঃ) সঙ্গে। হযরত ফাতিমা (রাঃ) হিজরতের সৌভাগ্যও লাভ করেছিলেন। তিনি অত্যন্ত মুখলিস সাহাবী ছিলেন।

হযরত যয়নব (রাঃ) বিনতে হানজালীহ্

সকল ঐতিহাসিকই তাঁকে হুজুরের (সাঃ) সাহাবী হিসেবে পরিগণিত করেছেন এবং বলেছেন যে, প্রিয় নবী (সাঃ) তাঁর বিয়ে দিয়েছিলেন হযরত উসামাহ (রাঃ) বিন যায়েদের (রাঃ) সঙ্গে। কিন্তু বনিবনা না হওয়ায় উভয়ে বিচ্ছিন্ন হয়ে যান। এরপর তাঁর বিয়ে হয় মশহুর সাহাবী হযরত নঈমুল খাম আদবীর (রাঃ) সঙ্গে। তাঁর ঔরসে জন্ম নিয়েছিলেন ইবরাহিম নামক এক পুত্র।

কাজী মুহাম্মদ সোলায়মান সালমান মানসুরপুরী (রঃ) ''রাহমাতুললিল আলামীন''-এর তৃতীয় খন্ডে হযরত যয়নবের (রাঃ) খান্দান সম্পর্কে লিখেছেন যে,

www.bjilibrary.com

যয়নব (রঃ) সেই বড় খান্দানের মহিলা ছিলেন যে শাহজাদা ইমরুল কায়েছ তাঁর দাদারঅনুরক্তছিলেন।

হযরত সাহলাহ (রাঃ) বিনতে আছেম কুজায়িয়াহ

বাল্পি কবিলাভূক্ত ছিলেন। এটা ছিল কুজায়ার একটি শাখা। কুজায়া সম্পর্কে আল্লামা ইবনে সা'দ লিখেছেন যে, ওয়াহুম মিনাল আনসার অর্থাৎ তাঁরা আনসার ছিলেন। প্রিয় নবীর (সাঃ) হিজরতের কিছুদিন আগে অথবা পরে ইসলাম গ্রহণ এবং সাহাবিয়াতের সৌভাগ্য অর্জন করেন। জালিলুল কদর সাহাবী হযরত আব্দুর রহমান (রাঃ) বিন আওফের সঙ্গে (আশারায়ে মুবাশশারাহ) বিয়ে হয়।

সহিহ বুখারীতে কিতাবুন নিকাহতে উল্লেখ রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) হযরত আব্দুর রহমানের (রাঃ) ওপর বিয়ের আলামত দেখে জিজ্ঞেস করলেন, ''বিয়ে কি জিনিস?'' তিনি আরজ করলেন,''জ্বী হাঁ। ইয়া রাসূলাল্লাহ!''

হুজুর (সাঃ) বললেন, ''কার সঙ্গে?'' হযরত আবদুর রহমান বললেন, ''এক আনসারিয়ার সঙ্গে।'' হুজুর (সাঃ) জিজ্ঞেস করলেন, ''মহরানা কি?'' আরজ করলেন, ''স্বর্ণের একটি গোছা।'' (অথবা খেজুরের গোছার সমান স্বর্ণ)। হুজুর (সাঃ) বললেন, ''আল্লাহ তোমাদের জন্য এই শাদী মুবারক করুন। ওয়ালিমা কর, একটি বকরীও যদিহয়।''

হাদিসের ব্যাখ্যাকারীরা লিখেছেন, যে আনসারীয়ার সঙ্গে হযরত আব্দুর রহমানের (রাঃ) বিয়ে হয়েছিল তিনি ছিলেন হযরত সাহলাহ বিনতে আছেম। তাঁর সম্পর্কে বিস্তারিত আর জানা যায়নি।

www.bjilibrary.com

হযরত ছাবিতাহ (রাঃ) বিনতে ইয়ায়ার আনসারিয়া

আনসারের কোন গোত্রভুক্ত ছিলেন। মক্কার রইস উত্বাহ বিন রবিয়ার পুত্র হযরত আবু হোজায়ফার (রাঃ) সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়েছিল। তিনি অত্যন্ত মর্যাদাবান সাহাবী ছিলেন। জালিলুল কদর সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ সালেম (রাঃ) প্রথমে হযরত ছাবিতারই (রাঃ) গোলাম ছিলেন। তিনি তাঁকে হক পথে স্বাধীন করে দেন। তারপর আবু হোজায়ফা (রাঃ) তাঁকে মুখে ডাকা পুত্র বানিয়ে নেন। বস্তুত তিনি সালেম (রাঃ) বিন হোজায়ফা নামে খ্যাত হন। যখন এই নির্দেশ নাযিল হলো যে, লোকদেরকে প্রকৃত বাপের সম্পর্ক ধরে ডাকতে হবে তখন লোকজন তাঁকে সালেম (রাঃ) মওলায়ে আবু হোজায়ফা (রাঃ) নামে ডাকতে শুরু করলো। হযরত সালেমের (রাঃ) কোন সন্তান ছিল না। এজন্য শাহাদাতের আগে (ইয়ামামার যুদ্ধ) তিনি ওসিয়ত করেছিলেন যে, তাঁর পরিত্যক্ত ধন-সম্পদের মধ্যেকার এক তৃতীয়াংশ বিভিন্ন ইসলামী প্রয়োজন ও গোলাম আযাদের কাজে এবং এক তৃতীয়াংশ তাঁর সাবেক মালিকদেরকে দিতে হবে। খলিফাতুর রাসূল হযরত আবুবকর সিদ্দিক (রাঃ) ওসিয়ত অনুযায়ী তাঁর পরিত্যক্ত সম্পত্তির এক তৃতীয়াংশ হযরত ছাবিতার (রাঃ) নিকট প্রেরণ করেন। তিনি তা এই বলে ফেরত পাঠান যে, সালেমকে (রাঃ) কোন কিছুর বিনিময়ের জন্য নয় বরং শুধুমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য আযাদ করেছিলেন। এই রাওয়ায়েত থেকে তাঁর খুলুসিয়াত ও মুখাপেক্ষীহীনতার কথা যেমন প্রকাশ পায় তেমন এটাও প্রমাণিত হয় যে, তিনি ইয়ামামার যুদ্ধের পরেও বেঁচে ছিলেন।

হযরত উম্মে আওস আনসারিয়াহ (রাঃ)

আনসারের কোন কবিলাভুক্ত ছিলেন। কেউ কেউ তাঁকে বাহযিয়া বলে অভিহিত করেছেন। হিজরতের পর ইসলাম গ্রহণ করেন এবং সাহাবীয়াহ হওয়ার

www.bjilibrary.com

মর্যাদা পান। ইসলাম গ্রহণের পর তিনি একটি কূপীতে ঘি ভর্তি করে হুজুরের (সাঃ) খিদমতে হাদিয়া হিসেবে পাঠান। হুজুর (সাঃ) ঘি গ্রহণ করেন এবং তাঁর বরকতের জন্য দোয়া করেন। অতঃপর তিনি সেই কূপী হযরত উম্মে আওসকে (রাঃ) ফেরত পাঠিয়ে দেন। তিনি এটা দেখে পেরেশান হয়ে গেলেন যে, কূপী যথারীতি ঘি ভর্তি রয়েছে। কাঁদতে কাঁদতে হুজুরের (সাঃ) খিদমতে হাজির হয়ে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি আমার মত অধমের হাদিয়া কবুল করেননি।

হুজুর (সাঃ) তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, আমি তোমার হাদিয়া কবুল করেছি। এখন এই কূপীতে ঘি রয়েছে তা তুমি ব্যবহার কর। এই ঘটনার পর হযরত উম্মে আওস (রাঃ) বছরের পর বছর ধরে সেই কূপীর ঘি ব্যবহার করেন এবং তা আর ফুরায়নি। কতিপয় রাওয়ায়েত থেকে জানা যায় যে, হযরত উম্মে আওস (রাঃ) হযরত আলীর (রাঃ) শাসনামল পর্যন্ত জীবিত ছিলেন এবং সেই কূপী থেকে তাঁর ঘি ব্যবহার অব্যাহত ছিল।

হযরত উম্মে খাল্লাদ (রাঃ) আনসারিয়াহ

আনসারের কোন কবিলার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত ছিলেন। সুয়ায়েদ বিন ছা'লাবার সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়। তাঁর ঔরসে জন্মগ্রহণ করেন পুত্র খাল্লাদ (রাঃ)। খাল্লাদ (রাঃ) ছিলেন অত্যন্ত মুখলিস সাহাবী। তিনি বনু কোরায়জার যুদ্ধে প্রিয় নবীর (সাঃ) সঙ্গী ছিলেন। একজন ইহুদী মহিলা নিজের গৃহের ছাদ থেকে তাঁর ওপর ভারী পাথর ফেলে দেয়। এই পাথরের আঘাতে তিনি শহীদ হন।

তাঁর মা উড়ো-ফুরো এই খবর পেলেন। এই ব্যাপারে তথ্য জানার জন্য তিনি প্রিয় নবীর (সাঃ) খিদমতে হাজির হলেন। জ্ঞান লোপ পাওয়ার মত এই ঘটনা সত্ত্বেও তাঁর মুখে নিকাব ছিল। নবীর (সাঃ) দরবারে যাঁরা উপস্থিত ছিলেন তাঁদের মধ্যে একজন বললেনঃ "বিবি, তোমার পুত্র নিহত হয়েছে। আশ্চর্য, এই মুসিবতের সময়ও তুমি চেহারার ওপর নিকাব দিয়ে রেখেছ!"

উম্মে খাল্লাদ (রাঃ) অত্যন্ত প্রশান্তির সঙ্গে বললেন, "যদি আমি আমার পুত্রকে হারিয়ে থাকি, তাই বলে কি এখন আমি আমার হায়া -শরমও খুয়াব।"

www.bjilibrary.com

মুসনাদে আবু দাউদে আছে, এ সময় হুজুর (সাঃ) বললেন, "তোমার পুত্র দ্বিগুণ সওয়াব পাবে। কেননা, আহলি কিতাব তাকে হত্যা করেছে।"

হযরত উম্মে খাল্লাদ (রাঃ) সম্পর্কিত বিস্তারিত তথ্য কোন কিতাবে পাওয়া যায়না।

হযরত উম্মুল খায়ের (রাঃ) বিনতে সাখার

নাম সালমা এবং কুনিয়ত হলো উম্মুল খায়ের। কোরেশের বনু তাইম বংশোদ্ভূত ছিলেন। নসবনামা হলোঃ উম্মুল খায়ের সালমা (রাঃ) বিনতে সাখার বিন আমের বিন কা'ব বিন সা'দ বিন তাইম বিন মাররাহ।

চাচাতো ভাই আবু কাহাফার (রাঃ) সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়েছিল। তাঁর ঔরসে ইসলামী মিল্লাতের সেই গর্বের ব্যক্তিত্ব জন্মগ্রহণ করেন, যাঁকে সমগ্র বিশ্ব আফজালুল উম্মাত সাইয়েদানা হযরত আবুবকর সিদ্দিক (রাঃ) হিসেবে জানে।

সিদ্দিকে আকবারের (রাঃ) ইসলাম গ্রহণের পর হযরত উম্মুল খায়ের (রাঃ) কিছুদিন নিজের বাপ-দাদার ধর্মের ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। এদিকে ভাগ্যবান পুত্র নিজের জীবন হকের তাবলীগের জন্য ওয়াকফ করে দিয়েছিলেন। তাঁর কার্যতৎপরতা কাফেরদের চক্ষুশূল হয়ে গেল। একদিন হযরত আবুবকর সিদ্দিক (রাঃ) [illegible] আলমের (সাঃ) সঙ্গে কাবা শরীফে তাশরীফ আনেন এবং সেখানে উপস্থিত মুশরিকদেরকে হকের দাওয়াত দেন। তাঁর কথা শুনে মুশরিকরা উত্তেজিত হয়ে ওঠে। তারা হুজুরকে (সাঃ) পিছনে ঠেলে দিয়ে হযরত আবুবকর সিদ্দিকের (রাঃ) ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। তারা তাঁর ওপর এমন নির্যাতন চালায় যে, তিনি বেহুঁশ হয়ে পড়েন। ইত্যবসরে বনু তাইমের কিছু লোক সেখানে পৌছে। তারা উত্তেজিত মুশরিকদেরকে হটিয়ে দিয়ে হযরত আবুবকর সিদ্দিককে (রাঃ) বাড়ী নিয়ে যায়। বাড়ী পৌছে হযরত আবুবকর সিদ্দিকের (রাঃ) কিছুটা হুঁশ ফিরলে সর্বপ্রথম তাঁর মুখ দিয়ে এই বাক্য বের হয়: "রাসূলুল্লাহর (সাঃ) কি অবস্থা?"

বাড়ীর যারা তখনো ইসলাম গ্রহণ করেনি তারা তাঁকে গালি দিতে লাগলো। তারা বললো, এই অবস্থাতেও আপনি আপনার সাথীকে ভুলেননি। কিন্তু হযরত

www.bjilibrary.com

আবুবকর সিদ্দিক (রাঃ) একই কথা জিজ্ঞেস করতে লাগলেন, "রাসূলের (সাঃ) কি অবস্থা? আমাকে তাঁর খবর এনে দাও।"

এক রাওয়ায়েত অনুযায়ী রাতে হুজুর (সাঃ) স্বয়ং হযরত আবুবকর সিদ্দিকের (রাঃ) বাড়ী তাশরিফ আনেন। তাঁকে দেখে তিনি বাকরুদ্ধ হয়ে পড়েন এবং ভালোবাসার আধিক্যে তাঁর কপালে চুম্বন দেন। এ সময় সিদ্দিকে আকবার (রাঃ) অত্যন্ত মিষ্টিস্বরে আরজ করেনঃ " ইয়া রাসূলাল্লাহ! ইনি আমার মা। তাঁর জন্য দোয়া করুন। যাতে আল্লাহ তাঁকে ইসলামের নিয়ামতে পূর্ণ করেন এবং দোজখের আজাব থেকে মাহফুজ রাখেন।"

হুজুর (সাঃ) হযরত উম্মুল খায়েরের (রাঃ) জন্য দোয়া করলেন। আল্লাহ তৎক্ষণাৎ এই দোয়া কবুল করলেন এবং তিনি সেই সময়ই ইসলাম গ্রহণ করেন।

কতিপয় রাওয়ায়েতে আছে, রাতে হযরত উম্মে জামিল ফাতিমা (রাঃ) বিনতে খাত্তাব হযরত আবুবকর সিদ্দিকের (রাঃ) খবর নেয়ার জন্য এলেন। সিদ্দিকে আকবার (রাঃ) তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন যে, হুজুর (সাঃ) এখন কোথায়? তিনি বললেন, রাসুলুল্লাহ (সাঃ) এখন আরকাম গৃহে অবস্থান করছেন। সিদ্দিকে আকবার (রাঃ) তাঁর নিকট আবেদন করলেন যে, তাঁকে হুজুরের (সাঃ) খিদমতে নিয়ে যাওয়া হোক।

রাতে অন্যান্য মানুষ চলে গেলে হযরত উম্মুল খায়ের এবং হযরত উম্মে জামিল (রাঃ) সিদ্দিকে আকবারকে (রাঃ) ধরে আরকাম গৃহে হুজুরের (সাঃ) খিদমতে নিয়ে গেলেন। তিনি হযরত আবুবকর সিদ্দিকের (রাঃ) কপালে চুমু দিলেন এবং তাঁর জন্য দোয়া-খায়ের করলেন। এই সময়ই তিনি হুজুরের (সাঃ) নিকট নিজের মায়ের জন্য দোয়ার আবেদন জানালেন। হুজুর (সাঃ) তৎক্ষণাৎ দোয়ার হাত সম্প্রসারিত করলেন এবং হযরত উম্মুল খায়ের (রাঃ) সেই সময়ই ইসলাম গ্রহণ করলেন। এই ঘটনা নবুয়ত প্রাপ্তির চতুর্থ অথবা ৫ম বছরের। এজন্য ইতিহাসবিদরা হযরত উম্মুল খায়েরকে (রাঃ) ইসলামের প্রাচীন সাহাবীদের মধ্যে গণ্য করে থাকেন।

হযরত উম্মুল খায়ের (রাঃ) দীর্ঘজীবী হয়েছিলেন। ইবনে কাছিরের (রঃ) বর্ণনা অনুযায়ী হযরত আবু কাহাফার (রাঃ) ওফাতের কিছুদিন পূর্বে তিনি ইন্তেকাল করেছিলেন। তিবরানী হাইছাম বিন আদি থেকে রাওয়ায়েত করেছেন যে, ১৩ হিজরীতে হযরত আবুবকর সিদ্দিক (রাঃ) ইন্তেকাল করেন। এই সময় তাঁর মাতা-পিতা হযরত আবু কাহাফা (রাঃ) এবং হযরত উম্মুল খায়ের (রাঃ) উভয়েই জীবিত

www.bjilibrary.com

ছিলেন। দু'জনই তাঁর মিরাছের অংশ লাভ করেন। কিয়াস হলো যে, উভয়েই হযরত ওমর ফারুকের (রাঃ) শাসনামলে ইন্তেকাল করেন।

হযরত ছাওবিয়াহ (রাঃ)

হযরত ছাওবিয়াহ (রাঃ) বিশ্ব নবীর (সাঃ) চাচা (ইসলামের দুশমন) আবু লাহাবের দাসী ছিলেন। কতিপয় রাওয়ায়েতে আছে, হযরত ছাওবিয়াহ (রাঃ) হুজুরের (সাঃ) জন্মের সুসংবাদ আবু লাহাবকে শুনিয়েছিলেন। এতে সে তাঁকে আযাদ করে দেয়। সহিহ বুখারীতে আছে, আবু লাহাবের মৃত্যুর পর হযরত আব্বাস (রাঃ) তাকে স্বপ্নে দেখলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন, জাহান্নামে তোমার অবস্থা কি? সে বললো, "আমি মুহাম্মাদের (সাঃ) জন্মের সুখবর শুনে ছাওবিয়াহকে স্বাধীন করে দিয়েছিলাম। তার বিনিময়ে প্রতি সোমবার আমার আযাব হাল্কা হয়।" কিন্তু কিছু এমন রাওয়ায়েতও আছে যাতে স্পষ্ট হয় যে, আবু লাহাব হযরত ছাওবিয়াহকে (রাঃ) সেই সময় স্বাধীন করে যখন হযরত খাদিজাতুল কোবরার (রাঃ) সঙ্গে হুজুরের (সাঃ) বিয়ে সুসম্পন্ন হয়। একবার হযরত খাদিজা (রাঃ) ছাওবিয়াহকে (রাঃ) আবু লাহাবের নিকট থেকে ক্রয় করে স্বাধীন করে দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তাতে সে অস্বীকৃতি জানায়। পরে কি খেয়ালে যেন সে নিজেই আযাদ করে দেয়।

হযরত ছাওবিয়াহর (রাঃ) মহান সৌভাগ্য হয়েছিল যে, জন্মের পর হুজুর (সাঃ) কিছুদিন পর্যন্ত তাঁর দুধ পান করেছিলেন। বুখারী ও মুসলিম শরীফে আছে, হযরত আবু সালমাহ (রাঃ) বিন আব্দুল আসাদও (হুজুরের ফুফাতো ভাই এবং উম্মুল মুমিনিন হযরত উম্মে সালমার (রাঃ) প্রথম স্বামী) তাঁর দুধ পান করেছিলেন। ইবনে সাদ (রঃ), ইবনে কাছির (রঃ) এবং সোহেল (রঃ) বর্ণনা করেছেন, রাসূলের চাচা হযরত হামযা (রাঃ) এবং হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) বিন জাহাশও (হুজুরের ফুফাতো ভাই) হযরত ছাওবিয়ার (রাঃ) দুধ পান করেছিলেন। এইদিক থেকে হযরত ছাওবিয়াহ (রাঃ) এই সকল জালিলুল কদর ব্যক্তির দুধ মা ছিলেন। হিজরতের পর হুজুর (সাঃ) মদীনা থেকে তাঁর জন্য কাপড় এবং খরচ প্রেরণ করতেন।

হযরত ছাওবিয়াহ (রাঃ) ৭ম হিজরীতে ওফাত পান। মাসরুহ (রাঃ) নামে তাঁর এক পুত্র ছিলেন। তিনি রাসূলের (সাঃ) দুধ ভাই ছিলেন। তিনি মায়ের সামনেই

www.bjilibrary.com

মারা যান। হযরত ছাওবিয়াহর (রাঃ) ইসলাম গ্রহণের ব্যাপারে বহু ঐতিহাসিক ঐকমত্য পোষণ করেন।

হযরত সাবিবিয়াহ গামিদিয়াহ (রাঃ)

হযরত সাবিবিয়াহ (রাঃ) গামিদ গোত্রের এক শরীফ কন্যা ছিলেন। তিনি ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু তিনি একবার পদস্খলনে পতিত হন। তিনি অত্যন্ত সংগোপনে সেই কাজ করেছিলেন। তিনি চাইলে কেউই তা জানতে পেতো না। কিন্তু তিনি একজন সত্যিকার মুসলমান ছিলেন। গুনাহর অনুভূতি তাঁকে শান্তিতে থাকতে দেয়নি এবং তিনি একদিন রাসূলের (সাঃ) দরবারে হাজির হয়ে আরজ করলেনঃ "ইয়া রাসুলাল্লাহ! আমাকে পবিত্র করে দিন। আমি বদকাজ করেছি।"

হুজুর (সাঃ) বললেনঃ " ফিরে যা, মাফ চা এবং আল্লাহর দিকে ফিরে যা।"

অন্য আরেক রাওয়ায়েতে আছে, তিনি (সাঃ) তাঁর নিকট স্বামী তলব করলেন। তিনি আরজ করলেন, "ইয়া রাসুলাল্লাহ (সাঃ) সে সময় কেউই উপস্থিত ছিল না।" এরপর রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ইরশাদ করলেন," যা এবং ইসতিগফার কর। সম্ভবত তোর গুনাহ আল্লাহ ক্ষমা করে দিতে পারেন।" তিনি দ্বিতীয় দিন পুনরায় হুজুরের (সাঃ) খিদমতে হাজির হয়ে বললেন, "হে আল্লাহর রাসূল! আপনি আমাকে কি সেইভাবে পুনরায় ফিরিয়ে দিতে চান যেভাবে আপনি মায়িজ (রাঃ) বিন মালিককে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন? খোদার কসম। বদ কাজের ফলে আমি বাচ্চার মা হতেচলেছি।"

তিনি হুকুম দিলেন, "ফিরে যা।" সে চলে গেল। তৃতীয় দিন পুনরায় রাসূলের (সাঃ) দরবারে হাজির হয়ে আরজ করলেনঃ "হে আল্লাহর রাসূল। আমার ওপর হদ জারি করা হোক। যাতে আমি পাক হয়ে যেতে পারি।" হুজুর (রাঃ) বললেনঃ "ফিরে যা এবং বাচ্চা পয়দা হওয়ার জন্য অপেক্ষা কর।"

তিনি চলে গেলেন। যখন বাচ্চা জন্ম নিল তখন তা কোলে করে রাসূলের (সাঃ) খিদমতে এসে হাজির হলেন এবং তার ওপর হদ জারি করার আবেদন

www.bjilibrary.com

জানালেন। হুজুর (সাঃ) বললেন, "দুধ পান করার মুদ্দত পর্যন্ত অপেক্ষা কর। বাচ্চা যখন দুধ ছেড়ে দেয় তখন আসবি।"

বাচ্চার দুধ খাওয়ার মুদ্দাত চলে গেলে পুনরায় রাসুলের (সাঃ) নিকট উপস্থিত হলেন। এ সময় তিনি আল্লাহর নির্দেশ মুতাবেক রজম (পাথর মারা) বা সংগেসার করার নির্দেশ দিলেন।

(অন্য আরেক রাওয়ায়েতে আছে, যখন হযরত সাবিবিয়াহ (রাঃ) নবজাতককে কোলে নিয়ে হুজুরের (সাঃ) খিদমতে হাজির হলেন তখন তিনি (সাঃ) বললেন, এখন আমরা তার ওপর হদ জারি করবো না এবং তাকে সেই সময় পর্যন্ত ছেড়ে দিয়ে রাখবো যে পর্যন্ত শিশুর দুধ খাওয়ানোর কোন বন্দোবস্ত না হয়। এই কথা শুনে এক বুজর্গ আনসারী উঠে দাঁড়ালেন এবং আরজ করলেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ! এই শিশুর দুধ পান করানোর দায়িত্ব আমার। তারপর হুজুর (সাঃ) সাবিবিয়াহর (রাঃ) ওপর হদ জারি করার হুকুম দিলেন।)

লোকজন হযরত সাবিবিয়াহর (রাঃ) ওপর পাথর বর্ষণ শুরু করলেন। হযরত খালিদ (রাঃ) বিন ওয়ালিদও এ সময় উপস্থিত ছিলেন। তিনি একটি পাথর নিক্ষেপ করলেন। তা সাবিবিয়াহর (রাঃ) মাথার ওপর পড়লো এবং রক্ত ছিটকে গিয়ে হযরত খালিদের মুখে লাগলো। এ সময় তাঁর মুখ দিয়ে হযরত সাবিবিয়াহ (রাঃ) সম্পর্কে কঠোর মন্তব্য বেরিয়ে পড়লো। হুজুর (সাঃ) বললেনঃ "খালিদ! জবান বন্ধ কর। খোদার কসম। এই মহিলা এমন তওবাহ করেছে যে জুলুম থেকে মাশুল আদায়কারীও যদি এই ধরনের তওবাহ করে তাহলে ক্ষমা করা হয়।" তারপর তিনি (সাঃ) হযরত সাবিবিয়াহর (রাঃ) নামাযে জানাযা পড়লেন।

এক রাওয়ায়েতে আছে যে, এই সময় হযরত ওমর ফারুক (রাঃ) আরজ করলেন ঃ "হে আল্লাহর রাসূল। এর কি কারণ থাকতে পারে যে, আপনি এমন এক মহিলার ওপর নামায পড়লেন যে হারাম কাজ করেছিল?

সাইয়েদুল মুরসালিন (সাঃ) বললেনঃ" খোদার রাস্তায় জীবন কুরবানী করার চেয়ে বড় আর কোন বস্তু সে পায়নি। অর্থাৎ সে শুধুমাত্র আল্লাহর ভয়ে স্বয়ং এসে নিজের গুনাহে কবিরার স্বীকৃতি এবং নিজের জীবন কুরবানী দিয়েছে।"

www.bjilibrary.com

হযরত সিরিন কিবতিয়াহ (রাঃ)

৬ষ্ঠ হিজরীতে হুদায়বিয়ার সন্ধির পর বিশ্বনবী (সাঃ) হযরত হাতিব (রাঃ) বিন আবি বালতায়াকে মিসরের শাসনকর্তা মাকুকাসের নিকট ইসলামের মুবাল্লিগ হিসেবে প্রেরণ করেন। মাকুকাস ইসলাম গ্রহণ করেননি। অবশ্য হযরত হাতিবকে (রাঃ) খুব সম্মান করলেন। তিনি যখন মিসর ত্যাগ করে চলে আসছিলেন তখন মাকুকাস প্রিয় নবীর (সাঃ) জন্য অনেক উপঢৌকন তাঁর মাধ্যমে পাঠালেন। এই উপঢৌকনের মধ্যে দুই সহোদরা মারিয়াহ (রাঃ) এবং সিরিনও (রাঃ) ছিলেন। এই দু'জনই হযরত হাতিবের (রাঃ) তাবলিগের ফলে ইসলাম গ্রহণ করেন। হযরত মারিয়াহ (রাঃ) তো নবীর (সাঃ) হেরেমে দাখিল হলেন এবং হযরত সিরিনের (রাঃ) বিয়ে রাসূলের (সাঃ) প্রশংসাকারী হযরত হাসসান (রাঃ) বিন ছাবিত আনসারীর সঙ্গে অনুষ্ঠিত হলো। তাঁর গর্ভে হযরত আব্দুর রহমান (রাঃ) বিন হাসসান (রাঃ) জন্মগ্রহণ করেন।

আল্লামা যারকানী (রঃ) লিখেছেন, মিসরের কিবতীরা সাধাণত খৃস্টান ছিলো। বস্তুত হযরত মারিয়া (রাঃ) এবং হযরত সিরিন (রাঃ) কিবতিয়াহ ছিলেন। এজন্য ঐতিহাসিকরা তাঁদেরকে আহলে কিতাব মহিলা সাহাবীদের মধ্যে গণ্য করেন।

ইবনে সা'দ-এর (রঃ) বর্ণনা হলো, রাসূলের (সাঃ) পুত্র হযরত ইবরাহিম (রাঃ) যখন ইন্তেকাল করেন তখন তাঁর মা হযরত মারিয়াহ খুবই দুঃখ ভারাক্রান্ত হলেন এবং কাঁদতে লাগলেন। ভাগিনার মৃত্যুতে হযরত সিরিনও (রাঃ) খুব দুঃখ পেলেন। কিন্তু তিনি নিজের আবেগ কাবু রাখলেন এবং সহোদরাকে (হযরত মারিয়াহকে) ধৈর্যের পরামর্শ দিতে লাগলেন।

www.bjilibrary.com

হযরত তামিমাহ (রাঃ) বিনতে ওয়াহাব

কতিপয় রাওয়ায়েতে তাঁর নাম আয়েশা, সাহমিয়াহ, উমাইমা, রামিসা এবং আমিজাও উল্লেখ করা হয়েছে। তিনি ইহুদীর বনু কোরায়জাহ বংশোদ্ভূত ছিলেন। তাঁর প্রথম বিয়ে হয়েছিলো স্ববংশের হযরত রাফায়াহ (রাঃ) বিন কারজাহ কারাজীর সঙ্গে। কিন্তু তাঁর সঙ্গে বনিবনা না হওয়াতে তিনি তালাক দেন। তারপর হযরত আব্দুর রহমান (রাঃ) বিন যোবায়েরের সঙ্গে বিয়ে হয়। কিন্তু কিছুদিন পর বিভিন্ন কারণে তিনি তাঁর থেকে বিচ্ছিন্ন হতে চান (তিনি দ্বিতীয়বার রাফায়াহর (রাঃ) সঙ্গে বিয়ে বসার ইচ্ছা রাখতেন)। হুজুরের (সাঃ) খিদমতে হাজির হয়ে আরজ করলেন যে, আব্দুর রহমান তো কাপড়ের পুটলীর মত।

হুজুর (সাঃ) তাঁর কথা শুনে মুচকি হাসি দিলেন এবং বললেন, "তুমি কি পুনরায় রাফায়ার নিকট যেতে চাও? কিন্তু যে কথা তুমি বলছো, সেই পরিপ্রেক্ষিতে আমি অনুমতি দেব না।"

হুজুরের (সাঃ) ইন্তেকালের পর তিনি হযরত আবুবকর সিদ্দিকের (রাঃ) খিদমতে হাজির হয়ে একই আবেদন পেশ করলেন। কিন্তু তিনিও অনুমতি দিলেন না। হযরত ওমর ফারুক (রাঃ) খলিফা হলে তাঁর নিকটও অনুমতি চাইলেন। তিনিও অত্যন্ত কঠোরভাবে তাঁর আবেদন প্রত্যাখ্যান করেন। তাঁর সম্পর্কে এর চেয়ে আর বেশী কিছু জানা যায়নি।

বিনতে আমর (রাঃ) বিন ওয়াহাব

বিশ্বনবীর (সাঃ) প্রতি জীবন উৎসর্গকারী এক সাহাবী হযরত সা'দুল আসওয়াদ সাহমী (রাঃ) বাহ্যিক রূপ থেকে বঞ্চিত ছিলেন। এজন্য কোন ব্যক্তি তাঁকে নিজের কন্যা বিয়ে দিতে রাজি হতেন না। তিনি হুজুরের (সাঃ) নিকট নিজের সমস্যার কথা বর্ণনা করলেন। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন, "তুমি এক্ষুণি আমর (রাঃ)

www.bjilibrary.com

বিন ওয়াহাব ছাকাফীর গৃহে যাও এবং সালামের পর তাঁকে বলো যে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) আপনার কন্যার সম্পর্ক আমার সঙ্গে স্থাপন করে দিয়েছেন।"

হযরত সা'দুল আসওয়াদ সাহমী (রাঃ) হযরত আমর (রাঃ) বিন ওয়াহাবকে হুজুরের ফরমান সম্পর্কে অবহিত করলেন। কিন্তু তিনি হযরত সা'দের কথায় বিশ্বাস স্থাপন করতে পারলেন না এবং তাঁর সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিতে অস্বীকৃতি জানালেন। কন্যা পিতার কথা শুনে দৌড়ে দরজায় এলেন এবং হযরত সা'দকে (রাঃ) সম্বোধন করে বললেনঃ

"হে আল্লাহর বান্দাহ! যদি সত্যি আল্লাহর রাসূল (সাঃ) তোমাকে পাঠিয়ে থাকেন তাহলে আমি আনন্দচিত্তে তোমার সঙ্গে বিয়েতে তৈরী রয়েছি।"

হযরত সা'দ (রাঃ) ফিরে গিয়ে হুজুরের (সাঃ) নিকট সকল কথা বললেন। তিনি তা শুনে কন্যার জন্য দোয়া খায়ের করলেন। ওদিকে কন্যা নিজের পিতাকেও আল্লাহর গজবের ব্যাপারে ভয় দেখালেন। তিনি নবীর (সাঃ) নিকট উপস্থিত হয়ে অপরাধের জন্য ক্ষমা ভিক্ষা করলেন। হুজুর (সাঃ) তখন আমরের (রাঃ) কন্যার বিয়ে হযরত সা'দের (রাঃ) সঙ্গে দিয়ে দিলেন। তখনো বউ নিজের বাড়ীতে আনেননি বা রুখসতের অনুষ্ঠান হয়নি। এক যুদ্ধে হযরত সা'দ শহীদ হয়ে গেলেন। হুজুর (সাঃ) তাঁর পরিত্যক্ত সম্পত্তি বিনতে আমর (রাঃ) বিন ওয়াহাবকে দেয়ালেন। তাঁর সম্পর্কে এইটুকুনই জানা যায়।

হযরত উম্মে হারমালাহ (রাঃ) বিনতে আব্দুল আসওয়াদ

হযরত উম্মে হারমালাহ (রাঃ) বিনতে আব্দুল আসওয়াদ বনু খাজায়াহ বংশের ছিলেন। তাঁর বিয়ে হয়েছিল জাহম (রাঃ) বিন কায়েসের সঙ্গে। তিনি ছিলেন বনু আবদিদ্দার বিন কুসাই বংশের মানুষ। স্বামী-স্ত্রী উভয়েই অত্যন্ত সুন্দর স্বভাবের মানুষ ছিলেন এবং ইসলামের দাওয়াতের শুরুতেই ইসলাম গ্রহণ করেন। নবুয়ত প্রাপ্তির ৬ষ্ঠ বছরে নিজের দুই পুত্র আমর বিন জাহম এবং খুজায়মা বিন জাহমকে সঙ্গে নিয়ে হাবশায় হিজরতকারী দ্বিতীয় কাফেলায় ছিলেন। হযরত উম্মে হারমালাহ (রাঃ) হাবশা অবস্থানকালেই ওফাত পান এবং হাবশাতেই তাঁর শেষ আরাম স্থল

www.bjilibrary.com

হয়। কতিপয় রাওয়ায়েতে তাঁর নাম হারিমলাহও বর্ণনা করা হয়েছে এবং খুজায়মাহকে (রাঃ) তাঁর কন্যা হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে।

হযরত বারাকাহ (রাঃ) বিনতে ইয়াসার

তাঁর হসব–নসব সম্পর্কে কিছু জানা যায়নি। শুধু এতটুকু জানা গেছে যে, আবু সুফিয়ানের (রাঃ) স্বাধীনকৃত দাসী ছিলেন এবং তাওহীদের দাওয়াতের শুরুতেই ঈমান এনেছিলেন। হযরত কায়েস (রাঃ) বিন আব্দুল্লাহর সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়েছিল। তিনিও সাবিকিনাল আউয়ালিন এবং বনু আসাদ বিন খুজায়মা কবিলার প্রদীপ সমতুল্য ছিলেন। হাবশায় দ্বিতীয় হিজরতের সময় স্বামী–স্ত্রী উভয়েই হাবশায় উদ্বাস্তুর জীবন গ্রহণ করেন এবং সেখান থেকে খায়বারের যুদ্ধের সময় মদীনা আগমন করেন। ইবনে আছির (রঃ) লিখেছেন, তাঁর কন্যা আমেনাহ উম্মুল মুমিনিন হযরত উম্মে হাবিবাহ (রাঃ) বিনতে আবি সুফিয়ানের দাই ছিলেন এবং হযরত কায়েস (রাঃ) তাঁর প্রথম স্বামী উবায়েদুল্লাহ বিন জাহাশের খাদেম ছিলেন। উবায়েদুল্লাহ হাবশা গিয়ে খৃষ্টান ধর্ম গ্রহণ করে। কিন্তু কায়েস (রাঃ) ও বারাকাহ (রাঃ) যথারীতি ইসালামের ওপর কায়েম থাকেন।

হযরত ফুকাইহা (রাঃ) বিনতে ইয়াসার

ইসলামের অন্যতম প্রবীণ মহিলা সাহাবী। সকল ঐতিহাসিক এ ব্যাপারে একমত যে, তিনি নবুয়তের তিন বছরের মধ্যে ইসলাম গ্রহণ করেন। তাঁর বিয়ে হয়েছিল হযরত খাত্তাব (রাঃ) বিন হারিছ জামহির সঙ্গে। তিনি তাঁর মত প্রবীণ সাহাবী ছিলেন। মুসলমানদের ওপর কাফেরদের জুলুম–নির্যাতন চরম পর্যায়ে পৌছলে স্বামী–স্ত্রী উভয়েই নবুয়তের ৬ষ্ঠ বছরের পর হাবশা গমনকারী মুহাজিরদের দ্বিতীয় কাফেলায় শামিল হন এবং হাবশাকে দ্বিতীয় জন্মভূমি বানিয়ে নেন। এক

www.bjilibrary.com

রাওয়ায়েত অনুযায়ী হযরত খাত্তাব (রাঃ) বিন হারিছ হাবশা অবস্থানকালেই ইন্তেকাল করেন এবং হযরত ফুকাইহা (রাঃ) বিধবা অবস্থায় খায়বারের যুদ্ধের সময় অন্যান্য মুসলমানের সঙ্গে মদীনা ফিরে যান। কিন্তু অন্য এক রাওয়ায়েতে আছে, হযরত খাত্তাব (রাঃ) স্ত্রীসহ সুস্থ অবস্থায় মদীনা ফিরে যান এবং হযরত ওমর ফারুকের (রাঃ) খিলাফতকালে ওফাত পান। কতিপয় রাওয়ায়েতে তাঁর নাম খাত্তাব (রাঃ) বিন হারিছও বলা হয়েছে।

হযরত আসমা (রাঃ) বিনতে সালামাহ

তিনি বনু তামিম বংশোদ্ভূত ছিলেন। তাওহীদের দাওয়াতের সম্পূর্ণ প্রথম যুগে ইসলাম গ্রহণ করেন। তাঁর বিয়ে হয়েছিল হযরত আয়াশ (রাঃ) বিন আবি রবিয়াহ মাখজুমীর সঙ্গে। তিনি আবু জেহেলের মত ইসলামের শত্রুর বৈমাত্রেয় ভাই ছিলেন। কিন্তু আল্লাহ পাক তাঁকে সুন্দর স্বভাব প্রকৃতি দান করেছিলেন। বস্তুত নবুয়তের প্রথম যুগেই ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি যখন ইসলাম গ্রহণ করেন তখনও হুজুর (সাঃ) হযরত আরকাম (রাঃ) বিন আবিল আরকামের গৃহে তাশরীফ রাখেননি।

আবু জেহেল এবং তার অনুসারীরা হযরত আয়াশ (রাঃ) এবং হযরত আসমাকে (রাঃ) ইসলাম গ্রহণের অপরাধে জীবিত থাকা কঠিন করে ফেলেছিল। স্বামী–স্ত্রী উভয়েই নবুয়তের ৬ বছরের পর মক্কা থেকে হিজরত করে হাবশা গমন করেন। সেখানে তাঁর এক পুত্র আব্দুল্লাহ (রাঃ) জন্মগ্রহণ করেন। হুজুরের (সাঃ) মদীনা হিজরতের কিছুদিন পূর্বে হযরত আসমা (রাঃ) স্বামী এবং শিশু পুত্রসহ মক্কা ফিরে আসেন। হযরত আয়াশ (রাঃ) কিছুদিন পর হযরত ওমরসহ (রাঃ) মদীনা হিজরত করেন। ধারণা করা হয় যে, হযরত আসমা (রাঃ) নবীর (সাঃ) হিজরতের পর মদীনা হিজরত করেন এবং পুরো পরিবার মদীনায় একত্রিত হন।

হযরত আয়াশের (রাঃ) ওফাতের পর হযরত আসমা (রাঃ) বিনতে সালামাহর নিকাহ হয়েছিল হযরত আব্দুর রহমান (রাঃ) বিন আওফের সঙ্গে।

www.bjilibrary.com

হযরত ইয়াকজাহ (রাঃ) বিনতে আলকামাহ

কতিপয় রাওয়ায়েতে তাঁর নাম ফাতিমা (রাঃ) বিনতে আলকামাহ (রাঃ) এবং উম্মে ইয়াকজাহ (রাঃ) বলেও উল্লেখ করা হয়েছে। তিনি প্রবীণদের বা সাবিকিনাল আউয়ালিনদের সেই শ্রেণীভুক্ত ছিলেন, যাঁরা সম্পূর্ণ প্রথম যুগে ইসলাম গ্রহণ করার সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন। তাঁর স্বামী হযরত সালিত (রাঃ) বিন আমরও সেই দলভুক্ত ছিলেন। তাঁর সম্পর্ক ছিল বনি আমের বিন লুয়ীর সঙ্গে। হাবশায় দ্বিতীয় হিজরতের সময় স্বামী-স্ত্রী উভয়েই হক পথে বাড়ী-ঘর ত্যাগ এবং হাবশায় উদ্বাস্তু জীবন গ্রহণ করেন। প্রায় ১৩ বছর বিদেশ বিভূয়ে প্রবাসী জীবন কাটিয়ে খায়বারের যুদ্ধের সময় মদীনা ফিরে আসেন। তাঁর সন্তানদের মধ্যে শুধুমাত্র এক পুত্র সালিতের (রাঃ) নামই ইবনে সা'দ (রঃ) বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করেছেন।

হযরত উম্মে হাবিবাহ (রাঃ) বিনতে জাহাশ

হযরত উম্মে হাবিবাহ (রাঃ) বিনতে জাহাশ প্রিয় নবীর (সাঃ) ফুফু উমাইমাহ বিনতে আব্দুল মুত্তালিবের কন্যা ছিলেন এবং উম্মুল মুমিনিন হযরত যয়নব (রাঃ) বিনতে জাহাশ, হযরত হামনাহ (রাঃ) বিনতে জাহাশ এবং ওহোদের শহীদ হযরত আব্দুল্লাহ (রাঃ) বিন জাহাশের সহোদরা ছিলেন। ভাই- বোনদের মত তিনিও তাওহীদের দাওয়াতের শুরুতে ইসলাম গ্রহণ করেন এবং দীর্ঘদিন যাবত বিভিন্ন ধরনের নির্যাতন সইতে থাকেন। ইত্যবসরে মদীনা হিজরতের অনুমতি পাওয়া গেলে নবীর (সাঃ) হিজরতের কিছুদিন পূর্বে তিনি মক্কার মাটিকে বিদায় জানিয়ে ইয়াছরেবে বসবাস শুরু করেন। মহান সাহাবী হযরত আব্দুর রহমান (রাঃ) বিন আওফের সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়।

www.bjilibrary.com

সহিহ মুসলিমের এক বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, তাঁর সহোদরা হযরত যয়নব (রাঃ) বিনতে জাহাশের সঙ্গে অত্যন্ত গভীর সম্পর্ক ছিল এবং দিনে কয়েকবার তাঁর গৃহে আসতেন। কতিপয় রাওয়ায়েতে হযরত উম্মে হাবিবাহর (রাঃ) কুনিয়ত উম্মে হাবিব উল্লেখ আছে।

হযরত আরওয়া (রাঃ) বিনতে আব্দুল মুত্তালিব

হযরত আরওয়ার (রাঃ) হসব–নসব সম্পর্কে এতটুকুন বলাই যথেষ্ট যে, তিনি রহমতে আলমের (সাঃ) আপন ফুফু ছিলেন। তাঁর ইসলাম গ্রহণ সম্পর্কে আল্লামা ইবনে সা'দ (রঃ), ইবনে কাইয়েম এবং অনেক ঐতিহাসিকই ঐকমত্য পোষণকরেন।

হযরত আরওয়ার (রাঃ) বিয়ে হয়েছিল উমায়ের বিন ওয়াহাবের (বিন আবদি বিন কুসাই) সঙ্গে। তাঁর ঔরসে তালিব (রাঃ) জন্মগ্রহণ করেছিলেন। হযরত মুহাম্মাদ মুস্তাফা (সাঃ) হকের দাওয়াত প্রদান শুরু করলে যে সকল পবিত্র নফস সেই দাওয়াত কবুল প্রশ্নে কোন পরিণাম চিন্তা না করেই সম্মতি জানিয়েছিলেন হযরত তালিব (রাঃ) তাঁদের অন্যতম। প্রিয় নবী (সাঃ) সে সময় কেবলমাত্র হযরত আরকাম (রাঃ) বিন আবিল আরকামের ঘরে অবস্থান গ্রহণ করেছিলেন। হযরত তালিব (রাঃ) দারে আরকাম থেকে মুসলমান হয়ে ঘরে এলেন এবং মাকে বললেনঃ "আম্মাজান! আমি মামাতো ভাই মুহাম্মাদের (সাঃ) ওপর সত্য অন্তরে ঈমান নিয়ে এসেছি। তিনি খোদারসত্যরাসূল।"

হযরত আরওয়া (রাঃ) তখনো ইসলাম গ্রহণ করেননি। কিন্তু অত্যন্ত ইখলাস ও দরদের সঙ্গে পুত্রকে বললেনঃ "পুত্র! তোমার ভাই আজকাল বিরোধিতার তুফানের মধ্যে রয়েছে। এতো অসহায় এবং মজলুম এবং বাস্তবিকই তোমার সাহায্যের মুখাপেক্ষী। হা খোদা! আমি যদি পুরুষের মত শক্তিশালী হতাম তাহলে ইয়াতিম ভাতিজাকে জালেমদের নির্যাতন থেকে রক্ষা করতাম।"

তালিব (রাঃ) বললেনঃ "আম্মা! আপনি কেন ইসলাম কবুল করছেন না?"

www.bjilibrary.com

হযরত আরওয়া (রাঃ) বললেনঃ "আমি অন্য বোনদের অপেক্ষা করছি।"

হযরত তালিব (রাঃ) বললেন, "আম্মা! এখন অপেক্ষার সময় নয়। আল্লাহরওয়াস্তে আমার সঙ্গে ভাইয়ের নিকট চলুন এবং ইসলাম গ্রহণ করে ধন্য হোন।"

হযরত আরওয়া (রাঃ) আর আপত্তি করতে পারলেন না। তৎক্ষণাৎ ভাগ্যবান পুত্রের সঙ্গে হযরত আরকামের (রাঃ) গৃহে রাসূলের (সাঃ) নিকট উপস্থিত হলেন এবং ইসলাম গ্রহণ করলেন। নবূয়ত প্রাপ্তির তৃতীয় বছরের দ্বিতীয়ার্ধে এই ঘটনা ঘটে। কতিপয় চরিতকার বলেছেন, হযরত তালিব (রাঃ) এবং হযরত আরওয়া (রাঃ) হযরত হামযার (রাঃ) ইসলাম গ্রহণের পর ঈমান আনেন এবং হযরত তালিব (রাঃ) মাকে ইসলামের দাওয়াত দেয়ার সময় হযরত হামযার (রাঃ) ইসলাম গ্রহণের উদ্ধৃতিও দেন। কিন্তু এই রাওয়ায়েত সঠিক নয়। কেননা হযরত হামযা (রাঃ) হাবশায় দ্বিতীয় হিজরতের পর মুসলমান হন। সে সময় হযরত তালিব (রাঃ) হিজরত করে হাবশা গিয়েছেলেন।

হযরত আরওয়া (রাঃ) এবং হযরত তালিব (রাঃ) ইসলাম গ্রহণের পূর্বেই বিশ্বনবীর (সাঃ) কল্যাণকামী ছিলেন। হযরত আরওয়া (রাঃ) পুত্রকে সব সময় হুজুরের (সাঃ) সাহায্যের জন্য উদ্বুদ্ধ করতেন। এমনিতেই তিনি হুজুরের (সাঃ) প্রতি জীবন উৎসর্গকারী ছিলেন। তার ওপর মায়ের সহযোগিতায় তাঁর সাহস আরো বেড়ে গিয়েছিল। তিনি সব সময় হুজুরের (সাঃ) হেফাজতে ও সাহায্যের জন্য প্রস্তুত থাকতেন।

হাফিজ ইবনে হাজার (রঃ) বর্ণনা করেছেন, একবার আওফ বিন ছাবরাহ সাহমী হযরত তালিবের (রাঃ) সামনে প্রিয় নবীর (সাঃ) শানে কিছু অসৌজন্যমূলক শব্দ বললো। এতে হযরত তালিব (রাঃ) ক্রোধে অস্থির হয়ে পড়লেন এবং তাকে উটের হাড় দিয়ে মেরে রক্তাক্ত করে দিলেন। আওফ হযরত আরওয়ার (রাঃ) নিকট এ ব্যাপারে অভিযোগ করলে তিনি বললেন, "তালিব নিজের মামার পুত্রের সাহায্য করেছে এবং তাঁর রক্ত ও সম্পদের প্রতি সহানুভূতি দেখিয়েছে।"

হযরত আরওয়ার (রাঃ) ভাই আবু লাহাব ইসলামের জঘন্যতম দুশমন ছিল। একবার সে ইসলাম গ্রহণের অপরাধে কতিপয় মুসলমানকে গ্রেফতার করলো। এতে হযরত তালিবের (রাঃ) খুব রাগ হলো এবং তিনি মামুকে খুব মারলেন। নিজেদের সম্মানিত ব্যক্তিকে মারতে দেখে অনেক মুশরিক হযরত তালিবকে (রাঃ) ধরে ফেললো এবং আবু লাহাবকে ছাড়িয়ে নিয়ে তালিবকে বেঁধে ফেললো। যেহেতু তিনি

www.bjilibrary.com

খুব সম্মানিত বংশের মানুষ ছিলেন, এজন্য কিছুক্ষণ পর আবার ছেড়ে দেয়া হলো। আবু লাহাব তাঁর বিরুদ্ধে সহোদরার নিকট অভিযোগ করলো। হযরত আরওয়া (রাঃ) জবাবে বললেন, "তালিবের জীবনের সর্বোত্তম সময় সেইটাই হবে যে সময় সে মুহাম্মাদের (সাঃ) সাহায্য করবে।"

একবার হযরত তালিব (রাঃ) জানতে পেলেন যে, আবু ইহাব বিন আজীজ দারেমী হুজুরকে (সাঃ) শহীদ করার পরিকল্পনা এঁটেছে। তিনি চুপিসারে গিয়ে তার মাথা কেটে ফেললেন। হযরত আরওয়া (রাঃ) একথা জানতে পেরে খুব খুশী হলেন।

নবুয়তের ৬ষ্ঠ বছরের পর হযরত তালিব (রাঃ) হুজুরের ইঙ্গিতে হাবশায় হিজরত করেন। সেখানে ৭ বছর অবস্থানের পর হুজুরের (সাঃ) মদীনা হিজরতের কিছুদিন পূর্বে মক্কা ফিরে আসেন। হযরত আরওয়া (রাঃ) ভাগ্যবান পুত্রের এই বিচ্ছিন্নতার দীর্ঘ সময় অত্যন্ত ধৈর্য ও স্থৈর্যের সাথে কাটান।

হযরত আরওয়ার (রাঃ) ওফাতের সাল এবং বিস্তারিত অবস্থা জানা যায়নি। কিন্তু একটি রাওয়ায়েত থেকে জানা যায় যে, তিনি হুজুরের (সাঃ) ওফাত পর্যন্ত জীবিত ছিলেন এবং হুজুরের (সাঃ) ওফাতে কতিপয় দরদভরা কবিতা বলেছিলেন। কিন্তু এই রাওয়ায়েত সঠিক হওয়া সম্পর্কে বিশ্বস্তভাবে কিছু বলা যায় না। কতিপয় চরিতকার লিখেছেন, হযরত আরওয়া (রাঃ) কবি ও কাব্যের ব্যাপারে বিশেষ অনুরাগীছিলেন।

হযরত উম্মে আবদ (রাঃ)

আসল নাম জানা যায়নি। অবশ্য কতিপয় রাওয়ায়েতে তাঁর পিতার নাম আবদি বুদ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। তিনি জালিলুল কদর সাহাবী ফকিহুল উম্মাত হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) বিন মাসউদের মা ছিলেন। মাসউদ বিন গাফাল হাজলীর সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল। তাঁরই ঔরসে হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) জন্মগ্রহণ করেন। দাওয়াতে হকের প্রারম্ভিক যুগে ইসলাম গ্রহণের সৌভাগ্য অর্জন এবং হিজরত করেন।

www.bjilibrary.com

রহমতে আলম (সাঃ) তাঁকে খুব স্নেহ করতেন এবং তাঁর পুত্র আবদুল্লাহ (রাঃ) বিন মাসউদকে প্রায়ই ইবনে উম্মে আবদ বলে ডাকতেন।

হযরত আব্দুল্লাহ (রাঃ) বিন মাসউদ মাঝে মধ্যেই মাকে নবীর (সাঃ) হেরেমে পাঠাতেন। লক্ষ্য ছিল হুজুরের (সাঃ) পারিবারিক জীবন সম্পর্কে তথ্য জানা।

৮

হযরত যয়নব (রাঃ) বিনতে আবি মাবিয়া

নাম ছিল যয়নব (রাঃ) এবং উপাধি রায়েতাহ। তিনি বনু ছাকিফ কবিলার মানুষ ছিলেন। নসবনামা হলোঃ যয়নব (রাঃ) বিনতে আবি মাবিয়া আব্দুল্লাহ বিন মাবিয়া বিন ইতাব বিন আসয়াদ বিন গাদিরাহ বিন হাতিত বিন জাশম বিন ছাকিফ।

তিনি উম্মাহর ফকিহ হযরত আব্দুল্লাহ (রাঃ) বিন মাসউদের স্ত্রী ছিলেন। হযরত আব্দুল্লাহর (রাঃ) জীবন নির্বাহের কোন ব্যবস্থা ছিল না। তিনি খুবই দরিদ্র ছিলেন। হযরত যয়নব (রাঃ) হস্ত শিল্পী ছিলেন। এর মাধ্যমে যা আয় হতো তা স্বামী এবং সন্তানদের জন্য খরচ করতেন। এজন্য অন্যান্য গরীব-মিসকিনদেরকে দান করার মত তাঁর নিকট কিছুই থাকতো না। প্রিয় নবীর (সাঃ) তরফ থেকে সাদকার সওয়াবের কথা শুনে তাঁর অন্তরেও প্রায়ই এই আকাংখা জন্মাতো যে, হায়! দান-খয়রাতের জন্য যদি কিছু অর্থ বাঁচতো।

একদিন হযরত আব্দুল্লাহ (রাঃ) বিন মাসউদকে বললেনঃ ''হস্ত শিল্পের মাধ্যমে আমি যা আয় করি তা আপনার এবং আপনার সন্তানের জন্য খরচ করি। এভাবে সাদকাহ-খয়রাতের সওয়াব থেকে মাহরুম থেকে যাচ্ছি। আপনিই বলুন, এতে আমার কি লাভ?''

হযরত আব্দুল্লাহ (রাঃ) বিন মাসউদ বললেনঃ '' যে কাজে তোমার লাভ হয়, তাই করো। আমি তোমাকে আখিরাতের সওয়াব থেকে মাহরুম করতে চাই না।''

হযরত যয়নব (রাঃ) রাসূলের (সাঃ) দরবারে হাজির হলেন এবং আরজ করলেনঃ'' হে আল্লাহর রাসূল। আমার মাতা-পিতা আপনার ওপর কুরবান হোক। আমি একজন হস্তশিল্পী মহিলা। যা কিছু আয় হয় তা স্বামী এবং সন্তানের জন্য

www.bjilibrary.com

খরচ করি। আমার স্বামীর জীবিকার কোন মাধ্যম নেই। এভাবে মিসকিনদেরকে সাদকাহ দিতে পারি না। এই অবস্থায় আমি কোন সওয়াব পাই কিনা?

হুজুর (সাঃ) বললেনঃ "হ্যাঁ, তাদের জন্য তোমার ব্যয় করা উচিত।"

অন্য আরেক রাওয়ায়েতে আছে, একবার বিশ্বনবী (সাঃ) মহিলাদেরকে সাদকাহ খয়রাতের ব্যাপারে উৎসাহ দিলেন। হযরত যয়নব (রাঃ) হযরত আব্দুল্লাহ (রাঃ) বিন মাসউদকে বললেন, "আপনি তো খুব গরীব। রাসূলের (সাঃ) নিকট যান। হুজুর (সাঃ) যদি ইজাজত দেন তাহলে আমি আপনাকেই সাদকাহ দিতে চাই।"

হযরত আব্দুল্লাহ (রাঃ) বললেনঃ "তুমিই যাও।"

হযরত যয়নব (রাঃ) হুজুরের মুবারক আস্তানায় হাজির হলেন। এ সময় আনসারের একজন মহিলা দরজায় দাঁড়িয়ে ছিলেন। তিনিও হুজুরের (সাঃ) নিকট একই প্রশ্ন জিজ্ঞেস করতে এসেছিলেন। ইতিমধ্যে ভেতর থেকে হযরত বেলাল (রাঃ) আসলেন। উভয় মহিলাই তাঁকে বললেন যে, তিনি যেন রাসূলের (সাঃ) খিদমতে আরজ করেন যে দরজায় দু'জন মহিলা দাঁড়িয়ে আছে। তারা স্বামীদের এবং তাদের লালন-পালনাধীন ইয়াতিমদের জন্য সাদকাহ খরচ করতে পারবে কি না তা জানতে চায়।

হযরত বেলাল (রাঃ) হুজুরের (সাঃ) খিদমতে তাঁদের প্রশ্ন পেশ করলেন। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) জিজ্ঞেস করলেনঃ "এই দুই মহিলা কে?"

তিনি বললেনঃ "একজন আনসার মহিলা অপরজন যয়নব।" হুজুর (সাঃ) জিজ্ঞেস করলেনঃ "কোন্ যয়নব?" আরজ করলেনঃ "আব্দুল্লাহ বিন মাসউদের স্ত্রী।" তিনি বললেন, "সে ডবল সওয়াব পাবে। একভাগ আত্মীয়তার। আরেক ভাগ সাদকার।"

হযরত আব্দুল্লাহ (রাঃ) বিন মাসউদ যখন বাড়ী আসতেন তখন বাইরে থেকেই গলা খাঁকারী দিতেন এবং উচ্চৈস্বরে কথা বলতেন। যাতে বাড়ীর লোকজন বুঝতে পারেন যে, তিনি এলেন। মুসনাদে আবু দাউদে হযরত যয়নব (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, একবার হযরত আব্দুল্লাহ (রাঃ) বিন মাসউদ গলা খাঁকারী দিয়ে ভেতরে এলেন। সে সময় এক বৃদ্ধা আমাকে তাবিজ পরাচ্ছিলেন। আমি তাঁর ভয়ে বৃদ্ধাকে খাটের নীচে লুকিয়ে ফেললাম। হযরত আব্দুল্লাহ (রাঃ) আমার নিকট বসলেন এবং আমার ঘাড়ের দিকে তাকিয়ে বললেন, এই তাবিজ কিসের? আমি বললাম, ফুঁ দিয়ে আমাকে এই তাবিজ দেয়া হয়েছে। একথা শুনতেই তিনি এই তাবিজ আমার

www.bjilibrary.com

গরদান থেকে ছিঁড়ে ফেলে দিলেন এবং বললেন, তুমি আব্দুল্লাহর স্ত্রী। তুমি শিরকের মুখাপেক্ষী নও। আমি রাসূলকে (সাঃ) বলতে শুনেছি যে, ঝাড়–ফুঁক ও তাবিজ ইত্যাদি কাজ শিরক। আমি বললাম, আমার চোখে কাঁটার মত বিঁধতো। সুতরাং আমি অমুক ইহুদীর নিকট ঝাড়ার জন্য যেতাম। সে ঝেড়ে দিলে আমি শান্তি পেতাম। হযরত আব্দুল্লাহ (রাঃ) বললেন, "এটা শয়তানী কাজ। অতএব তোমার জন্য এভাবে বলাই যথেষ্ট ছিল যেভাবে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ফরমাতেনঃ

"হে সৃষ্টি জীবের পালনকারী। কষ্ট দূর করে দাও এবং তোমার শিফাই প্রকৃত শিফা। তুমি শিফা দাও, কেননা তুমি শিফা দানকারী। এমন শিফা দান কর, যার পর আর কোন কষ্ট না থাকে।"

এই রাওয়ায়েত ইবনে মাজাহ (রঃ), ইবনে হাব্বান এবং হাকিমও (রঃ) নকল করেছেন। ইমাম জাহাবী তাকে সঠিক বলে আখ্যায়িত করেছেন। কিন্তু কতিপয় আলেম এর ব্যাখ্যা করেছেন এবং অন্য রাওয়ায়েতসমূহের পরিপ্রেক্ষিতে যেসব ঝাড়–ফুঁতে শিরকী কালাম ব্যবহৃত না হয় তা জায়েজ করেছেন।

মুসনাদে আহমদ বিন হাম্বলে আছে, হযরত যয়নব (রাঃ) বিনতে আবি মাবিয়া প্রিয় নবীকে (সাঃ) অত্যন্ত শ্রদ্ধা করতেন এবং মাঝে মধ্যে নবীর (সাঃ) দরবারে হাজির হতেন। হুজুরও (সাঃ) তাঁকে অসাধারণ স্নেহ করতেন এবং কখনো কখনো তাঁকে নিজের মাথা দেখার অনুমতি দিতেন। একদিন হুজুরের (সাঃ) মাথায় উকুন দেখছিলেন। সে সময় আরো কিছু মুহাজির মহিলাও নবীর (সাঃ) নিকট উপস্থিত ছিলেন। কোন বিষয়ের ওপর আলোচনা শুরু হয়ে গেল। হযরত যয়নব (রাঃ) বলতে লাগলেনঃ হুজুর (সাঃ) বলেছেন, তোমরা চোখ দিয়ে কথা বলো না, কাজও করো এবং কথাও বলো।

হযরত যয়নবের (রাঃ) ওফাতের সাল এবং বিস্তারিত অবস্থা জানা যায় না। প্রখ্যাত মুহাদ্দিস হযরত আবু উবায়দাহ (রঃ) তাঁর পুত্র ছিলেন।

হযরত যয়নব (রাঃ) থেকে কতিপয় হাদিসও বর্ণিত আছে। এইসব হাদিস তিনি রাসূলে আকরাম (সাঃ), হযরত ওমর ফারুক (রাঃ) এবং হযরত আব্দুল্লাহ (রাঃ) বিন মাসউদ থেকে বর্ণনা করেছেন।

www.bjilibrary.com

হযরত জামানাহ (রাঃ) বিনতে আবি তালিব

হযরত আবু তালিব বিন আব্দুল মুত্তালিবের কন্যা এবং হযরত আলীর (রাঃ) সহোদরা ছিলেন। এইদিক থেকে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তাঁর চাচাতো ভাই ছিলেন।

কাজী মুহাম্মাদ সোলায়মান সালমান মানসুরপুরী (রঃ) ''রাহমাতুললিল আলামীন'' গ্রন্থের দ্বিতীয় খন্ডে বর্ণনা করেছেন, '' আবি তালিবের আওলাদের'' মধ্যে জামানাহ'র নাম পাওয়া যায়। কিন্তু তাঁর জীবনী সম্পর্কে কিছুই জানা যায় না। ঐতিহাসিক ইবনে ইসহাক (রঃ) লিখেছেন, নবী করিম (সাঃ) খায়বারের উৎপাদিত দ্রব্যের মধ্য থেকে ত্রিশ ওয়াসাক খোরমা আবি তালিবের কন্যা জামানাহ'র জন্য নির্ধারিত করেছিলেন। এ থেকে এটাও জানা যায় যে, তিনি ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন এবং এটাও পরিষ্কার যে, তিনি খায়বার বিজয় পর্যন্ত জীবিত ছিলেন।

হযরত উম্মে হানি (রাঃ) বিনতে আবি তালিব

বিভিন্ন রাওয়ায়েত অনুযায়ী কেউ বলেছেন তাঁর নাম ফাখতাহ। আবার কেউ বলেছেন ফাতিমা। আবার কেউ হিন্দও বলেছেন। তাঁর কুনিয়ত ছিল ''উম্মে হানি।'' সকল ঐতিহাসিকই কুনিয়তের ব্যাপারে একমত।

তিনি রাসূলের (সাঃ) চাচা হযরত আবি তালিবের কন্যা ছিলেন। মাতার নাম ছিল ফাতিমা (রাঃ) বিনতে আসাদ। হযরত জাফর (রাঃ) তাইয়ার, তালিব, আকিল (রাঃ) এবং হযরত আলী কাররামাল্লাহ ওয়াজহাহু তাঁর সহোদর ছিলেন।

উম্মে হানির (রাঃ) বিয়ে হয়েছিল হাবিরাহ বিন আবি ওয়াহাব (বিন আমর বিন আয়েজ বিন ইমরান বিন মাখজুম) মাখজুমীর সঙ্গে। হাবিরাহ বিন আবি ওয়াহাব

www.bjilibrary.com

মক্কা বিজয়ের সময় মুশরিক অবস্থায় নাজরানের দিকে পালিয়ে গিয়েছিল। নাজরান থেকে তার প্রত্যাবর্তন এবং ইসলাম গ্রহণ সম্পর্কে কোন রাওয়ায়েত পাওয়া যায়নি।

হযরত উম্মে হানির ইসলাম গ্রহণ সম্পর্কে সকল ঐতিহাসিকই ঐকমত্য পোষণ করেন। কিন্তু কোন সময় তিনি ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন সে ব্যাপারে মতবিরোধ রয়েছে। কেউ কেউ লিখেছেন, মক্কা বিজয়ের সময় তিনি ইসলাম গ্রহণের সৌভাগ্য লাভ করেন। আবার কেউ বলেছেন, তিনি অন্যতম প্রবীণ মুসলমান ছিলেন। অবশ্য নিজের ইসলাম গ্রহণের কথা লুকিয়ে রেখেছিলেন।

মক্কা বিজয় প্রসঙ্গে হযরত উম্মে হানির (রাঃ) ব্যাপারে রাওয়ায়েত সমূহে জানা যায় যে, তিনি প্রথমেই ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন এবং রাসূলকে (সাঃ) অত্যন্ত শ্রদ্ধা এবং ভালোবাসতেন। হুজুর (সাঃ) তাঁকে খুব খেয়াল রাখতেন। বস্তুত হযরত উম্মে হানি (রাঃ) যেসব মুশরিককে নিজের ঘরে আশ্রয় দিয়েছিলেন, হুজুরও (সাঃ) তাদেরকে আশ্রয় দেন। অধিকন্তু তিনি (সাঃ) একা একাই হযরত উম্মে হানির (রাঃ) গৃহে তাশরীফ নেন এবং সেখানে নামায পড়েন।

মুসনাদে আহমদ বিন হাম্বলে (রঃ) আছে, মক্কা বিজয়ের সময় হারিছ বিন হিশাম মাখজুমী এবং জোহায়ের বিন উমাইয়াহ মাখজুমী (হাকিম (রঃ) জোহায়েরের স্থানে আব্দুল্লাহ বিন আবি রবিয়াহ লিখেছেন) হযরত উম্মে হানির (রাঃ) ঘরে আশ্রয় নেন। হযরত আলী (রাঃ) একথা জানতে পেরে তরবারী হাতে বোনের বাড়ী পৌছলেন এবং তাদেরকে কতল করা ওয়াজিব বলে দু'জনকেই কতল করতে চাইলেন। হযরত উম্মে হানি (রাঃ) বললেন, তারা আমার নিকট আশ্রয় নিয়েছে। আমি তাদেরকে অবশ্যই কতল করতে দেব না। অতঃপর ঘরের দরজা বন্ধ করে দিলেন। এরপর উম্মে হানি (রাঃ) দুই মাখজুমীকে সঙ্গে নিয়ে রাসূলের (সাঃ) দরবারে হাজির হলেন। হুজুর (সাঃ) উম্মে হানিকে (রাঃ) দেখে বললেন, " হে উম্মে হানি! মুবারকবাদ। কিভাবে এলে?"

হযরত উম্মে হানি আরজ করলেনঃ "হে আল্লাহর রাসূল! আমি এই দু'জনকে আশ্রয় দিয়েছি। আর আলী (রাঃ) তাদেরকে কতল করতে চায়।"

হুজুর (সাঃ) বললেন, "যাকে তুমি আশ্রয় দিয়েছ। আমিও তাকে আশ্রয় দিয়েছি।"

এই ঘটনার পর হারিছ (রাঃ) বিন হিশাম এবং জোহায়ের (রাঃ) বিন উমাইয়াহ দু'জনই সত্য অন্তরে মুসলমান হয়ে গেলেন।

www.bjilibrary.com

সহিহ বুখারী এবং মুসলিমে স্বয়ং হযরত উম্মে হানি (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, মক্কা বিজয়ের দিন নবী করিম (সাঃ) আমার ঘরে তাশরীফ আনলেন, গোসল করলেন এবং আট রাকায়াত নামায পড়লেন। আমি এত সংক্ষিপ্ত ও হালকা নামায দেখিনি। কিন্তু তিনি রুকু ও সিজদাহ পুরোই করেছিলেন। অন্য এক রাওয়ায়েতে হযরত উম্মে হানি (রাঃ) এই কথাও বলেছেন যে, এটা চাশতের সময় ছিল (অথবা এটা চাশতের নামায ছিল)।

মুসনাদে আবু দাউদ এবং সুনানে দারেমীতে হযরত উম্মে হানি (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, মক্কা বিজয়ের দিন রাসূলুল্লাহ (সাঃ) আমার গৃহে তাশরীফ আনলেন। একজন খাদেমাহ একটি পাত্র নিয়ে হাজির হলো। তাতে পান করার কোন বস্তু ছিল (কতিপয় রাওয়ায়েত অনুযায়ী এটা শরবত ছিল)। খাদেমাহ পাত্রটি রাসূলকে (সাঃ) দিলেন। তিনি সামান্য পান করলেন এবং পুনরায় আমাকে দিয়ে দিলেন। আমি তা পান করলাম এবং আরজ করলাম, "হে আল্লাহর রাসূল! আমি রোযা ছিলাম এবং পান করে ফেলেছি৷ তিনি জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি কি কোন কাজা রোযা রেখেছিলে?" আমি বললাম, "না।" তিনি বললেন, ''যদি এটা নফল রোযা হয়, তাহলে কোন অসুবিধা নেই।''

মুসনাদে আহমদ (রঃ) এবং তিরমিজীর এক রাওয়ায়েতে এই বাক্য ব্যবহার করা হয়েছেঃ উম্মে হানি (রাঃ) বললেন, "ইয়া রাসূলাল্লাহ ! আমি রোযা ছিলাম।" তিনি বললেন, "নফল রোযাকারীরা নিজের নফসের মালিক। চাইলে সে রোযা রাখতে পারে। চাইলে নাও রাখতে পারে।" মুসনাদে আহমদে এও রয়েছে যে, হুজুর (সাঃ) উম্মে হানির (রাঃ) নিকট রোযা ভাঙ্গার কারণ জিজ্ঞেস করলেন। তিনি আরজ করলেন যে, তিনি তাঁর ঝুটা ফিরিয়ে দিতে পারতেন না। এই রাওয়ায়েত থেকে এটা পরিষ্কার হয় যে, হযরত উম্মে হানি (রাঃ) মক্কা বিজয়ের আগেই ঈমান এনেছিলেন এবং রোযা রাখতেন। হুজুরের (সাঃ) প্রতি তাঁর শ্রদ্ধাবোধ এবং মুহাব্বাতের প্রমাণও পাওয়া যায়।

সহিহ মুসলিমে আছে, একবার রাসূলুল্লাহ (সাঃ) হযরত উম্মে হানির (রাঃ) নিকট তাঁকে বিয়ে করার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। এতে তিনি মাফ চেয়ে বলছিলেন, "ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার বয়স বেশী হয়ে গেছে। তাছাড়া আমার সন্তানও রয়েছে (যাদের প্রতিপালন আমার জন্য আবশ্যক)। এই সময় হুজুর (সাঃ) কোরেশ মহিলাদের ব্যাপারে বলেছিলেন, উটের ওপর সওয়ার মহিলাদের মধ্যে সর্বোত্তম হলো

www.bjilibrary.com

কোরেশ মহিলা। শৈশবকালে নিজের ইয়াতিম শিশুদেরকে ভালোবাসে এবং স্বামীর সম্পদ সংরক্ষণ করে।

প্রিয় নবী (সাঃ) হযরত উম্মে হানিকে (রাঃ) খুব স্নেহ করতেন। একবার তাঁকে বললেন," বকরী নিয়ে নাও, এটা খুব বরকতওয়ালা জন্তু।"

ইমাম আহমদ (রাঃ) লিখেছেন, একবার হযরত উম্মে হানি (রাঃ) হুজুরের (সাঃ) খিদমতে আরজ করলেনঃ "হে আল্লাহর রাসূল! বৃদ্ধ হয়ে গেছি। চলতে-ফিরতে খুব দুর্বলতা অনুভব করি। এমন ওজিফা বলে দিন যা বসে বসে পড়তে পারি।" হুজুর (সাঃ) বললেন, 'একশ' বার সুবহান আল্লাহ, একশ'বার আলহামদুলিল্লাহ, একশ'বার আল্লাহু আকবার এবং একশ'বার লাইলাহা ইল্লাল্লাহ পড়ে নিও"। অন্য কতিপয় রাওয়ায়েতে আছে, হযরত উম্মে হানি (রাঃ) হুজুরের (সাঃ) নিকট ফিকাহর মাসলা মাসায়েল এবং কুরআনে হাকিমের ভাবার্থ জিজ্ঞাসা করেনিতেন।

হাফিজ ইবনে হাজার (রঃ) বর্ণনা করেছেন, হযরত উম্মে হানি (রাঃ) আমিরে মাবিয়ার (রাঃ) শাসনকালে ওফাত পান। সন্তানদের মধ্যে আমর, হানি ইউসুফ এবং জা'দাহ খ্যাতি লাভ করেন।

হযরত উম্মে হানি (রাঃ) অত্যন্ত উঁচু মর্যাদার অধিকারিনী ছিলেন। তাঁর থেকে ৪৬টি হাদীস বর্ণিত আছে। তাঁর রাবী বা বর্ণনাকারীদের মধ্যে রয়েছেন হযরত আব্দুল্লাহ (রাঃ) বিন আব্বাস, আব্দুল্লাহ বিন হারিছ (রাঃ), ইবনে আবি লায়লা (রঃ) মুজাহিদ (রঃ), উরওয়াহ (রঃ) এবং শা'বীর মত মহান ব্যক্তিত্ব।

হযরত হাওলা (রাঃ)

ঐতিহাসিকরা তাঁর হসব-নসব সম্পর্কে কিছু বলেননি। অবশ্য তিনি যে সাহাবী ছিলেন এ ব্যাপারে সকলেই একমত।

ইবনে আছির (রঃ) লিখেছেন, তিনি আতরের ব্যবসা করতেন। একবার উম্মুল মুমিনিন হযরত আয়েশা সিদ্দিকাহ'র (রাঃ) খিদমতে হাজির হয়ে আরজ

www.bjilibrary.com

করলেন, "আমার স্বামী বিনা কারণে আমার প্রতি বিরক্তি প্রকাশ করে থাকেন। অথচ আমি প্রতি রাতে খোশবু লাগাই। সাজ-গোজও কম করি না। এ সত্ত্বেও তিনি আমার দিকে মনোযোগ দেন না এবং মুখ ফিরিয়ে থাকেন।" এসময় প্রিয় নবী (সাঃ) তাশরীফ আনলেন এবং হযরত হাওলার (রাঃ) অভিযোগ শুনে বললেন,"যাও এবং স্বামীর আনুগত্য করতে থাকো।"

মুসনাদে আহমদ বিন হাম্বলে রয়েছে, আল্লাহর ইবাদাতের প্রতি হযরত হাওলার (রাঃ) গভীর আগ্রহ ছিল। নামায পড়ে পড়ে সারা রাত কাটিয়ে দিতেন। একদিন বিশ্ব নবী (সাঃ) হযরত আয়েশা সিদ্দিকাহর (রাঃ) নিকট উপস্থিত ছিলেন। এমন সময় হযরত হাওলা (রাঃ) সামনে দিয়ে চলে গেলেন। হযরত আয়েশা সিদ্দিকাহ (রাঃ) আরজ করলেনঃ "হে আল্লাহর রাসূল! সে হাওলা। লোকে বলে, সে রাতে ঘুমোয়না এবং সারা রাত নামায পড়ে। হুজুর (সাঃ) আশ্চর্য হয়ে বললেনঃ "সারা রাত ঘুমোয়না? মানুষের এতটুকু কাজ করা চাই যা সে সব সময় (কোন কষ্ট ছাড়া) করতে পারে।" এ ছাড়া তাঁর সম্পর্কে আর কিছু জানা যায়নি।

হযরত উম্মে হাকিম (রাঃ) বিনতে হারিছ

অষ্টম হিজরীর রমযান মাসে আল্লাহ পাক মক্কার কোরেশদেরকে পরাজিত করলেন এবং হকপন্থীরা মক্কা মুয়াজ্জমায় বিজয়ীর বেশে প্রবেশ করলেন। কিন্তু তাঁদের এই প্রবেশ বিশ্বের অন্যান্য বিজয়ীদের মত ছিল না। কতিপয় চরম মুশরিক দুষ্কৃতকারী ছাড়া আর মক্কার কোন মুশরিকের গায়ে আঁচর পর্যন্ত লাগেনি। দশ হাজার পবিত্র আত্মার মানুষ রহমতে আলমের (সাঃ) সঙ্গে মক্কা মুয়াজ্জমায় এমনভাবে পা রাখেন যেমন ভোরের সমিরণ ফুলের বাগানে প্রবেশ করে থাকে। বিশ্ব নবীর (সাঃ) ক্ষমার মেঘ মক্কাবাসীর ওপর টপ টপ করে বর্ষিত হতে থাকে। তারা সেই মক্কাবাসী যারা হকপন্থীদের খুন পিপাসু ছিল এবং যারা তাদের ওপর নির্যাতন চালাতে বিন্দুমাত্র কসুর করেনি। দয়ার সাগর নবী (সাঃ) সবাইকে ক্ষমা করে দিলেন। কারোর নিকট কোন জবাব চাইলেন না। কিন্তু মক্কায় এমনকিছু মানুষও ছিল যাদের অন্তরের কাঁটা তাদেরকে কোন মতেই স্থির থাকতে দেয়নি। অতীতের

www.bjilibrary.com

প্রেক্ষাপটে তারা কোনক্রমেই এ আশা করেনি যে, প্রিয় নবী (সাঃ) বাগে পেয়ে তাদেরকে জীবন্ত ছেড়ে দেবেন। তারা মক্কা থেকে পালিয়ে যাওয়া উত্তম মনে করলো।

সেই যুগের কথা। মক্কা ফিরে আসার পর এক মহিলা রাসূলুল্লাহর (সাঃ) নিকট উপস্থিত হলেন এবং অত্যন্ত উৎসাহ-উদ্দীপনার সঙ্গে ইসলাম গ্রহণ করার মহান সৌভাগ্য অর্জন করলেন। অতঃপর তিনি রহমতে আলমকে (সাঃ) বললেনঃ "ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার স্বামী জীবনের ভয়ে ইয়েমেনের দিকে পালিয়ে গেছে। যদি তার নিরাপত্তা দেন তাহলে আমি তাকে ফিরিয়ে আনি।"

হুজুরের (সাঃ) রহমতের দরিয়া জোশ মেরে উঠলো। তিনি নিশ্চিন্তে বলে দিলেনঃ "যাও, আমি তাকে নিরাপত্তা দিলাম।"

হুজুরের (সাঃ) ইরশাদ শুনে মহিলার আর খুশী ধরে না। কেননা তাঁর স্বামী ছিল একজন স্বীকৃত ইসলাম দুশমন এবং সে হকপন্থীদের ওপর নির্যাতন চালানোর কোন সুযোগই হাতছাড়া করেনি। এই অবস্থায় মক্কায় একদিন অবস্থানও তার জন্য ছিল কঠিন ব্যাপার। মহিলা সেই সময়ই রোমক গোলামকে সঙ্গে নিয়ে স্বামীর সন্ধানেবেরিয়েগেলেন।

সাইয়েদুল মুরসালিন (সাঃ) যে মহিলাকে এত খাতির করেছিলেন তিনি ছিলেন ইকরামাহ বিন আবু জেহেলের স্ত্রী হযরত উম্মে হাকিম (রাঃ) বিনতে হারিছ মাখজুমিয়াহ।

হযরত উম্মে হাকিম (রাঃ) বিশ্বনবীর অন্যতম মশহুর মহিলা সাহাবী ছিলেন। চরিতকাররা তাঁর কথা শুধু কুনিয়াত সহই উল্লেখ করেছেন এবং আসল নাম লিখেননি। কোরেশের বিখ্যাত শাখা বনু মাখজুমের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ছিল। নসবনামা হলোঃ উম্মে হাকিম (রাঃ) বিনতে হারিছ বিন হিশাম বিন মুগিরাহ বিন আব্দুল্লাহ বিন আমর বিন মাখজুম বিন ইয়াকজাহ বিন মাররাহ বিন কা'ব বিন লুব্বী। মাতার নাম ছিল ফাতিমা বিনতে ওয়ালিদ বিন মুগীরাহ। তিনি খালিদ (রাঃ) বিন ওয়ালিদের (সাইফুল্লাহ) সহোদরা ছিলেন।

হযরত উম্মে হাকিম (রাঃ) যে পরিবারে চোখ খুলেছিলেন সেই পরিবার ছিল কুফর ও শিরকের দোলনা। তাঁর পিতা আবু আব্দুর রহমান হারিছ বিন হিশাম আবু জেহেলের (আমর বিন হিশাম) সহোদর ছিল এবং দুই ভাইই ইসলামের কট্টর দুশমন ছিল। একই অবস্থা ছিল মা এবং মামা খালিদ (রাঃ) বিন ওয়ালিদের। এই পরিবেশে ইসলামের আলোয় আলোকিত হওয়া তাঁর জন্য ছিল অসম্ভব ব্যাপার।

www.bjilibrary.com

বিয়েও হয়েছিল চাচা আবু জেহেলের পুত্র ইকরামার সঙ্গে। ইসলাম দুশমনীতে সে পিতার পদাংক অনুসরণ করেছিল।

দ্বিতীয় হিজরীতে বদরের যুদ্ধে আবু জেহেল খুব জিল্লতীর সঙ্গে মারা যায়। তার মৃত্যুর পর ইকরামাহ পিতার পরিত্যক্ত কাজ পূর্ণ করার দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং মক্কা বিজয় পর্যন্ত হকপন্থীদের ওপর নির্যাতন চালানোর জন্য বিরাট বিরাট পদক্ষেপ নেন। ওহোদের যুদ্ধের সময় তিনি স্ত্রীকেও (উম্মে হাকিম) সঙ্গে নিয়ে যান এবং হযরত খালিদ (রাঃ) বিন ওয়ালিদের সঙ্গে মিলে মুসলমানদের খুব ক্ষতি সাধন করেন। খন্দকের যুদ্ধে বনু কিনানাহকে সঙ্গে নিয়ে মদীনার ওপর চড়াও হন। অষ্টম হিজরীতে মুসলমানদের মিত্র বনু খাযায়াহ গোত্রের কতল ও গারতগিরিতে আংশগ্রহণ করেন এবং হুদায়বিয়ার সন্ধিনামা বাস্তবত ভঙ্গ করেন। এমনকি মক্কা বিজয়ের সময়ও তারা কতিপয় মুশরিককে সঙ্গে নিয়ে সেই সৈন্য দলকে বাধা দিয়েছিলেন যারা হযরত খালিদ (রাঃ) বিন ওয়ালিদের নেতৃত্বে শহরে প্রবেশ করছিলেন। এ ছিলেন সেই খালিদ (রাঃ) বিন ওয়ালিদ যিনি হকপন্থীদের বিরুদ্ধে কয়েকটি যুদ্ধে ইকরামার সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়াই করেছিলেন। তিনি উম্মে হাকিমের (রাঃ) আপন মামু ছিলেন এবং সম্পর্কের দিক দিয়ে ইকরামারও চাচা ছিলেন। ইকরামার পিতা আবু জেহেল এবং খালিদ (রাঃ) বিন ওয়ালিদ পরস্পর চাচাতো ভাই ছিলেন। মক্কা বিজয়ের কিছু দিন পূর্বে হযরত খালিদ (রাঃ) বিন ওয়ালিদ ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু তাঁর এই পদক্ষেপও ইকরামাকে সঠিক পথে আনতে পারেনি। ইসলামের বিরুদ্ধে ইকরামা এইসব তৎপরতা চালিয়েছিল। ফলে মক্কা বিজয়ের পর তিনি প্রিয় নবীর (সাঃ) সামনে যাওয়ার হিম্মত বা সাহস করতে পারেননি এবং জীবন বাঁচানোর জন্য ইয়েমেনের দিকে পালিয়ে যান। এদিকে হযরত উম্মে হাকিম (রাঃ), পিতা হারিছ (রাঃ) বিন হিশাম এবং মা ফাতিমা (রাঃ) বিনতে ওয়ালিদ তিনজন হুজুরের খিদমতে হাজির হলেন এবং সত্য অন্তরে ইসলাম গ্রহণ করে নিলেন। স্বামীর প্রতি হযরত উম্মে হাকিমের (রাঃ) সীমাহীন ভালোবাসা ছিলো। ইকরামা কুফর ও শিরকের ফাঁদে আটকা পড়ে থাক এটা তাঁর সহ্যের বাইরে ছিল। বস্তুত তিনি অত্যন্ত দরদের সঙ্গে রহমতে আলমের (সাঃ) নিকট স্বামীর নিরাপত্তা চেয়ে মিনতি জানালেন। হুজুর (সাঃ) তাঁর দরখাস্ত কবুল করলেন এবং তিনি ইকরামার সন্ধানে সাগরের তীরের দিকে রওয়ানা হয়ে গেলেন।।

এদিকে ইকরামা মক্কা থেকে পালিয়ে লোহিত সাগরের কূলে পৌছলেন। এ সময় ইয়েমেন গমনকারী একটি নৌকা প্রস্তুত ছিল। তিনি তাতে চেপে বসেন। কিছু দূর যাওয়ার পর নৌকাটি ঝড়-তুফানের দুর্যোগে পড়ে। ইকরামা লাত ও উজ্জাকে

www.bjilibrary.com

ডাকা শুরু করলেন। মাঝিরা বললেন, এখন আল্লাহকে ডাকার সময়। লাত এবং উজ্জা দুর্যোগ থেকে নৌকাকে বাঁচাতে পারেনা। এই কথা ইকরামার মনের ওপর প্রভাব ফেললো। হাফিজ ইবনে হাজার "ইসাবাহ" তে লিখেছেন, এসময় ইকরামা এই বলে দোয়া করেছিলেনঃ

"হে আল্লাহ! আমি ওয়াদা করছি যে, এই তুফান যদি আমাকে জীবিত ছেড়ে দেয়, তাহলে আমি নিজেকে মুহাম্মাদের (সাঃ) সামনে পেশ করবো। তিনি বড় মেহেরবান ও দয়ালু। (আশা করি) তিনি আমার নিকট জবাব চাইবেন না।"

খোদার কুদরাত। নৌকা সহিহ সালামতে সেই স্থানে এসে লাগলো যেখান থেকে রওয়ানা দিয়েছিল। ইত্যবসরে হযরত উম্মে হাকিমও (রাঃ) স্বামীর সন্ধানে তীরে এসে পড়েছিলেন। তিনি হযরত ইকরামাকে (রাঃ) বললেন, আমি এমন একজন মানুষের নিকট থেকে আসছি যিনি সবচেয়ে বেশী নেক এবং সবচেয়ে বেশী মেহেরবান ও স্নেহপরায়ন এবং আত্মীয়ের হক আদায়কারী। আমি তাঁর নিকট থেকে তোমার নিরাপত্তার নিশ্চয়তা পেয়েছি। এখন আমার সঙ্গে তাঁর নিকট চলো। ইকরামা (রাঃ) তৎক্ষণাৎ এই প্রস্তাব মেনে নিলেন এবং হযরত উম্মে হাকিমের (রাঃ) সঙ্গে রাসূলের (সাঃ) নিকট উপস্থিত হলেন। হুজুর (সাঃ) তাঁকে দেখে খুব খুশী হলেন এবং "স্বাগত হে ভিনদেশগামী সওয়ার" হিসেবে আখ্যায়িত করে উষ্ণ সম্বর্ধনা জানালেন। হযরত ইকরামা (রাঃ) স্ত্রী উম্মে হাকিমের (রাঃ) দিকে ইঙ্গিত করে আরজ করলেনঃ "সে বলেছে, আপনি আমার প্রাণ ভিক্ষা দিয়েছেন।" হুজুর (সাঃ) বললেনঃ "হাঁ, সে ঠিকই বলেছে। তুমি মাহফুজ এবং নিরাপদ।"

ইকরামাহ (রাঃ) এই দয়ায় এত প্রভাবিত হলেন যে, সেই সময়ই তিনি সত্য অন্তরে ইসলাম গ্রহণ করলেন এবং ওয়াদা করলেন যে, ভবিষ্যতে তাঁর ধন-সম্পদ ও জীবন জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহর জন্য ওয়াকফ থাকবে। এর পর তাঁর জীবনে এক মহাবিপ্লব সাধিত হয়। যে তীব্রতার সঙ্গে তিনি ইসলামের বিরোধিতা করেছিলেন, তারচেয়েও বেশী উদ্দীপনার সঙ্গে তিনি ইসলামের খিদমত করেন। ১১ হিজরীতে হুজুরের (সাঃ) ওফাতের পর হযরত আবুবকর সিদ্দিকের (রাঃ) শাসনামলে ধর্মদ্রোহিতার ফিতনা মথা চাড়া দিয়ে উঠলে তিনি তার মূলোৎপাটনের জন্য জীবন বাজি রাখেন। এই ফিতনার মূলোৎপাটিত হলে এবং মুসলমানরা সিরিয়া আক্রমণ করলে হযরত ইকরামাহ (রাঃ) হযরত উম্মে হাকিমকে (রাঃ) সঙ্গে নিয়ে সিরিয়ার অভিযানে গমনকারী মুজাহিদদের দলে শামিল হয়ে যান। কয়েকটি যুদ্ধে অত্যন্ত বীরত্বের সঙ্গে রোমকদের বিরুদ্ধে জিহাদ করেন এবং অবশেষে আজনাদাইনের যুদ্ধে

www.bjilibrary.com

অত্যন্ত বাহাদুরীর সাথে লড়াই করে শহীদ হয়ে যান। এইভাবে হযরত উম্মে হাকিম (রাঃ) বিদেশ বিভুইয়ে বিধবা হয়ে যান।

ইদ্দত শেষ হওয়ার পর হযরত উম্মে হাকিম (রাঃ) নিকাহর পয়গাম পেতে লাগলেন। তারমধ্যে হযরত খালিদ (রাঃ) বিন সাঈদ বিন আছের পয়গামও ছিল। উম্মে হাকিম (রাঃ) অন্যসব পয়গাম প্রত্যাখ্যান করলেন। কিন্তু হযরত খালিদ (রাঃ) বিন সাঈদের সঙ্গে নিকাহর ব্যাপারে সম্মতি প্রকাশ করেন। হযরত খালিদ (রাঃ) বিন সাঈদ একজন বড় জালিলুল কদর সাহাবী ছিলেন। তিনি সাবিকুনা আউয়ালুনের মধ্যে বা প্রাচীন মুসলমান ছিলেন। তিনি দুই হিজরতেরই (হাবশা ও মদীনা) মর্যাদা লাভ করেছিলেন এবং মক্কা বিজয়, হুনাইন, তায়েফ ও তাবুকের যুদ্ধেও প্রিয় নবীর (সাঃ) সঙ্গী হওয়ার সৌভাগ্য পেয়েছিলেন। এজন্য হযরত উম্মে হাকিম (রাঃ) তাঁকে অন্যদের ওপর অগ্রাধিকার দিয়েছিলেন। সুতরাং চারশ' দিনার মোহরের বিনিময়ে মারজুস সফর নামক স্থানে হযরত খালিদ (রাঃ) বিন সাঈদের সঙ্গে তাঁর নিকাহ হয়। স্থানটি দামেস্কের নিকট অবস্থিত। সে সময় ইসলামী বাহিনী দামেস্কের দিকে অগ্রসর হচ্ছিল। নিকাহর পর হযরত খালিদ (রাঃ) বিন সাঈদ উরুসের রসম আদায় করার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। হযরত উম্মে হাকিম (রাঃ) বললেন, "দুশমন মাথার ওপর দাঁড়িয়ে এবং সব সময়ই যুদ্ধের ভয় রয়েছে। এজন্য কিছুদিন অপেক্ষা করে শান্তির সঙ্গে রসম আদায় হওয়াটাই উত্তম হবে।" হযরত খালিদ (রাঃ) বিন সাঈদ বললেন, এই যুদ্ধে আমি শহীদ হয়ে যেতে পারি। উম্মে হাকিম (রাঃ) চুপ মেরেগেলেন।

একটি পুলের নিকট (বর্তমানে যাকে উম্মে হকিমের পুল বলা হয়) উরুসের রসম আদায় হলো। সকালে ওয়ালিমার দাওয়াত হলো। তখনো লোকজন খাওয়া শেষ করেনি। এমন সময় রোমকরা হামলা করে বসলো। এক বিরাট বপুর রোমক সকলের আগে ছিল এবং মুসলমানদেরকে আহ্বান জানাচ্ছিল। হযরত খালিদ (রাঃ) বিন সাঈদ তীর বেগে তাকে মুকাবিলা করার জন্য বেরিয়ে গেলেন এবং অত্যন্ত বাহাদুরীর সঙ্গে লড়াই করে তার হাতে শাহাদাতের পেয়ালা পান করলেন। তারপর সাধারণ যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল। হযরত উম্মে হাকিম (রাঃ) স্বামীর শাহাদাতের দৃশ্য অবলোকন করছিলেন। তিনি অত্যন্ত উৎসাহের সঙ্গে উঠে দাঁড়ালেন। নিজের কাপড় বাঁধলেন এবং তাঁবুর খুঁটা উঠিয়ে লড়াইয়ে শরীক হয়ে গেলেন। এই খুঁটা দিয়েই তিনি রোমকদেরকে জাহান্নামে প্রেরণ করছিলেন। এই যুদ্ধে তিনি সাতজন রোমককে হত্যা করেন।

www.bjilibrary.com

এক রাওয়ায়েতে আছে, হযরত উম্মে হাকিম (রাঃ) ইয়ারমুকের ভয়াবহ যুদ্ধেও অংশ নিয়েছিলেন এবং অন্যান্য মহিলার সঙ্গে মিলে রোমকদের বিরুদ্ধে অত্যন্ত বাহাদূরীর সঙ্গে লড়াই করেন। ইতিহাস গ্রন্থে হযরত উম্মে হাকিমের (রাঃ) ব্যাপারে আর কোন তথ্য জানা যায়নি। কেউ ওফাতের সময়ও বলেননি এবং সন্তান-সন্তুতি সম্পর্কেও কেউ কিছু লিখেননি।

হযরত ছুফিয়াহ (রাঃ) বিনতে রবিয়াহ

কোরেশের অত্যন্ত সম্ভ্রান্ত বংশ বনু আবদি শামসের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত ছিলেন। নসবনামা হলোঃ ছুফিয়াহ (রাঃ) বিনতে রবিয়াহ বিন আবদি শামস বিন আবদি মান্নাফ বিন কুসাই।

কোরেশের প্রখ্যাত সরদার উতবাহ বিন রবিয়াহ এবং শাইবাহ বিন রবিয়াহ তাঁর ভাই ছিল। এই দু'জনই বদরের যুদ্ধে নিহত হয়। ওসমান বিন আশ-শারিদ মাখজুমির সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়েছিল। তাঁর ঔরসেই হযরত শামমাস (রাঃ) জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তিনি একজন জালিলুল কদর সাহাবী ছিলেন। ওসমান বিন আশ-শারিদ ইসলামের যুগ পাননি। শামমাস (রাঃ) অল্প বয়স্ক ছিলেন এমন সময় তিনি মারা যান। এতিম শামমাসকে (রাঃ) তাঁর মামা উতবাহ বিন রবিয়াহ নিজের লালন পালনে নিয়ে নেয় এবং স্বসন্তানের মত তাঁকে লালন-পালন করে। শামমাস (রাঃ) বাহ্যিক রূপ যৌবনে যেমন নজিরবিহীন ছিলেন তেমনি ছিলেন সুন্দর চরিত্রবান। নুবয়তের পর বিশ্বনবী (সাঃ) তাওহীদের দাওয়াত প্রদান শুরু করলেন। হযরত শামমাস (রাঃ) কোন চিন্তা-ভাবনা ছাড়াই হক দাওয়াত কবুল করলেন। হযরত ছুফিয়াহও (রাঃ) ভাইদের ইসলাম দুশমনি সত্ত্বেও পুত্রের সঙ্গে ইসলাম গ্রহণ করেন। মুশরিকরা যখন মক্কায় মুসলমানদের ওপর চরম জুলুম-নির্যাতন শুরু করলো তখন রহমতে আলম (সাঃ) সাহাবীদেরকে হাবশায় হিজরতের অনুমতি দিলেন। বস্তুত অনেক মজলুম মুসলমান নবুয়তের ৫ ও ৬ বছরের পর হাবশা হিজরত করে গেলেন। তাঁদের মধ্যে হযরত ছুফিয়াহ (রাঃ) এবং হযরত শামমাসও (রাঃ) অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। কিছুদিন পর মা ও পুত্র উভয়েই সেখান থেকে মক্কা ফিরে এলেন এবং পুনরায় মক্কা থেকে মদীনা

www.bjilibrary.com

হিজরত করেন। সেখানে হযরত মুবাশশির (রাঃ) বিন আব্দুল জানযার আনসারী তাঁদেরকে মেহমান বানিয়ে নিলেন।

হযরত শামমাস (রাঃ) প্রথমে বদরের যুদ্ধে অংশ নেন এবং তারপর ওহোদের যুদ্ধে বীরত্ব প্রদর্শন করেন। এই যুদ্ধেই তিনি গুরুতর আহত হন এবং পরপারের ডাকে যাত্রা করেন।

হযরত ছুফিয়ার (রাঃ) ওফাতের সাল এবং বিস্তারিত অবস্থা জানা যায়নি।

হযরত তাইয়্যেবাহ (রাঃ) বিনতে ওয়াহাব

হযরত তাইয়্যেবাহ (রাঃ) বিনতে ওয়াহাব জালিলুল কদর সাহাবী হযরত আবু মুসা আশয়ারীর (রাঃ) মা ছিলেন। আক গোত্রের সঙ্গে তিনি সম্পর্কযুক্ত ছিলেন। আল্লামা ইবনে আছির (রঃ) ''উসুদুল গাব্বাহ'' গ্রন্থে লিখেছেন যে, স্বীয় পুত্র হযরত আবু মুসা আশয়ারীর (রাঃ) তাবলীগে তিনি মুসলমান হন এবং মদীনা পৌছে মারা যান।

হযরত উম্মে হাকিম (রাঃ) বিনতে যোবায়ের

বিশ্ব নবী হযরত মুহাম্মাদ মুস্তাফার (সাঃ) আপন চাচা যোবায়ের বিন আব্দুল মুত্তালিবের কন্যা ছিলেন। ইসলাম গ্রহণ ও সাহাবী হওয়ার মর্যাদা লাভ করেছিলেন। হযরত দাবায়াহ (রাঃ) তাঁর সহোদরা এবং হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) সহোদর ছিলেন। রাসূলে করিম (সাঃ) সাহাবী হযরত মিকদাদ (রাঃ) বিনুল আসওয়াদের সঙ্গে হযরত দাবায়াহ'র (রাঃ) বিয়ে দিয়েছিলেন। হযরত আব্দুল্লাহ (রাঃ) আজনাদাইনের যুদ্ধে বীরত্বের সঙ্গে লড়াই করে শহীদ হয়ে যান।

www.bjilibrary.com

রহমতে আলম (সাঃ) এই দুই ভাই- বোনকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন। হযরত উম্মে হাকিমের (রাঃ) জীবনী সম্পর্কে বিস্তারিত আর কিছু কোন কিতাবে পাওয়া যায়নি।

হযরত হালিমা সাদিয়াহ (রাঃ)

নাম হালিমা। আবু জুয়েব আব্দুল্লাহ বিন হারিছের কন্যা এবং হারিছ বিন আব্দুল উজ্জা বিন রিফায়াহর স্ত্রী ছিলেন।

হযরত হালিমার (রাঃ) সম্পর্ক ছিল সা'দ বিন বকর গোত্রের সঙ্গে। গোত্রটি ছিল হাওয়াযেন গোত্রের একটি শাখা। বাকপটুতা এবং এলাকার পানি মিষ্টি হওয়ার কারণে খুব মশহুর ছিল। প্রিয় নবী (সাঃ) বলতেন, আল্লাহ পাক আমাকে সকল আরবের মধ্যে বাকপটু বানিয়েছেন। প্রথমতঃ আমাদের কবিলা কোরেশ ভাষা এবং বাকপটুতার দিক থেকে নজিরবিহীন। দ্বিতীয়তঃ আমি বনি সা'দে লালিত-পালিত হয়েছি। তারাও বাকপটুতায় প্রসিদ্ধ। সম্ভ্রান্ত আরবদের প্রথা ছিল যে, তাঁরা শিশুদেরকে মায়ের নিকট রাখতেন না। লালন-পালনের জন্য প্রায়ই নিকটবর্তী বা পার্শ্ববর্তী উপজাতীয় গ্রামে অন্য মহিলার কাছে প্রেরণ করতেন। শিশু গ্রামের খোলা আবহাওয়াতে লালিত পালিত হতো। কয়েক বছর পর তার মাতা-পিতা ফেরত নিয়ে যেতেন। কিছুদিন পরপরই গ্রামের গরীব মহিলারা শহরে আসতো এবং এ সময়ে যেসব শিশু জন্মগ্রহণ করতো তাদেরকে নিয়ে যেত।

বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মাদ মুস্তাফা (সাঃ) বিশ্বে শুভাগমনের পর সাতদিন পর্যন্ত মায়ের দুধ পান করেছিলেন। এরপর হযরত ছুয়াইবা (রাঃ) কিছুদিন দুধ পান করিয়েছিলেন। এই সময় বনি সা'দ গোত্রের কতিপয় মহিলা শিশু নেয়ার জন্য মক্কা আসেন। তাঁদের মধ্যে হযরত হালিমাও (রাঃ) ছিলেন। অন্যান্য মহিলা বিত্তশালী লোকদের শিশু নিয়ে নেন। কিন্তু হযরত হালিমা (রাঃ) কোন শিশু পাননি। ফিরেই যাচ্ছিলেন, এমন সময় জানতে পেলেন যে, কোরেশ সরদার আব্দুল মুত্তালিবের একটি ইয়াতিম পৌত্র আছে। স্বামীর সঙ্গে পরামর্শ করলেন যে, এই শিশুর তো পিতাই নেই। থাকলে না হয় তার প্রতিপালনের বিনিময়ে আমাদেরকে কিছু দিত। অবশ্য তাঁর

www.bjilibrary.com

দাদা সম্ভ্রান্ত এবং উচ্চ বংশের লোক। আশা করা যায় যে, এই শিশুর বদৌলতে আল্লাহ পাক আমাদের কল্যাণের ব্যবস্থা করে দিতে পারেন।

স্বামী বললেন, ঠিক আছে, কোন অসুবিধা নেই। শিশুটিকে অবশ্যই নিয়ে নাও। শূন্যহাতে ফিরে যাওয়া ভালো মনে হয় না। হযরত হালিমা (রাঃ) তৎক্ষণাৎ গিয়ে মক্কার ইয়াতিমকে নিয়ে এলেন। তিনি তো একথা জানতেন না যে, এই শিশু দিন–দুনিয়ার সরদার এবং তাঁকে দুধ পান করিয়ে তিনি মহান সৌভাগ্য অর্জন করতে যাচ্ছেন। সে সময় আরবে দুর্ভিক্ষ চলছিলো। খরার কারণে পশুর স্তনের দুধ শুকিয়ে গিয়েছিল। অভুক্ততার কারণে মহিলাদের স্তনেও দুধ হতো না এবং তাদের শিশুরা ক্ষুধায় কাতরাতো। হযরত হালিমা (রাঃ) মক্কা আসার সময় সঙ্গে দুধের শিশুও ছিল। ক্ষুধা এবং পিপাসায় সেও সব সময় কাঁদতো। হযরত হালিমা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, যেদিন তিনি প্রিয় নবীকে (সাঃ) কোলে তুলে নিয়েছিলেন সেই দিনই তাঁর পরিস্থিতি সম্পূর্ণ পরিবর্তন হয়ে গিয়েছিলো। তাঁর শুকনো স্তনও দুধে পরিপূর্ণ হয়ে গেল এবং তাদের উটনীর স্তনও দুধে ভরে গেল। দু'টি শিশুই খুব তৃপ্তির সঙ্গে এবং আমরাও পেটপুরে উটনীর দুধ পান করলাম। মক্কা থেকে আমরা যখন রওয়ানা হলাম তখন আমাদের দুর্বল গাধা এত দ্রুতগতিতে চলতে লাগলো যে সকল কাফেলাকে পিছু ফেলে দিল। আমার স্বামী এবং কাফেলার অন্য লোক বার বার একথাই বলতে লাগলো যে, শিশুটি খুব বরকত বিশিষ্ট এবং হালিমা (রাঃ) বড় ভাগ্যবতী। আমরা যখন আমাদের বাড়ী পৌঁছলাম তখন আমাদের বকরীর স্তন দুধে ভরে গেল। গ্রামের অন্যদের পশুর দুধের স্তন যথারীতিই শুকনো ছিল এবং লোকজন আমাদেরকে ঈর্ষা করতো। অবশেষে সকল গ্রামবাসীই আমার পশুর সঙ্গে তাদের পশু চরাতে লাগলো। খোদার কুদরতে সেইসব পশুরও দুধ নামলো।

হালিমা (রাঃ) ও তাঁর পরিবার–পরিজন এই ভাগ্যবান শিশুর জন্য একদম ফিদা ছিলেন এবং অত্যন্ত স্নেহ ও ভালোবাসার সঙ্গে হুজুরের (সাঃ) লালন–পালন করতে লাগলেন। প্রিয় নবীর (সাঃ) বয়স দু'বছর হলে হযরত হালিমা (রাঃ) হুজুরকে (সাঃ) সঙ্গে নিয়ে মক্কায় বিবি আমেনার নিকট এলেন। তিনি নিজের শিশু পুত্রকে দেখে খুশীতে বাগবাগ হয়ে গেলেন এবং খুব আদর করলেন। মন বিচ্ছিন্ন হতে চাচ্ছিল না। হযরত হালিমা বললেন, ''মক্কায় আবহাওয়া এ সময় খুব খারাপ। বর্তমানে শিশুটিকে যদি আপনি আমার নিকট রেখে দেন তাহলে সেইটাই ভালো হবে।'' বিবি আমেনা তাঁর কথা মেনে নিলেন এবং হযরত হালিমা (রাঃ) হুজুরকে (সাঃ) সঙ্গে নিয়ে নিজের কবিলায় ফিরে এলেন।

www.bjilibrary.com

এক রাওয়ায়েতে আছে, হযরত হালিমা (রাঃ) শিশু হুজুরকে (সাঃ) খাওয়ানোর সময় এই আবেদন জানাতেনঃ "হে খোদা! তুমিতো তাঁকে আমার নিকট সোপর্দ করেছ, এজন্য তাঁকে প্রয়োজন মাফিক সাহায্য কর এবং তাঁকে জ্ঞান ও বুজুর্গীর শীর্ষতা প্রদান কর। উপরন্তু তাঁকে শয়তান ও তার খারাপ কাজ থেকে মাহফুজরাখো।"

পাঁচ বছর পর্যন্ত প্রিয় নবী (সাঃ) হযরত হালিমার (রাঃ) নিকট লালিত পালিত হন। ইত্যবসরে সিনা চাকের ঘটনা সংঘটিত হলো। ঘটনার বিবরণ হলোঃ একদিন হযরত হালিমার (রাঃ) দুই সন্তান দৌড়ে তাঁর নিকট এসে বললো, দু'জন সাদা পোশাকধারী মানুষ আমাদের কোরেশী ভাইকে ধরে নিয়ে গিয়ে হত্যা করে ফেলেছে। হযরত হালিমা এবং তাঁর স্বামী হারিছ অস্থির হয়ে সেদিকে দৌড় দিলেন। তাঁরা দেখলেন যে, হুজুর (সাঃ) সহিহ সালামতে আছেন। কিন্তু চেহারার রং পরিবর্তিত হয়ে গেছে। হযরত হালিমা (রাঃ) হুজুরকে (সাঃ) কোলে তুলে নিলেন এবং কি হয়েছিল জিজ্ঞেস করলেন। হুজুর (সাঃ) বললেন, সাদা পোশাকধারী দু'জন মানুস আমার নিকট এলেন এবং আমাকে চিত করে শুইয়ে আমার বুক ফাড়লেন এবং আমার দিল বা কলিজা বের করলেন। পুনরায় তা থেকে যেন কি বের করলেন। অতঃপর আমার দিল বা অন্তরকে বুকের মধ্যে রেকে ঠিক করে দিলেন।

হযরত হালিমা (রাঃ) এবং তাঁর স্বামী এ ঘটনা শুনে হয়রান হয়ে পড়লেন যে, শিশুটির কোন ক্ষতি না হয়। সুতরাং পরস্পর পরামর্শ করে তাঁরা হুজুরকে (সাঃ) সঙ্গে নিয়ে মক্কা পৌছলেন এবং হাতীর বছরের ৬ষ্ঠ সালে হুজুরের (সাঃ) বয়স পাঁচ বছর দু' দিন হলে দুনিয়ার সবচেয়ে মূল্যবান আমানতকে তাঁর মায়ের কাছে সোপর্দ করে দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে সিনা চাকের ঘটনা বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করলেন এবং শিশু হুজুরের (সাঃ) ব্যাপারে আশংকা প্রকাশ করলেন। বিবি আমেনা বললেন, "তুমি আশংকা করছো যে কোন জ্বিন অথবা শয়তান এই শিশুকে ক্ষতি করবে। অবশ্যই নয়। আমার পুত্র বিশ্বে একজন মহান ব্যক্তি হতে চলেছে। সে প্রতিটি মুসিবত থেকে মাহফুজ থাকবে এবং খোদা তাকে সকল অবস্থাতেই হেফাজত করবেন।" এরপর হযরত বিবি আমেনা অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় নবীর (সাঃ) জন্মের সময়কার মু'জিজা বর্ণনাকরলেন।

হযরত হালিমা (রাঃ) সম্পূর্ণ অনিচ্ছায় এই মূল্যবান সম্পদকে মক্কায় রেখে স্বগোত্রে ফিরে এলেন।

www.bjilibrary.com

তারপর বেশ কিছুদিন হযরত হালিমা (রাঃ) জীবিত ছিলেন। ইবনে সা'দ (রঃ) মুহাম্মাদ বিন মুনকাদিরের উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেছেন, একবার এক মহিলা হুজুরের (সাঃ) খিদমতে হাজির হলেন। তিনি শৈশবে তাঁকে দুধ পান করিয়েছিলেন। তাঁকে দেখে হুজুর (সাঃ) ''আমার মা, আমার মা'' বলে উঠে দাঁড়ালেন এবং নিজের চাদর বিছিয়ে তাঁকে বসালেন। এই মহিলা নিঃসন্দেহে হযরত হালিমা (রাঃ) ছিলেন।

তাবকাতে ইবনে সা'দেরই অন্য একটি রাওয়ায়েত অনুযায়ী হযরত খাদিজাতুল কুবরার (রাঃ) সঙ্গে হুজুরের (সাঃ) বিয়ের পর একবার হযরত হালিমা (রাঃ) তাঁর খিদমতে হাজির হয়ে দুর্ভিক্ষের অভিযোগ করলেন। হুজুর (সাঃ) তাঁকে ৪০টি বকরী এবং সামানে ভর্তি একটি উট দান করলেন।

আল্লামা সোহায়লী (রঃ) রাওজুল আনফ পুস্তকে লিখেছেন, একবার হযরত হালিমা (রাঃ) হুজুরের (সাঃ) খিদমতে হাজির হলেন। এ সময় হযরত খাদিজাতুল কুবরা (রাঃ) তাঁকে কয়েকটি উটনী দান করলেন। উটগুলো নিয়ে তিনি দোয়া করতে করতে চলে গেলেন।

হাফিজ ইবনে হাজার (রঃ) ''ইসাবাহ'তে লিখেছেন, হুনাইনের যুদ্ধের (অষ্টম হিজরীর শওয়াল মাস) পর হুজুর (সাঃ) যখন জি'রানাহ'তে অবস্থান করছিলেন তখন হযরত হালিমা (রাঃ) তাঁর খিদমতে হাজির হলেন। হুজুর (সাঃ) তাঁকে খুব শ্রদ্ধা প্রদর্শন করলেন এবং নিজের চাদর বিছিয়ে তাতে তাঁকে বসালেন। অন্য রাওয়ায়েত অনুযায়ী আগত এই মহিলা হালিমা (রাঃ) ছিলেন না। বরং তিনি ছিলেন তাঁর কন্যা শিমা(রাঃ)।

যাহোক, এই সকল রাওয়ায়েত থেকে জানা যায় যে, হযরত হালিমা (রাঃ) প্রায়ই প্রিয় নবীর (সাঃ) খিদমতে হাজির হতেন এবং হুজুর (সাঃ) তাঁর প্রতি অত্যন্ত শ্রদ্ধা প্রদর্শন করতেন এবং ইহসান ও মুহাব্বাতের আচরণ করতেন। অনেক চরিত গ্রন্থই হযরত হালিমার (রাঃ) ইসলাম গ্রহণ ও সাহাবী হওয়ার ব্যাপারে নীরব। কিন্তু বিভিন্ন দলিলে জানা যায় যে, তিনি ইসলাম গ্রহণ এবং সাহাবীর মর্যাদায় অবশ্যই অভিষিক্ত ছিলেন। ইমাম সোহায়লী (রঃ) ''রাওজুল আনফ''–এ বলেছেন, ''হযরত হালিমার (রাঃ) স্বামী হারিছ (রাঃ) বিন আব্দুল উজ্জা হুজুরের (সাঃ) নবুয়ত প্রাপ্তির পর একবার মক্কা এলেন এবং মুশরিকদের প্রতারণা সত্ত্বেও তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন এবং তাতে অটল রইলেন।'' স্পষ্ট কথা হলো, স্বামীর ইসলাম গ্রহণের পর হযরত হলিমাও (রাঃ) অবশ্যই ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। এভাবে তাঁর সাহাবী হওয়ার ব্যাপারেও কোন সন্দেহ নেই।

www.bjilibrary.com

হযরত শিমা (রাঃ) বিনতে হারিছ

নাম ছিল জাদামাহ এবং ডাক নাম ছিল শিমা (রাঃ)। পিতার নাম হলো হারিছ বিন আব্দুল উজ্জা বিন রাফায়াহ। মা ছিলেন হযরত হালিমা (রাঃ) সাদিয়াহ। তিনি নবী করিমের (সাঃ) দুধ মা ছিলেন।

''সিরতে হালবিয়াহ'' গ্রন্থে আছে, শৈশবকালে হুজুর (সাঃ) হযরত হালিমার (রাঃ) তত্ত্বাবধানে লালিত-পালিত হন। এ সময় শিমা (রাঃ) শিশু নবীকে (সাঃ) কোলে নিয়ে খেলা করতেন এবং তাঁকে ঘুম পাড়ানীর গান গেয়ে শুনাতেন। গানের মমার্থ হলোঃ ''হে আল্লাহ! মুহাম্মাদকে জীবিত রেখ। এমনকি যাতে আমরা তাকে জওয়ান দেখি। অতঃপর আমরা যেন তাকে একজন সম্মানিত সরদার হিসেবে দেখি। তাছাড়া তার সঙ্গে শত্রুতাকারী দুশমণ যেন পরাজিত হয়। হে আল্লাহ! মুহাম্মাদকে স্থায়ী সম্মান প্রদান কর।''

হুনাইনের যুদ্ধ পর্যন্ত শিমা (রাঃ) অখ্যাত অবস্থায় স্বগোত্রে বসবাস করতে থাকেন। ওদিকে শিমার (রাঃ) সেই শিশু মুহাম্মাদকে (সাঃ) আল্লাহ পাক শীর্ষ মান-ইজ্জত দিয়েছেলেন। অষ্টম হিজরীর রমযান মাসে হুজুর (সাঃ) মক্কা জয় করেছিলেন এবং একই হিজরীর শওয়ালে হুনাইন যুদ্ধ সংঘটিত হয়। বনি হাওয়াযেন এবং বনি ছাকিফের গোত্রসমূহ তায়েফের জায়গীরের লোভে চার হাজার যোদ্ধা নিয়ে মক্কার ওপর হামলার কথা ঘোষণা করলো। অন্যদিকে হুজুর (সাঃ) নিজের জীবন উৎসর্গকারীদেরকে নিয়ে মক্কা থেকে বের হয়ে হুনাইনে উপস্থিত হলেন। এক রক্তাক্ত যুদ্ধের পর শত্রুরা পরাজিত হলো এবং তারা নিরাপত্তা চাইলো। রাহমাতুললিল আলামীন (সাঃ) তাদেরকে ক্ষমা করে দিলেন এবং সকল কয়েদীকে মুক্ত করে দিলেন।

এই কয়েদীদের মধ্যে শিমাও (রাঃ) ছিলেন। যখন তাঁকে হুজুরের (সাঃ) সামনে আনা হলো তখন আরজ করলেনঃ "ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি আপনার দুধ বোন। (রাসূলে করিম (সাঃ) এবং শিমা (রাঃ) উভয়েই বিবি হালিমার (রাঃ) দুধ পান করেছিলেন।" এরপর তিনি এমন এক চিহ্নের কথা বললেন যে, তাতে আর কোন

www.bjilibrary.com

সন্দেহের অবকাশ রইলো না। (কতিপয় রাওয়ায়েতে আছে, শৈশবকালে একদিন হযরত শিমা (রাঃ) হুজুরের (সাঃ) সাথে খেলা করছিলেন। কোন কথায় অসন্তুষ্ট হয়ে শিশু হুজুর (সাঃ) শিমার (রাঃ) কাঁধের ওপর অথবা পিঠের ওপর এত জোরে কামড় দেন যে, আজীবন তার দাগ পড়ে যায়। হুনাইনের যুদ্ধের সময় শিমা (রাঃ) সেই চিহ্নই হুজুরকে (সাঃ) দেখিয়েছিলেন) হুজুর (সাঃ) নিজের শৈশবের কথা স্মরণ করে বিহবল হয়ে পড়েন এবং নিজের পবিত্র চাদর মাটিতে বিছিয়ে শিমাকে (রাঃ) অত্যন্ত সম্মানের সঙ্গে বসান। অতঃপর তাঁকে বলেনঃ "বোন। তুমি যদি আমার নিকট থাকতে চাও তাহলে অত্যন্ত আরামের সঙ্গে থাকো। আর যদি স্বগোত্রে ফিরে যেতে চাও তাতেও তোমার স্বাধীনতা রয়েছে।"

হযরত শিমার (রাঃ) জীবন স্বগোত্রেই কেটে গিয়েছিল। তিনি ফিরে যাওয়াই পছন্দ এবং সঙ্গে সঙ্গে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। হুজুর (সাঃ) অত্যন্ত মান-সম্মানের সঙ্গে তাঁকে স্বগোত্রে ফেরত পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। সে সময় তিনি তাঁকে কিছু অর্থ, একটি বকরী, তিনটি গোলাম এবং একটি দাসী প্রদান করেছিলেন।

হযরত হিন্দ (রাঃ) বিনতে উতবাহ

নাম হিন্দ বা হিন্দাহ। তিনি কোরেশের বনু আবদি শামস বংশোদ্ভূত ছিলেন। বংশনামা হলোঃ হিন্দ বিনতে উতবাহ বিন রবিয়া বিন আবদি শামস বিন আবদি মান্নাফ।

উতবাহ বিন রবিয়াহ কোরেশের সম্মানিত সরদার ছিল। মা'র নাম ছিল ছুফিয়াহ বিনতে উমাইয়াহ। প্রথমে ফাকিহাহ বিন মুগিরাহ মাখজুমীর সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল। তার সঙ্গে বনিবনা না হওয়াতে আবু সুফিয়ান বিন হারবের সঙ্গে বিয়ে হয়।

হিন্দের পিতা উতবাহ বিন রবিয়াহ এবং স্বামী আবু সুফিয়ান ইসলামের কঠোর দুশমন ছিলো। হিন্দও ইসলাম দুশমনীতে কম যেতেন না। হিজরতের পর দ্বিতীয় হিজরীতে বদরের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এই যুদ্ধে হিন্দের পিতা উতবাহ কোরেশের অন্য কয়েকজন সরদারসহ নিহত হয়। তারমধ্যে আবু জেহেলও ছিল। তারপর মক্কায় মুশরিকদের নেতৃত্ব আসে আবু সুফিয়ানের হাতে। হিন্দাহ অত্যন্ত

www.bjilibrary.com

উৎসাহ-উদ্দীপনার সঙ্গে স্বামীর সাহায্য করেন। তিনি অগ্নিঝড়া বক্তা ছিলেন এবং পিতার হত্যা তাঁর অন্তরে প্রতিশোধের আগুন জ্বেলে দিয়েছিল। তৃতীয় হিজরীতে মক্কার মুশরিকরা আবু সুফিয়ানের নেতৃত্বে ব্যাপক প্রস্তুতিসহ মদীনার ওপর হামলা করে এবং ওহোদের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। হিন্দ বিশেষ করে পিতার হত্যাকারী হযরত হামযার (রাঃ) প্রতিশোধ নিতে চাইছিলেন। সুতরাং তিনি জোবায়ের বিন মাতয়ামের গোলাম ওয়াহশীকে (রাঃ) হযরত হামযাকে (রাঃ) হত্যার জন্য উদ্বুদ্ধ করলেন। ওয়াহশী বর্শা নিক্ষেপে খুব পারদর্শিতা রাখতো। লড়াই যখন তুঙ্গে তখন হিন্দ আগুনঝরা বীরত্ব গাথা পড়ে পড়ে কাফেরদেরকে উদ্বুদ্ধ করছিলেন। ওয়াহশী বর্শা হাতে তাক করে বসে গেল। হযরত হামযা (রাঃ) যেই তার নাগালে এ ফোঁড় ওফোঁড় হয়ে গেল এবং তিনি আল্লাহর ডাকে সাড়া দিলেন। কাফেরদের মহিলারা এই মহান ব্যক্তির শাহাদাতে খুশী হয়ে গীত গাইতে লাগলো। প্রতিশোধ স্পৃহায় হিন্দ হযরত হামযার পেট চিরে কলিজা বের করলেন এবং চিবোলেন। কিন্তু গলার নীচে নামলো না। উগরিয়ে দিতে হলো। এই ঘটনায় রাসূলুল্লাহ (সাঃ) সীমাহীন দুঃখিত হলেন।

অষ্টম হিজরীতে রাসূলে আকরাম (সাঃ) মক্কা জয় করেন এবং বিজয়ীর বেশে ১০ হাজার সাহাবী সমভিব্যাহারে মক্কা প্রবেশ করেন। সে সময় এমন কোন শক্তি ছিল না যে রাসূলে আকরামের (সাঃ) প্রতিশোধ গ্রহণে বাধা দান করে। কিন্তু রহমতে দো-আলম (সাঃ) নিজের ঘোরতর শত্রুকেও ক্ষমা করে দেন। এমনকি তিনি ঘোষণা দেন যে, যে ব্যক্তি আবু সুফিয়ানের (রাঃ) গৃহে আশ্রয় নেবে তার বিরুদ্ধেও কোন ব্যবস্থা নেয়া হবে না। আবু সুফিয়ান (রাঃ) মক্কা বিজয়ের দুই একদিন পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। হিন্দাহও (রাঃ) তখন ইসলামের সত্যতা উপলব্ধি করতে শুরু করেছিলেন। বস্তুত তিনিও কতিপয় বোরকা পরিহিতা মহিলার সঙ্গে রাসূলে করিমের (সাঃ) পবিত্র খিদমতে হাজির হলেন। এ সময় হুজুর (সাঃ) এবং তাঁর মধ্যে এই আলোচনা হয়েছিলঃ

হিন্দাহঃ হে আল্লাহর রাসূল! আপনি আমাদের নিকট থেকে কোন কথার বাইয়াত নিয়ে থাকেন?

রাসূল (সাঃ)ঃ শিরক করো না এবং খোদার একত্ববাদের স্বীকৃতি দাও।

হিন্দাহঃ এই প্রতিশ্রুতি আপনি পুরুষদের নিকট থেকে নেননি। তবুও আমরা মেনে নিলাম।

রাসূল (সাঃ)ঃ চুরি করো না।

www.bjilibrary.com

হিন্দাহঃ আমি আমার স্বামীর অনুমতি ব্যতিরেকে কিছু খরচ করে ফেলি। জানিনা, তা জায়েজ না নাজায়েজ।

রাসূল (সাঃ)ঃ সন্তান হত্যা করো না।

হিন্দাহঃ আমরাতো নিজের সন্তানদেরকে প্রতিপালন করেছিলাম (অর্থাৎ হত্যা করিনি) যখন তারা বড় হয়েছিল, তখন আপনি হত্যা করেন। রাসূলে করিমের (সাঃ) রহমতের অন্তর ছিল প্রশস্ত। হিন্দাহ যদিও তাঁর (সাঃ) প্রিয় চাচার কলিজা চিবিয়েছিলেন এবং এখনো বেআদবীপূর্ণ কথা বলছিলেন, তবুও দয়ার সাগর রাসূলে আকরাম (সাঃ) তাঁর সকল অপরাধ ক্ষমা করে দিলেন। হিন্দাহর নিজের জীবনের আর কোন আশা ছিল না। কিন্তু যখন রাহমাতুললিল আলামীন (সাঃ) তাঁকে সম্পূর্ণ মাফ করে দিলেন তখন তাঁর অন্তরের জগৎ সম্পূর্ণরূপে বদলে গেল এবং তিনি সত্য অন্তরে মুসলমান হয়ে গেলেন। তখন তাঁর মুখ দিয়ে নির্দ্বিধায় বেরিয়ে পড়লোঃ

"ইয়া রাসুলাল্লাহ! এর আগে আপনিই ছিলেন আমার সবচেয়ে বড় শত্রু। কিন্তু আজ আপনিই আমার সবচেয়ে বড় বন্ধু এবং শ্রদ্ধার পাত্র।" এর পর বাড়ী গিয়ে মূর্তি মাবুদকে ভেঙ্গে টুকরো টুকরো করে ফেললেন।

ইসলাম গ্রহণের পর হযরত হিন্দাহর (রাঃ) জীবন সম্পূর্ণভাবে ইসলামের খিদমতের জন্য ওয়াকফ হয়ে গেল। হযরত ওমর ফারুকের (রাঃ) শাসনামলে তিনি স্বামী আবু সুফিয়ানের সঙ্গে সিরিয়ায় গমনকারী মুজাহিদ বাহিনীতে শামিল হন। মুসলমানদের বিরুদ্ধে এই দম্পত্তি যেভাবে যুদ্ধের ময়দানে কাতারবন্দী হতেন তারচেয়েও কয়েক গুণ বেশী উৎসাহ-উদ্দীপনার সঙ্গে কাফেরদের বিরুদ্ধে জিহাদে অংশ নিয়েছিলেন এবং ইসলাম গ্রহণের পুর্বেকার ইসলাম দুশমনীর কাফফারা আদায়ে সামান্যতম ত্রুটিও করেননি।

সিরিয়ার যুদ্ধসমূহের মধ্যে ইয়ারমুকের যুদ্ধ একটি বিরাট সিদ্ধান্তকারী যুদ্ধ ছিল। এই যুদ্ধে রোমের বাদশাহ নিজের পূর্ণ শক্তি নিয়োগ করেছিল। কতিপয় রাওয়ায়েত অনুসারে রোমক সৈন্যের সংখ্যা প্রায় দু' লাখ ছিল। অন্য এক রাওয়ায়েত মতে দশ লাখ ছিল। ইসলামী মুজাহিদদের সংখ্যা ছিল ৩০ থেকে ৪০ হাজার। এই যুদ্ধে হযরত হিন্দ (রাঃ) এবং তাঁর স্বামী আবু সুফিয়ান (রাঃ) উভয়েই অত্যন্ত উৎসাহ-উদ্দীপনার সঙ্গে অংশ নেন। যুদ্ধে শত্রুর প্রচন্ড চাপের কারণে মুসলমানরা কয়েকবার পিছু হটেছিলেন। কিন্তু মহিলারা তাঁদেরকে লজ্জা দিয়েছিলেন এবং স্বয়ং তাঁরা তাঁবুর খুঁটি উঠিয়ে অথবা হাতে পাথর দিয়ে রোমকদের ওপর হামলা করেছিলেন। হযরত হিন্দ (রাঃ) যুদ্ধ গাথা পড়ে পড়ে মুসলমানদেরকে উজ্জীবিত

www.bjilibrary.com

করছিলেন। যদি কোন মুসলমান যুদ্ধ থেকে মুখ ফিরিয়ে পিছু হটতো তাহলে তাঁর ঘোড়ার মুখের ওপর তাঁবুর খুঁটি মেরে লজ্জা দেয়া হতো এবং বলা হতো জান্নাত ছেড়ে জাহান্নাম কিনছো। আর নিজেদের মহিলাদেরকে রোমকদের হাওয়ালা করছো। এই হিন্দাহ (রাঃ) আর অন্যান্য মহিলার অটলতার কারণেই পিছু হটা মুসলমানরা উল্টো এমন জোরে রোমকদের ওপর হামলা করে বসলেন যে, তারা কচুকাটা হয়ে গেল।

একবার পিছু হটনেওয়ালা মুসলমানদের মধ্যে হযরত আবু সুফিয়ানও (রাঃ) ছিলেন। হিন্দ তাঁকে দেখলেন। নিজের তাঁবুর খুঁটি নিয়ে তাঁর দিকে অগ্রসর হলেন এবংবললেনঃ

"খোদার কসম। তুমি দ্বীনে হকের বিরোধিতায় এবং খোদার সত্য রাসূলের (সাঃ) মিথ্যা প্রতিপন্নে খুব কঠোর ছিলে। আজ সুযোগ এসেছে। যুদ্ধক্ষেত্রে দ্বীনে হকের বুলন্দি এবং রাসূলে খোদার (সাঃ) সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য নিজের জীবন কুরবান করে দাও এবং খোদার সামনে অবনত মস্তক হও।"

হযরত আবু সুফিয়ান (রাঃ) এই কথায় খুব লজ্জা পেলেন এবং তরবারী হাতে শত্রু ব্যূহে ঢুকে পড়লেন।

এই যুদ্ধে একবার রোমকরা মহিলাদের তাঁবুর নিকট এসে পড়েছিল। সকল মহিলা মিলে তাঁবুর খুঁটি উঠিয়ে রোমকদের বিরুদ্ধে হামলা শুরু করলেন। এই মহিলার মধ্যে হযরত উম্মে আবান (রাঃ), উম্মে হাকিম (রাঃ), খাওলাহ (রাঃ) বিনতে আয়ুব এবং হিন্দও (রাঃ) ছিলেন। মুসলমানদের একটি দল যতক্ষণ তাঁদের সাহায্যে না এসে পৌছলেন ততক্ষণ তাঁরা মুকাবিলা অব্যাহত রাখলেন এবং বেশ কিছু সংখ্যক রোমককে জাহান্নামে পাঠিয়ে দিলেন।

হযরত হিন্দ (রাঃ) হযরত ওসমান গনির (রাঃ) খিলাফতকালে মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর সন্তানদের মধ্যে আমির মাবিয়া (রাঃ) ইসলামের ইতিহাসে এক প্রসিদ্ধ ব্যক্তিত্ব।

ইবনে আছির (রঃ) "উসদুল গাবাহ"তে লিখেছেনঃ "হযরত হিন্দ (রাঃ) আত্মমর্যাদাসম্পন্ন, সঠিক রায়সম্পন্ন এবং বিজ্ঞ মহিলা ছিলেন।"

সহিহ বুখারীর এক রাওয়ায়েত থেকে জানা যায় যে, প্রকৃতগতভাবে তিনি বিরাট দানশীলা ছিলেন। কাব্যের প্রতিও তাঁর ঝোঁক ছিল। বদরের যুদ্ধে সহোদর আবু হোজায়ফাকে (রাঃ) কবিতার মাধ্যমে গালি দিয়েছিলেন। এমনিভাবে ওহোদের যুদ্ধে

www.bjilibrary.com

কবিতা পড়ে পড়ে কোরেশ মুশরিকদেরকে লড়াইয়ে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন। যখন তাঁর জীবনে বিপ্লব এলো তখন নিজের কবিতার মাধ্যমে ইসলামের মুজাহিদদেরকে কাফেরদের বিরুদ্ধে উজ্জীবিত করতেন। চরিতকাররা তাঁর বেশ কিছু কবিতা নকল করেছেন।

ইবনে হিশাম লিখেছেন, নবীর (সাঃ) হিজরতের পর যখন হযরত যয়নব (রাঃ) বিনতে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) মক্কা থেকে মদীনা গমনের জন্য প্রস্তুত হলেন তখন হিন্দ (রাঃ) তাঁর নিকট গেলেন এবং বললেনঃ "হে মুহাম্মাদের (সাঃ) কন্যা। তুমি তোমার পিতার নিকট যাচ্ছ। সফরের কোন জিনিস যদি তোমার প্রয়োজন থাকে তাহলে লৌকিকতা ছাড়া তা বলো, আমি তোমাকে তা দেব।"

এই রাওয়ায়েত থেকে জানা যায় যে, ইসলামের সঙ্গে শত্রুতা সত্ত্বেও তাঁর মধ্যে সহিষ্ণুতার অভাব ছিল না। ইসলাম গ্রহণের পর তাঁর প্রকৃতি প্রদত্ত স্বভাব খুব ভালোভাবেই বিকশিত হয়েছিল।

৪২

হযরত দুররাহ (রাঃ) বিনতে আবি লাহাব

হসব ও নসবের জন্য এতটুকুন লিখাই যথেষ্ট যে, তিনি ছিলেন প্রিয় নবীর (সাঃ) চাচার কন্যা। পিতার ইসলামের প্রতি শত্রুতা এমন ছিল যে, আল্লাহ পাক পবিত্র কুরআনে নাম নিয়ে তার নিন্দা করেছেন। কিন্তু কন্যাকে আল্লাহতায়ালা ইসলাম গ্রহণের সৌভাগ্য দিয়েছিলেন এবং হুজুরের (সাঃ) অন্যতম মহিলা সাহাবী ছিলেন।

তাঁর বিয়ে হয়েছিল হুজুরের (সাঃ) চাচাতো ভাই নওফিল (রাঃ) বিন হারিছ বিন আব্দুল মুত্তালিবের পুত্র হারিছের সঙ্গে। তাঁর ঔরসে জন্মগ্রহণ করেছিল তিনি পুত্র উতবাহ, ওয়ালিদ এবং আবু মুসলিম। তাঁর স্বামী এবং শ্বশুর খন্দকের যুদ্ধের পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। শ্বশুর নওফিল (রাঃ) বিন হারিছ হিজরত করার সৌভাগ্যও পেয়েছিলেন কিন্তু স্বামী হারিছ (রাঃ) বিন নওফিল এই সৌভাগ্য প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত ছিলেন। অবশ্য হযরত দুররাহর ব্যাপারে কতিপয় চরিতকার বলেছেন যে, তিনি হিজরত করেছিলেন। আল্লামা ইবনে আছির (রাঃ) উসুদুল গাবাহতে

www.bjilibrary.com

লিখেছেন, তিনি মদীনা পৌছে হযরত রাফে (রাঃ) বিন মুয়াল্লি যারকীর গৃহে অবস্থান নেন। বনি যরিকের মহিলারা তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আসেন এবং বলেন, "তুমি সেই আবি লাহাবের কন্যা, যার ব্যাপারে সুরায়ে তাব্বাত ইয়াদা আবি লাহাব নাযিল হয়েছে। তুমি হিজরতের কি ছওয়াব পাবে?"

হযরত দুররাহ এই কথা শুনে খুব দুঃখিত হলেন এবং রাসূলের (সাঃ) নিকট উপস্থিত হয়ে এই ঘটনা বর্ণনা করলেন। হুজুর (সাঃ) তাঁকে সান্ত্বনা দিলেন এবং কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার জন্য নির্দেশ দিলেন। অতঃপর জোহরের নামায পড়ে মিম্বরে দাঁড়ালেন এবং লোকদেরকে সম্বোধন করে বললেনঃ

"হে মানুষেরা! তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ আমার বংশের ব্যাপারে আমার অন্তরে দুঃখ দিয়ে থাকো। প্রকৃতপক্ষে খোদার কসম! আমার আত্মীয়রা আমার শাফায়াত অবশ্যই পাবে। এমনকি ছাদ, হাকাম ও সালহাবও (তিন গোত্র যাদের সঙ্গে হুজুরের (সাঃ) দূরতম আত্মীয়তা ছিল) তা থেকে উপকৃত হবে।"

হযরত দুররাহ (রাঃ) থেকে কয়েকটি হাদীস বর্ণিত আছে। তারমধ্যে দু'টি মশহুর হাদীস রয়েছেঃ

১- একবার জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহকে (সাঃ) জিজ্ঞেস করলেন যে, মানুষের মধ্যে কে উত্তম? তিনি বললেন, "যার মধ্যে খোদা ভীতি বেশী হবে, যে লোকদেরকে ভালো কাজের নির্দেশ দেয়, খারাব কাজ থেকে বিরত রাখে এবং সেলায়ে রেহেমী করে।"

২- রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ফরমিয়েছেন,"কোন মৃত ব্যক্তির কাজের বদলায় কোন জীবিত ব্যক্তিকে শাস্তি দেয়া যায় না।"

হাফিজ ইবনে হাজার (রঃ) "ইসাবাহ"তে লিখেছেন, "হযরত দুররাহ (রাঃ) অত্যন্ত দানশীলা ছিলেন এবং মুসলমানদেরকে খাবার খাওয়াতেন।"

হযরত দুররাহর ওফাতের সাল এবং বিস্তারিত অবস্থা সম্পর্কে কিছু জানা যায়নি।

www.bjilibrary.com

হযরত উমাইমাহ (রাঃ) উম্মে আবি হুরাইরাহ (রাঃ)

নাম ছিল উমাইমাহ। কিন্তু সাধারণভাবে কুনিয়ত উম্মে আবি হুরাইরাহ (রাঃ) নামে মশহুর। পিতার নাম ছিল সাবিহ অথবা সাফিহ বিনুল হারিছ। জালিলুল কদর সাহাবী হযরত আবু হুরাইরাহ (রাঃ) দাওসীর মা ছিলেন। তাঁর বিয়ে হয়েছিল আমের বিন আবদি জিশ শূরা দাওসীর সঙ্গে। তিনি যৌবনকালেই মারা যান। এ সময় হযরত আবু হুরাইরাহ (রাঃ) অপ্রাপ্ত বয়স্ক ছিলেন।

অত্যন্ত কঠিন অবস্থার মধ্যে দিয়ে মা তাঁকে লালন-পালন করেন। হযরত আবু হুরাইরাহ (রাঃ) নবীর (সাঃ) হিজরতের কয়েক বছর পূর্বে হযরত তোফায়েল (রাঃ) বিন আমর দাওসীর তাবলীগে মুসলমান হন। এ সত্ত্বেও খায়বারের যুদ্ধের সময় রাসূলের (সাঃ) সঙ্গে সাক্ষাতের সৌভাগ্য ঘটে। মাও সঙ্গে ছিলেন। কিন্তু তিনি মদীনায় আসার পরও কুফর ও শিরকের ভুল পথে চলতে থাকেন। হযরত আবু হুরাইরাহ (রাঃ) মা'র অত্যন্ত অনুগত ছিলেন। কিন্তু তাঁর শিরকের কারণে মনে মনে কষ্ট পেতে থাকেন। মাও ইসলামের মহান নিয়ামতে অভিষিক্ত হোক এটা ছিল তাঁর আন্তরিক কামনা। কিন্তু মা ইসলামকে এত ঘৃণা করতেন যে, একদিন হুজুরের (সাঃ) শানে কিছু আপত্তিকর কথাই বলে ফেললেন। এতে হযরত আবু হুরাইরাহ (রাঃ) খুব দুঃখ পেলেন। কাঁদতে কাঁদতে হুজুরের (সাঃ) খিদমতে হাজির হলেন এবং আরজ করলেনঃ "হে আল্লাহর রাসূল। আমার মায়ের জন্য দোয়া করুন। যাতে আল্লাহ পাক তাঁকে হক কবুলের তাওফিক দান করেন।"

রহমতে আলম (সাঃ) দোয়া করলেনঃ "হে আল্লাহ! আবু হুরাইরাহর (রাঃ) মা'কে হিদায়াত কর। " হযরত আবু হুরাইরাহ (রাঃ) খুশী মনে বাড়ী ফিরে এসে দেখলেন যে, কেওয়ারী বন্ধ এবং মা গোসল করছেন। গোসল শেষে কেওয়ারী খুললেন এবং বললেনঃ "হে পুত্র! সাক্ষী থেকো যে, আমি আল্লাহ এবং তাঁর সত্য রাসূলের ওপর সত্য অন্তরে ঈমান আনয়ন করছি।"

হযরত আবু হুরাইরাহ (রাঃ) আনন্দের আতিশয্যে আত্মহারা হয়ে পড়লেন এবং আনন্দাশ্রুসহ রাসূলের (সাঃ) গৃহে উপস্থিত হয়ে আরজ করলেন, "হে আল্লাহর

www.bjilibrary.com

রাসূল! সুসংবাদ হলো যে, আপনার দোয়া কবুল হয়েছে এবং আমার মা'কে আল্লাহ পাক হেদায়াত দান করেছেন।" হুজুরও (সাঃ) এই খবর শুনে খুব খুশী হলেন এবং আল্লাহর নিকট কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করলেন।

হযরত উমাইমাহ (রাঃ) অত্যন্ত ভাগ্যবতী ছিলেন যে, আল্লাহ তাঁকে আবু হুরাইরাহর (রাঃ) মত ভাগ্যবান পুত্র দান করেছিলেন। তিনি ঘরে এসে বলতেন, "আস্‌সালামু আলাইকুম ইয়া আমাতাহু ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।" তিনি জবাবে বলতেন, "ওয়া আলাইকা ইয়া বুনাইয়্যা ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।" অতঃপর হযরত আবু হুরাইরাহ (রাঃ) বলতেন, "আল্লাহ তায়ালা আপনার ওপর তেমনিভাবে রহমত নাযিল করুন যেমনিভাবে আপনি শৈশবকালে আমাকে লালন-পালন করেছিলেন।" তিনি জবাবে বলতেন, "হে পুত্র! আল্লাহ তোমার ওপরও তেমনি রহমত নাযিল করুন যেমনিভাবে তুমি জওয়ান হয়ে আমার সঙ্গে আচরণ করেছ।"

হযরত আবু হুরাইরাহর (রাঃ) সঙ্গে তাঁর মা'র এত গভীর সম্পর্ক ছিল যে, যতদিন তিনি জীবিত ছিলেন ততদিন তিনি হজ্ব আদায় করতেও যাননি।

হযরত উমাইমাহ (রাঃ) বিনতে গানাম

সাইয়েদানা হযরত আবু উবায়দাহ (রাঃ) বিনুল জারাহ'র (আশারায়ে মুবাশশারার একজন) বুজর্গ মা ছিলেন। নসবনামা নিম্নরূপঃ উমাইমাহ (রাঃ) বিনতে গানাম বিন জাবের বিন আব্দুল উজ্জা বিন আমেরাহ বিন আমিরাহ।

আব্দুল্লাহ বিন জারাহ ফাহরীর সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়েছিল। তাঁর ঔরসেই হযরত আবু উবায়দাহ (রাঃ) জন্মগ্রহণ করেন। আব্দুল্লাহ বিন জারাহ ইসলাম গ্রহণ করেনি। কিন্তু হযরত উমাইমার (রাঃ) ইসলাম গ্রহণ ও সাহাবী হওয়ার ব্যাপারে সকল নেতৃস্থানীয় চরিতকারই ঐকমত্য পোষণ করেন। তাঁর পুত্র হযরত আবু উবায়দাহ'র (রাঃ) সম্পর্কে কিছু বলার প্রয়োজন পড়ে না। কারণ তিনি উম্মাহর অন্যতম স্তম্ভ ছিলেন।

www.bjilibrary.com

তিবরানীর রাওয়ায়েত অনুযায়ী আব্দুল্লাহ বিন জারাহ কুফরী অবস্থায় বদরের যুদ্ধে নিহত হয় এবং স্বয়ং হযরত আবু ওবায়দাহ (রাঃ) তাকে হত্যা করেন। কিন্তু আল্লামা ওয়াকেদী এই বক্তব্য অস্বীকার করেন। তিনি লিখেছেন, সে ইসলামের আগমনের আগেই মারা যায়। অধিকাংশ চরিতকার তিবরাণীর রাওয়ায়েতকেই অগ্রাধিকারদিয়েছেন।

হযরত হিন্দ (রাঃ) বিনতে জাবের

সিরিয়া বিজয়ী আমিনুল উম্মাত হযরত আবু উবায়দাহ (রাঃ) বিনুল জারাহ'র স্ত্রী ছিলেন। তিনি সাদা-সিধে প্রকৃতির এবং মুখলিস সাহাবিয়াহ ছিলেন। তাঁর গর্ভে হযরত আবু উবায়দাহ'র (রাঃ) এক অথবা দুই পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। তারপর আর বংশধারা এগোয়নি। তাঁর সম্পর্কে বিস্তারিত কিছু জানাও যায়নি।

হযরত আতিকাহ (রাঃ) বিনতে আওফ

তিনি কোরেশের বনু যাহরাহ অংশোদ্ভূত এবং জালিলুল কদর সাহাবী হযরত আব্দুর রহমান (রাঃ) বিন আওফের (আশারায়ে মুবাশশারাহ'র একজন) সহোদরা ছিলেন। বংশধারা হলোঃ আতিকাহ (রাঃ) বিনতে আওফ বিন আবদি আওফ বিন আবদি বিনুল হারিছ বিন যাহরাহ বিন কিলাব বিন মাররাহ।

তাঁর বিয়ে হয়েছিল মাখরামাহ বিন নাওফিলের সঙ্গে। হযরত আতিকাহ (রাঃ) দাওয়াতে হকের প্রাথমিক যুগে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন এবং হিজরতের সৌভাগ্যও লাভ করেছিলেন। মশহুর সাহাবী হযরত মিসওয়ার বিন মাহযামাহ হযরত আতিকাহরই (রাঃ) পুত্র ছিলেন। তিনি দ্বিতীয় হিজরীতে মক্কা মুয়াজ্জমাতে জন্মগ্রহণ করেন এবং মক্কা বিজয়ের পর ৬ বছর বয়সে মদীনা আগমন করেন। হযরত আতিকাহ তাঁকে প্রায়ই হুজুরের (সাঃ) খিদমতে প্রেরণ করতেন।

www.bjilibrary.com

হযরত সাফওয়ান (রাঃ) বিন মুয়াত্তালের স্ত্রী

নাম ও নসব জানা যায়নি। মশহুর সাহাবী হযরত সাফওয়ান (রাঃ) বিন মুয়াত্তালের স্ত্রী ছিলেন। ইমাম মালিক (রঃ) মুয়াত্তায় লিখেছেন, হযরত সাফওয়ান (রাঃ) তায়েফের যুদ্ধের পর ইসলাম গ্রহণ করেন। কিন্তু তাঁর স্ত্রী তাঁর আগেই ইসলাম গ্রহণের সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন। তা সত্ত্বেও রাসূলে আকরাম (সাঃ) তাঁর বিয়ে দোহরাননি। তিনি অত্যন্ত মুখলিস সাহাবিয়াহ এবং ইবাদাত গুজার ছিলেন। একদিন নবীর (সাঃ) খিদমতে হাজির হয়ে আরজ করলেনঃ

"হে আল্লাহর রাসূল! আমার স্বামী সাফওয়ান (রাঃ) বিন মুয়াত্তাল নামায পড়ার কারণে আমার ওপর বাড়াবাড়ি করেন। আমি রোযা রাখলে তা ভাঙ্গিয়ে দেন এবং স্বয়ং বেশী বেলায় নামায পড়েন"।

ঘটনাক্রমে সেই সময় নবীর (সাঃ) মজলিসে হযরত সাফওয়ানও (রাঃ) উপস্থিত ছিলেন। হুজুর (সাঃ) তাঁর নিকট প্রকৃত অবস্থা জিজ্ঞাসা করলে তিনি আরজ করলেনঃ "ইয়া রাসূলাল্লাহ! সে নামাযে লম্ব লম্বা দু'টি সূরা পড়ে থাকে। আমি তাকে এ ধরনের করতে নিষেধ করেছি।"

হুজুর (সাঃ) বললেনঃ "একটি সূরা পড়াও যথেষ্ট।"

সাফওয়ান (রাঃ) অতঃপর বললেনঃ "হে আল্লাহর রাসূল। সে বলছে যে, আমি তার রোযা ভাঙ্গিয়ে দিই। এ কথার মাহাত্ম্য হলো, যখন সে নফল রোযা রাখা শুরু করে তখন তা চালিয়েই যেতে থাকে। এটা আমার জন্য কষ্টকর ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়।

হুজুর (সাঃ) বললেনঃ "স্বামীর অনুমতি ব্যতিরেকে কোন মহিলাকে এমন ধরনের নফল রোযা রাখা উচিত নয়।"

অতঃপর সাফওয়ান (রাঃ) আরজ করলেনঃ "হে আল্লাহর রাসূল। বেশী বেলায় নামায পড়ার অভিযোগটি ঠিক। তার কারণ হলো, আমরা শ্রমিক মানুষ এবং

www.bjilibrary.com

আমাদের বংশের লোকদের মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে সূর্য ওঠার পূর্বে ঘুম থেকে না জাগার প্রথা চলে আসছে।"

হুজুর (সাঃ) বললেন, "ঠিক আছে সাফওয়ান, যখনই ঘুম থেকে উঠবে তখনই অবশ্যই নামায পড়ে নেবে।"

হযরত সাফওয়ান (রাঃ) বিন মুয়াত্তালের স্ত্রী সম্পর্কে আর বিস্তারিত তথ্য জানাযায়নি।

হযরত উম্মে মাহজান (রাঃ)

আসল নাম ও নসব জানা যায়নি। শুধু এতটুকুন জানা যায় যে, তিনি সব সময় মসজিদে নববীতে (সাঃ) ঝাড়ু দানের খিদমত আঞ্জাম দিতেন। এজন্য বিশ্ব নবীর (সাঃ) নিকট তাঁর খুব মর্যাদা ছিল। তিনি ইন্তেকাল করলে সাহাবায়ে কিরামগণ (রাঃ) হুজুরকে (সাঃ) খবর না দিয়েই তাঁকে দাফন করেন। পরে হুজুর (সাঃ) জানতে পেলে বললেনঃ "আমাকে কেন খবর দেয়া হয়নি?" সাহাবীরা (রাঃ) আরজ করলেনঃ "হে আল্লাহর রাসূল! আপনি রোযা ছিলেন এবং দুপুরের ঘুমে ছিলেন। এজন্য আমরা আপনাকে কষ্ট দেয়া উচিত মনে করিনি।"

হযরত খাওলাহ (রাঃ) বিনতে হাকিম

নাম খাওলাহ এবং কুনিয়ত হলো উম্মে শুরাইক। তিনি বনি সুলাইম গোত্রভুক্ত ছিলেন। নসবনামা হলোঃ খাওলাহ (রাঃ) বিনতে হাকিম বিন উমাইয়াহ বিন হারিছাহ বিন আওকাস বিন মাররাহ বিন হেলাল বিন ফালেহ বিন জাকওয়ান বিন ছা'লাবাহ বিন বাহছাহ বিন সুলাইম।

www.bjilibrary.com

জালিলুল কদর সাহাবী হযরত আবুস সায়িব ওসমান (রাঃ) বিন মাজউন জুমহির সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়েছিল। নবুয়তের ১৩ বছর পর স্বামীর সঙ্গে মদীনা হিজরত করেন। হযরত ওসমান (রাঃ) বিন মাজউন খুব ইবাদাত গুজার ছিলেন। রাত জেগে নামায পড়তেন। আর দিনে প্রায়ই রোযা রাখতেন। তাঁর ইবাদাতের উদ্দীপনা বিবি বাচ্চাদের থেকে মুখাপেক্ষীহীন করে দিয়েছিল। একদিন হযরত খাওলাহ (রাঃ) নবীর (সাঃ) হেরেমে আসলেন। এ সময় তিনি পেরেশান অবস্থায় ছিলেন। প্রত্যেক ধরনের মহিলাই সেজে-গুজে এসেছিলেন। উম্মুহাতুল মুমিনিন তাঁকে এই অবস্থায় দেখে জিজ্ঞেস করলেনঃ "তুমি একজন বিবাহিতা মহিলা হয়ে নিজের অবস্থা এমন করে রেখেছ কেন? প্রকৃতপক্ষে তোমার স্বামী কোরেশের অন্যতম পরিতৃপ্ত ব্যক্তি।"

হযরত খাওলাহ (রাঃ) ইঙ্গিতে ইঙ্গিতে বললেনঃ "তাঁর তো বিবি-বাচ্চার কোন প্রয়োজন নেই। সে রাতে নামায পড়ে আর দিনে রোযা রাখে।"

উম্মুহাতুল মুমিনিন আসল অবস্থা বুঝতে পারলেন। প্রিয় নবী (সাঃ) তাশরীফ আনলে তাঁরা কথায় কথায় সেই কথা উল্লেখ করলেন। হুজুর (সাঃ) তৎক্ষণাৎ সশরীরে হযরত ওসমান (রাঃ) বিন মাজউনের নিকট তাশরীফ নিলেন এবং বললেনঃ "ওসমান, তোমার নিকট কি আমার জীবন পদ্ধতি অনুকরণযোগ্য নয়?"

তিনি আরজ করলেনঃ "ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার মাতা-পিতা আপনার ওপর কুরবান হোক। নিঃসন্দেহে আপনি আমার জন্য অনুকরণীয়। আমার পক্ষ থেকে কি কোন কসুর হয়েছে?"

হুজুর (সাঃ) বললেনঃ "ওসমান, আমাদের জন্য সন্ন্যাসীত্বের কোন নির্দেশ নেই। আমি তোমার থেকে খোদাকে বেশী ভয় করি। নামাযও পড়ি, রোযাও রাখি এবং পরিবার-পরিজনের হকও আদায় করি। তোমার ওপরও তোমার চোখ, শরীর এবং পরিবার পরিজন সকলের অধিকার রয়েছে। নামায পড়, রোযা রাখো। কিন্তু পরিবার-পরিজনের হকও আদায় কর।"

হযরত ওসমান (রাঃ) হুজুরের (সাঃ) ইরশাদের মর্মার্থ বুঝে ফেললেন। এর কিছুদিন পর হযরত খাওলাহ (রাঃ) উম্মুহাতুল মুমিনিনের খিদমতে হাজির হলেন। এ সময় তাঁর অবস্থা ছিল দুলহিনের মত। ইবনে সা'দ (রঃ) এই বর্ণনা দিয়েছেন। মুসনাদে আহমদ বিন হাম্বলে আছে, হযরত খাওলাহ (রাঃ) হযরত আয়েশা সিদ্দিকাহর (রাঃ) খিদমতে হাজির হয়েছিলেন এবং তিনিই হুজুরের (সাঃ) নিকট তাঁরউল্লেখকরেছিলেন।

www.bjilibrary.com

বদরের যুদ্ধের পর দ্বিতীয় হিজরীর শেষদিকে হযরত ওসমান (রাঃ) বিন মাজউন ওফাত পান এবং হযরত খাওলাহ (রাঃ) ও দুই পুত্র আবদুর রহমান এবং সায়েবকে রেখে যান। তারপর হযরত খাওলাহ (রাঃ) আজীবন বৈধব্যের জীবন কাটান এবং দ্বিতীয় বিয়ে করেননি। সহিহ বুখারীতে আছে, তিনি একবার উম্মুহাতুল মুমিনিনের মধ্যে শামিল হওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু হুজুর (সাঃ) বিভিন্ন কারণে তা মঞ্জুর করেননি।

হাফিজ ইবনে আব্দুল বার (রঃ) "আল ইসতিয়াবে" লিখেছেন, একবার তিনি হুজুরের (সাঃ) নিকট দরখাস্ত করলেনঃ "হে আল্লাহর রাসূল! তায়েফ বিজিত হলে আমাকে বাদিয়াহ বিনতে খাইলান অথবা ফারিয়াহ বিনতে আকিলের গহনা দেবেন।" হুজুর (সাঃ) বলেন, "আল্লাহ পাক যদি তার অনুমতি না দেন তাহলে আমি কি করবো!"

কতিপয় রাওয়ায়েত থেকে জানা যায় যে, স্বামীর মৃত্যুর পর হযরত খাওলাহ (রাঃ) প্রায়ই পেরেশান থাকতেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও ইবাদাতে মশগুল থাকতেন। ইমাম আহমদ (রাঃ) বিন হাম্বল (রঃ) বলেন, তিনি কায়িমুল লাইল এবং সায়িমুন নাহার ছিলেন (অর্থাৎ সারারাত ইবাদত করতেন এবং দিনে রোযা রাখতেন)।

হাফিজ ইবনে আব্দুল বার (রঃ) লিখেছেন, তিনি একজন নেক ও শ্রদ্ধাযোগ্যা মহিলা ছিলেন। এক রাওয়ায়েত থেকে জানা যায়, হযরত খাওলাহ (রাঃ) কাব্যে ব্যুৎপত্তিরাখতেন।

হযরত খাওলাহ (রাঃ) বিনতে হাকিম থেকে ১৫টি হাদীস বর্ণিত আছে। তাঁর রাবীদের মধ্যে হযরত সা'দ (রাঃ) বিন আবি ওয়াক্কাস, হযরত সাঈদ বিনুল মুসাইয়্যিব (রাঃ) এবং হযরত উরওয়াহ বিন যোবায়েরের (রাঃ) মত মহান ব্যক্তিত্বও রয়েছেন।

www.bjilibrary.com

হযরত হামনাহ (রাঃ) বিনতে জাহাশ

কোরেশের আসাদ বিন খুযাইমাহ বংশের লোক ছিলেন। নসবনামা হলোঃ হামনাহ (রাঃ)বিনতে জাহাশ বিন রিয়াব বিন ইয়ামার বিন সাবরাহ বিন মাররাহ বিন কাছির বিন গানাম বিন দাওদান বিন আসাদ বিন খুযাইমাহ।

মায়ের নাম ছিল উমাইমাহ বিনতে আব্দুল মুত্তালিব। তিনি প্রিয় নবীর (সাঃ) আপন ফুফু ছিলেন। এই দিক থেকে হযরত হামনাহ হুজুরের (সাঃ) ফুফাতো বোন ছিলেন। উম্মুল মুমিনিন হযরত যয়নব (রাঃ) বিনতে জাহাশ তাঁর সহোদরা এবং সাইয়েদেনা আব্দুল্লাহ বিন জাহাশ সহোদর ছিলেন। নবুয়তের প্রথম যুগে ইসলাম গ্রহণ করেন। জালিলুল কদর সাহাবী হযরত মাসয়াব (রাঃ) বিন উমায়েরের সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়েছিল। তাঁর সঙ্গেই মদীনায় হিজরত এবং মুহাজির ও আনসারের কতিপয় মহিলার সাথে প্রিয় নবীর (সাঃ) বাইয়াত লাভ করেন। তৃতীয় হিজরীতে ওহোদের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। হযরত হামনাহ (রাঃ) অন্যান্য মহিলার সঙ্গে মিলে এই যুদ্ধে উল্লেখযোগ্য খিদমত আঞ্জাম দেন। তিনি মুজাহিদদেরকে পানি পান করাতেন এবং আহতদের সেবা-শুশ্রুষা ও দেখাশুনা করতেন। এই যুদ্ধেই তাঁর স্বামী হযরত মাসয়াব (রাঃ) বিন উমায়ের বীরত্বের সঙ্গে লড়াই করতে করতে শাহাদাত প্রাপ্ত হন। হযরত হামনাহ (রাঃ) তাঁকে খুবই ভালোবাসতেন। যখন তাঁর শাহাদাতের খবর পেলেন তখন ডুকরে কেঁদে উঠলেন। এই যুদ্ধে তাঁর ভাই হযরত আব্দুল্লাহ (রাঃ) বিন জাহাশও শহীদ হন এবং মুশরিকরা তাঁর লাশের বিকৃতি ঘটায়। হযরত মাসয়াবের (রাঃ) ঔরসে যয়নব নামক একটি মাত্র কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। এরপর সাইয়েদেনা হযরত তালহা (রাঃ) বিন উবায়েদুল্লাহর সঙ্গে হযরত হামনার (রাঃ) পুনরায় বিয়ে হয়। হযরত তালহাকে (রাঃ) (আশারায়ে মুবাশশারাহ'র অন্যতম) সাহিবে ওহোদও বলা হয়। তাঁর ঔরসে মুহাম্মাদ (রাঃ) ও ইমরান নামক দুই পুত্র জন্মগ্রহণ করেন।

ইফকের ঘটনায় হযরত হাসসান (রাঃ) বিন ছাবিত এবং হযরত মিসতাহ'র (রাঃ) সঙ্গে হযরত হামনাও (রাঃ) মুনাফিকদের ধোঁকায় পড়ে যান এবং উম্মুল মুমিনিন হযরত আয়েশা সিদ্দিকাহর (রাঃ) ওপর আরোপিত তোহমতের সত্যতা স্বীকার করেন। আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে হযরত আয়েশা সিদ্দিকা'হর (রাঃ)

www.bjilibrary.com

পবিত্রতার ঘোষণা দেয়া হলে হযরত হামনাহ (রাঃ) নিজের কৃতকর্মের জন্য খুব লজ্জিত হন এবং তওবাহ করেন। কিন্তু হযরত আয়েশা সিদ্দিকাহ (রাঃ) তাঁর এই কাজের কথা কোন সময়ই ভুলতে পারেননি।

হযরত হামনাহ (রাঃ) বিশ হিজরীর পর কোন এক বছর ইন্তেকাল করেন। তাঁর থেকে কতিপয় হাদীস বর্ণিত আছে। এই হাদিসসমূহের রাবী হলেন স্বীয় পুত্র ইমরান বিন তালহা (রাঃ)।

হযরত আরওয়া (রাঃ) বিনতে কুরাইয

তিনি বনু আবদি শামস বংশোদ্ভূত ছিলেন। নসবনামা হলোঃ আরওয়া (রাঃ) বিনতে কুরাইয বিন রবিয়াহ বিন হাবিব বিন আবদি শামস বিন আবদি মান্নাফ বিন কুসাই।

হযরত আরওয়ার (রাঃ) মাতা উম্মে হাকিম আল বাদইয়া বিনতে আব্দুল মুত্তালিব প্রিয় নবীর (সাঃ) আপন ফুফু ছিলেন। এইদিক থেকে তিনি হুজুরের (সাঃ) ফুফাতো বোন ছিলেন। হযরত আরওয়ার (রাঃ) প্রথম বিয়ে হয় আফফান বিন আবিল আছের সঙ্গে। তাঁর ঔরসে জন্মগ্রহণ করেন হযরত ওসমান জুন্নুরাইন এবং কন্যা আমেনাহ। আফফানের মৃত্যুর পর উকবাহ বিন আবি মুইতের সঙ্গে হযরত আরওয়ার দ্বিতীয়বার বিয়ে হয়। তাঁর ঔরসে উম্মে কুলছুম (রাঃ) জন্মগ্রহণ করেন। তিনি প্রখ্যাত মহিলা সাহাবী ছিলেন।

উকবাহ বিন আবি মুইত কোরেশের অন্যতম প্রসিদ্ধ ব্যক্তি ছিলেন। হযরত মুহাম্মাদ মুস্তাফা (সাঃ) হকের দাওয়াত প্রদান শুরু করলে তিনি তাঁর জীবনের শত্রু হয়ে পড়েন এবং তাঁর ওপর নির্যাতন চালানোতে কোন রকম ত্রুটি করেননি। কিন্তু হযরত আরওয়াকে (রাঃ) আল্লাহ পাক হক কবুলের তাওফিক দেন এবং হিজরতের পূর্বেই ইসলাম গ্রহণ করেন। আল্লামা ইবনে সা'দ (রঃ) বর্ণনা করেছেনঃ

''আরওয়া (রাঃ) ইসলাম গ্রহণ করেন এবং স্বীয় কন্যা উম্মে কুলছুম (রাঃ) বিনতে উকবার পর হিজরত করেন। তিনি রাসূলের (সাঃ) বাইয়াত করেন এবং

www.bjilibrary.com

স্থায়ীভাবে মদীনায় ছিলেন। স্বীয় পুত্র ওসমান (রাঃ) বিন আফফানের খিলাফতকালে ওফাতপান।"

কতিপয় রাওয়ায়েত অনুযায়ী হযরত আরওয়া (রাঃ) নবুয়তের প্রথম তিন বছরের মধ্যে ইসলাম গ্রহণ করেন। তাঁর পুত্র ওসমানও (রাঃ) সেই যুগেই মুসলমান হন। এছাড়া হযরত আরওয়ার (রাঃ) বিস্তারিত জীবনী জানা যায়নি।

হযরত সু'দা (রাঃ) বিনতে কুরাইয

তিনি হযরত আরওয়া (রাঃ) বিনতে কুরাইযের বোন ছিলেন। জাহেলী যুগে গণকের গণনা খুব প্রিয় ছিল এবং তিনি এতে বিশেষজ্ঞ ছিলেন। কাব্য সাহিত্যেও ব্যুৎপত্তি রাখতেন। হাফিজ ইবনে হাজার (রঃ) এবং অন্য চরিতকাররা স্ব স্ব কিতাবে তাঁর বেশ কিছু কবিতা উল্লেখ করেছেন। তাঁর ইসলাম গ্রহণের কালের ব্যাপারে স্পষ্ট করে কিছু বলা যায় না। কিন্তু কতিপয় রাওয়ায়েতে আছে, দাওয়াতে হকের শুরুতেই ঈমান এনেছিলেন। হাফিজ ইবনে হাজার (রঃ) এমনো লিখেছেন যে, তিনিই সর্বপ্রথম ভাগিনেয় হযরত ওসমান জুন্নুরাইনকে (রাঃ) ইসলামের প্রতি উদ্বুদ্ধ করেছিলেন এবং তাঁকে সম্বোধন করে কবিতা বলেছিলেন।

কবিতা বলার পর তিনি হযরত ওসমানকে (রাঃ) বলেছিলেন, ভাগিনেয়! নিঃসন্দেহে মুহাম্মাদ (সাঃ) বিন আব্দুল্লাহ খোদার রাসূল। তাঁর ওপর কুরআন নাযিল হয়েছে এবং তিনি আল্লাহর দিকে আহবান জানান। তাঁর প্রদীপই প্রকৃত প্রদীপ এবং তাঁর দ্বীন কল্যাণের মাধ্যম।

হযরত ওসমান (রাঃ) খালার কথায় খুব প্রভাবান্বিত হলেন এবং হযরত আবুবকর সিদ্দিকের (রাঃ) নিকট গিয়ে এ কথার উল্লেখ করলেন। তিনি বললেন, "খোদার কসম! তোমার খালা যা বলেছেন তা সত্য।" তারপরই হযরত ওসমান (রাঃ) মুসলমান হয়ে যান।

হযরত সু'দার (রাঃ) বিস্তারিত অবস্থা জানা যায়নি। কিন্তু তাঁর ইসলাম গ্রহণ এবং সাহাবী হওয়ার ব্যাপারে অধিকাংশ চরিতকারই ঐকমত্য পোষণ করেন।

www.bjilibrary.com

হযরত হালাহ (রাঃ) বিনতে খুয়ায়েলদ

তিনি উম্মুল মুমিনিন হযরত খাদিজাতুল কুবরার (রাঃ) সহোদরা ছিলেন। নসবনামা হলোঃ হালাহ বিনতে খুয়ায়েলদ বিন আসাদ বিন আব্দুল উজ্জা বিন কুসাই।

অধিকাংশ চরিতকার বর্ণনা করেছেন যে, তিনি মুসলমান হয়েছিলেন এবং হযরত খাদিজাতুল কুবরার (রাঃ) ওফাতের পরও জীবিত ছিলেন।

হাফিজ ইবনে আব্দুল বার (রঃ) লিখেছেন, একবার তিনি প্রিয় নবীর (সাঃ) সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্য মক্কা থেকে মদীনা গিয়েছিলেন। রাসূলের (সাঃ) বাসগৃহে পৌছে তিনি ভেতরে যাওয়ার অনুমতি চাইলেন। তাঁর কন্ঠস্বর উম্মুল মুমিনিন খাদিজাতুল কুবরার স্বরের সাথে সাদৃশ্য ছিল। হুজুরের (সাঃ) কান পর্যন্ত আওয়াজ পৌছলে তাঁর খাদিজাতুল কুবরার (রাঃ) কথা স্মরণ হয়ে গেল এবং তিনি হযরত আয়েশা সিদ্দিকাহকে (রাঃ) বললেন, ''খাদিজার বোন হালাহ হবে।'' অতঃপর তিনি ভেতরে গেলে হুজুর (সাঃ) খুব সম্মান করলেন।

হযরত হালাহ'র (রাঃ) বিয়ে হয়েছিল রবি' বিন আব্দুল উজ্জার সঙ্গে। তাঁর ঔরসে জন্মগ্রহণ করেছিলেন আবুল আছ (রাঃ)। এই আবুল আছের (রাঃ) সঙ্গে রাসূল তনয়া হযত যয়নবের বিয়ে হয়েছিল। এইভাবে হযরত হালাহ (রাঃ) রাসূলের (সাঃ) বেয়াইন হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন। হযরত খাদিজাতুল কুবরা (রাঃ) আবুল আছকে (রাঃ) খুব ভালোবাসতেন এবং তাঁকে নিজের পুত্র মনে করতেন। হযরত হালাহ'র ওফাতের সাল এবং বিস্তারিত জীবনী জানা যায়নি।

হযরত জাছামাহ (রাঃ) (হানানাহ) মুযনিয়াহ

তিনি বনু মুযনিয়াহ বংশোদ্ভূত ছিলেন। প্রিয় নবীর (সাঃ) হিজরতের পূর্বেই ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। তিনি প্রায়ই হযরত খাদিজাতুল কুবরার (রাঃ) সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আসতেন। হযরত খাদিজার (রাঃ) ওফাতের কয়েক বছর পর তিনি

www.bjilibrary.com

একবার মদীনা এসে হুজুরের (সাঃ) খিদমতে উপস্থিত হন। অনেক বয়স হয়ে গিয়েছিল। এজন্য প্রথম দৃষ্টিতে হুজুর (সাঃ) তাঁকে চিনতে পারেননি। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি কে?" তিনি আরজ করলেন, ''হুজুর! আমি জাছামাহ মুযনিয়াহ।'' তিনি বললেন, ''বরং তুমি হানানাহ মুযনিয়াহ।'' অতঃপর তিনি জিজ্ঞেস করলেন, "তোমরা কেমন আছ, আমাদের পর তোমরা কেমন রয়েছ?"

তিনি আরজ করলেন, ''হে আল্লাহর রাসূল! আমার মাতা-পিতা আপনার ওপর কুরবান হোক। আমরা সম্পূর্ণ ভালো আছি।'' যখন তিনি চলে গেলেন তখন উম্মুল মুমিনিন হযরত আয়েশা (রাঃ) হুজুরকে (সাঃ) জিজ্ঞেস করলেন, ''ইয়া রাসূলাল্লাহ! এই বুড়ির প্রতি আপনি খুব শ্রদ্ধা প্রদর্শন করলেন।''

হুজুর (সাঃ) বললেন, ''এই বৃদ্ধা খাদিজার (রাঃ) সময় আমাদের নিকট আসতো এবং পুরনো সাক্ষাৎকারীদের সঙ্গে ভালোভাবে মুলাকাত করাও ঈমানের নিদর্শন।''

মুসনাদে বাইহাকীতে এই রাওয়ায়েত হযরত আয়েশার (রাঃ) মুখে এইভাবে বর্ণনা করা হয়েছে যে, এক বৃদ্ধা রাসূলের (সাঃ) খিদমতে হাজির হতেন। তিনি তাঁকে দেখে খুব খুশী হতেন এবং তাঁকে সীমাহীন শ্রদ্ধা করতেন। আমি একদিন জিজ্ঞাসা করলাম, ''আমার মাতা-পিতা আপনার উপর কুরবান হোক। আপনি এই বৃদ্ধাকে এত খাতির-যত্ন করেন যে অন্য কাউকে তা করেন না।'' হুজুর (সাঃ) বললেন, "এই বৃদ্ধা খাদিজার (রাঃ) যুগে আমাদের নিকট আসতেন। তুমি কি জাননা যে, ভালোবাসার কদর করাও ঈমানের প্রতীক।''

হজরত জাছামাহ সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য কোন কিতাবেই পাওয়া যায়না।

হযরত উম্মে কুলছুম (রাঃ) বিনতে উকবাহ

নাম জানা যায়নি। উম্মে কুলছুম কুনিয়তেই তিনি মশহুর হয়েছিলেন। কোরেশের বনু আবদি শামসের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। নসবনামা হলোঃ উম্মে কুলছুম বিনতে উকবাহ বিন আবি মুয়াইত বিন আবি আমর বিন উমাইয়াহ বিন আবদি শামস বিন আবদি মান্নাফ বিন কুসাই।

www.bjilibrary.com

মাতার নাম ছিল আরওয়া (রাঃ) বিনতে কুরাইয। তাঁর প্রথম বিয়ে হয়েছিল আফফান বিন আবিল আছের সঙ্গে। তাঁর ঔরসে জন্মগ্রহণ করেছিলেন হযরত ওসমান জুন্নুরাইন (রাঃ)। আফফানের মৃত্যুর পর আরওয়ার (রাঃ) বিয়ে হয়েছিল উকবাহ বিন আবি মুয়াইতের সাথে। হযরত উম্মে কুলছুম (রাঃ) তাঁর ঔরসেই জন্মগ্রহণ করেন। এই দিক থেকে তিনি হযরত ওসমানের (রাঃ) বৈপিত্রীয় বোন। উকবাহ বিন আবি মুয়াইত ইসলামের কট্টর শত্রু ছিল। কিন্তু স্ত্রী এবং কন্যাকে আল্লাহ তায়ালা অত্যন্ত সুন্দর স্বভাবে অভিষিক্ত করেছিলেন। তিনি অত্যন্ত কঠিন অবস্থায় ইসলাম গ্রহণ করেন এবং উকবাহ বিন আবি মুয়াইতের বিরোধিতার কোন পরওয়াই করেননি।

বিশ্বনবী (সাঃ) এবং অন্যান্য হকপন্থীরা মদীনায় হিজরত করলে হযরত উম্মে কুলছুমের (রাঃ) অন্তরও হিজরতের জন্য অস্থির হয়ে উঠলো। কিন্তু পিতা ও ভাই কড়া নজর রাখতো। এজন্য তিনি বেশ কিছুদিন পর্যন্ত হিজরতের সুযোগ পাননি। পিতা উকবাহ বিন আবি মুয়াইত বদরের যুদ্ধে হযরত আছেম (রাঃ) বিন ছাবিত বিন আবিল আফলাহ'র হাতে জাহান্নাম প্রাপ্ত হলে ভাইয়েরা তাঁর তত্ত্বাবধান আরো কঠোর করে দেয়। তারা প্রায়ই বিশ্বনবী (সাঃ) এবং দ্বীনে হকের বিরুদ্ধে যবান দারাজ করতো। হযরত উম্মে কুলছুম (রাঃ) তাদের কথা শুনতেন এবং মনে মনে গোস্বা হতেন। মহিলা হওয়ার কারণে কিছুই করতে পারতেন না। সব সময়ই দোয়া করতেন আল্লাহ পাক যেন তাঁকে এই নাপাক পরিবেশ থেকে নাজাত দেন এবং তিনি উড়ে গিয়ে রাসূলের (সাঃ) নিকট পৌছতে পারেন। ঘটনাক্রমে হুদায়বিয়ার সন্ধির অব্যবহিত পরই তিনি ঘর থেকে বের হওয়ার সুযোগ পেয়ে গেলেন। তিনি বনি খাযয়াহ'র এক নেক ব্যক্তির সঙ্গে পদব্রজেই মদীনা রওয়ানা হলেন এবং রাত দিন সফর করে বিশ্বনবীর (সাঃ) খিদমতে মদীনায় পৌছলেন। বাড়ীর লোকজন যখন তাঁর পলায়নের খবর জানতে পেলো তখন তারা মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লো। তাঁর দুই ভাই ওয়ালিদ বিন উকবাহ এবং আম্মারাহ বিন উকবাহ খুব ক্রুদ্ধ হলো এবং তারা সহোদরার পিছু নিলো। সৌভাগ্যবশত হযরত উম্মে কুলছুমকে (রাঃ) তারা রাস্তায় পেলো না। দুই ভাই সোজা মদীনা গিয়ে রাসূলের (সাঃ) নিকট দাবী করে বসলো যে, হুদায়বিয়ার সন্ধির সেই শর্ত পুরণ করুন, যে শর্তে কোরেশের কোন ব্যক্তি মদীনা এলে তাকে ফিরিয়ে দেয়ার কথা বলা হয়েছে।

এদিকে হযরত উম্মে কুলছুম (রাঃ) ফরিয়াদ করলেন, "হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে আপনার আশ্রয় থেকে বাইরে ঠেলে দেবেন না। আমি একজন দুর্বল মহিলা এবং মুশরিকদের মধ্যে ফিরে গেলে আমার ঈমান আশংকার মধ্যে নিপতিত হবে।"

www.bjilibrary.com

হুজুর (সাঃ) খুব চিন্তায় পড়লেন। কেননা চুক্তিতে মহিলাদের কথা উল্লেখ ছিল না। সে সময় আল্লাহর নিকট থেকে এই আয়াত নাযিল হলোঃ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ
اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ
إِلَى الْكُفَّارِ (الممتحنة)

"হে ঈমানদাররা! যখন তোমাদের নিকট মুসলমান মহিলারা হিজরত করে আসে তখন তাদেরকে পরীক্ষা কর। আল্লাহ তাদের ঈমান সম্পর্কে ভালোভাবে জানেন। তোমরা যদি জানো যে, তারা ঈমানের ওপর রয়েছে তাহলে তাদেরকে কাফেরদের হাওয়ালা করো না।"

আল্লাহর এই নির্দেশ মোতাবেক হুজুর (সাঃ) উম্মে কুলছুমকে (রাঃ) ফিরিয়ে দিতে অস্বীকৃতি জানালেন এবং তার ভাইয়েরা ব্যর্থ হয়ে ফিরে গেল।

অতঃপর হাদিয়ে বরহক (সাঃ) হযরত উম্মে কুলছুমকে (রাঃ) নিজের প্রিয় জান–নিছার হযরত যায়েদ (রাঃ) বিন হারিছার সঙ্গে বিয়ে দেন। মাওতাহ'র যুদ্ধে হযরত যায়েদ (রাঃ) শাহাদাত পেলে হযরত যোবায়ের (রাঃ) বিনুল আওয়ামের সঙ্গে বিয়ে হয়। কিন্তু তিনি কঠোর স্বভাবের লোক ছিলেন। এজন্য বনিবনা হয়নি। তালাকের পার্যায় পর্যন্ত গড়ায়। অতঃপর হযরত আব্দুর রহমান (রাঃ) বিন আওফের সঙ্গে বিয়ে হয়। যখন তিনি ওফাত পান তখন মিসর বিজেতা হযরত আমর (রাঃ) বিনুল আছের সঙ্গে আবার বিয়ে অনুষ্ঠিত হয়। এই বিয়ের একমাস পর হযরত উম্মে কুলছুম (রাঃ) ওফাত পান। এ সময় হযরত আমর বিনুল আছ মিসরের শাসক ছিলেন।

হযরত যায়েদ (রাঃ) বিন হারিছাহ এবং হযরত আমর (রাঃ) বিনুল আছের ঔরসে কোন সন্তান জন্মগ্রহণ করেনি। হযরত যোবায়েরের পক্ষে যয়নব নামক একটি কন্যা এবং হযরত আব্দুর রহমান (রাঃ) বিন আওফের ঔরসে ইবরাহিম, হামিদ, মুহাম্মাদ এবং ইসমাইল নামক চারপুত্র জন্ম গ্রহণ করেন।

হযরত উম্মে কুলছুমের (রাঃ) নিকট থেকে কয়েকটি হাদিসও বর্ণিত হয়েছে।

www.bjilibrary.com

হযরত উম্মে খালিদ (রাঃ) বিনতে খালিদ বিন সাঈদ

খায়বারের যুদ্ধের পরের কথা। একবার কোন এক স্থান থেকে বিশ্বনবী (সাঃ) তোহফা হিসেবে ফুল খচিত একটি কালো চাদর পান। হুজুর (সাঃ) বললেন, এই চাদর কাকে দেব? লোকজন চুপ রইলো। তাদের চুপ থাকার অর্থ হলো হুজুর (সাঃ) যাকে ইচ্ছা তাকে চাদরটি দিতে পারেন। হুজুর (সাঃ) বললেন, ''উম্মে খালিদকে ডাকো।'' এক ব্যক্তি দৌড়ে গেলেন এবং উম্মে খালিদকে বললেন যে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তাঁকে স্মরণ করছেন। তিনি তৎক্ষণাৎ রাসূলের (সাঃ) খিদমতে হাজির হলেন। রহমতে আলম (সাঃ) অত্যন্ত মুহাব্বাত এবং স্নেহের সাথে চাদরটি তাঁকে দিলেন এবং দু'বার বললেন, ''ব্যবহার করো এবং পুরাতন কর।''

অতঃপর হুজুর (সাঃ) চাদরের বুটিতে হাত রেখে হযরত উম্মে খালিদকে (রাঃ) দেখালেন এবং বললেন, ''উম্মে খালিদ দেখ! এটা সানাহ, এটা সানাহ। হাবশী ভাষায় ''সানাহ''–এর অর্থ হলো সুদর্শন। উম্মে খালিদ (রাঃ) হাবশী ভাষা জানতেন। তিনি বিশ্বনবীর (সাঃ) পবিত্র মুখে এই শব্দ শুনে খুশীতে বাগ বাগ হয়ে গেলেন।

এই উম্মে খালিদ, যাঁকে রহমতে আলম (সাঃ) এত স্নেহ করতেন তিনি ছিলেন জালিলুল কদর সাহাবী হযরত খালিদ (রাঃ) বিন সাঈদ বিনুল আছের কন্যা।

হযরত উম্মে খালিদের (রাঃ) আসল নাম ছিল আমাতা। তিনি কোরেশের মশহুর বংশ বনু উমাইয়ার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত ছিলেন। নসবনামা হলোঃ উম্মে খালিদ আমাতা বিনতে খালিদ (রাঃ) বিন সাঈদ বিনুল আছ বিন উমাইয়াহ বিন আবদি শামস বিন আবদি মান্নাফ বিন কুসাই।

মাতার নাম ছিল উমাইনাহ (রাঃ) অথবা হুমাইনাহ (রাঃ) বিনতে খালফ বিন আসায়াদ বিন আমের। বনু খাযায়াহ'র সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ছিল। হযরত উম্মে

www.bjilibrary.com

খালিদের (রাঃ) পিতা এবং মাতা উভয়েই দাওয়াতে হকের প্রাথমিক যুগে মুসলমান হয়েছিলেন এবং অন্যান্য প্রাচীন মুসলমানদের মত নানা ধরনের নির্যাতন সহ্য করেছিলেন। নবুয়তের পাঁচ বছর পর প্রিয় নবী (সাঃ) সাহাবায়ে কিরামকে মক্কার কাফিরদের জুলুম-নির্যাতনের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার জন্য হাবশা গমনের পরামর্শ দেন। সুতরাং কতিপয় সাহাবী (রাঃ) ঐ বছরই হিজরত করে হাবশা চলে যান।

পরবর্তী বছর মজলুম সাহাবীদের একটি বড় কাফেলা হাবশায় হিজরত করেন। এই কাফেলায় হযরত খালিদ (রাঃ) বিন সাঈদ বিনুল আছ এবং তাঁর ভাই হযরত আমর (রাঃ) বিন সাঈদ বিনুল আছও শামিল ছিলেন। তাঁদের সঙ্গে তাঁদের স্ত্রী উমাইনাহ(রাঃ) এবং ফাতিমা (রাঃ) বিনতে সাফওয়ানও ছিলেন। হযরত খালিদ (রাঃ) বিন সাঈদ খায়বারের যুদ্ধ পর্যন্ত হাবশা অবস্থান করেন। হাবশা অবস্থান কালেই হযরত উম্মে খালিদ আমাতা (রাঃ) জন্মগ্রহণ করেন। তিনি যে পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন সেই পরিবার প্রথম থেকেই ইসলামের আলোয় আলোকিত ছিল। সেজন্য তিনি জন্মগতভাবে মুসলমান ছিলেন। আল্লামা ইবনে আছির (রঃ) বর্ণনা করেছেন, হযরত উম্মে খালিদের (রাঃ) এক ভাইও হাবশায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর নাম ছিল সাঈদ (রাঃ)। ভাই-বোন উভয়েই সাহাবী ছিলেন। হযরত সাঈদ (রাঃ) হযরত আবুবকর সিদ্দিকের (রাঃ) খিলাফতকালে সিরিয়ার এক যুদ্ধে পিতার সামনেই শাহাদাত লাভ করেন।

হাবশায় মুহাজিরদের মধ্যেকার কিছু সাহাবী বিভিন্ন সময়ে বিশ্বনবীর (সাঃ) মদীনা হিজরতের পূর্বে মক্কা ফিরে আসেন। কিন্তু অধিকাংশ সাহাবী হাবশাতেই থেকে যান এবং খায়বারের যুদ্ধের সময় হযরত জাফর (রাঃ) বিন আবি তালিবের সঙ্গে মদীনা ফিরে আসেন। হযরত খালিদ (রাঃ) বিন সাঈদ, তাঁর পরিবার-পরিজন এবং অন্যান্য পরিবারও এই দলে ছিলেন। হযরত উম্মে খালিদ (রাঃ) সে সময় বয়োপ্রাপ্ত হয়েছিলেন। যখন তাঁরা হাবশা থেকে রওয়ানা হতে লাগলেন তখন হাবশার বাদশাহ নাজ্জাশী অত্যন্ত শ্রদ্ধা সহকারে তাঁদের নিকট একটি বাণী প্রেরণ করলেন। বাণীতে তিনি রাসূলের (সাঃ) নিকট সালাম পাঠালেন।

হযরত উম্মে খালিদ (রাঃ) বলতেন, আমিও সেই সকল লোকের মধ্যে ছিলাম যাঁদের নিকট হাবশার বাদশাহ রাসূলের (সাঃ) প্রতি সালাম দিয়েছিলেন। সম্ভত আমিও অন্যান্য মুসলমানের সঙ্গে হুজুরকে (সাঃ) নাজ্জাশীর সালাম পৌছিয়েছিলাম।

www.bjilibrary.com

মদিনায় আগমনের পর উম্মে খালিদের (রাঃ) বিয়ে হয়েছিল হুজুরের ফুফাতো ভাই হযরত যোবায়ের (রাঃ) বিনুল আওয়ামের সঙ্গে। তাঁর ঔরসে দুই পুত্র খালিদ ও ওমর এবং তিন কন্যা হাবিবাহ, সাওদাহ ও হিন্দ জন্মগ্রহণ করেন।

বিশ্বনবী (সাঃ) হযরত উম্মে খালিদকে (রাঃ) খুব স্নেহ করতেন। একবার তিনি নিজের মার সঙ্গে হুজুরের (সাঃ) খিদমতে হাজির হলেন। সে সময় তিনি লাল কুরতাহ পরিধান করেছিলেন। হুজুর (সাঃ) তাঁকে খোশ মেজাজের সঙ্গে বলে উঠলেন, "সানাহ, সানাহ"। খুব সুন্দর, খুব সুন্দর। হযরত উম্মে খালিদকে (রাঃ) খুশী করার জন্য হুজুর (সাঃ) হাবশী ভাষার এই শব্দ উচ্চারণ করেছিলেন। এমনিভাবে অন্য একবার হুজুর (সাঃ) উম্মে খালিদকে (রাঃ) বিশেষভাবে ডেকে একটি সুন্দর চাদর দিয়েছিলেন এবং সে সময়ও তাঁকে খুশী করার জন্য এই শব্দ ব্যবহার করেছিলেন।

হযরত উম্মে খালিদের (রাঃ) ওফাতের সাল জানা যায়নি। তাঁর থেকে কতিপয় হাদিস বর্ণিত আছে।

হযরত উম্মে ওয়ারকাহ (রাঃ) বিনতে নাওফিল আনসারিয়াহ

আসল নাম জানা যায়নি। পিতার নাম ছিল আব্দুল্লাহ। প্রপিতামহের নাম নাওফিল। সুতরাং লোকজন তাঁকে উম্মে ওয়ারকাহ বিনতে আব্দুল্লাহ এবং উম্মে ওয়ারকাহ বিনতে নাওফিল দুই নামেই ডাকতেন। হাফিজ ইবনে হাজার (রঃ) "ইসাবাহ" গন্থে তাঁর নসবনামা এভাবে লিখেছেনঃ উম্মে ওয়ারকাহ বিনতে আব্দুল্লাহ বিন হারিছ বিন উয়াইমির বিন নাওফিল।

নবীর হিযরতের পর ইসলাম গ্রহণ এবং হুজুরের (সাঃ) হাতে বাইয়াত হন। তারপর অত্যন্ত উৎসাহ-উদ্দীপনার সঙ্গে হুজুরের (সাঃ) নিকট থেকে কুরআনের তালিম নেন। ইবনে আছির (রঃ) লিখেছেন, তিনি সমগ্র কুরআন মজিদ হেফজ করেছিলেন। বদরের যুদ্ধের প্রস্তুতি চলছিল। তিনি হুজুরের (সাঃ) নিকট দরখাস্ত করেছিলেন যে, আমাকেও এই যুদ্ধে আপনার সঙ্গে নিয়ে চলুন। আমি আহতদের খিদমত এবং রোগীদের দেখা-শুনা করবো। সম্ভবত আল্লাহ পাক আমাকে হক পথে শহীদ হওয়ার সৌভাগ্য দান করবেন। হুজুর (সাঃ) বললেন,"তুমি গৃহেই থাকো।

www.bjilibrary.com

আল্লাহ তোমাকে এখানেই শাহাদাত নসিব করবেন।" তিনি হুজুরের (সাঃ) ইরশাদ তামিল করলেন এবং যুদ্ধে যাওয়ার ইচ্ছা পরিত্যাগ করলেন। ইবাদাতের প্রতি গভীর আকর্ষণ ছিল। তিনি কুরআন হেফজ করেছিলেন। এজন্য হুজুর (সাঃ) তাঁকে মহিলাদের ইমাম নির্বাচিত করে দিয়েছিলেন এবং তিনি নিজের গৃহকে সিজদাগাহ বানিয়ে নিয়েছিলেন। সেখানে তিনি মহিলাদের ইমামতি করতেন। হুজুর (সাঃ) তাঁর নিবেদনে একজন মুয়াজ্জিনও নিয়োগ করেছিলেন। তাঁর আওয়াজ শুনে মহিলারা জামায়াতের সঙ্গে নামায আদায় করার জন্য উম্মে ওরাকাহর গৃহে আসতেন।

আল্লামা ইবনে আছির (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, প্রিয় নবী (সাঃ) তাঁকে খুব স্নেহ করতেন। কখনো কখনো কিছু সাহাবীকে সঙ্গে নিয়ে তাঁর বাড়ী চলে যেতেন এবং বলতেন,"চলো,শহীদের বাড়ী যাই।" রাসূলের যুগে তাঁর সম্পর্কে এইটুকুই জানা যায়।

হাফিজ ইবনে হাজার (রঃ) বর্ণনা করেছেন, হযরত উম্মে ওয়ারকাহ (রাঃ) নিজের একজন দাস ও একজন দাসীর সঙ্গে ওয়াদা করেছিলেন যে, "আমার মৃত্যুর পর তোমরা আযাদ হয়ে যাবে।" এই হতভাগারা তাড়াতাড়ি আযাদ হওয়ার জন্য একরাতে চাদর দিয়ে তার গলায় ফাঁস লাগিয়ে দেয়। সকালে হযরত ওমর ফারুক (রাঃ) লোকদেরকে বললেন,আজ খালা উম্মে ওয়ারকাহর (রাঃ) কুরআন পাঠের আওয়াজ পেলাম না যে! জানিনা, তাঁর কি অবস্থা। এরপর হযরত উম্মে ওয়ারকাহর (রাঃ) বাড়ী গেলেন। গিয়ে দেখলেন যে, ওয়ারকাহ (রাঃ) ঘরের এক কোণায় চাদর জড়িয়ে নিষ্প্রান পড়ে রয়েছেন। হযরত ওমর (রাঃ) খুব দুশ্চিন্তাযুক্ত হলেন এবং বললেন,"আল্লাহর রাসুল (সাঃ) সত্যিই বলতেন, "শহীদের বাড়ী চলো।" এরপর তিনি মিম্বরে উঠে দাঁড়ালেন। এই খবর বললেন। দাস-দাসী দু'জনকেই গ্রেফতারের নির্দেশ দিলেন। তাদেরকে গ্রেফতার করে আনা হলো এবং আমিরুল মুমিনিনের নির্দেশ অনুযায়ী এই মারাত্মক অপরাধের কারণে শুলিতে লটকিয়ে দেয়া হয়। চরিতকাররা লিখেছেন, এই দু'জনই প্রথম অভিযুক্ত ছিলেন যাদেরকে মদীনায় শুলে চড়ানোহয়।

ইবনে সা'দ (রঃ) বর্ণনা করেছেন, হযরত উম্মে ওয়ারকাহ (রাঃ) হুজুর (সাঃ) থেকে কতিপয় হাদিসও রাওয়ায়েত করেন। কিন্তু অন্য কোন কিতাবে তাঁর কোন হাদিস রাওয়ায়েতের উল্লেখ করা হয়নি।

www.bjilibrary.com

হযরত উম্মে মানি' আনসারিয়াহ

তাঁর নাম ছিল আসমা (রাঃ) বিনতে আমর বিন আদি এবং খাজরাজ গোত্রের বনু সালমা বংশের লোক ছিলেন। নবীর (সাঃ) হিজরতের আগে মুসলমান হন এবং লাইলাতুল আকাবাহতে রহমতে আলমের (সাঃ) হাতে বাইয়াত হন। এসময় এই ভাগ্য (৭৩ জন পুরুষ ছাড়া) শুধুমাত্র আর একজন মহিলার জোটে। তিনি ছিলেন উম্মে আম্মারাহ (রাঃ)। এটা ছিল সেই দাওয়াত যাতে আনসাররা হুজুরকে (সাঃ) মদীনা তাশরীফ নেয়ার দাওয়াত দেন এবং জান, মাল এবং সন্তানসহ তাঁর (সাঃ) হিফাজত এবং সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেন। এর অতিরিক্ত হযরত উম্মে মানি' সম্পর্কে জানা যায়নি।

হযরত উম্মে আম্মারাহ (রাঃ) খাতুনে ওহোদ

আমিরুল মুমিনিন হযরত ওমর ফারুকের (রাঃ) খিলাফতকালে একবার গনিমতের মাল রাজধানীতে (মদীনা) এলো। তারমধ্যে অনেক মূল্যবান কাপড় ছিল। কাপড়ের মধ্যে একটি দামী দোপাট্টা ছিল। গনিমতের মাল বন্টন হচ্ছিল । এমন সময় সাইয়েদেনা ওমর ফারুক (রাঃ) উপস্থিত সবাইকে জিজ্ঞেস করলেন, এই দোপাট্টার সবচেয়ে বেশী হকদার কে? কিছু লোক মত দিলেন যে, দোপাট্টাটি আপনি আপনার পুত্রের (হযরত আব্দুল্লাহ) স্ত্রীকে দিন।

হযরত ওমর (রাঃ) কিছুক্ষণ চিন্তা করলেন এবং বললেন,"না,না। আমি দোপাট্টাটি উম্মে আম্মারাহকে দেব। সেই এর সবচেয়ে বেশী হকদার, কেননা ওহোদের যুদ্ধের পর আমি রাসূলুল্লাহ (সাঃ) থেকে শুনেছিলাম যে, ওহোদের দিন তিনি উম্মে আম্মারাহকে ডাইনে ও বাঁয়ে একাধারে যুদ্ধ করতে দেখেছেন।"

www.bjilibrary.com

একথা বলে তিনি দোপাট্টাটি হযরত উম্মে আম্মারাহর নিকট পাঠিয়ে দিলেন। এসময় তিনি মদীনার এক গ্রহে রাসূলের (সাঃ) স্মৃতি অন্তরে জাগরুক রেকে জীবনের শেষ কাল কাটাচ্ছিলেন। তাঁর জীবনে রাসূলের (সাঃ) প্রতি সীমাহীন ভালোবাসা এবং হক পথে জীবন, সন্তান ও সম্পদ কুরবানীর আবেগ এতো প্রোজ্জ্বল ছিলো যে ফারুকে আযমসহ (রাঃ) সকল সাহাবী (রাঃ) তাঁকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করতেন এবং খাতুনে ওহোদ বলে স্মরণ করতেন।

হযরত উম্মে আম্মারাহর)রাঃ) নাম "নুসাইবাহ"। কিন্তু ইতিহাসে তিনি নিজের কুনিয়তেই খ্যাত হয়ে আছেন। তিনি আনসারের খাজরাজ গোত্রের নাজ্জার বংশোদ্ভূত। নসবনামা হলোঃ নুসাইবাহ বিনতে কা'ব বিন আমর বিন আওফ বিন মাবজুল বিন আমর বিন গানাম বিন মাযন বিন নাজ্জার।

রাসূলে আকরামের (সাঃ) পরদাদী সালমাও (হযরত আবদুল মুত্তালিবের মা এবং হাশিম বিন আবদি মান্নাফের স্ত্রী) নাজ্জার বংশের মানুষ ছিলেন। মদীনায় আগে থেকেই এই বংশকে খুবই সম্ভ্রান্ত মনে করা হতো। কিন্তু পরে হযরত আবদুল মুত্তালিবের মাতামহ হওয়ার ভিত্তিতে এবং প্রিয় নবীর (সাঃ) মাধ্যমে আত্নীয়তার বদৌলতে একে মদীনার প্রসিদ্ধ বংশ হিসেবে মনে করা হচ্ছিল। রাসূলে আকরাম (সাঃ) বনু নাজ্জারকে অত্যন্ত সম্মানিত মনে করতেন। সহিহ মুসলিমে আছে,একবার হুজুর (সাঃ) বলেছিলেনঃ"আমি যদি আনসারের কোন পরিবারভুক্ত হতাম তাহলে বনু নাজ্জারে শামিল হতাম।"

রহমতে আলমের (সাঃ) বয়স যখন ৬বছর তখন তাঁর সম্মানীয়া মা হযরত আমেনা দাসী উম্মে আইমান (রাঃ) এবং শিশু হুজুরের (সাঃ) সঙ্গে মক্কা মুয়াজ্জামা থেকে মদীনা মুনাওয়ারাহ তাশরীফ নেন এবং সেখানে কম-বেশী এক মাস পর্যন্ত বনু নাজ্জার বংশে অবস্থান করেন। প্রত্যাবর্তনকালে আবওয়া নামক স্থানে পৌছলে অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং সেখানেই ইন্তেকাল করেন। শিশু হুজুর (সাঃ) উম্মে আইমানের (রাঃ) সঙ্গে মক্কা পৌছলেন। মদীনায় অবস্থানের কথা সারা জীবন রাসূলের (সাঃ) স্মরণ ছিল। অনেক বছর পর তিনি একবার বনু নাজ্জারের মহল্লা দিয়ে অতিক্রম করছিলেন। তখন একটি বাড়ীর দিকে ইঙ্গিত করে বলেছিলেনঃ"এই সেই বাড়ী যেখানে আমি আমার মা'সহ অবস্থান করেছিলাম।" অতঃপর তিনি একটি পুকুর এবং একটি মাঠের দিকে ইশারা করে বলেছিলেনঃ"এই সেই পুকুর যাতে আমি সাঁতার কাটতে শিখেছিলাম। আর এই সেই মাঠ যেখানে আমি আনিসা নাম্নী একটি মেয়ের সঙ্গে খেলতাম।" হিযরতের পর কুবা থেকে মদীনা মুনাওয়ারাহ

www.bjilibrary.com

তাশরীফ আনলে হুজুরের (সাঃ) মেযবানীর মর্যাদা পেয়েছিলেন হযরত আবু আইউব আনসারী (রাঃ)। তিনি বনু নাজ্জারেরই সরদার ছিলেন। হুজুরের (সাঃ) শুভাগমনের সময় এমনিতেই আনসারের প্রতিটি শিশু আনন্দে আত্মহারা হয়ে পড়েছিলো। কিন্তু বনু নাজ্জারের উৎসাহ-উদ্দীপনা ও আনন্দের সীমা-পরিসীমা ছিলনা। তাদের নিষ্পাপ শিশুরা দফ বাজিয়ে বাজিয়ে এই গান গাইছিলঃ "আমরা বনি নাজ্জারের সন্তান। মুহাম্মাদ (সাঃ) কত ভালো প্রতিবেশী।"

হুজুর (সাঃ) এইসব শিশুর পাশ দিয়ে অতিক্রমকালে মুচকি হেসে বললেনঃ "শিশুরা। তোমরা কি আমাকে ভালোবাস?" সবাই সম্মিলিতভাবে জবাব দিলঃ "হাঁ, ইয়া রাসুলাল্লাহ।" হুজুর (সাঃ) বললেনঃ "তোমরা আমার খুব প্রিয়।"

দ্বিতীয় উকবাহর বাইয়াতের পর হুজুরের (সাঃ) ইরশাদ অনুযায়ী মদীনাবাসী দ্বীনি বিষয়াদি সংরক্ষণের জন্য ১২জন নকিব নির্বাচন করেছিলেন। তাঁদের মধ্যে হযরত আসয়াদ(রাঃ) বিন ফারারাহ বনু নাজ্জারের নকীব ছিলেন। হিজরতের কিছু দিন পর হযরত আসয়াদ (রাঃ) ওফাত পেলে বনু নাজ্জারের লোকজন হুজুরের (সাঃ) খিদমতে হাজির হয়ে আরজ করলেনঃ "হে আল্লাহর রাসুল। আসয়াদের স্থলে আপনি অন্য কাউকে বনু নাজ্জারের নকিব নিয়োগ করুন।"

হুজুর (সাঃ) বললেনঃ "তোমরা আমার মামু হও। এজন্য এখন আমি স্বয়ং বনুনাজ্জারেরনকিব।"

হুজুরের (সাঃ) ইরশাদ শুনে বনু নাজ্জার খুশীতে একদম বাগ বাগ। বাস্তবত এটা একটা মহাভাগ্যের ব্যাপার ছিল। প্রিয় নবী (সাঃ) প্রকৃত অর্থে আনসারের উত্তম খান্দান হয়ে গিয়েছিলেন। হযরত উম্মে আম্মারাহ (রাঃ) সেই মহান খান্দানের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত ছিলেন। স্পষ্ট কথা হলো,এই ধরনের খান্দানের সঙ্গে সম্পর্ক রাখাটাই একটা বড় মর্যাদার ব্যাপার ছিল। কিন্তু সত্যিকথা বলতে কি, হযরত উম্মে আম্মারাহ'র (রাঃ) প্রকৃত গৌরবের বস্তু ছিল অন্য কিছু। তিনি দ্বীনে হকের খাতিরে প্রতিটি মুহূর্ত আপাদমস্তক প্রস্তুত থাকতেন এবং হাদিয়ে আকরামকে (সাঃ) গভীরভাবে শ্রদ্ধা করতেন। আর একারণেই তিনি নিজের জান, মাল সন্তান ও প্রতিটি জিনিস থেকে মুখাপেক্ষীহীন ছিলেন। এই নিষ্ঠা, একাগ্রতা এবং শ্রদ্ধাবোধ তাঁকে এতবড় মর্যাদা দান করেছিল।

হযরত উম্মে আম্মারার (রাঃ) প্রথম বিয়ে হয়েছিল চাচাতো ভাই যায়েদ বিন আছেমের সঙ্গে। যায়েদের ঔরসে তাঁর দুটি সন্তান হয়েছিল। তাঁদের নাম হলো আব্দুল্লাহ (রাঃ) এবং হাবিব (রাঃ)। এই দুই ভাই সাহাবী ছিলেন এবং ইতিহাসখ্যাত

www.bjilibrary.com

হয়েছিলেন। যায়েদের ওফাতের পর হযরত উম্মে আম্মারাহর (রাঃ) বিয়ে হয়েছিল আরবাহ (রাঃ)বিন আমরের সঙ্গে। তাঁর ঔরসে তামিম ও খাওলাহ জন্মগ্রহণ করেছিলেন।

হযরত উম্মে আম্মারা (রাঃ) আনসারের সাবিকিনা আওয়ালিনার মধ্যে পরিগণিত। প্রথম বাইয়াতে উকবার পর যখন হযরত মাসয়াব (রাঃ) বিন উমাইর ইয়াছরেবে ইসলামের তাবলীগ করছিলেন তখন তিনি খান্দান সমেত ইসলাম গ্রহণ করেন। ইসলাম গ্রহণের পর নবুয়তের ১৩ তম বছরে তিনি সেই ৭৫ জনের অর্ন্তভুক্ত হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন যাঁরা বড় উকবাতে প্রিয় নবীর (সাঃ) হাতে বাইয়াত করেছিলেন এবং হুজুর (সাঃ) ইয়াছরেব তাশরীফ নিলে জান,মাল এবং সন্তানসহ তাঁকে সমর্থন করবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। হাফিজ ইবনে হাজার (রঃ) বর্ণনা করেছের,তাঁর স্বামী আরবাহ (রাঃ) বিন আমরও বড় বাইয়াতে উকবাতে শরীক ছিলেন। কিন্তু অধিকাংশ চরিত গ্রন্থে বাইয়াতে উকবায়ে কবিরায় অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে তাঁর নাম পাওয়া যায় না। অবশ্য হযরত উম্মে আম্মারাহর (রাঃ) এই বাইয়াতে অংশগ্রহণ প্রশ্নে সকলেই একমত।

নবীর হিজরতের তৃতীয় বছরে ওহোদের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। হযরত উম্মে আম্মারাহও (রাঃ) যুদ্ধে অংশ নেন এবং এমন বীরত্ব, দৃঢ়তা ও অটলতা প্রদর্শন করেন যে, ইতিহাসে তিনি"খাতুনে ওহোদ" উপাধিতে খ্যাত হন। তাবাকাতে ইবনে সাদের রাওয়ায়েত অনুযায়ী তাঁর স্বামী আবরাহ (রাঃ) বিন আমর, দুই পুত্র আবদুল্লাহ (রাঃ) এবং হাবিবও (রাঃ) ওহোদের দুদ্ধে তাঁর সঙ্গে অংশ নিয়েছিলেন।

যুদ্ধে যখন মুসলমানরা অগ্রগামী ছিলেন তখন উম্মে আম্মারাহ (রাঃ) অন্য মহিলাদের সাথে মশকে পানি ভরে ভরে মুজাহিদদেরকে পান এবং আহতদেরকে সেবা করতেন। যখন একটি ভুলের কারণে যুদ্ধের দৃশ্য বদলে গেল এবং মুজাহিদরা বিশৃংখলার শিকার হলেন তখন রাসূলের (সাঃ) নিকট হাতে গোনা মাত্র কয়েকজন জীবন উৎসর্গকারী রয়ে গেলেন। হযরত উম্মে আম্মারাহ (রাঃ) এই অবস্থা প্রত্যক্ষ করে মশক ফেলে দিয়ে তরবারী এবং ঢাল হাতে তুলে নিলেন ও হুজুরের (সাঃ) নিকট পৌছে কাফেরদের সামনে বুক পেতে দাঁড়িয়ে গেলেন। কাফেররা বার বার হামলা করে রাসূলের (সঃ) দিকে অগ্রসর হতো এবং উম্মে আম্মারাহ (রাঃ) তাদেরকে অন্যান্য অটল সাহাবীর (রাঃ) সংগে একত্রিত হয়ে তীর ও তরবারী দিয়ে বাধা দিতেন। এটা বড় ভয়ানক সময় ছিল। বড় বড় বাহাদুরের পা টলে গিয়েছিল। কিন্তু এই ব্যাঘ্র অন্তর মহিলা অটল পাহাড়ের মত যুদ্ধের ময়দানে দাড়িঁয়েছিলেন। ইত্যবসরে এক মুশরিক তাঁর মাথার ওপর পৌছে তরবারী চালিয়ে দিল। উম্মে

www.bjilibrary.com

আম্মারাহ (রাঃ) তাকে নিজের ঢাল দিয়ে প্রতিরোধ করলেন এবং তার ঘোড়ার পায়ের ওপর তরবারীর এমন আঘাত হানলেন যে, ঘোড়া এবং সওয়ার উভয়েই মাটিতে পতিত হলো । সারওয়ারে আলম (সাঃ)এই চিত্র দেখছিলেন। তিনি উম্মে আম্মারাহর (রাঃ) পুত্র আব্দুল্লাহকে (রাঃ) ডেকে বললেন, "আব্দুল্লাহ! তোমার মাকে সাহায্য কর।" তিনি তৎক্ষণাৎ সেদিকে এগিয়ে গেলেন এবং তরবারীর এক আঘাতেই সেই মুশরিককে জাহান্নামে পাঠিয়ে দিলেন। ঠিক সেই সময় অন্য একজন মুশরিক দ্রুত সেদিকে এলো এবং হযরত আব্দুল্লাহর (রাঃ) বাম বাহুতে আঘাত করে চলে গেল। হযরত উম্মে আম্মারাহ (রাঃ) স্বহস্তে আব্দুল্লাহর (রাঃ) ক্ষতস্থান বাঁধলেন এবং বললেনঃ"পুত্র ! যাও, এবং যতক্ষণ দম আছে ততক্ষণ লড়াই কর।" হুজুর (সাঃ) তাঁর জীবন উৎসর্গের আবেগ দেখে বললেন,"হে উম্মে আম্মারাহ! তোমার মধ্যে যে শক্তি রয়েছে তা আর কার মধ্যে থাকবে?" ঠিক এই সময় আব্দুল্লাহকে (রাঃ) আঘাতকারী মুশরিক ফিরে আবার হামলা করে বসলো। হুজুর (সাঃ) উম্মে আম্মারাহকে বললেনঃ "উম্মে আম্মারাহ! ঠেকানো চাই। এ সেই হতভাগা যে আব্দুল্লাহকে আহত করেছিল।" হযরত উম্মে আম্মারাহ (রাঃ) ক্রোধান্বিত হয়ে তার দিকে অগ্রসর হলেন এবং তরবারীর এমন আঘাত হানলেন যে, সে দুই টুকরো হয়ে নীচে পড়ে গেল। প্রিয় নবী (সাঃ) এই দৃশ্য দেখে মুচকি হাসি দিলেন এবং বললেনঃ "উম্মে আম্মারাহ! তুমি পুত্রের খুব প্রতিশোধ নিয়েছ।"

যুদ্ধের মধ্যে এক হতভাগা দূর থেকে হুজুরের (সাঃ) ওপর পাথর নিক্ষেপ করলো। তাতে তাঁর দুটি দান্দান মুবারক শহীদ হয়ে গেল। রিসালাত প্রদীপের পতঙ্গরা অস্থির হয়ে সেদিকে দৃষ্টি ফেললেন। এ সময় ইবনে কামিয়া নামক এক কাফের দৌড়ে হুজুরের (সাঃ) নিকট পৌছে পূর্ণশক্তি দিয়ে তরবারী চালিয়ে দিল। হুজুর (সাঃ) স্বয়ং যিরাহ পরিহিত অবস্থায় ছিলেন। ইবনে কামিয়ার তরবারীর আঘাত নিজের ওপরই পড়লো। তার আঘাত পবিত্র গন্ডদেশে লাগলো এবং রক্তের ধারা প্রবাহিত হয়ে গেল। এসবই চোখের পলকে ঘটে গেল। উম্মে আম্মারাহ (রাঃ) অস্থির হয়ে পড়লেন এবং সামনে অগ্রসর হয়ে ইবনে কামিয়াকে বাধা দিলেন। এই ব্যক্তি কোরেশের প্রখ্যাত ঘোড় সওয়ার ছিল। কিন্তু ব্যাঘ্র হৃদয় উম্মে আম্মারাহ (রাঃ) মোটেই না ঘাবড়িয়ে তার ওপর অত্যন্ত বীরত্বের সঙ্গে হামলা চালালেন। সে ডবল যিরাহ পরিধান করেছিল। এজন্য উম্মে আম্মারাহর (রাঃ) হামলায় কাজ হলো না এবং ইবনে কামিয়া জবাবী হামলার সুযোগ পেয়ে গেল। ফলে তাঁর কাঁধে মারাত্মক আঘাত লাগলো। তবে, ইবনে কামিয়াও সেখানে অবস্থানের সাহস পেল না। তাড়াতাড়ি ঘোড়া দৌড়িয়ে সেখান থেকে পলায়ন করলো। হযরত উম্মে আম্মারার

www.bjilibrary.com

(রাঃ) ক্ষতস্থান থেকে দরদর করে রক্ত প্রবাহিত হচ্ছিল। হুজুর (সাঃ) তাঁর ক্ষতস্থানে স্বয়ং পট্টি বাঁধলেন এবং কয়েকজন বাহাদুর সাহাবীর (রাঃ) নাম উচ্চারণ করে বললেনঃ "আল্লাহর কসম! আজ উম্মে আম্মারাহ (রাঃ) তাদের সবার চেয়ে বাহাদুরীপ্রদর্শনকরেছেন।"

উম্মে আম্মারাহ (রাঃ) আরজ করলেনঃ "হে আল্লাহর রাসূল! আমার মাতা-পিতা আপনার ওপর কুরবান হোক। আমার জন্য দোয়া করুন, যাতে জান্নাতেও আপনার সঙ্গে থাকার ভাগ্য হয়।"

হুজুর (সাঃ) অত্যন্ত একাগ্রতার সঙ্গে তাঁর জন্য দোয়া করলেন এবং উচ্চৈস্বরে বললেনঃ "আল্লাহুম্মা আজয়ালহুম রিফকায়ি ফিল জান্নাতি।"

হযরত উম্মে আম্মারাহ (রাঃ) খুব খুশী হলেন এবং তাঁর মুখ দিয়ে অযাচিতভাবে এই বাক্য উচ্চারিত হলোঃ "এখন আর আমার এই দুনিয়ায় মুসিবতের কোন পরওয়া নেই।"

যুদ্ধ শেষ হলে হুজুর (সাঃ) হযরত উম্মে আম্মারাহর (রাঃ) অবস্থা না জানা পর্যন্ত বাড়ী ফিরে যাননি। হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) বিন কা'ব মাযনীকে পাঠিয়ে তাঁর খবর নেন। তার পর বাড়ী যান। হুজুর (সাঃ) বলতেন,"ওহোদের দিন ডাইনে বামে যেদিকেই নজর দিতাম, শুধু উম্মে আম্মারাই লড়াই করছে দেখতাম।"

এক রাওয়ায়েতে আছে, ওহোদের যুদ্ধে হযরত উম্মে আম্মারাহর (রাঃ) শরীরে ১২টি আঘাত লেগেছিল। আল্লামা ইবনে সাদ (রঃ) বর্ণনা করেছেন, ওহোদের যুদ্ধের পর তিনি বাইয়াতে রেদওয়ান, খায়বারের যুদ্ধ, ওমরাতুল কাজা এবং হুনাইনের যুদ্ধেও অংশ নিয়েছিলেন। অন্য আরেক রাওয়ায়েত অনুযায়ী তিনি মক্কা বিজয়ের সময়ও প্রিয় নবীর (সাঃ) সঙ্গী ছিলেন।

১১ হিজরীতে রাসূলে আকরাম (সাঃ) ওফাত পেলে হযরত আবুবকর সিদ্দিক (রাঃ) খলিফা নির্বাচিত হলেন। এসময় সমগ্র আরবে ধর্মদ্রোহিতার ফিতনার আগুন প্রজ্বলিত হয়ে উঠলো। ধর্মদ্রোহীদের মূলোৎপাটনের জন্য যেসব যুদ্ধ সংঘটিত হয় তারমধ্যে সবচেয়ে ঘোরতর যুদ্ধ হয় মুসায়লামাহ কাজ্জাবের সঙ্গে। এই ব্যক্তি ইয়ামামার নাজদ এলাকার বনু হানিফা গোত্রের সরদার ছিল। সে রাসূলের (সাঃ) জীবনের শেষদিকে মুরতাদ হয়ে নবুয়তের দাবী করেছিল এবং হুজুরকে (সাঃ) এই পত্র প্রেরণ করেছিলঃ "মুসায়লামাহ রাসূলুল্লাহর তরফ থেকে মহাম্মাদ রাসূলুল্লাহর নামে। আমাকে তোমার রিসালাতে শরীক করা হয়েছে। অর্ধেক দেশ আমার,অর্ধেক কোরেশের। তবে, কোরেশ একটি চরমপন্থী জাতি।"

www.bjilibrary.com

হুজুর (সাঃ) এই চিঠির জবাব এই ভাষায় দিয়েছিলেনঃ

"বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম। মুহাম্মাদ রাসুলুল্লাহর পত্র মুসায়লামাহ কাজ্জাবেরনামে।

যে ব্যক্তি হেদায়াতের অনুগত তার ওপর সালাম। এরপর তোমার জানা আছে যে, দেশ আল্লাহর এবং তিনি নিজের বান্দাহর মধ্য থেকে যাকে ইচ্ছা তাঁর উত্তরাধিকার বানান এবং আখিরাতের কল্যাণ পরহেযগারদের জন্য।"

এই পবিত্র চিঠি প্রেরণের কিছুদিন পর হুজুর (সাঃ) ইন্তেকাল করেন। ফলে মুসায়লামাহ প্রকাশ্য খেলায় নামে। সে ধোঁকাবাজি এবং গালাগালির মাধ্যমে লোকদেরকে জোরপূর্বক নিজের অনুসারী বানানো শুরু করলো। কিছুদিনের মধ্যেই ৪০হাজারেরও বেশী যোদ্ধা তার অধীনে একত্রিত হলো। যে তার নবুয়তের অস্বীকৃতি জানাতো তার ওপর কঠোর নির্যাতন চালাতো।

সেই যুগেই একদিন হযরত উম্মে আম্মারাহর (রাঃ) পুত্র হাবিব (রাঃ) বিন যায়েদ আম্মান থেকে মদীনা আসছিলেন। রাস্তায় এই জালেমের হাতে পড়ে গেলেন। সে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলোঃ "মুহাম্মাদ (সাঃ) সম্পর্কে তোমার ধারণা কি?"

হযরত হাবিব (রাঃ) নিশ্চিন্তে জবাব দিলেনঃ "তিনি খোদার সত্য রাসূল।" মুসায়লামাহ বললোঃ "না, এটা বলো যে, মুসায়লামাহ আল্লাহর সত্য রাসূল।" হযরত হাবিব (রাঃ) তার কথা অবজ্ঞার সঙ্গে প্রত্যাখ্যান করলেন। মুসায়লামাহ ক্রোধান্বিত হয়ে তরবারীর আঘাতে তাঁর একটি হাত শহীদ করে ফেললো এবং বললোঃ"এখন আমার কথা মানবে কিনা?" হযরত হাবিব (রাঃ)জবাব দিলেন,"অবশ্যই নয়।" এরপর মুসায়লামাহ তাঁর দ্বিতীয় হাতও শহীদ করে ফেললো এবং বললোঃ"এখনো যদি আমার রিসালাত কবুল কর তাহলে তোমার জীবন বাঁচতে পারে।" সেই আশেকে রাসূল যিনি উম্মে আম্মারাহর মত মায়ের দুধ পান করেছিলেন, বললেনঃ"অবশ্যই নয়,অবশ্যই নয়। আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ।"

এতে মুসায়লামাহ ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে তাঁকে টুকরো টুকরো করে কাটা শুরু করলো। হযরত হাবিব (রাঃ) এভাবে শাহাদাত বরণ করলেন কিন্তু হক পথ থেকে বিচ্যুত হলেননা।

www.bjilibrary.com

হযরত উম্মে আম্মারাহ (রাঃ) মুজাহিদ পুত্রের নির্যাতনমূলক শাহাদাতের খবর পেয়ে তাঁর দৃঢ়তা ও অটলতার জন্য আল্লাহর শুকুর আদায় করলেন। কিন্তু প্রতিজ্ঞা করলেন যে, মুসায়লামাহর এই জুলুমের প্রতিশোধ অবশ্যই নেবেন।

এই ঘটনার কিছু দিন পর যখন হযরত আবুবকর সিদ্দিক (রাঃ) হযরত খালিদ (রাঃ) বিন ওয়ালিদকে মুসায়লামাহকে উৎখাতের জন্য নিয়োগ করলেন তখন হযরত উম্মে আম্মারাহ (রাঃ) হযরত খালিদের বাহিনীতে যোগ দিলেন। মুসায়লামাহও মোকাবিলার জন্য ব্যাপক প্রস্তুতি নিল। সে বনু হানিফা এবং অন্যান্য সমর্থকদের গোত্রগত গোঁড়ামীকে খুব করে হাওয়া দিলো এবং ৪০হাজার যোদ্ধাকে হযরত খালিদের (রাঃ) বিরুদ্ধে এনে দাঁড় করালো। উভয় পক্ষের মধ্যে ঘোরতর যুদ্ধ হল। মুসলমান ও মুরতাদদের সংখ্যার অনুপাত ছিল ১ ঃ ৪। কিন্তু ইসলামের মুজাহিদরা দ্বীনে হকের খাতিরে বীরত্বের সঙ্গে লড়াই করে মুসায়লামাহ বাহিনীকে পরাস্ত করলেন। এই অবস্থায় মুসায়লামাহর পুত্র শুরাহবিল নিজের গোত্রকে সম্বোধন করে বললো ঃ

"হে বনু হানিফার লোকেরা! নিজের জীবন হাতলের ওপর রেখে মুসলমানদের মুকাবিলা কর। আজ জাতীয় লজ্জার দিন। যদি তোমরা পরাজিত হও তাহলে তোমাদের–পরিবার পরিজনকে মুসলমানরা কব্জা করে নেবে। এজন্য নিজেদের মান–মর্যাদা রক্ষার্থে জীবন দিয়ে লড়াই কর।"

শুরাহবিলের এই বক্তৃতা বিদ্যুতের মত কাজ দিল এবং বনু হানিফা এত প্রচন্ডভাবে হামলা করলো যে, মুসলমানরা পিছু হটে গেল। এ পর্যন্ত মুসলমানদেরকে এত কঠিন লড়াইয়ের সম্মুখীন হতে হয়নি। অতঃপর হযরত খালিদ (রাঃ) মুসলমানদের সকল গোত্রকে পৃথক করে দিলেন এবং ঘোষণা করলেন যে, প্রত্যেক গোত্রকে স্বস্ব ঝান্ডা তুলে লড়াই করতে হবে। তাতে হক পথে কে অটলতা দেখাতে পারে তা প্রমাণিত হবে। এই কৌশলের যথার্থ ফল পাওয়া গেল। প্রত্যেক গোত্রই বীরত্ব ও অটলতার প্রশ্নে পরস্পরকে অতিক্রম করার চেষ্টা করলো এবং এমন–ভাবে লাড়াই করলো যে মুসায়লামার বাহিনী অব্যাহত মারাত্মক হামলার পরও তাঁদেরকে পিছু হটাতে পারলো না। মুসলমানদের বড় বড় অভিজ্ঞ অফিসার শহীদ হয়ে গেলেন। তাঁদের মধ্যে ছিলেন হযরত যায়েদ (রাঃ) বিন খাত্তাব, হযরত আবু হোযায়ফা (রাঃ), হযরত সালেম (রাঃ) এবং হযরত ছাবিত (রাঃ) বিন কায়েস। কিন্তু এ সত্ত্বেও মুসলমানরা অটল রইলেন। এতক্ষণে মুসায়লামাহ বাহিনী পিছু হটা শুরু করলো এবং তার বাগানে প্রবেশ করে ভেতর থেকে ফটক বন্ধ করে দিল।

www.bjilibrary.com

হযরত বারা' (রাঃ) বিন মালিক প্রাচীর টপকে বাগানের মধ্যে লাফিয়ে পড়লেন এবং যুদ্ধ করতে করতে দরজা পর্যন্ত পৌছে ফটক ভেতর থেকে খুলে দিলেন। এরপর মুরতাদ ও মুসলমানদের মধ্যে সিদ্ধান্তমূলক যুদ্ধ শুরু হলো। হযরত উম্মে আম্মারাহও (রাঃ) শুরু থেকে নিয়ে এ পর্যন্ত অত্যন্ত উৎসাহ-উদ্দীপনার সঙ্গে যুদ্ধ করছিলেন। কয়েকবার মুসায়লামার নিকট পৌছার চেষ্টা করলেন। কিন্তু বারবার বনু হানিফার লৌহ প্রাচীর পথে বাধার সৃষ্টি করলো। এদিকে হযরত খালিদও (রাঃ) মুসায়লামাকে জাহান্নামে প্রেরণের চিন্তায় ছিলেন। কিন্তু সুযোগ পাচ্ছিলেন না। তৎক্ষণে ১২শ'র মত মুসলমান শাহাদাতের পিয়ালা পান করেছিলেন। তবে, তারচেয়েও বেশী সংখ্যক মুরতাদ নিহত হয়েছিল এবং যুদ্ধের ধারা পরিবর্তিত হচ্ছিল। মুসায়লামাহ যুদ্ধের অবস্থা দেখে মুরিদদেরকে বললো, যদি জীবন বাঁচাতে চাও তাহলে আর দেরী করো না, সটকে পড়। সে সময় উম্মে আম্মারাহ (রাঃ) তাকে তাক করলেন এবং জখমের ওপর জখম খেতে খেতে এবং নিজের বর্শা দিয়ে পথ বানিয়ে তার দিকে অগ্রসর হলেন। এই চেষ্টায় তিনি ১১টি আঘাত পেলেন এবং একটি হাতও কেটে গেল। মুসায়লামার (রাঃ) নিকটে পৌছে বর্শা দিয়ে তার ওপর হামলা করতে চাইলেন। ইত্যবসরে দু'টি অস্ত্র তার ওপর এক সঙ্গে গিয়ে পড়লো এবং খণ্ডিত হয়ে ঘোড়ার নীচে গিয়ে পড়লো। উম্মে আম্মারাহ (রাঃ) নজর উঠিয়ে পুত্র আবদুল্লাহকে (রাঃ) পাশে দেখতে পেলেন এবং নিকটেই ওয়াহশীকে (রাঃ) দণ্ডায়মান পেলেন। ওয়াহশী (রাঃ) নিজের অস্ত্র মুসায়লামার ওপর নিক্ষেপ করেছিলেন এবং আব্দুল্লাহ (রাঃ) সেই সময়ই তার ওপর তরবারী চালিয়েছিলেন। উম্মে আম্মারাহ (রাঃ) পুত্র হাবিবের (রাঃ) হন্তা এবং মুসলমানদের জঘন্যতম শত্রুর মৃত্যুতে শুকরিয়ার সিজদায় মাথা অবনত করলেন। সেনাবাহিনী প্রধান হযরত খালিদ (রাঃ) বিন ওয়ালিদ হযরত উম্মে আম্মারাহর ফজিলত ও মর্যাদা সম্পর্কেও ওয়াকিবহাল ছিলেন। তিনি খুব দ্রুততার সঙ্গে তাঁর চিকিৎসা করলেন। কিছুদিন পর তাঁর ক্ষতস্থান শুকিয়ে গেল। কিন্তু একটি হাত চিরকালের জন্য আল্লাহর পথে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। যখনই এই ঘটনার উল্লেখ হতো তখনই তযরত উম্মে আম্মারাহ (রাঃ) হযরত খালিদ (রাঃ) বিন উয়ালিদের প্রশংসা করতেন এবং বলতেন, "খালিদ অত্যন্ত সহানুভূতির সঙ্গে আমার চিকিৎসা করায়। সে বড় হামদরদ এবং নেক মানুষ।

হযরত উম্মে আম্মারাহর (রাঃ) ইন্তেকালের সাল সম্পর্কে সকল ইতিহাস গ্রন্থই নীরব। অবশ্য কতিপয় রাওয়ায়েত থেকে জানা যায় যে, তিনি হযরত ওমর ফারুকের (রাঃ) খিলাফতকালে জীবিত ছিলেন এবং সেই আমলেই মারা যান।

www.bjilibrary.com

হযরত উম্মে আম্মারাহ (রাঃ) রাসূলে আকরামকে (সাঃ) গভীর ভক্তি ও শ্রদ্ধা করতেন এবং সব সময় প্রিয় নবীর (সাঃ) জন্য জীবন কুরাবান করতে প্রস্তুত থাকতেন। রহমতে আলমও (সাঃ) তাঁকে খুব স্নেহ করতেন এবং কখনো কখনো তাঁর বাড়ী তাশরীফ নিতেন। মুসনাদে আহমদ ও ইসাবাহতে বর্ণিত আছে, একবার হুজুর (সাঃ) উম্মে আম্মারাহর (রাঃ) বাড়ী তাশরীফ নিলেন। এ সময় তিনি হুজুরের (সাঃ) সামনে খাবার পেশ করলেন। তিনি বললেন,"তুমিও খাও।" আরজ করলেন,"হে আল্লাহর রাসূল ! আমি রোযা আছি।" ইরশাদ হলোঃ রোযাদারের সামনে কিছু খাওয়া হলে ফেরেশতা তাঁর ওপর দরুদ প্রেরণ করে থাকে।" অতঃপর তিনি হযরত উম্মে আম্মারাহর সামনে খাবার খেলেন।

এক রাওয়ায়েতে আছে, হুজুরের (সাঃ) পর হযরত আবুবকর সিদ্দিকও (রাঃ) কখনো কখনো হযরত উম্মে আম্মারাহর গৃহে তাঁর খোঁজ-খবর নেয়ার জন্য যেতেন। হযরত উম্মে আম্মারাহ (রাঃ) কতিপয় হাদীস বর্ণনা করেছেন।

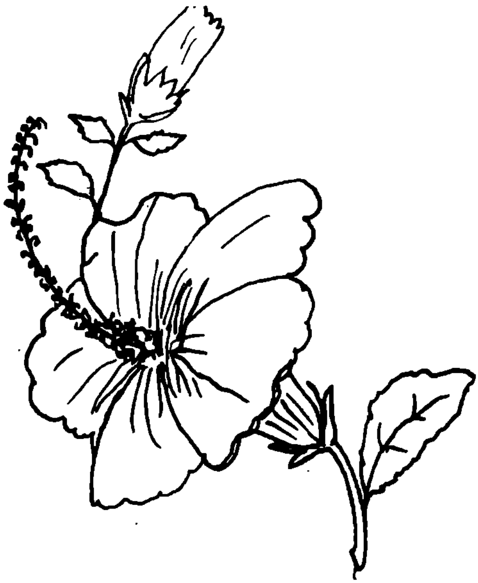

www.bjilibrary.com

হযরত উম্মে আতিয়্যাহ বিনতে হারিছ

খিলাফতে রাশেদার আমলের কথা। মদীনার এক মহিলা আনসারের পুত্র জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহর জন্য গেলেন। ঘটনাক্রমে তিনি যুদ্ধের ময়দানে অসুস্থ হয়ে পড়লেন। কোনমতে বসরা পৌছলেন, যাতে চিকিৎসা করাতে পারেন। তাঁর মা পুত্রের এই কঠিন রোগের খবর পেয়ে অস্থির হয়ে মদীনা থেকে বসরা রওয়ানা হলেন। কিন্তু তিনি পুত্রের মুখ দেখুন তা আল্লাহর মনজুর ছিল না। তিনি পথেই ছিলেন এমন সময় তাঁর কলিজার টুকরো পরপারে যাত্রা করলেন। বসরা পৌছে যখন জানতে পেলেন যে তাঁর পুত্র দুই একদিন পূর্বে স্রষ্টার নিকট পৌছে গেছে তখন দুঃখে তিনি কাতর হয়ে পড়লেন। কিন্তু "ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন" পড়ে চুপ হয়ে গেলেন। তিনি সুর করে কাঁদলেনও না এবং চুলও ছিঁড়লেন না। তৃতীয় দিন খোশবু আনিয়ে শরীরে লাগালেন এবং বললেনঃ

"রাসূলুল্লাহ (সাঃ) স্বামী ছাড়া অন্য মৃত ব্যক্তির জন্য তিনদিনের বেশী শোক পালননিষেধকরেছেন।"

হাদিয়ে আকরামের (সাঃ) এই অনুগত মহিলা, যিনি নিজের প্রিয় পুত্রের মৃত্যুতেও হুজুরের (সাঃ) ইরশাদের প্রতি নজর রেখেছিলেন, তিনি ছিলেন হযরত উম্মে আতিয়্যাহ আনসারিয়াহ।

হযরত উম্মে আতিয়্যাহ (রাঃ) অন্যতম জালিলুল কদর মহিলা সাহাবী ছিলেন। তাঁর নাম ছিল "নাসিবাহ।" পিতার নাম ছিল হারিছ। আল্লামা ইবনে সা'দের বর্ণনা অনুযায়ী তিনি আনসারের আবি মালিক বিন নাজ্জার গোত্রের মানুষ ছিলেন। হাফিজ ইবনে হাজার (রঃ) শুধুমাত্র তাঁর পিতার নাম উল্লেখ করেছেন এবং হসব-নসব সম্পর্কে অজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন। হযরত উম্মে আতিয়্যাহ (রাঃ) সেই সকল ভাগ্যবানদের অন্যতম ছিলেন যাঁরা নবীর (সাঃ) হিজরতের পূর্বেই ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। কিয়াস করা হয় যে, তিনি নবুয়তের ১২তম বছরে প্রথম বাইয়াতে উকবার পর ইসলাম গ্রহণ করেন। এভাবে তিনি আনসারের "আসসাবিকূনাল আউয়ালুনের" মধ্যে পরিগণিত হন।

www.bjilibrary.com

হিজরতের পর রহমতে আলম (সাঃ) নিজের কদম মুবারক যখন মদীনায় রাখলেন তখন মদীনাবাসী উৎসাহ-উদ্দীপনার সঙ্গে ইসলাম গ্রহণ করে হুজুরের (সাঃ) হাতে বাইয়াত হতে লাগলেন। আনসারের কিছু মহিলা নবীর (সাঃ) হিজরতের প্রথমে অথবা হিজরতের অব্যবহিত পরই ইসলাম গ্রহণ করেন। পুরুষদের মত তাঁরাও হুজুরের (সাঃ) হাতে বাইয়াত হতে চাইলেন। বস্তুত প্রিয় নবী (সাঃ) নিজের হাত দিয়ে অন্য মহিলার হাত স্পর্শ করতেন না। তিনি বাইয়াতে ইচ্ছুক মহিলাদেরকে এক বাড়ী একত্রিত হওয়ার হেদায়েত দিলেন। সেই মহিলাদের মধ্যে হযরত উম্মে আতিয়্যাহও (রাঃ) ছিলেন। যখন সব মহিলা সেই বাড়ী একত্রিত হলেন তখন হুজুর (সাঃ) হযরত ওমর ফারুককে (রাঃ) তাঁদের নিকট প্রেরণ করলেন এবং কয়েকটি শর্তে তাঁদের বাইয়াত নিতে বললেন। শর্তগুলো হলোঃ

১– কাউকে খোদার সঙ্গে শরীক করবে না অর্থাৎ শিরক করবে না।

২– নিজের সন্তানদেরকে হত্যা করবে না (জাহেলী যুগে অনেক আরব নিজের কন্যাদেরকে ভূমিষ্ঠ হতেই জীবিত দাফন করে দিত। সেই জুলুমমূলক রেওয়াজ নির্মূলের জন্য এই শর্ত আরোপ করা হয়েছিল)।

৩– চুরি করবে না।

৪– যিনা থেকে বেঁচে থাকবে।

৫– কোন মিথ্যা অপবাদ দেবে না।

৬– ভালো কথা অস্বীকার করবে না।

হযরত ওমর ফারুক (রাঃ) সেই বাড়ীতে তাশরীফ নিলেন এবং দরজায় দাঁড়িয়ে বাইয়াতের শর্ত বর্ণনা করলেন। সব মহিলা বিনা বাক্য ব্যয়ে সব শর্ত মেনে নিলেন। হযরত ওমর (রাঃ) নিজের হাত ভেতরের দিকে বাড়িয়ে দিলেন। অন্যদিকে সব মহিলা বাইয়াতের নিদর্শন হিসেবে নিজেদের হাত বাইরে বের করে দিলেন। আর এমনিভাবে হযরত ওমর ফারুকের (রাঃ) মাধ্যমে রাসূলে আকরামের (সাঃ) বাইয়াত হয়ে গেল।

বাইয়াতের পর হযরত উম্মে আতিয়্যাহ (রাঃ) হযরত ওমর ফারুককে (রাঃ) জিজ্ঞেস করলেনঃ "ভালো কথা অস্বীকার করার অর্থ কি?"

তিনি জবাব দিলেনঃ "বিলাপ না করা।"

www.bjilibrary.com

মুসনাদে ইমাম আহমদ বিন হাম্বলে (রঃ) বর্ণিত আছে, বাইয়াতের সময় হযরত উম্মে আতিয়্যাহ (রাঃ) হুজুরের (সাঃ) নিকট আরজ করলেন, অমুক বংশের লোক আমার নিকট এসে (কোন মৃত্যুর পর) বিলাপ করে ফেলেছে। গোত্রগত রেওয়াজ অনুযায়ী আমাকেও বদলায় তার বাড়ী গিয়ে বিলাপ করা আবশ্যক। এজন্য আপনি বিশেষভাবে আমাকে অনুমতি দিন। তিনি (সাঃ) অনুমতি দিয়ে দিলেন।

মওলানা সাঈদ আনসারী মরহুম স্বলিখিত পুস্তক "সিয়রুসসাহাবিয়াহতে এই রাওয়ায়েতের পর্যালোচনা হিসেবে বলেছেনঃ "কতিপয় রাওয়ায়েতে আছে যে, হুজুর (সাঃ) হযরত উম্মে আতিয়্যাহকে (রাঃ) কোন জবাব দেননি। যেসব রাওয়ায়েতে হুজুর (সাঃ) তাঁকে অনুমতি দিয়েছিলেন বলে বর্ণিত আছে তার অর্থ হলো এটা হযরত উম্মে আতিয়্যাহর (রাঃ) জন্য বিশেষ অনুমতি ছিল। নচেত আসল মাসয়ালা মৃত ব্যক্তির জন্য বিলাপ করা স্বস্থানে নাজায়েয বা অবৈধই রয়েছে।"

কিন্তু সহিহ বুখারীর রাওয়ায়েতে স্বয়ং হযরত উম্মে আতিয়্যাহ (রাঃ) বাইয়াতের ঘটনাকে অন্যভাবে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, "আমরা যখন রাসূলের (সাঃ) বাইয়াত করি তখন তিনি আল্লাহর নির্দেশ মুতাবেক একদিকে শিরক না করার প্রতিশ্রুতি নিলেন। অন্যদিকে বিলাপ করতে নিষেধ করলেন। এ কথা শুনে এক মহিলা নিজের হাত উঠিয়ে নিলেন এবং বললেন, এক মহিলা আমার নিকট বিলাপ করেছে। আমি তার বদলা দিয়ে নেই। এ কথা বলেই তিনি চলে গেলেন। অতঃপর ফিরে এসে রাসূলের (সাঃ) নিকট বাইয়াত করেন"।

প্রকৃতপক্ষে সিহাহ সিত্তার বিশুদ্ধ হাদীসসমূহে এ কথা স্পষ্টভাবে প্রামাণিত যে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বিলাপ, শোক গাথা এবং বুক চাপড়ানো প্রভৃতি কঠোরভাবে নিষেধকরেছেন।

এজন্য এটাই স্বীকার করতে হবে যে, যে মহিলা বিলাপের বদলা দিয়েছিলেন তিনি এই কাজ হুজুরের (সাঃ) নিকট বাইয়াতের পূর্বেই করেছিলেন।

বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা (সাঃ) হযরত উম্মে আতিয়্যাহকে (রাঃ) খুব স্নেহ এবং বিশ্বাস করতেন। তিনি সেইসব মহিলার অন্যতম ছিলেন যাঁদেরকে হুজুর (সাঃ) যুদ্ধে নিজের সঙ্গে রাখতেন। চরিতকাররা বিস্তারিতভাবে লিখেছেন যে, তিনি সাতটি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন এবং উল্লেখযোগ্য খিদমত আঞ্জাম দেন। তিনি মুজাহিদদের জন্য খাবার রান্না করতেন এবং আহতদেরকে সেবা করতেন। ইসলামী বাহিনীতে যদি কেউ অসুস্থ হয়ে পড়তো তাহলে খুব দ্রুততার সঙ্গে তার সেবা-শুশ্রূষাকরতেন।

www.bjilibrary.com

সহিহ মুসলিমে স্বয়ং হযরত উম্মে আতিয়্যাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, আমি রাসূলের (সাঃ) সঙ্গে সাতটি যুদ্ধে অংশ নিয়েছি। আমি মুজাহিদদের তাঁবু দেখা–শুনার জন্য পেছনে থাকতাম। মুজাহিদদের জন্য খাবার পাকাতাম, আহতদের চিকিৎসা করতাম এবং মুসিবতযাদাহদের দেখা–শুনা করতাম।

এই রাওয়ায়েত থেকে জানা যায় যে, হযরত উম্মে আতিয়্যাহ (রাঃ) চিকিৎসা শাস্ত্রেও দক্ষতা রাখতেন অথবা কমপক্ষে আহতদের ব্যান্ডেজ করা প্রভৃতি কাজে পারদর্শিনী ছিলেন। একবার প্রিয় নবী (সাঃ) স্নেহবশত হযরত উম্মে আতিয়্যাহকে (রাঃ) সাদকার একটি বকরী পাঠালেন। তিনি বকরীটি জবেহ করে গোশ্‌ত বন্টন করলেন। একটি অংশ উম্মুল মুমিনিন হযরত আয়েশা সিদ্দিকাহর (রাঃ) খিদমতে প্রেরণ করলেন। হুজুর (সাঃ) বাড়ী ফিরে হযরত আয়েশার (রাঃ) নিকট খাবার চাইলেন। তিনি আরজ করলেন, "হে আল্লাহর রাসূল! ঘরে অন্য কোন জিনিসতো নেই। অবশ্য আপনি যে বকরী নাসিবাহকে (উম্মে আতিয়্যাহ) দিয়েছিলেন তার গোশ্‌ত রয়েছে।" তিনি বললেন, "আনো। কেননা, বকরী হকদারের নিকট পৌছে গেছে।"

অষ্টম হিজরীতে রাসূলে আকরামের (সাঃ) কন্যা হযরত যয়নব (রাঃ) ওফাত পেলে হযরত উম্মে আতিয়্যাহ (রাঃ) কতিপয় মহিলার সঙ্গে তাঁকে গোসল দেন। হুজুর (সাঃ) আড়ালে দাঁড়িয়ে তাঁদেরকে গোসল দানের নিয়ম বলে দিয়েছিলেন।

সাহিহ বুখারী ও মুসলিমে হযরত উম্মে আতিয়্যাহ থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) আমাদের নিকট তাশরীফ আনলেন। এ সময় আমরা তাঁর কন্যাকে (যয়নব) গোসল দিচ্ছিলাম। তিনি বললেন, "তাকে পানি এবং বরই পাতা দিয়ে তিনবার অথবা তারচেয়ে বেশী গোসল দাও। যদি তোমরা প্রয়োজন মনে কর এবং শেষবারে কর্পূরও পানিতে মিশাও। যখন তোমরা গোসলদান শেষ কর তখন আমাকে খবর দেবে।" অতঃপর যখন আমরা গোসলদান শেষ করলাম এবং রাসূলুল্লাহকে (সাঃ) খবর দিলাম তখন তিনি নিজের তহবন্দ বা লুঙ্গি আমাদের দিকে নিক্ষেপ করলেন এবং বললেন, "এই লুঙ্গি মাইয়্যেতের শরীরে লাগাও।" অর্থাৎ তার শরীরে লেপ্টে দাও যাতে গায়ে লেগে থাকে।

অন্য এক রাওয়ায়েতে এই বাক্যাবলী রয়েছে, "তাকে বেজোড় গোসল দাও অর্থাৎ তিনবার, পাঁচবার অথবা সাতবার এবং ডান দিক থেকে গোসলদান শুরু কর এবং ওজুর অঙ্গ–প্রত্যঙ্গ থেকে।" উম্মে আতিয়্যাহ (রাঃ) বলেন, আমরা মাইয়্যেতের চুলকে তিনভাগে ভাগ করে বাঁধলাম এবং তা কোমরের দিকে ছেড়ে দিলাম।

www.bjilibrary.com

মাইয়্যেতের গোসলের ব্যাপারে হযরত উম্মে আতিয়্যাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসই বিশুদ্ধ হাদীস বলে মানা হয়। বড় বড় সাহাবী (রাঃ) ও তাবেয়ী (রঃ) তাঁর নিকট থেকে মাইয়্যেতের গোসলের নিয়ম-কানুন ও মাসলা-মাসায়েল সম্পর্কে জিজ্ঞেসকরতেন।

হযরত উম্মে আতিয়্যাহ (রাঃ) বিশ্ব নবীর (সাঃ) আহকাম পুরোপুরি তামিল করতেন এবং কোন কাজ হুজুরের (সাঃ) অনুমতি ছাড়া করতেন না। রাসূলের (সাঃ) প্রতি তাঁর এই অনুগত্যের জন্য মহিলা সাহাবী মহলে তাঁর বিরাট মর্যাদা ছিল। রাসূলের (সাঃ) প্রতি তাঁর ভক্তি-শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার সীমা-পরিসীমা ছিল না। তাঁর (সাঃ) আত্মীয়-স্বজনকেও ভালোবাসতেন। আল্লামা ইবনে সাদ (রঃ) তাবকাতুল কাবিরে লিখেছেন, হযরত আলী (রাঃ) কখনো কখনো তাঁর বাড়ী তাশরীফ নিতেন এবং খাওয়ার পর আরাম (কাইলুলা) করতেন।

হযরত উম্মে আতিয়্যাহ'র (রাঃ) বিস্তারিত জীবনী চরিত বা ইতিহাস গ্রন্থে পাওয়া যায় না এবং তাঁর মৃত্যু সাল সম্পর্কেও কেউ কিছু বলেননি। অবশ্য এতটুকুন জানা যায় যে, তিনি খিলাফতে রাশেদার যুগে জীবিত ছিলেন। তাঁর পুত্রের মৃত্যুর ঘটনা খিলাফতে রাশেদার কোন এক সময়ই ঘটেছিল। এই ঘটনার পর তিনি বসরায় স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন এবং সেখানেই কোন এক সময় মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর এক পুত্র ছাড়া অন্য সন্তানের কথাও পুস্তকে উল্লেখ নেই এবং কেউ তাঁর স্বামীর কথাওবলেননি।

ইলম ও ফজিলতের দিক থেকে হযরত উম্মে আতিয়্যাহ (রাঃ) উঁচু মর্যাদায় সমাসীন ছিলেন। মুহাদ্দিসরা হাদীস রাওয়ায়েতের দিক থেকে তাঁকে পুরুষ ও মহিলা সাহাবার চতুর্থ তাবকার মানুষ হিসেবে গণ্য করেছেন। তিনি ৪১টি হাদীস বর্ণনা করেছেন।

কতিপয় মাসলা-মাসায়েলে তাঁর বর্ণিত হাদীস খুব বিশ্বস্ত এবং বিশুদ্ধ বলে মানা হয়। মাইয়্যেতের গোসল সম্পর্কিত রাওয়ায়েতের কথা ওপরে আলোচিত হয়েছে। মাইয়্যেতের প্রতি শোক, মহিলাদের জানাযায় যাওয়া এবং দু' ঈদের নামাযে অংশগ্রহণের ব্যাপারেও তাঁর রাওয়ায়েত বিশেষ গুরুত্ব রাখে। সহিহ বুখারীতে এক হাদীসে তিনি বলেনঃ

"আমাদেরকে কোন মাইয়্যেতের প্রতি তিনদিনের বেশী শোক পালন করতে নিষেধ করা হয়েছে। হাঁ, স্বামীর মৃত্যুতে (স্ত্রী) চারমাস ১০ দিন শোক পালনের

www.bjilibrary.com

নির্দেশ রয়েছে। এই সময় (বিধবা মহিলা) সুরমা লাগাবে না, খোশবু মাখবে না। ইয়েমেনী এক ধরনের চাদর ছাড়া রঙিন কাপড় পরতে পারে।"

সহিহ বুখারীর অন্য আরেক হাদীসে বর্ণনা করা হয়েছে যে, আমাদেরকে জানাযার সঙ্গে গমনে নিষেধ করা হয়েছিল। কিন্তু জোর দিয়ে নিষেধ করা হয়নি।

হাদীসের ব্যাখ্যাকারীরা লিখেছেন, মহিলাদের ধৈর্য কম এবং বেশী অস্থিরতা প্রকাশ করে থাকে। এজন্য তাদেরকে জানাযার সঙ্গে কবরস্তানে গমনে নিষেধ করা হয়েছিল। হ্যাঁ, যদি কেউ ধৈর্যশীলা এবং মুত্তাকী হয় তাহলে যেতে পারে।

দু' ঈদের ব্যাপারে সহিহ বুখারীতে হযরত উম্মে আতিয়্যাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, নবী (সাঃ) দু' ঈদে যুবতী এবং পরদাওয়ালী মহিলাদেরকে ঈদগায় যেতে বলেছিলেন এবং হায়েজা মহিলাদেরকে ঈদগাহ থেকে দূরে থাকতে নিষেধ করেছিলেন। অর্থাৎ ঈদগাহর পাশেই থাকতে বলেছিলেন।

অন্য এক রাওয়ায়েতে আছে, ঈদের দিন আমাদেরকে ঈদগাহ'র দিকে যাওয়ার নির্দেশ দেয়া হতো। এমনকি কুমারী মেয়েদেরকেও সেখানে পাঠানো হতো। হায়েজা মহিলাদের (ঈদগাহ থেকে বিচ্ছিন্ন থাকা সত্ত্বেও) প্রতি নির্দেশ ছিল যে, তারা যেন তাকবিরের সঙ্গে সঙ্গে তাকবির বলে, দোয়ার সঙ্গে দোয়া করে এবং সেই দিনের খুশী ও বরকতে অংশগ্রহণ করে।

হাদীসের ব্যাখ্যাকারীরা লিখেছেন যে, পর্দার যুক্তিযুক্ত ব্যবস্থা হলে মহিলারাও জুমায়া এবং দু' ঈদের নামাযে শরীক হতে পারে, বরং তাদের উপস্থিত হওয়া সুন্নাত।

হাফিজ আবদুল বার উন্দুলুসী (রঃ) আল-ইসতিয়াব গ্রন্থে হযরত উম্মে আতিয়্যাহ (রাঃ) সম্পর্কে বলেছেনঃ "মহিলা সাহাবীদের মধ্যে তাঁর উঁচু মর্যাদা ছিল।"

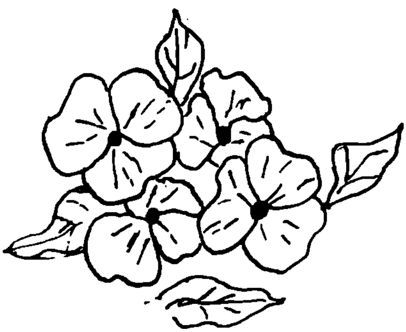

www.bjilibrary.com

হযরত আসমা (রাঃ) আনসারিয়াহ

মক্কা থেকে হিজরতের পর রহমতে আলম (সাঃ) মদীনা তাশরিফ নিলেন। এ সময় মদীনাবাসীদের (আওস ও খাজরাজ) মধ্য থেকে যারা উকবাহ'র বাইয়াত থেকে বঞ্চিত হয়েছিলেন তাঁরা উৎসাহ-উদ্দীপনার সঙ্গে রাসূলের (সাঃ) খিদমতে হাজির হয়ে সাক্ষাৎ ও বাইয়াত করতে লাগলেন। সেই যুগেই একদিন প্রিয় নবী (সাঃ) সঙ্গীদের মধ্যে বসেছিলেন। এমন সময় মহিলাদের একটি দল তাঁর খিদমতে হাজির হলেন। তাঁদের মধ্য থেকে একজন মহিলা অগ্রসর হয়ে আরজ করলেনঃ

"হে আল্লাহর রাসূল। আমার মাতা-পিতা আপনার ওপর কুরবান হোক। আমি মুসলমান মহিলাদের পক্ষ থেকে একটি বাণী নিয়ে এসেছি। আল্লাহ পাক আপনাকে নারী-পুরুষ সবার হেদায়াতের জন্য প্রেরণ করেছেন। আমরা আপনার ওপর ঈমান এনেছি। কিন্তু পুরুষ ও মহিলাদের মধ্যে বড় পার্থক্য বিদ্যমান। মহিলারা ঘরে বসে থাকে। এজন্য পুরুষদের মত জামায়াতের সঙ্গে নামায, জুমায়ার নামায এবং জানাযার নামাযে অংশ নিতে পারে না। এমনকি হজ্ব ও জিহাদেও সাধারণভাবে যোগ দিতে পারে না, অবশ্য যখন পুরুষ বাইরে থাকে তখন সে তাঁর সন্তান লালন-পালন করে, তাঁর সম্পদ রক্ষণাবেক্ষণ করে এবং তাঁর পরিবার-পরিজনের পোশাকের জন্য চরকা কাটে ও কাপড় বোনে। মহিলারাও কি পুরুষদের মত ভালো কাজের সওয়াব পাবে?"

প্রিয় নবী (সাঃ) মহিলাটির শুদ্ধ, সুন্দর ও ওজস্বী বর্ণনায় খুব প্রভাবিত হলেন এবং সাহাবাদেরকে (রাঃ) সম্বোধন করে বললেনঃ "দ্বীনের ব্যাপারে তোমরা কি কোন মহিলার নিকট থেকে এ ধরনের আলোচনা শুনেছ?"

সকল সাহাবী সমস্বরে বললেন, "ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদের ধারণাতেও আসে না যে, কোন মহিলা এমন আলাপ-আলোচনা করতে পারে!"

অতঃপর রহমতে আলম (সাঃ) সেই মহিলাকে সম্বোধন করে বললেনঃ "মহিলার জন্য স্বামীর সন্তুষ্টি খুব প্রয়োজন। যদি কোন মহিলা স্ত্রীর কর্তব্য পালন এবং স্বামীর আনুগত্য করে তাহলে সেও পুরুষের সমান সওয়াব পাবে।"

www.bjilibrary.com

হুজুরের (সাঃ) এই বর্ণনা শুনে সেই মহিলা ও তাঁর সঙ্গীরা এত খুশী হলেন যে, তাঁদের পা আর জমিনে ধরে না। এই মহিলা, যাঁর শুদ্ধ বর্ণনা এবং সুন্দর বক্তৃতার স্বীকৃতি রাসূলুল্লাহ (সাঃ) দিয়েছেন তিনি হলেন, হযরত আসমা (রাঃ) বিনতেইয়াযিদআনসারিয়াহ।

হযরত আসমা (রাঃ) অন্যতম মর্যাদাবান মহিলা সাহাবী ছিলেন। তিনি আওস গোত্রের বনু আব্দুল আশহাল বংশোদ্ভূত সম্ভ্রান্ত পরিবারের মানুষ ছিলেন এবং উত্তরাধিকার সূত্রেই গোত্রের নেতৃত্ব এই পরিবারের হাতে ছিল। আওস সরদার সিদ্দিকে আনসার হযরত সা'দ (রাঃ) বিন মা'জও এই বংশের মানুষই ছিলেন।

হযরত আসমার (রাঃ) নসবনামা হলোঃ আসমা বিনতে ইয়াযিদ বিন আসসাকান বিন রাফে বিন ইমরুল কায়েস বিন যায়েদ বিন আবদুল আশহাল বিন জাছাম বিন হারিছ বিন খাজরাজ বিন আমর বিন মালিক বিন আওস।

তাঁর নসব ইমরুল কায়েস এ গিয়ে হযরত সা'দ (রাঃ) বিন মোয়াজের সঙ্গে এবং রাফে'–তে গিয়ে জালিলুল কদর সাহাবী হযরত উসায়েদ (রাঃ) বিন হুজায়েরুল কাতায়েব আশহালির সঙ্গে মিলে যায়। আত্মীয়তার দিক থেকে হযরত সা'দ (রাঃ) তাঁর চাচা হতেন এবং হযরত উসায়েদ (রাঃ) হতেন ভ্রাতুষ্পুত্র।

সাধারণ রাওয়ায়েত অনুযায়ী হযরত আসমা (রাঃ) বিনতে ইয়াযিদ নবীর (সাঃ) হিজরতের পর ইসলাম গ্রহণ করেন। কিন্তু বিভিন্ন প্রমাণাদি থেকে জানা যায় যে, তিনি হিজরতের পূর্বেই ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। কারণ সকল ঐতিহাসিকই এ ব্যাপারে একমত যে, বাইয়াতে উকবায়ে কবিরার পূর্বে হযরত মাসয়াব (রাঃ) বিন উমায়েরের তাবলিগী প্রচেষ্টার ফলশ্রুতিতে আওস সরদার হযরত সা'দ (রাঃ) বিন মায়াজ এবং বনু আব্দুল আশহালের অন্য সরদার হযরত উসায়েদ (রাঃ) বিন হুজায়ের ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। তাঁদের প্রভাব-প্রতিপত্তির কারণে দু' একজন ব্যতীত আব্দুল আশহাল গোত্রের সবাই একদিনে ইসলাম গ্রহণ করেন। এটাই কিয়াস করা হয় যে, হযরত আসমা (রাঃ) বিনতে ইয়াযিদও সেই সময় ইসলাম গ্রহণের সৌভাগ্য লাভকরেন।

ওপরে যে ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে তা নবীর (সাঃ) হিজরতের কিছুদিন পর সংঘটিত হয়েছিল। হযরত আসমার (রাঃ) বক্তৃতাতেও প্রকাশ পায় যে, হুজুরের

www.bjilibrary.com

(সাঃ) খিদমতে উপস্থিত হওয়ার পূর্বেই তিনি ঈমান এনেছিলেন। এক রাওয়ায়েতে হযরত আসমার (রাঃ) পিতা ইয়াযিদ বিন সাকানকে সাহাবী বলা হয়েছে। কিন্তু সাধারণভাবে চরিত গ্রন্থগুলো তার ব্যাপারে নিশ্চুপ। এজন্য তার ব্যাপারে আস্থার সঙ্গে কিছু বলা যায় না। অবশ্য ইয়াযিদের সহোদর (হযরত আসমার চাচা) হযরত যিয়াদ বিন সাকান এবং তাঁর (ইয়াযিদ) ভ্রাতুষ্পুত্র হযরত আম্মারাহ (রাঃ) বিন যিয়াদ (রাঃ) অত্যন্ত মুখলিস ও পুরনো ইসলাম গ্রহণকারী সাহাবী ছিলেন। এক রাওয়ায়েতে আছে, হযরত আসমার (রাঃ) বোন উম্মে জায়েদ হাওয়া (রাঃ) বিনতে ইয়াযিদ বিন সাকানও তাঁর সঙ্গে ঈমান আনয়নের সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন। তিনি সেই মহিলা সাহাবীদের অন্যতম যাঁরা বাইয়াতে রিদওয়ানে অংশ নিয়েছিলেন।

মুসনাদে আহমদ বিন হাম্বলে বর্ণিত আছে, হযরত আসমার (রাঃ) সঙ্গে তাঁর খালাও হুজুরের (সাঃ) খিদমতে হাজির হয়েছিলেন। তিনি হাতে সোনার চুরি এবং আংটি পরে ছিলেন (অন্য এক রাওয়ায়েতে আছে যে, স্বয়ং হযরত আসমা (রাঃ) এই গহনা পরিধান করেছিলেন এবং হুজুরের (সাঃ) ইরশাদ শুনে তিনি তৎক্ষণাৎ সকল গহনা খুলে দিয়েছিলেন)। হুজুরের (সাঃ) দৃষ্টি এইসব গহনার ওপর পড়লে জিজ্ঞেস করলেনঃ "এসবের যাকাত দিয়ে থাকো? তিনি বললেন, "না।" হুজুর (সাঃ) বললেনঃ "আখিরাতের দিন খোদা তোমাকে এর বিনিময়ে আগুনের চুরি পরাবেন এইটাইকি পছন্দ কর? "হযরত আসমা (রাঃ) খালাকে বললেন,"খালা। এসব খুলে ফেল " তিনি সকল গহনা খুলে ফেলে দিলেন। অতঃপর হযরত আসমা (রাঃ) আরজ করলেনঃ "হে আল্লাহর রাসূল। আমরা যদি গহনা পরিধান না করি, তাহলে স্বামীদের দৃষ্টিতে খাটো হয়ে যাবো।" হুজুর (সাঃ) বললেনঃ "তাহলে রৌপ্যের গহনা বানাও এবং তার ওপর জাফরান লাগিয়ে দাও। তাতে সোনার চমক সৃষ্টি হবে।" এরপর হযরত আসমা (রাঃ) অন্যান্য মহিলার সঙ্গে রাসূলের (সাঃ) হাতে বাইয়াত গ্রহণ করতে চাইলেন এবং রাসূলকে (সাঃ) হাত বাড়িয়ে দেয়ার জন্য নিবেদন জানালেন। হুজুর (সাঃ) বললেন, আমি মহিলাদের সঙ্গে হাত মিলাই না। অবশ্য তুমি এই সকল কথা ইকরার করলে বাইয়াত হয়ে যাবে:

(১) নিজের সন্তানকে হত্যা করবে না (২) চুরি করবে না (৩) কাউকে খোদার সাথে শরীক করবে না (৪) যিনা থেকে বেঁচে থাকবে (৫) কারোর ওপর মিথ্যা অপবাদ আরোপ করবে না (৬) ভালো কথা অস্বীকার করবে না।

হযরত আসমা (রাঃ) এবং তাঁর সঙ্গী মহিলারা সত্য অন্তরে এই সকল কথার ওপর আস্থা স্থাপন করলেন এবং স্ব স্ব গৃহে ফিরে গেলেন।

www.bjilibrary.com

প্রথম হিজরীর শওয়াল মাসে হযরত আয়েশা সিদ্দিকাহর (রাঃ) রুখসত হলে হযরত আসমা (রাঃ) অন্য কতিপয় মহিলার সঙ্গে তাঁকে সাজালেন এবং নবপরিণীতার জন্য সাজানো ঘরে বসিয়ে রাসূলকে (সাঃ) খবর দিলেন। হুজুর (সাঃ) তাশরীফ নিলেন। কেউ একজন দুধ পেশ করলো। হুজুর (সাঃ) সামান্য কিছু পান করে অবশিষ্টাংশ হযরত আয়েশাকে (রাঃ) দিয়ে দিলেন। তিনি লজ্জায় মাথা অবনত করে রইলেন। হযরত আসমা (রাঃ) স্নেহের সঙ্গে ডাটলেন এবং বললেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) যা দিয়েছেন তা নাও। সুতরাং হযরত আয়েশাও (রাঃ) কিছু দুধ পান করলেন।

সহিহ বুখারীতে আছে, আনসার মহিলারা (যাঁদের মধ্যে হযরত আসমাও ছিলেন) দুলহিনকে নেয়ার জন্য হযরত আবুবকর সিদ্দিকের (রাঃ) গৃহে আসলেন। হযরত উম্মে রুমান (রাঃ) হযরত আয়েশার (রাঃ) মুখ ধুইয়ে চুল চিরুনী করে দিলেন। অতঃপর তাঁকে সেই রুমে নিয়ে গেলেন যেখানে আনসার মহিলারা দুলহিনের জন্য ইনতিজার করছিলেন। হযরত আয়েশা (রাঃ) ভেতরে প্রবেশ করলে আনসার মহিলারা তাঁকে স্বাগত জানালেন।

স্বয়ং হযরত আসমা (রাঃ) বিনতে ইয়াযিদ থেকে বর্ণিত আছে, হযরত আয়েশার (রাঃ) রুখসতীর পর রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তাশরীফ আনলেন। এ সময় আমিও সেখানে উপস্থিত ছিলাম। হুজুর (সাঃ) পেয়ালা থেকে কিছু দুধ পান করে হযরত আয়েশার (রাঃ) দিকে এগিয়ে দিলেন। তিনি লজ্জা করতে লাগলেন। আমি বললাম, "রাসূলুল্লাহ (সাঃ) যে বস্তু দিচ্ছেন তা ফিরিয়ে দিও না।"

তিনি লজ্জা করতে করতে দুধ নিলেন এবং এক চুমুক পান করে রেখে দিলেন। তিনি (সাঃ) বললেন, "তোমার সখীদেরকে দাও। " আমি বললাম, "হে আল্লাহর রাসূল! এখন আমাদের ক্ষুধা নেই। " তিনি বললেন, "মিথ্যা বলো না, মানুষের একেকটি মিথ্যাকে লিখা হয়ে থাকে।" (মুসনাদে আহমদ হাম্বল)।

এই রাওয়ায়েত থেকে জানা যায় যে, হযরত আসমা (রাঃ) বিনতে ইয়াযিদ উম্মুল মুমিনিন হযরত আয়েশা সিদ্দিকাহ'র (রাঃ) বান্ধবী ছিলেন।

হযরত আসমা (রাঃ) এবং তাঁর সকল আত্মীয়-স্বজন আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসূলকে (সাঃ) গভীরভাবে ভালোবাসতেন এবং দ্বীনে হকের জন্য নিজের জান-মাল তথা সকল বস্তুই কুরবানী করার জন্য কোমর বেঁধে দাঁড়িয়ে থাকতেন। দ্বিতীয়

www.bjilibrary.com

হিজরীতে বদরের যুদ্ধ সংঘটিত হলো। তাতে বনু আব্দুল আশহালের সবাই জীবন বাজি রেখে অংশ নিলেন। তাঁদের মধ্যে হযরত আসমার (রাঃ) কয়েকজন নিকটাত্মীয়ও ছিলেন। ওহোদের যুদ্ধেও এই অবস্থা ছিল। এই যুদ্ধে হযরত আসমার (রাঃ) চাচা হযরত যিয়াদ (রাঃ) বিন সাকান এবং চাচার পুত্র হযরত আম্মারাহ (রাঃ) বিন যিয়াদ (রাঃ) এমনভাবে রাসূলের (সাঃ) জন্য জীবন কুরবান করেছিলেন যে, অন্যান্য সাহাবা (রাঃ) তাতে ঈর্ষা প্রকাশ করতেন।

মুশরিকরা ওহোদের ময়দানে রিসালাত প্রদীপ নিভিয়ে দেয়ার কঠোর প্রতিজ্ঞা করে রেখেছিল। এই হীন উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্য তারা রহমতে আলমের (সাঃ) ওপর বার বার হামলা করেছিল। একবার কঠিন পরিস্থিতির উদ্ভব হলো। এ সময় হুজুর (সাঃ) বললেন, কে আছ যে এই দুশমনদের প্রতিহত এবং হক পথে নিজের জীবন বিক্রি করবে? সঙ্গে সঙ্গে পাঁচজন আনসারী জাঁবাজ অগ্রসর হলেন এবং বীরবিক্রমে যুদ্ধ করে নিজেদের জীবনকে রহমতে আলমের (সাঃ) ওপর কুরবানী করে দিলেন। এই জাঁবাজদের মধ্যে হযরত যিয়াদ (রাঃ) বিন সাকানও ছিলেন। যিয়াদের (রাঃ) পুত্র আম্মারও (রাঃ) অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে লড়াই করেছিলেন। তাঁর শরীরে ১৩টি আঘাত লেগেছিল। কিন্তু পিছু হটার নামও নেননি। অবশেষে ১৪তম আঘাতে শরীরের শক্তি জবাব দিল এবং ঢলে পড়লেন। লোকজন মনে করলো শহীদ হয়ে গেছেন। হুজুরকে (সাঃ) খবর দেয়া হলে তিনি বললেন, "আম্মারে লাশ আমার নিকটআনো।"

লোকজন তৎক্ষণাৎ দৌড়ে তাঁর নিকট গেল। গিয়ে দেখল যে, তখনো শ্বাস-প্রশ্বাস চলছে। উঠিয়ে এনে হুজুরের (সাঃ) সামনে এনে রাখা হলো। কথা বলার শক্তি ছিল না। কিন্তু আলো নির্বাপিত তাঁর চোখ যেন বলছিল, "হে আল্লাহর রাসূল। এটাতো একটা জীবন ছিল। যদি হাজারটি জীবনও হতো তাহলেও আপনার জন্য বিলিয়ে দিতাম।" বস্তুত তিনি নিজকে রাসূলের (সাঃ) নিকট সোপর্দ করলেন এবং এই অবস্থাতেই পরপারের ডাকে সাড়া দিলেন। এই বংশেই হযরত আসমা (রাঃ) লালিত-পালিত হয়েছিলেন এবং বার্ধক্য পর্যন্ত পৌছেছিলেন।

রাসূলে করিমের (সাঃ) প্রতি হযরত আসমার (রাঃ) গভীর ভক্তি-শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা ছিল। প্রায়ই রাসূলের (সাঃ) দরবারে হাজির হতেন এবং ফয়েজ লাভ করতেন। একবার তাঁর সামনে রাসূলে করিম (সাঃ) দাজ্জালের কথা উল্লেখ করলেন। এতে তিনি খুব প্রভাবিত হলেন এবং কাঁদতে লাগলেন। হুজুর (সাঃ) উঠে বাইরে গেলেন। কিছুক্ষণ পর দ্বিতীয়বার তাশরীফ আনলেন। তখনো হযরত আসমা (রাঃ) কেঁদেই চলেছিলেন। তিনি বললেন, "আসমা। এত কাঁদো কেন?" আরজ করলেন,

www.bjilibrary.com

হে আল্লাহর রাসূল! দাসী আরামের সঙ্গে আটা বানিয়ে রুটি তৈরী করবে এতটুকু সময়ের ক্ষুধাও তো আমরা সহ্য করতে পারি না। দাজ্জালের আমলে যে দুর্ভিক্ষ পড়বে তাতে আমরা ঈমানের ওপর কেমন করে অটল থাকবো।

অতঃপর তাঁকে সাহস দিয়ে বললেন, "কাঁদার কোন প্রয়োজন নেই। আমি যদি সেই সময় পর্যন্ত জীবিত থাকি তাহলে মুসলমানদের হেফাজতের জন্য বুক পেতে দেব। আর যদি দাজ্জালের আগমন আমার পরে হয় তাহলে আল্লাহ প্রত্যেক মুসলমানের হেফাজত করবেন।"

একবার হযরত আসমা (রাঃ) রাসূলের (সাঃ) উটনীর রশি ধরে দাঁড়িয়েছিলেন। এমন সময় হুজুরের (সাঃ) ওপর ওহী নাযিল হলো। হযরত আসমা (রাঃ) বলেছেন, উটনী সে সময় বোঝার ভারে দেবে যাচ্ছিল। আমি ভয় পাচ্ছিলাম যে, তার পা ভেঙ্গে না যায়।

একবার কতিপয় মহিলার সঙ্গে তিনি হুজুরের (সাঃ) খিদমতে উপস্থিত ছিলেন। তিনি ইরশাদ করলেন, "সম্ভবত পুরুষ অথবা মহিলার পারস্পরিক সম্পর্কের কথা অন্যের নিকট পৌছিয়ে থাকো?" সব মহিলা চুপ রইলেন।। হযরত আসমা (রাঃ) আরজ করলেন, "জ্বী হাঁ, হে আল্লাহর রাসূল! কিছু কিছু পুরুষ এবং মহিলা এ ধরনের করে থাকে।" তিনি বললেন, "কখনো এ ধরনের করবে না। এ ধরনের মানুষের তুলনা শয়তানের সঙ্গেই দেয়া চলে। যে কোন শয়তান মহিলার সঙ্গে সবার সামনে মিলিত হয়।"

হযরত ওমর ফারুকের (রাঃ) শাসনামলে ইয়ারমুকের ভয়াবহ লড়াই সংঘটিত হয়। জিহাদের উদ্দীপনা এ সময় হযরত আসমাকে (রাঃ) ঘরে বসে থাকতে দেয়নি। তিনি বংশের অন্যদের সঙ্গে এই যুদ্ধে অংশ নেন এবং বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করেন। একবার খৃষ্টানরা মুসলমানদেরকে পিছু ঠেলতে ঠেলতে মহিলাদের তাঁবু পর্যন্ত এসে পৌছলো। হযরত আসমা (রাঃ) এবং ইসলামের অন্য কন্যারা তাঁবুর খুঁটি উঠিয়ে শত্রুর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন এবং তাদেরকে পিছু হাটিয়ে দিলেন। ঐতিহাসিকরা লিখেছেন, এই যুদ্ধে হযরত আসমা (রাঃ) একাকী নিজের কাঠ দিয়ে ৯ জন রোমককে জাহান্নামে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন।

মেহমানদের খিদমত করতে হযরত আসমা (রাঃ) খুব আনন্দ পেতেন। একবার মশহুর তাবেয়ী শাহার বিন হাওশাব (রঃ) তাঁর বাড়ী এলেন। তাঁর সামনে অত্যন্ত স্নেহের সঙ্গে খাবার পরিবেশন করলেন। তিনি খাওয়ার ব্যাপারে ওজর করলেন। হযরত আসমা (রাঃ) রাসূলে আকরামের (সাঃ) এক ঘটনা শুনিয়ে

www.bjilibrary.com

বললেন,"এখনতো তোমার কোন ওজর নেই।" তিনি বললেন, "আম্মা, এই ধরনের ভুল আর করবো না।"

হযরত আসমা (রাঃ) ইয়ারমুকের যুদ্ধের (১৫ হিঃ) কয়েক বছর পর ওফাত পান। তিনি কয়েকটি হাদীসও বর্ণনা করেছেন। সন্তান প্রভৃতির বিস্তারিত বিবরণ কোন কিতাবে পাওয়া যায় না।

হযরত উম্মে হারাম (রাঃ) বিনতে মিলহান

বিদায় হজ্বের (১০ হিজরী) কিছুদিন পরের কথা। একদিন রহমতে আলম (সাঃ) মদীনা মুনাওয়ারাহ থেকে কুবা তাশরীফ নিলেন এবং একজন মহিল আত্মীয়ের বাড়ী অবস্থান করলেন। এই মহিলা তাঁকে (সাঃ) মন-প্রাণ দিয়ে শ্রদ্ধা করতেন। তিনি হুজুরের (সাঃ) খিদমতে খাবার পেশ করলেন। তিনি খাবার খেয়ে শুয়ে পড়লেন। এ সময় মহিলাটি রাসূলের (সাঃ) পবিত্র মাথার চুলের মধ্যে আঙ্গুল দিয়ে বিলি দিতে গেলেন। উকুন থাকলে তা বের করে দেয়াই উদ্দেশ্য ছিল। শিগগিরই রাসূলে করিম (সাঃ) ঘুমিয়ে পড়লেন। কিন্তু কিছুক্ষণ পরই তিনি জেগে গেলেন। এ সময় তাঁর ঠোঁটে মুচকি হাসি লেগেছিল। তিনি বললেনঃ

"আমি স্বপ্নে দেখলাম যে, আমার উম্মাতের কিছু ব্যক্তি সমুদ্রে জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহর জন্য সফরে রওনা হচ্ছে।" মহিলাটি আরজ করলেনঃ "হে আল্লাহর রাসূল! আমার মাতা-পিতা আপনার উপর কুরবান হোক। দোয়া করুন যাতে আমিও এই দলে যোগ দেয়ার সৌভাগ্য অর্জন করতে পারি।"

রহমতে (সাঃ) দোয়া করলেন এবং আবার শুয়ে পড়লেন। কিছুক্ষণ পর পুনরায় মুচকি হেসে জাগলেন এবং একই স্বপ্নের কথা উল্লেখ করলেন। মেযবান মহিলাটি এবারও সেই একই দোয়ার জন্য আরজ করলেন। হুজুর (সাঃ) বললেন, "তুমিও সেই দলের সঙ্গে রয়েছ।"

সাইয়েদুল মুরসালিনের (সাঃ) ইরশাদ শুনে মহিলাটি এত আনন্দিত হলেন যে, অবলীলাক্রমে তাঁর মুখ দিয়ে তাকবির ধ্বনি উচ্চারিত হলো। এই মহিলাই ছিলেন হযরত উম্মে হারাম (রাঃ) বিনতে মিলহান আনসারিয়াহ।

www.bjilibrary.com

হযরত উম্মে হারাম (রাঃ) বিনতে মিলহান অন্যতম জালিলুর কদর মহিলা সাহাবী ছিলেন। তিনি ছিলেন খাজরাজের বনু নাজ্জারভুক্ত। নসবনামা হলোঃ উম্মে হারাম (রাঃ) বিনতে মিলহান বিন খালিদ বিন যায়েদ বিন হারাম বিন জুনদ বিন আমের বিন গানাম বিন আদি বিন নাজ্জার।

নেতৃস্থানীয় ঐতিহাসিকরা হযরত উম্মে হারামের নামের বিশ্লেষণ করেননি। এজন্য তিনি কুনিয়তের সঙ্গেই মশহুর হন।

হযরত উম্মে হারামের (রাঃ) মায়ের নাম ছিল মালিকাহ্ বিনতে মালিক। তিনিও বনু নাজ্জার বংশের মানুষ ছিলেন। পিতার দিক থেকে হযরত উম্মে হারাম (রাঃ) সালমা বিনতে যায়েদ (অথবা অন্য রাওয়ায়েত অনুযায়ী সালমা বিনতে আমর বিন যায়েদ) নাজ্জারীর পৌত্রী ছিলেন। তিনি হুজুরের (সাঃ) দাদা হযরত আব্দুল মুত্তালিবের মাতা ছিলেন। এইদিক থেকে হযরত উম্মে হারামকে (রাঃ) প্রিয় নবীর (সাঃ) খালা বলা হতো। রাসূলের (সাঃ) খাদিম হযরত আনাস (রাঃ) বিন মালিকের মাতা হযরত উম্মে সুলাইম (রাঃ) তাঁর সহোদরা ছিলেন এবং বিরে মাউনাহর শহীদ হযরত হারাম (রাঃ) বিন মিলহান ছিলেন সহোদর।

হক দাওয়াত কবুল করার প্রশ্নে অগ্রবর্তী হওয়ার কারণে আনসারের মধ্যে বনু নাজ্জারের বিশেষ মর্যাদা ছিল। হযরত উম্মে হারামও (রাঃ) সহোদর এবং সহোদরার সঙ্গে প্রথমদিকেই মদীনায় ইসলাম গ্রহণ করেন। তাঁর প্রথম বিয়ে হয়েছিল আমর (রাঃ) বিন কায়েসের (বিন যায়েদ বিন সওয়াদ বিন মালিক বিন গানাম বিন মালিক বিন নাজ্জার) সঙ্গে। তিনিও প্রথমদিকেই ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে যুবক পুত্র কায়েস (রাঃ) বিন আমরও এই নিয়ামত লাভের সৌভাগ্য অর্জন করেন। ইসলামের আলো যেন পরিবারের সকলকেই আলোকিত করেছিল এবং তাঁর সকল পুরুষ ও মহিলাই রিসালাত প্রদীপের পতঙ্গ হয়ে গিয়েছিলেন।

নবীর (সাঃ) হিজরতের পর যুদ্ধের ধারা শুরু হলে (আল্লামা ওয়াকেদী, আবু মা'শার মুহাম্মাদ বিন ওমর এবং আব্দুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ বিন আম্মারাহ আনসারীর রাওয়ায়েত অনুযায়ী) হযরত উম্মে হারামের স্বামী হযরত আমর (রাঃ) বিন কায়েস এবং পুত্র হযরত কায়েস (রাঃ) বিন আমর (রাঃ) হক ও বাতিলের প্রথম যুদ্ধ বদরের লড়াইয়ে অংশগ্রহণকারী ৩১৩ জন জীবন উৎসর্গকারীর অন্যতম ছিলেন।

তৃতীয় হিজরীতে ওহোদের যুদ্ধ সংঘটিত হলো। এ সময়ও পিতা-পুত্র উভয়ই জীবন হাতে নিয়ে জিহাদের ময়দানে উপস্থিত হলেন এবং বীরত্বের সঙ্গে লড়াই করতে করতে শাহাদাতের পেয়ালা পান করলেন। স্বামী এবং পুত্রের বিচ্ছিন্নতা

www.bjilibrary.com

হযরত উম্মে হারামের জন্য প্রচন্ড শোক ও দুঃখের ব্যাপার ছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি অত্যন্ত ধৈর্য ও কৃতজ্ঞতার সাথে তা বরদাশত করেন। এই ঘটনার কিছুদিন পর হযরত উবাদাহ (রাঃ) বিন ছামতের সঙ্গে তাঁর দ্বিতীয় বিয়ে অনুষ্ঠিত হয়। আল্লামা ইবনে সায়াদ (রঃ) এই ধারণা ব্যক্ত করেছেন যে, প্রথমে হযরত উবাদাহ (রাঃ) বিন ছামতের সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়েছিল এবং পরে হযরত আমর (রাঃ) বিন কায়েসের স্ত্রী হন। কিন্তু অন্যান্য বিশ্বস্ত রাওয়ায়েতের আলোকে তাঁর এই কিয়াস ভুল।

চতুর্থ হিজরীতে হযরত উম্মে হারাম (রাঃ) পুনরায় বিরাট দুঃখের সম্মুখীন হন। প্রিয় ভাই হারাম (রাঃ) বিন মিলহান বিরে মাউনাহর ঘটনায় নির্দয়ভাবে শাহাদাত প্রাপ্ত হন। হযরত উম্মে হারাম(রাঃ) শোকে–দুঃখে কাতর হয়ে পড়লেন। কিন্তু আল্লাহর সন্তুষ্টির সামনে মাথা নত করে দিলেন এবং নিজেও হক পথে জীবন বিলিয়ে দেয়ার জন্য অস্থির হয়ে উঠলেন। হযরত হারামের (রাঃ) নির্দয় শাহাদাত রাসূলের (সাঃ) বড় লেগেছিল। সহিহ মুসলিমে আছে, আজওয়াজে মুতাহ্হিরাত ছাড়া অন্য কোন মহিলার ঘরে রাসূলে আকরাম (সাঃ) যেতেন না। কিন্তু উম্মে সুলাইম (রাঃ) এ ব্যাপারে ব্যতিক্রম ছিলেন। লোকজন জিজ্ঞাসা করলে তিনি জানান, তাঁর ওপর আমার খুব দয়া হয়। তার ভাই আমার সঙ্গে থেকে শাহাদাত লাভ করেছে।

এই রাওয়ায়েতে শুধু হযরত উম্মে সুলাইমের (রাঃ) নাম উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু অন্যান্য চরিত গ্রন্থে এমন কিছু রাওয়ায়েতও পাওয়া যায় যেখানে রাসূলে আকরাম (সাঃ) হযরত উম্মে সুলাইম (রাঃ) ছাড়া আরো কতিপয় মহিলা সাহাবী যেমন হযরত উম্মে হারাম, হযরত উম্মুল ফজল, হযরত শিফা বিনতে আবদুল্লাহ, হযরত আসমা বিনতে আমিস এবং হযরত আসমা (রাঃ) বিনতে আবি বকরের (রাঃ) গৃহেও কখনো কখনো গমন করতেন।

আল্লামা ইবনে সা'দ (রঃ) হাফিজ ইবনে হাজার (রঃ), আল্লামা ইবনে আছির (রঃ) এবং যারকানী (রঃ) বিশেষভাবে লিখেছেন যে, রাসূলে আকরাম (সাঃ) হযরত উম্মে হারামকে (রাঃ) খুব সম্মান করতেন। তাঁকে দেখার জন্য যেতেন এবং তাঁর গৃহে আরাম করতেন। এ কথা এজন্যও সঠিক বলে মনে হয় যে, হযরত উম্মে হারামও (রাঃ) হযরত হারাম (রাঃ) বিন মিলহানের সহোদরা ছিলেন। অর্থাৎ যে সম্পর্ক হযরত হারামের (রাঃ) সঙ্গে হযরত উম্মে সুলাইমের (রাঃ) ছিল সেই একই সম্পর্ক ছিল হযরত উম্মে হারামের সঙ্গেও। তাঁর প্রথম স্বামী এবং যুবক পুত্রও হক পথে শহীদ হয়ে গিয়েছিলেন। এজন্য রহমতে আলম (সাঃ) তাঁকেও অবশ্যই দয়ার হকদার মনে করেছেন। বিশ্বস্ত রাওয়ায়েত অনুযায়ী হুজুর (সাঃ) সামুদ্রিক যুদ্ধের স্বপ্ন

www.bjilibrary.com

সেই সময় দেখেছিলেন যখন তিনি হযরত উম্মে হারামের (রাঃ) গৃহে আরাম করছিলেন।

এই স্বপ্নের তাবির হযরত ওসমান জুন্নুরাইনের (রাঃ) খিলাফতকালে পুরো হয়। ২৮ হিজরীতে সিরিয়ার গবর্নর হযরত আমীর মাবিয়া (রাঃ) আমিরুল মুমিনিনের অনুমতিক্রমে সাইপ্রাস পদানত করার জন্য একটি নৌবাহিনী প্রেরণ করেছিলেন। ইসলামী বাহিনীতে বড় বড় জালিলুল কদর সাহাবী শামিল ছিলেন। তাঁদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন উবাদাহ (রাঃ) বিন ছামত। খোদার পথে জিহাদ এবং শাহাদাতের মর্যাদা লাভের জন্য হযরত উম্মে হারামের (রাঃ) খুবই আকাংখা ছিল। তিনিও স্বামীর সঙ্গে সেই বাহিনীতে যোগ দিয়ে সাইপ্রাস গমন করেন। আল্লাহ তায়ালা মুসলমানদেরকে বিজয় দান করেন এবং সাইপ্রাসের ওপর ইসলামের পতাকা উড্ডীন হয়। মুজাহিদরা যখন অভিযান শেষ করে ফিরতে লাগলেন তখন হযরত উম্মে হারামও (রাঃ) সওয়ারীর ওপর বসতে লাগলেন। পশু তাঁকে মাটিতে ফেলে দেয়। তাতে তিনি গুরুতর আহত হন এবং তাতেই তিনি ওফাত পান। ইমাম বুখারী (রঃ) এবং ইবনে আছির (রঃ) বর্ণনা করেছেন, সাইপ্রাসের মাটিতেই তাঁকে দাফন করা হয়।

হযরত উম্মে হারামের (রাঃ) সন্তানদের মধ্যে তিন পুত্রের নাম পাওয়া যায়। হযরত আমর (রাঃ) বিন কায়েস আনসারীর ঔরসে কায়েস (রাঃ) ও আব্দুল্লাহ (রাঃ) এবং হযরত উবাদাহ (রাঃ) বিন ছামত থেকে মুহাম্মাদ (রঃ)।

কায়েস (রাঃ) বদরী সাহাবীদের মধ্যে গণ্য হয়ে থাকেন। তিনি ওহোদের যুদ্ধে শাহাদাত পান। হযরত উম্মে হারাম (রাঃ) থেকে কতিপয় হাদীসও বর্ণিত আছে।

www.bjilibrary.com

হযরত খাওলাহ (রাঃ) বিনতে ছা'লাবাহ

আমীরুল মুমিনিন হযরত ওমর ফারুক (রাঃ) একদিন কতিপয় সাহাবী সমভিব্যাহারে কোথাও যাচ্ছিলেন। পথিমধ্যে এক বৃদ্ধার সঙ্গে দেখা হলো। তিনি আমীরুল মুমিনিনকে বাধা দিলেন এবং কথা বলা শুরু করে দিলেন। হযরত ওমর (রাঃ) মাথা অবনত করে তাঁর কথা শুনতে থাকলেন এবং যতক্ষণ পর্যন্ত তিনি চুপ না করলেন ততক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলেন।

সঙ্গীদের মধ্যে একজন আরজ করলেনঃ "আমিরুল মুমিনিন! আপনি এই বৃদ্ধার কথা শোনার জন্য এত সময় লাগালেন এবং সঙ্গীদেরকে দাঁড় করিয়ে রাখলেন।"

হযরত ওমর (রাঃ) বললেন, "জানো কি, মহিলাটি কে? তিনি সেই মহিলা যাঁর কথা আল্লাহতায়ালা সাত আসমানের ওপর শুনেছিলেন। খোদার কসম! তিনি যদি সারা রাতও দাঁড়িয়ে থাকতেন তাহলেও আমি নামায ছাড়া অন্য কোন কাজ না করে তাঁর কথা শুনতাম।"

এই মহিলা যাঁর দরদভরা আওয়াজ আল্লাহতায়ালা আরশে মুয়াল্লার ওপর শুনেছিলেন এবং যাঁকে আরব ও আযমের খলিফা হযরত ফারুকে আযম (রাঃ) এ ধরনের শ্রদ্ধা করতেন তিনি ছিলেন হযরত খাওলাহ (রাঃ) বিনতে ছা'লাবাহ।

হযরত খাওলাহ (রাঃ) বিনতে ছা'লাবাহ (বিন আসরাম বিন ফাহার বিন কায়েস বিন ছা'লাবাহ বিন গানাম বিন সালিম বিন আওফ) আনসারের বনি আওফ বিন খাজরাজের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত ছিলেন। চাচাতো ভাই হযরত আওস (রাঃ) বিন ছামতের সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়েছিল। হযরত আওস (রাঃ) ছিলেন হযরত উবাদাহ (রাঃ) বিন ছামতের সহোদর। তাঁরা দুই ভাইই জালিলুল কদর সাহাবী হিসেবে পরিগণিত ছিলেন। হযরত খাওলাহও (রাঃ) স্বামীর সঙ্গে ইসলাম গ্রহণ এবং রহমতে আলমের (সাঃ) বাইয়াত গ্রহণ করেন। তিনি একজন সাধারণ মহিলা হিসেবে অখ্যাত– ভাবে জীবন যাপন করছিলেন। হঠাৎ করে এমন একটি ঘটনা সংঘটিত

www.bjilibrary.com

হলো যে তিনি চিরকালীন খ্যাতি লাভ করে ফেললেন এবং সাহাবাদের নিকট তাঁর মর্যাদা খুব বেড়ে গেল।

ঘটনাটি ছিল: হযরত খাওলাহর (রাঃ) স্বামী আওস বিন ছামত ছিলেন একজন বৃদ্ধ মানুষ এবং বার্ধক্যের কারণে তাঁর মেযাজে রুক্ষতা এসে গিয়েছিল। সামান্য সামান্য কথাতেই তেলে বেগুনে জ্বলে উঠতেন এবং কোন কোন সময় ক্রোধে একদম আয়ত্তের বাইরে চলে যেতেন। একদিন রাগে স্ত্রীকে (হযরত খাওলাহ) বলে ফেললেন, "আনতা আলাইয়া কাজাহরি উম্মি" অর্থাৎ তুমি আমার নিকট তেমন যেমন আমার মায়ের পিঠ। সে যুগে এ ধরনের কথা বলার অর্থ ছিল, "তুমি আমার ওপর আমার মায়ের মত হারাম।" এ ধরনের কাজকে বলা হয় "জিহার।" যখন তাঁর ক্রোধ অবদমিত হলো তখন খুব পেরেশান হলেন এই ভেবে যে তিনি কি আচরণ করে বসেছেন। এখন সংসার বাঁচানোর কি উপায়। যখন হযরত আওস (রাঃ) তার সামনে লজ্জা প্রকাশ করলেন তখন তিনি বললেনঃ "যদিও তুমি তালাক দাওনি, তবুও আমি বলতে পারি না যে, তুমি যে কথা বলেছ তার পর আমার এবং তোমার মধ্যে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক অবশিষ্ট রয়েছে অথবা নেই। তুমি রাসূলের (সাঃ) খিদমতে যাও এবং এই ব্যাপারে সিদ্ধান্ত করাও।"

হযরত আওস (রাঃ) বললেনঃ "রাসূলের (সাঃ) সামনে এই ঘটনা বর্ণনা করতে আমার খুব লজ্জা লাগবে। আল্লাহর ওয়াস্তে তুমিই হাদিয়ে বরহকের (সাঃ) নিকট গিয়ে এ ব্যাপারে ফতোয়া গ্রহণ কর।"

হযরত খাওলাহ (রাঃ) তৎক্ষণাৎ রহমতে আলমের (সাঃ) নিকট পৌছলেন। তিনি সে সময় উম্মুল মুমিনিন হযরত আয়েশা সিদ্দিকাহর (রাঃ) ঘরে ছিলেন। হযরত খাওলাহ (রাঃ) সকল ঘটনা বর্ণনা করে আরজ করলেনঃ

"ইয়া রাসুলাল্লাহ! আমার মাতা-পিতা আপনার ওপর কুরবান হোক। আমার এবং আমার সন্তানদের জীবন ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচানোর কি কোন পথ আছে?"

হুজুর (সাঃ) বললেনঃ "আমার ধারণা তুমি তার জন্য হারাম হয়ে গেছ।"

অন্য এক রাওয়ায়েত অনুযায়ী হুজুর (সাঃ) এই কথা বলেছিলেনঃ "এই মাসায়ালায় এখন পর্যন্ত আল্লাহ তায়ালার তরফ থেকে কোন নির্দেশ দেয়া হয়নি।"

প্রিয় নবীর (সাঃ) জবাব শুনে হযরত খাওলাহ (রাঃ) কান্নাকাটি করতে লাগলেন এবং বারবার হুজুরের নিকট আরজ করলেন যে, আওস (রাঃ) আমার

www.bjilibrary.com

চাচাতো ভাই। তাঁর রুক্ষ মেযাজ এবং বার্ধক্যের অবস্থা আপনার নিকট পরিষ্কার। সে রাগান্বিত হয়ে এমন কথা বলে ফেলেছে। আমি কসম করে বলছি যে, এটা তালাক নয়। আল্লাহর কসম! এমন কোন পথ বলে দিন যাতে আমার, আমার বৃদ্ধ স্বামী এবং সন্তানদের জীবন ধ্বংস হওয়া থেকে রক্ষা পায়।

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) নিজের মতের ওপর অটল রইলেন। কিন্তু খাওলাহ (রাঃ) নিরাশ হলেন না এবং বারবার হুজুরকে (সাঃ) রাজি করাতে চেষ্টা করতে লাগলেন। অতঃপর হাত উঠিয়ে দোয়া করলেনঃ "হে মাওলা! আমি তোমার নিকট নিজের কঠিনতম মুসিবতের ফরিয়াদ জানাচ্ছি। হে আল্লাহ! যা আমাদের জন্য রহমতের কারণ হয় তা নবীর (সাঃ) মুখ দিয়ে প্রকাশ করুন।"

হযরত আয়েশা সিদ্দিকাহ (রাঃ) বলেন, এই দৃশ্য এত করুণ ছিল যে, আমি এবং ঘরের সকল লোকের চোখ অশ্রুপূর্ণ হয়ে গেল।

হযরত খাওলার (রাঃ) কাকুতি-মিনতি অব্যাহত ছিল। এমন সময় রাসূলের (সাঃ) ওপর ওহি নাযিলের অবস্থা সৃষ্টি হলো। হযরত আয়েশা (রাঃ) বললেন, খাওলা! কিছু সময় অপেক্ষা কর। সম্ভবত আল্লাহতায়ালা তোমার ব্যাপারে ফায়সালা দিয়েছেন।

হযরত খাওলার (রাঃ) জন্য এটা ছিল কঠিন পরীক্ষার সময়। তাঁর ভয় ছি যে, সিদ্ধান্ত বা ফায়সালা যদি তাঁর বিরুদ্ধে যায় তাহলে সেই দুঃখ তিনি সইতে পারবেন না। কিন্তু যখন তিনি রাসূলের (সাঃ) প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন তখন তিনি তাঁকে মুচকি হাসতে দেখলেন। তাতে তাঁর অন্তর একটু ঠান্ডা হলো এবং সুসংবাদ শোনার জন্য দাঁড়িয়ে গেলেন। হুজুর (সাঃ) বললেন, "খাওলা! আল্লাহ তোমার ফায়সালা করে দিয়েছেন।" অতঃপর তিনি সূরায়ে মুজাদেলার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পাঠ করলেন। সূরাটির প্রথম আয়াতই হযরত খাওলার (রাঃ) প্রসঙ্গে ছিল।

এরপর এই সূরায় নাযিলকৃত নির্দেশ মুতাবিক তিনি হযরত খাওলাকে (রাঃ) বললেন, তোমার স্বামীকে একটি গোলাম অথবা দাসী আযাদ করতে বলো।

হযরত খাওলা (রাঃ) আরজ করলেনঃ "ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার মাতা-পিতা আপনার ওপর কুরবান হোক। আমার স্বামীর না আছে কোন গোলাম না কোন বাঁদী।

হুজুর (সাঃ) বললেনঃ "তাহলে সে অব্যাহতভাবে ৬০ দিন রোযা রাখবে।"

www.bjilibrary.com

হযরত খাওলা (রাঃ) বললেনঃ "হে আল্লাহর রাসূল। খোদার কসম। আমার স্বামী খুবই দুর্বল। সে যদি দিনে তিনবার খানা-পিনা না করে তাহলে চোখে দেখতে পারে না। অব্যাহতভাবে ৬০টি রোযা রাখা তার জন্য অসম্ভব ব্যাপার।"

হুজুর (সাঃ) বললেনঃ "ঠিক আছে, তাহলে তাকে ৬০ জন মিসকিনকে খাবার খাওয়াতে বলো।"

খাওলা (রাঃ) বললেনঃ "হে আল্লাহর রাসূর। আমার স্বামীর এরও সামার্থ নেই। আপনি যদি সাহায্য করেন।"

রহমতে আলমের (সাঃ) দয়ার মেঘতো অভাবগ্রস্তদের ওপর সব সময়ই বর্ষিত হতো। তিনি হযরত আওস (রাঃ) বিন ছামতকে এত খাদ্য বস্তু দিলেন যা ৬০ ব্যক্তির দু' বেলার খাবারের জন্য যথেষ্ট ছিল। হযরত আওস (রাঃ) এই খাদ্য সাদাকাহ করে নিজের জিহারের কাফফারা আদায় করলেন।

অন্য এক রাওয়ায়েতে আছে কাফফারার অর্ধেক খোরাক হুজুর (সাঃ), অর্ধেক হযরত খাওলা (রাঃ) স্বামীকে দিয়েছিলেন।

আল্লামা ইবনে সা'দ (রঃ) বর্ণনা করেছেন, খাওলা (রাঃ) হুজুর (সাঃ) থেকে বিদায় নিয়ে বাড়ী এলেন। এ সময় হযরত আওসকে (রাঃ) দরজায় তাঁর জন্য অপেক্ষারত পেলেন। অস্থিরচিত্তে জিজ্ঞেস করলেন, খাওলা, হুজুর (সাঃ) কি নির্দেশ দিয়েছেন? খাওলা (রাঃ) সকল ঘটনা বিবৃত করলেন এবং বললেন, তুমি বড় ভাগ্যবান। উম্মুল মানযার (রাঃ) বিনতে কায়েসের নিকট থেকে খেজুর নিয়ে ৬০ জন মিসকিনকে সাদকা দিয়ে এসো। যাতে তোমার কসমের কাফফারাহ হয়ে যায়।

হযরত আওস (রাঃ) এই সিদ্ধান্তের কথা শুনে অবর্ণনীয় খুশী হলেন এবং তিনি কাফফারা আদায় করে ভবিষ্যতের জন্য এমন ধরনের কথা মুখ দিয়ে বের না করার প্রতিশ্রুতি দিলেন।

সুরায়ে মুজাদেলা নাযিল হওয়ার পর হযরত খাওলার (রাঃ) মর্যাদা মানুষের মধ্যে অনেক বেড়ে গেল। এমনকি বড় বড় সাহাবারাও (রাঃ) তাঁকে মর্যাদা ও সম্মান দিতে লাগলেন। হযরত ওমর ফারুকের (রাঃ) সঙ্গে তাঁর সাক্ষাতের যে ঘটনা ওপরে বর্ণনা করা হয়েছে তা বায়হাকী থেকে গৃহীত হয়েছে। কতিপয় অন্য চরিতকার এই ঘটনাকে অন্যভাবে বর্ণনা করেছেন। তাঁরা লিখেছেন যে, হযরত ওমর (রাঃ) রাস্তায় খাওলাকে (রাঃ) দেখে সালাম দিলেন। তিনি সালামের জবাব দিয়ে হযরত ওমকে (রাঃ) সেখানেই দাঁড় করিয়ে বললেনঃ

www.bjilibrary.com

"হে ওমর! এক সময় ছিল, আমি তোমাকে ওকাজের বাজারে দেখেছিলাম। সে সময় লোকজন তোমাকে উমায়ের উমায়ের বলে ডাকতো এবং তুমি লাঠি হাতে বকরী চরিয়ে ফিরতে। কিছুকাল পরেই লোকজন তোমাকে ওমর বলতে লাগলো। অতঃপর সেই সময় এলো যখন তোমার উপাধি হলো আমীরুল মুমিনিন। খোদার মাখলুকের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করো এবং নিশ্চিত জেনো যে, যে ব্যক্তি আল্লাহর আজাবকে ভয় করে তার জন্য দূরও নিকটবর্তী হয়। আর যে ব্যক্তি মৃত্যুকে ভয় করে সব সময় সে মৃত্যু ভয়ে ভীত থাকে এবং সে তা হারিয়ে ফেলে যা বাঁচাতে চায়।"

সে সময় হযরত ওমর ফারুকের (রাঃ) সঙ্গে কতিপয় লোক ছিলেন। তাঁদের মধ্য থেকে একজন বললেন, "বড় বিবি। তুমিতো আমীরুল মুমিনিনকে অনেক কথা শুনিয়ে দিয়েছ।" (হাফিজ ইবনে আব্দুল বার–এর (রঃ) বক্তব্য অনুযায়ী হযরত জারুদ আবদি (রাঃ) এ কথা বলেছিলেন) হযরত ওমর ফারুক (রাঃ) বললেনঃ

"ইনি যা বলছেন, তা বলতে দাও। তোমরা জানোনা যে, ইনি কে? ইনি হলেন খাওলা (রাঃ) বিনতে ছা'লাবাহ। তাঁর কথা তো সাত আসমানের ওপর শোনা হয়েছিল এবং তাঁর ব্যাপারেই কাদ সামিয়াল্লাহ নাযিল হয়েছিল। আমার মত আল্লাহর নাচিজ বান্দাহকে তো তাঁর কথা ভালোভাবেই শোনা উচিত।"

হযরত খাওলা (রাঃ) বিনতে ছা'লাবার ওফাতের সাল এবং জীবনের অন্যান্য দিকের বিবরণ চরিত গ্রন্থে পাওয়া যায় না।

www.bjilibrary.com

হযরত রুবায়্যি' বিনতে মুয়াব্বিজ (রাঃ)

হযরত মুহাম্মাদ মুস্তাফার (সাঃ) ওফাতের কয়েক বছর পর জালিলুল কদর সাহাবী হযরত আম্মার বিন ইয়াসিরের (রাঃ) পৌত্র আবু ওবায়দাহ বিন মুহাম্মাদ (রাঃ) একদিন মদীনার এক বুজর্গ মহিলার খিদমতে হাজির হয়ে জিজ্ঞাসা করলেনঃ

"আম্মাজান। আমাদের রাসূলে মকবুলের (সাঃ) হুলিয়া মুবারক কেমন ছিল?" এই মহিলা বছরের পর বছর ধরে প্রিয় নবীর (সাঃ) অবয়ব দর্শনে নিজের চোখকে আলোকিত করেছিলেন। বললেন, ইয়া বুনাইয়্যা, লাও রায়াইতাহু রায়াইতাস শামসা তালিয়াতান অর্থাৎ "হে বেটা। যদি তুমি হুজুরকে (সাঃ) দেখতে তাহলে মনে করতে যে, সূর্য উদিত হচ্ছে।" এতটুকু বলেই তাঁর চোখ অশ্রুপূর্ণ হয়ে উঠলো এবং তিনি হুজুরকে (সাঃ) স্মরণ করে কাঁদতে লাগলেন। রাসূল (সাঃ) সম্পর্কে যে মহিলা এই শব্দ প্রয়োগ করেছিলেন তিনি ছিলেন হযরত রুবায়্যি বিনতে মুয়াব্বিজ (রাঃ)।

হযরত রুবায়্যি বিনতে মুয়াব্বিজ (রাঃ) অন্যতম আনসার মহিলা সাহাবী ছিলেন। তাঁর সম্পর্ক ছিল আনসারের সম্ভ্রান্ত পরিবার বনু নাজ্জারের সঙ্গে। নসবনামা হলোঃ রুবায়্যি বিনতে মুয়াব্বিজ বিন হারিছ বিন রিফায়াহ বিন হারিছ বিন সওয়াদ বিন মালিক বিন গানাম বিন মালিক বিন নাজ্জার। মা'র নাম ছিল উম্মে ইয়াযিদ বিনতে কায়েস। তিনিও বনু নাজ্জারভুক্ত ছিলেন।

হযরত রুবায়্যি'র (রাঃ) পিতা ও চাচা সকলেই নিজের মা আফরা'র (হযরত রুবায়্যি'র দাদী) মশহুর সন্তান ছিলেন। তাঁদের সকলকেই (অর্থাৎ মুয়াব্বিজ (রাঃ), মায়াজ (রাঃ) এবং আওফ (রাঃ) হারিছ পুত্র না বলে আফরার পুত্র বলা হতো।

ঐতিহাসিকরা হযরত রুবায়্যি'র (রাঃ) জন্মের সাল উল্লেখ করেননি। কিন্তু বিভিন্নভাবে জানা যায় যে, তিনি নবীর (সাঃ) হিজরতের পূর্বে বয়োপ্রাপ্তা হয়েছিলেন। তাঁর পিতা মুয়াব্বিজ (রাঃ) এবং চাচা মায়াজ (রাঃ) ও আওফ (রাঃ) শুধুমাত্র নবীর (সাঃ) হিজরতের পূর্বেই ইসলাম গ্রহণ করেননি বরং হযরত মায়াজ (রাঃ) এবং

www.bjilibrary.com

আওফ (রাঃ) বাইয়াতে উকবায়ে কবিরাতে অংশগ্রহণের সৌভাগ্যও লাভ করেন। সম্ভবত হযরত রুবায়্যি'র (রাঃ) যখন জ্ঞান চক্ষু উন্মিলিত হয় তখন তিনি নিজের খান্দানকে ইসলামের আলোয় আলোকিত দেখতে পান। বস্তুত তিনিও নবীর (সাঃ) হিজরতের পূর্বেই ইসলাম গ্রহণ করেন।

হিজরতের পর রহমতে আলম (সাঃ) যেদিন মদীনা মুনাওয়ারাতে শুভ পদার্পণ করলেন সেদিনটি ছিল মদীনাবাসীর সবচেয়ে বড় খুশীর দিন। হযরত রুবায়্যিও সেই আনন্দে শরীক ছিলেন এবং অন্যান্য মহিলা ও বালিকাদের সঙ্গে একত্রিত হয়ে স্বাগত সঙ্গীত গেয়েছিলেন।

হযরত রুবায়্যি'র পিতা হযরত মুয়াব্বিজ (রাঃ) প্রিয় নবীর (সাঃ) সত্যিকার আশিক ছিলেন এবং তাঁর দু' সহোদর মায়াজ (রাঃ) এবং আওফও (রাঃ) একই ধরনের ছিলেন। দ্বিতীয় হিজরীতে বদরের ময়দানে হক ও বাতিলের মধ্যে প্রথম যুদ্ধ সংঘটিত হয়। কোরেশের পক্ষ থেকে উতবাহ বিন রবিয়াহ, শাইবাহ বিন রবিয়াহ এবং ওলিদ বিন উতবাহ ময়দানে বের হয়ে মুকাবিলার জন্য মুসলমানদের প্রতি আহ্বান জানালো। তখন সর্বপ্রথম এই তিন সহোদর (মুয়াব্বিজ, মায়াজ এবং আওফ) তাদের বিরুদ্ধে মোকাবিলার জন্য অগ্রসর হলেন। কিন্তু কোরেশেরা তাঁদের সঙ্গে যুদ্ধ করা পছন্দ করলো না। তাঁরা চেঁচিয়ে বললো, "মুহাম্মাদ! আমাদের সঙ্গে মুকাবিলার জন্য আমাদের কওম এবং সম-মর্যাদার লোক পাঠাও।" সুতরাং হুজুরের (সাঃ) নির্দেশে এই তিন জাঁবাজ নিজেদের ব্যূহে ফিরে এলেন এবং হযরত হামযা, (রাঃ) হযরত আলী (রাঃ) ও হযরত উবায়দাহ (রাঃ) বিন হারিছ তাদের সামনা সামনি হলেন। এই লড়াইয়ে হযরত উবায়দাহ (রাঃ) শাইবাহ'র হাতে গুরুতর আহত হল। এ সত্ত্বেও হযরত হামযা (রাঃ) এবং হযরত আলী (রাঃ) কোরেশের তিন যুদ্ধবাজকে জাহান্নামে পাঠিয়ে দিলেন।

এইবার সাধারণ যুদ্ধ শুরু হলো। হযরত মায়াজ (রাঃ) এবং মুয়াব্বিজ (রাঃ) আবু জেহেলের ফিতনা সৃষ্টি ও ইসলাম দুশমনির চর্চা শুনে রেখেছিলেন এবং দৃষ্টিতে আসামাত্র তাকে খতম করার আন্তরিক আকাংখাও তাঁরা পোষণ করতেন। সুতরাং যুদ্ধের ময়দানে তাঁরা সব সময় তার সন্ধানে রইলেন। হযরত আব্দুর রহমান বিন আওফ (রাঃ) বলেছেন, তিনি যুদ্ধের ময়দানে দাঁড়িয়েছিলেন। এমন সময় দু' জোয়ান আনসার তাঁর ডাইনে এবং বামে এসে দাঁড়িয়ে গেলেন। তাঁদের মধ্যে একজন যুবক তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, "চাচা! আবু জেহেল কোথায়।" তিনি বললেন, "হে ভ্রাতুষ্পুত্র! তাকে দিয়ে তোমরা কি করবে?" তাঁরা বললেন, "আমরা শুনেছি যে, সে

www.bjilibrary.com

রাসূলকে (সাঃ) গালি দিয়ে থাকে। খোদার কসম! তাকে পেলে হত্যা করে ছাড়বো। অথবা সেই চেষ্টাতেই নিজের জীবন কুরবানী করে দেব।"

তিনি এই যুবকদ্বয়ের আত্মত্যাগের আবেগে অভিভূত হয়ে পড়লেন। তিনি তাঁদেরকে ইঙ্গিত করে বললেন, আবু জেহেল সামনে যুদ্ধের ব্যূহে চক্কর দিয়ে ফিরছে। তারা দু' জন বাজ পাখীর মত তার ওপর গিয়ে পড়লেন এবং সঙ্গে সঙ্গে তাকে মাটি ও রক্তে একাকার করে ফেললেন। অতঃপর দু' সহোদর রহমতে আলমের (সাঃ) খিদমতে হাজির হয়ে আবু জেহেলকে হত্যার খবর দিলেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেনঃ "কে মেরেছে।' উভয়েই আরজ করলেনঃ "আমরা।" হুজুর (সাঃ) বললেন, "তোমাদের তরবারী দেখাও। উভয়েই তাদের তরবারী পেশ করলেন। তাতে রক্ত লেগে ছিলো। হুজুর (সাঃ) বললেন, "অবশ্যই তোমরা দু'জনে তাকে হত্যা করেছ।"

হযরত মুয়াব্বিজ (রাঃ) আবু মাসাফি নামক এক মুশরিকের হাতে এই যুদ্ধেই শাহাদাতের পিয়ালা পান করেন এবং হযরত মায়াজ (রাঃ) গুরুতর আহত হয়ে যুদ্ধের ময়দান থেকে ফিরে আসেন। এক রাওয়ায়েতে আছে, ইকরামাহ বিন আবি জেহেল পিতৃ হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য তাঁর ওপর হামলা করে এবং তাঁর বাহু কেটে ফেলে। এ সত্ত্বেও তিনি তার মুকাবিলা করেন এবং ইকরামাকে পিছু হটিয়ে দেন।

অন্য এক রাওয়ায়েত অনুযায়ী বনু যরিকের ইবনে মাজ নামক এক মুশরিক তাঁকে সেই সময় আহত করে যখন তিনি আবু জেহেলের ওপর হামলা করছিলেন। যা হোক, তাঁর ক্ষত সেরে যায় এবং তিনি এই ঘটনার পর প্রায় তিরিশ-পঁয়ত্রিশ বছর পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। কতিপয় রাওয়ায়েতে আছে যে, হযরত মুয়াব্বিজের (রাঃ) ভাই আওফও (রাঃ) বদরের যুদ্ধে শাহাদাত লাভ করেন এবং মায়াজেরও (রাঃ) ক্ষত ভালো হয়নি।

হযরত রুব্বায়্যির (রাঃ) পিতা ও চাচা প্রিয় নবীর (সাঃ) খাতিরে যেভাবে জীবনের বাজি লাগিয়েছিলেন সেই ভিত্তিতে মুসলমানরা তাঁকে বড্ড সম্মানের দৃষ্টিতে দেখতেন এবং হুজুরও (সাঃ) তাঁকে খুব স্নেহ করতেন।

বদরের যুদ্ধের কিছুদিন পর হযরত রুব্বায়্যির (রাঃ) বিয়ে হয়েছিল হযরত আয়াস (রাঃ) বিন বাকির লাইসীর সঙ্গে। সহিহ বুখারীতে আছে, বিয়ের দ্বিতীয় দিনে রহমতে আলম (সাঃ) হযরত রুব্বায়্যির (রাঃ) বাড়ী গেলেন এবং বিছানায় বসে পড়লেন। সে সময় কিছু বালিকা দফ বাজিয়ে বাজিয়ে বদরের শহীদদের প্রশংসায়

www.bjilibrary.com

কবিতা আবৃত্তি করছিলো। (এই আয়োজন সম্ভবত এজন্য করা হয়েছিল যে, হযরত রুব্বায়্যির পিতা ও চাচা বদরের যুদ্ধে শাহাদাত বরণ করেছিলেন এবং বিয়ের সময় এই কবিতা তাঁর দুঃখ হালকা করার জন্য পাঠ করা হচ্ছিল।) এই কবিতা পড়তে পড়তে সেই বালিকারা যখন এই পংক্তি আবৃত্তি করলোঃ ওয়া ফিনা নাবিয়্যুন ইয়ালামু মা ফি গাদিন অর্থাৎ "এবং আমাদের মধ্যে সেই নবী রয়েছেন যিনি আগামীকালের খবর রাখেন।" এই পংক্তি শুনে হুজুর (সাঃ) নিষেধ করে বললেন, তাই পড় যা আগে পড়ছিলে।

হযরত রুব্বায়্যি (রাঃ) সেই সকল ভাগ্যবতী মহিলার অন্যতম ছিলেন যাঁদেরকে রহমতে আলম (সাঃ) যুদ্ধের সময় ইসলামী বাহিনীর সঙ্গে রাখতেন। তিনি কয়েকটি যুদ্ধে অংশ নেন এবং খুব নিপুণতার সঙ্গে আহত ও অসুস্থদেরকে সেবা ছাড়াও অন্যান্য খিদমতও আঞ্জাম দেন। সহিহ বুখারীতে স্বয়ং হযরত রুব্বায়্যি (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, আমরা রাসূলের (সাঃ) সঙ্গী হতাম। আমরা পানি পান করাতাম, আহতদের চিকিৎসা করতাম এবং নিহতদের লাশ নিয়ে আসতাম। এক রাওয়ায়েতে তাঁর প্রতি এই শব্দসমূহ সংশ্লিষ্ট করা হয়েছেঃ "আমরা রাসূলের (সাঃ) সঙ্গে যুদ্ধ করতাম। কওমকে পানি পান করাতাম, তাদের খিদমত করতাম এবং নিহতদের লাশ ও আহতদেরকে মদীনায় ফিরিয়ে আনতাম।

হযরত রুব্বায়্যি (রাঃ) বিশ্ব নবীর (সাঃ) প্রতি গভীর শ্রদ্ধা পোষণ করতেন। হুজুর (সাঃ) কখনো কখনো বাড়ী গিয়ে তাঁর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতেন। মুসনাদে আবু দাউদে আছে, একবার হুজুর (সাঃ) হযরত রুব্বায়্যির (রাঃ) গৃহে তাশরীফ নেন এবং ওজুর জন্য পানি চান। হযরত রুব্বায়্যি (রাঃ) অত্যন্ত উৎসাহ ও শ্রদ্ধা সহকারে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হুজুরকে (সাঃ) ওজু করান।

৬ষ্ঠ হিজরীতে বাইয়াতে রিদওয়ান এবং হুদায়বিয়ার সন্ধির মহান ঘটনা সংঘটিত হয়। এই সময় হযরত রুব্বায়্যিও (রাঃ) প্রিয় নবীর (সাঃ) সঙ্গে ছিলেন। তিনি অত্যন্ত আত্মসম্ভ্রম সম্পন্ন মহিলা ছিলেন।

হাফিজ ইবনে আব্দুল বার (রঃ) "ইসতিয়াবে" লিখেছেন, একবার আতর বিক্রেতা এক কোরেশ মহিলা আসমা বিনতে মাখরাবাহ আতর বিক্রির জন্য হযরত রুব্বায়্যির (রাঃ) গৃহে এলো এবং তাঁকে তাঁর বংশের কথা জিজ্ঞেস করতে লাগলো। যখন সে জানতে পেলো যে , রুব্বায়্যির (রাঃ) পিতা আবু জেহেলকে হত্যা করেছিলেন। তখন তার মধ্যে বংশীয় গোড়ামী দেখা দিল এবং বললো, "ওহ, তুমি তাহলে আমাদের সরদারের হত্যাকারীর কন্যা?" ইসলামের দুশমন আবু জেহেলের

www.bjilibrary.com

নামের সঙ্গে সরদার শব্দ যোগ করায় হযরত রুব্বায়্যি (রাঃ) খুব ক্রোধান্বিত হলেন। তিনি বললেন, "আমিতো গোলাম হত্যাকারীর কন্যা।" আসমা আবু জেহেলের এই অবমাননা সহ্য করতে পারলো না। বললো, তোমার নিকট সওদা বিক্রি করা আমার জন্য হারাম। হযরত রুব্বায়্যিও মুখে মুখে জবাব দিলেন, "তোমার নিকট থেকে কিছু ক্রয় করাও আমার জন্য হারাম। আমি তোমার আতরকে দুর্গন্ধ মনে করি।"

হযরত রুব্বায়্যির (রাঃ) ওফাতের সাল সম্পর্কে কোন কিতাবে উল্লেখ নেই। হাফিজ ইবনে হাজার (রঃ) অবশ্য "ইসাবাহ'তে একটি ঘটনার কথা লিখেছেন। এই ঘটনা থেকে জানা যায় যে, তিনি হযরত ওসমান জুন্নুরাইনের (রাঃ) শাসনকাল পর্যন্ত জীবিতছিলেন।

হযরত রুব্বায়্যি (রাঃ) থেকে ২১টি হাদীস বর্ণিত আছে। মুসনাদে আহমদ বিন হাম্বলে আছে, হযরত আব্দুল্লাহ (রাঃ) বিন আব্বাস এবং ইমাম যয়নুল আবেদীনকে (রঃ) ইলম ও ফজলের আকাশের সূর্য ও চন্দ্র বলা হতো। তাঁরাও হযরত রুব্বায়্যির (রাঃ) নিকট মাসয়ালা জিজ্ঞেস করতেন। এ থেকে তাঁর জ্ঞানের পরিধি আঁচ করা যায়।

www.bjilibrary.com

হযরত উম্মে সুলাইম (রাঃ)

আল্লাহর কুদরতের কারিশমার শান আশ্চর্য ধরনের। একদিকে মক্কার কোরেশের বঞ্চনার ভাগ্য। হকের রহমত তাদের গৃহেই অবতীর্ণ হলেন। অথচ তারা তাঁকে স্বহস্তে দূরে ঠেলে দিলো। পক্ষান্তরে তিনশ' মাইল দূরে ইয়াছরেব শহরের বাসিন্দাদের সৌভাগ্যও দেখার মত। ভয়াবহ পরিস্থিতির ঝুঁকি নিয়ে নিজের জীবনকে বাজি রেখে তাঁরা অগ্রসর হলেন। অত্যন্ত উৎসাহ-উদ্দীপনার সঙ্গে রহমতে আলমকে (সাঃ) তাঁরা স্বাগত জানালেন এবং নিজেদেরকে রাসুলের (সাঃ) নিকট সমর্পণ করলেন।

নবুয়ত প্রাপ্তির ত্রয়োদশ বছরে সাইয়েদুল আনাম (সাঃ) মক্কার মাটিকে বিদায় জানিয়ে ইয়াছরেবে গিয়ে উপস্থিত হলেন। তাঁর শুভাগমনে দু' হাজার বছরের এই পুরাতন শহরে বসন্তের আগমন ঘটলো। এই শহর ইয়াছরেব থেকে "মদীনাতুন নবী"তে পরিণত হলো। শহরটির প্রতিটি অলি-গলিতে রাসুলের (সাঃ) রিসালাতের আলোকমালায় ঝলমল করতে লাগলো।

সেই যুগেরই কথা। একদিন একজন সম্ভ্রান্ত মহিলা ১০ বছর বয়স্ক পুত্রকে সঙ্গে নিয়ে রহমতে আলমের (সাঃ) খিদমতে হাজির হলেন। অত্যন্ত আদবের সঙ্গে হুজুরকে (সাঃ) সালাম এবং আরজ করলেনঃ "হে আল্লাহর রাসুল! আমার মাতা-পিতা আপনার ওপর কুরবান হোক। এ আমার পুত্র আনাস। আমার আন্তরিক কামনা হলো সে আপনার খিদমত করুক। তাকে নিজের খাদিমদের মধ্যে শামিল করে নিন এবং তার জন্য দোয়া করুন।" হুজুর (সাঃ) মহিলাটির নিষ্ঠাপূর্ণ আবেগের প্রশংসা করলেন। কিশোরের মাথার ওপর স্নেহের হাত বুলালেন এবং তার জন্য দোয়া খায়ের করলেন।

এই মহিলা, যিনি নিজের কলিজার টুকরাকে রাসুলের (সাঃ) পবিত্র খিদমত প্রদানের সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন এবং যাঁর নিষ্ঠাপূর্ণ আবেগ রহমতে আলমকে (সাঃ) খুশী করেছিল, তিনি ছিলেন হযরত উম্মে সুলাইম (রাঃ) আনসারিয়াহ।

www.bjilibrary.com

হযরত উম্মে সুলাইম (রাঃ) একজন অন্যতম সম্মানিত মহিলা সাহাবী ছিলেন। তাঁর আসল নাম রামলাহ অথবা সাহলাহ এবং অনেকের নিকট রামিশাহ ছিলো। গামিসাহ এবং রামিছাহ ছিল তাঁর লকব। আর উম্মে সুলাইম ছিল কুনিয়ত। কতিপয় চরিতকার তাঁর অন্য এক কুনিয়ত "উম্মে আনাস"ও লিখেছেন। কিন্তু এই কুনিয়ত বেশী প্রসিদ্ধ লাভ করেনি। হযরত উম্মে সুলাইম (রাঃ) খাজরাজ গোত্রের অত্যন্ত সম্ভ্রান্ত শাখা আদি বিন নাজ্জারের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত ছিলেন। নসবনামা হলোঃ উম্মে সুলাইম (রাঃ) বিনতে মিলহান বিন খালিদ বিন হারাম বিন জুনদুব বিন আমের বিন গানাম বিন আদি বিন নাজ্জার। মাতার নাম মালিকাহ (বিনতে মালিক বিন আদি) ছিল। তিনিও বনু নাজ্জার বংশোদ্ভূত ছিলেন।

অধিকাংশ চরিতকার লিখেছেন, হযরত উম্মে সুলাইম (রাঃ) রাসূলে আকরামের (সাঃ) খালা হিসেবে মশহুর ছিলেন। প্রকৃতপক্ষে হযরত উম্মে সুলাইমকে (রাঃ) এজন্য হুজুরের (সাঃ) খালা বলা হতো যে তাঁর (সাঃ) পরদাদী সালমার (হযরত আব্দুল মুত্তালিবের মাতা) সম্পর্কও বনু নাজ্জারের সঙ্গে ছিল এবং হযরত উম্মে সুলাইম (রাঃ) সালমার ভাইয়ের পৌত্রী ছিলেন। এই সম্পর্কের দিক থেকে তিনি এবং তাঁর বোন উম্মে হারাম (রাঃ) হুজুরের (সাঃ) খালা হিসেবে মশহুর হন যদিও এই সম্পর্ক ছিল দূরের সম্পর্ক তবুও প্রিয় নবীর (সাঃ) নিকট তা অত্যন্ত মূল্যবান ছিল এবং তিনি প্রায়ই হযরত উম্মে সুলাইমের (রাঃ) গৃহে পদার্পণ করতেন।

আল্লাহ তায়ালা হযরত উম্মে সুলাইমকে (রাঃ) অত্যন্ত সৎ স্বভাব দান করেছিলেন। প্রথম বাইয়াতে উকবায় কতিপয় ভাগ্যবান ইয়াছরেবী হুজুরের (সাঃ) হাতে বাইয়াত গ্রহণ করে মদীনা ফিরে যান এবং সেখানে ইসলামের চর্চা শুরু করেন। এ সময় হযরত উম্মে সুলাইম (রাঃ) দ্বীনে হক কবুল করায় এক মুহূর্তও বিলম্ব করেননি। সুতরাং তিনি আনসারের সাবিকুনাল আউয়ালুনদের মধ্যে পরিগণিত হন।

চাচাতো ভাই মালিক বিন নাজ্জারের (বিন দামদাম বিন যায়েদ) সঙ্গে হযরত উম্মে সুলাইমের (রাঃ) প্রথম বিয়ে হয়েছিল। তারই ঔরসে হযরত আনাস বিন মালিক জন্মগ্রহণ করেন। হযরত আনাস (রাঃ) উম্মাহর স্তম্ভ হিসেবে স্বীকৃত। হযরত উম্মে সুলাইম (রাঃ) যখন ইসলাম গ্রহণ করেন তখন হযরত আনাসের (রাঃ) শৈশবকাল। মা পুত্রকে নিজের রংয়ে রঞ্জিত করতে চাইলেন। তিনি তাঁকে কালেমা পড়াতেন এবং ইসলামের আদব-কায়দা শিক্ষা দিতেন। তাঁর স্বামী মালিক বিন

www.bjilibrary.com

নাজার ছিল হতভাগা। সে শুধু নিজের পিতৃ ধর্মের ওপরই কায়েম রইলোনা বরং হযরত উম্মে সুলাইমের (রাঃ) ইসলাম গ্রহণেও অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হলো এবং তাঁকে স্বীয় পুত্র আনাসকে (রাঃ) কালেমা পড়ানো থেকে বিরত থাকতে বললো। কিন্তু ইসলামের নেশা এমন ছিল না যে তা কোন উৎসাহ অথবা ভীতি প্রদর্শনের জন্য ভঙ্গ হবে। হযরত উম্মে সুলাইম (রাঃ) খুব কঠিন অবস্থার মধ্যে দিয়ে ইসলামের ওপর কায়েম রইলেন এবং শিশু আনাসকেও সেই রংয়েই রঞ্জিত করতে লাগলেন। ফলশ্রুতিতে স্বামী–স্ত্রীর মধ্যে খুব জটিলতা সৃষ্টি হয়। অসন্তুষ্ট হয়ে মালিক বিন নাজার সিরিয়া চলে যায় এবং সেখানেই মারা যায়। (এক রাওয়ায়েত অনুযায়ী কোন শত্রু তাকে হত্যা করে)। এই ঘটনা ছিল বাইয়াতে উকবায়ে কবিরাহর পুর্বেকার।

হযরত উম্মে সুলাইম (রাঃ) বিধবা হয়ে গেলেন। আর তাঁর কলিজার টুকরা কিশোর পুত্র হয়ে পড়লো এতিম। কিছুদিন পর চারদিক থেকে নিকাহর পয়গাম আসা শুরু হলো। কিন্তু তিনি সকলকেই শিশু পুত্র মজলিসে উঠা–বসা এবং আলোচনার যোগ্য না হওয়া পর্যন্ত বিয়ে করবেন না বলে জানালেন।

হযরত আনাসের (রাঃ) যখন কিছুটা বৃদ্ধি হলো তখন তাঁর গোত্রের আবু তালহা যায়েদ (রাঃ) বিন সাহাল হযরত উম্মে সুলাইমকে (রাঃ) নিকাহর পয়গাম প্রেরণকরলেন।

আবু তালহা তখনো ইসলাম গ্রহণ করেননি এবং কাঠের একটি মূর্তি পূজা করতেন। হযরত উম্মে সুলাইম (রাঃ) শিরকের কারণে প্রথম স্বামীর সঙ্গে বিচ্ছেদ সহ্য করেছিলেন। এখন তিনি অন্য একজন মুশরিককে কি করে বিয়ে করতে পারেন! তিনি স্পষ্ট অস্বীকার করলেন এবং বললেনঃ

"আমি তো এক খোদা এবং তাঁর সত্য রাসূলের ওপর ঈমান এনেছি। আফসোস তোমার জন্য! তুমি যে খোদাকে পুজা করে থাকো তা একটি বৃক্ষ অর্থাৎ কাঠের মূর্তি। বৃক্ষটি যমিন থেকে উত্থিত হয়েছে এবং তাকে অমুক হাবশী ঘের দিয়ে বড় করেছে। আমি এক খোদার পূজারী। আর তুমি স্বহস্তে তৈরী মূর্তির পুজারী। যা কাউকে কোন ক্ষতি বা উপকার করতে পারে না। আমার এবং তোমার মিল কি করে হতে পারে?"

এই কথাগুলো এমন হৃদয়গ্রাহী করে বলা হলো যে, আবু তালহার অন্তরে গেঁথে গেল। কিছুদিন তিনি চিন্তা করলেন। অতঃপর হযরত উম্মে সুলাইমের (রাঃ) নিকট এসে বললেনঃ "আমার ওপর সত্য সমুদ্ভাসিত হয়েছে এবং এখন আমি তোমার দ্বীন কবুল করার জন্য প্রস্তুত।"

www.bjilibrary.com

হযরত আবু তালহা (রাঃ) আর্থিক দিক দিয়ে তখন খুব সাধারণ পর্যায়ের ছিলেন। কিন্তু তাঁর ইসলাম গ্রহণের কারণে উম্মে সুলাইম এত খুশী হলেন যে, অযাচিতভাবে বলে ফেললেনঃ "অতঃপর আমি তোমাকে বিয়ে করছি এবং ইসলাম ছাড়া কোন মহর নিব না।" এরপর পুত্র আনাসকে (রাঃ) বললেনঃ "এখন তুমি তাঁর সঙ্গে আমার বিয়ে দিয়ে দাও।"

হযরত আনাস (রাঃ) মায়ের বিয়ে হযরত আবু তালহার (রাঃ) সঙ্গে পড়িয়ে দেন। তিনি বলতেন, আমার মায়ের বিয়ে হযরত আবু তালহার (রাঃ) সঙ্গে আশ্চর্য ধরনের মহরের বিনিময়ে সম্পন্ন হয়েছিল। ইবনে সা'দ (রঃ) এই রাওয়ায়েত করেছেন। হাফিজ ইবনে হাজরও "ইসাবাহতে" তা একইভাবে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু অন্য অনেক রাওয়ায়েত থেকে জানা যায় যে, হযরত আবু তালহার (রাঃ) ইসলাম গ্রহণের সময় হযরত আনাসের (রাঃ) বয়স ছিল ৯ বছরের মতো। এক নাবালেগ শিশুর বিয়ে পড়ানো আশ্চর্য ধরনের কথা বলে মনে হয়। হতে পারে যে, বিয়ে অন্য কেউ পড়িয়েছিলেন এবং হযরত আনাস (রাঃ) বিয়ের মজলিসে উপস্থিত ছিলেন। হযরত ছাবিত (রাঃ) বলতেন, আমি কোন মহিলার মহর উম্মে সুলাইমের থেকে উত্তম বলে শুনিনি।

ইসলাম গ্রহণের পর আবু তালহা (রাঃ) ঈমানের উদ্দীপনায় রাসূলের (সাঃ) প্রেম এবং কুরবানীর আবেগের বদৌলতে অন্যতম জালিলুল কদর সাহাবী হিসেবে পরিগণিত হলেন। ইসলাম গ্রহণের কয়েক মাস পর হযরত আবু তালহা (রাঃ) আনসারের সেই ৭৫ ব্যক্তির দলে শামিল হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেন যে দলটি নবুয়তের ত্রয়োদশ বছরে মক্কা গমন করে রহমতে আলমের (সাঃ) খিদমতে হাজির হয়ে তাঁর হাতে বাইয়াত গ্রহণ করেন এবং জান–মাল ও সন্তান দিয়ে রাসূলের (সাঃ) সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে তাঁকে মদীনা গমনের দাওয়াত দেন। ইতিহাসে এই বাইয়াত বাইয়াতে লাইলাতুল উকবা, বাইয়াতে উকবায়ে ছানিয়াহ এবং বাইয়াতে উকবায়ে কবিরাহ নামে মশহুর। কিছুদিন পর যখন হযরত মুহাম্মাদ মুস্তাফা (সাঃ) মদীনা তাশরীফ নেন তখন হযরত উম্মে সুলাইম (রাঃ)। তাঁর স্বামী এবং পুত্রের আনন্দ আর ধরে না। হুজুরের (সাঃ) মদীনা আগমনের দিন তাঁদের জন্য ঈদের দিন ছিল। হিজরতের প্রথম দিনগুলোতেই হযরত উম্মে সুলাইম (রাঃ) কলিজার টুকরা হযরত আনাসকে (রাঃ) সাইয়েদুল মুরসালিনের (সাঃ) খিদমতে দেয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেন। অন্য এক রাওয়ায়েতে আছে যে, হযরত উম্মে সুলাইমের (রাঃ) ইঙ্গিতে হযরত আবু তালহা (রাঃ) হযরত আনাসকে (রাঃ) সঙ্গে নিয়ে হুজুরের (সাঃ)

www.bjilibrary.com

খিদমতে হাজির হন এবং আনাসকে (রাঃ) তাঁর গোলামীতে নেয়ার জন্য নিবেদন জানান। হুজুর (সাঃ) তাঁর দরখাস্ত কবুল করেন।

হিজরতের কয়েক মাস পর রহমতে আলম (সাঃ) মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করেন। এ সময় হযরত উম্মে সুলাইমের (রাঃ) গৃহেই মানবতার নেতা (সাঃ) এবং সকল মুহাজির ও আনসার এই মহান লক্ষ্যে একত্রিত হন।

তৃতীয় হিজরীতে হযরত উম্মে সুলাইম (রাঃ) স্বামী হযরত আবু তালহার (রাঃ) সঙ্গে অত্যন্ত উৎসাহ–উদ্দীপনা নিয়ে ওহোদের যুদ্ধে শরীক হন। যখন একটি আকস্মিক ভুলের কারণে মুসলমানদের মধ্যে বিশৃংখলা সৃষ্টি হলো তখন হযরত আবু তালহা (রাঃ) সেই মুষ্টিমেয় সাহাবায়ে কেরামের অন্যতম ছিলেন যাঁরা শেষ পর্যন্ত রহমতে আলমের (সাঃ) হিফাজতে বুক পেতে দিয়েছিলেন। এ সময় হযরত উম্মে সুলাইম (রাঃ) হযরত আয়েশা সিদ্দিকাহ'র (রাঃ) সঙ্গে মশক ভরে ভরে যুদ্ধের ময়দানে পানি আনতেন এবং আহতদেরকে পানি পান করাতেন।

৬ষ্ঠ হিজরীর শেষের দিকে রাসূলে আকরাম (সাঃ) খায়বারের যুদ্ধে যোগদান করেন। এ সময় হযরত উম্মে সুলাইম (রাঃ) কতিপয় মহিলা সাহাবীসহ ইসলামী বাহিনীর পেছনে রওয়ানা হলেন। হুজুর (সাঃ) জানতে পেরে অসন্তুষ্টির স্বরে জিজ্ঞেস করলেন, "তোমরা কার সঙ্গে এবং কার অনুমতিতে এসেছ?" তাঁরা আরজ করলেন, "ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদের মাতা–পিতা আপনার উপর কুরবান হোক। আমরা উল কেটে থাকি এবং তা দিয়ে খোদার পথে সাহায্য করি। আমাদের নিকট আহতদের চিকিৎসার সরঞ্জাম রয়েছে। আমরা লোকদেরকে তীর উঠিয়ে দিই এবং ছাতু গুলিয়ে পান করাই।" হুজুর (সাঃ) জবাব শুনে তাঁদেরকে যুদ্ধের ময়দানে উপস্থিত থাকার অনুমতিদিলেন।

খায়বার বিজয়ের পর হযরত ছুফিয়া (রাঃ) বিনতে হুইয়্যি যখন রাসূলে করিমের (সাঃ) নিকাহতে আসার ব্যাপারে সম্মতি প্রদান করলেন তখন হুজুর (সাঃ) তাঁকে হযরত উম্মে সুলাইমের (রাঃ) নিকট সোপর্দ করলেন এবং গোসল– টোসল করিয়ে তাঁকে দুলহিন বানাতে বললেন। কেননা যুদ্ধের কষ্টে হযরত ছুফিয়ার অবস্থা অত্যন্ত করুণ হয়ে পড়েছিল। হযরত উম্মে সুলাইম (রাঃ) খুব উৎসাহ–উদ্দীপনার সঙ্গে হুজুরের (সাঃ) নির্দেশ পালন করেন।

অষ্টম হিজরীতে মক্কা বিজয়ের কিছুদিন পর হুনাইনের রক্তাক্ত যুদ্ধ সংঘটিত হয়। হযরত উম্মে সুলাইম (রাঃ) স্বামী হযরত আবু তালহার (রাঃ) সঙ্গে এই যুদ্ধে

www.bjilibrary.com

অত্যন্ত উৎসাহ-উদ্দীপনার সঙ্গে অংশগ্রহণ করেন। যুদ্ধের প্রারম্ভে বনু হাওয়াযেনের অভিজ্ঞ তীরন্দাজরা মুসলমানদের ওপর এমন প্রচন্ডভাবে তীর বর্ষণ করলো যে তাদের ব্যূহ বিশৃংখলা হয়ে পড়লো। এ সময় রহমতে আলম (সাঃ) হাতে গোনা কয়েকজন জীবন উৎসর্গকারী সঙ্গীসহ যুদ্ধের ময়দানে অটল পাহাড় হিসেবে দাঁড়িয়েছিলেন এবং তাঁর মুখ দিয়ে উচ্চারিত হচ্ছিল এই যুদ্ধ গাথাঃ

আনান্নাবিয়্যু লা কাজিব আনাবনু আব্দুল মুত্তালিব (আমি নবী। এটা কোন মিথ্যা কথা নয়। আমি আব্দুল মুত্তালিবের ফরযন্দ)। যে মুসলমানই এ কথা শুনলেন তিনিই ঘুরে দাঁড়ালেন। অতঃপর হুজুরের (সাঃ) ইঙ্গিত পেয়ে হযরত আব্বাস (রাঃ) উচ্চৈস্বরে মুসলমানদেরকে ডেকে বললেনঃ

"হে আনসারের জামায়াত। হে আসহাবে শাজারাহ!" তোমরা সকলেই নতুন উদ্দীপনা নিয়ে হুজুরের (সাঃ) চারপাশে একত্রিত হয়েছ এবং কাফেরদের ওপর এত জোরে হামলা করেছ যে, তারা পরাজয়ের গ্লানি স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে।"

যখন প্রচন্ড যুদ্ধ হচ্ছিল তখন হযরত আবু তালহা (রাঃ) অত্যন্ত বীরত্বের সঙ্গে হুজুরের (সাঃ) ডাইনে ও বামে লড়াই করছিলেন এবং হযরত উম্মে সুলাইম (রাঃ) খঞ্জর হাতে রাসূলের ওপর কুরবান হওয়ার জন্য দাঁড়িয়েছিলেন। যুদ্ধ স্তিমিত হয়ে এলে হযরত আবু তালহা (রাঃ) হুজুরকে (সাঃ) বললেন, উম্মে সুলাইম (রাঃ) খঞ্জর হাতে দাঁড়িয়ে আছে। হুজুর (সাঃ) উম্মে সুলাইমকে (রাঃ) জিজ্ঞাসা করলেনঃ "খঞ্জর দিয়ে কি করবে?" তিনি আরজ করলেনঃ "ইয়া রাসূলাল্লাহ! কোন মুশরিক নিকটে এলে তার পেট ফেড়ে ফেলবো।" হুজুর (সাঃ) একথা শুনে মুচকি হাসলেন। এরপর হযরত উম্মে সুলাইম (রাঃ) আরজ করলেনঃ "হে আল্লাহর রাসূল। মক্কার যারা আজ যুদ্ধের ময়দান থেকে পালিয়েছে তাদেরকে হত্যা করুন। রহমতে আলম (সাঃ) বললেনঃ "খোদা স্বয়ং তার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন।" সহিহ মুসলিমে আছেঃ "রাসূলুল্লাহ (সাঃ) হযরত উম্মে সুলাইম (রাঃ) এবং আনসারের কতিপয় মহিলাকে যুদ্ধে সাথে রাখতেন। তাঁরা লোকদেরকে পানি পান করাতেন এবং আহতদেরকে চিকিৎসা করতেন।" এই রাওয়ায়েত থেকে স্পষ্ট হয় যে, ওহোদ, খায়বার এবং হুনাইন ছাড়া হযরত উম্মে সুলাইম (রাঃ) অন্য কয়েকটি যুদ্ধেও অংশ নিয়ে থাকবেন।

প্রিয় নবীর (সাঃ) প্রতি হযরত উম্মে সুলাইমের (রাঃ) অত্যন্ত শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা ছিল। হুজুরও (সাঃ) তাঁকে খুব মর্যাদা ও সম্মান দিতেন। কতিপয় রাওয়ায়েত অনুযায়ী নবীর স্ত্রীগণ (রাঃ) ছাড়া মহিলাদের মধ্যে শুধুমাত্র হযরত উম্মে

www.bjilibrary.com

সুলাইম (রাঃ) এবং তাঁর বোন উম্মে হারামই (রাঃ) ব্যতিক্রমধর্মী মর্যাদা লাভ করেছিলেন। সেই মর্যাদাটি হলো প্রিয় নবী (সাঃ) মাঝে মধ্যে তাঁদের গৃহে যেতেন এবং দ্বিপ্রহরে সেখানে আরাম করতেন। হুজুর (সাঃ) বলতেন, উম্মে সুলাইমের (রাঃ) প্রতি আমার দয়া হয়। কারণ তাঁর ভাই হারাম (রাঃ) বিন মিলহান আমাকে সমর্থন করে শাহাদাত পেয়েছেন। হযরত উম্মে সুলাইম (রাঃ) হুজুরকে (সাঃ) এত শ্রদ্ধা করতেন যে, যখনই তিনি তাঁর গৃহে আরাম করতেন তখন তাঁর পবিত্র ঘাম এবং পড়ে যাওয়া মুবারক মোচ একটি শিশিতে বরাকত হিসেবে একত্রিত করতেন। যদি কখনো উম্মে সুলাইমের (রাঃ) ঘরে হুজুরের (সাঃ) নামাযের সময় হতো তাহলে তিনি সেখানেই চাটাইয়ের ওপর নামায আদায় করতেন। একবার হুজুর (সাঃ) হযরত উম্মে সুলাইমের (রাঃ) মশকে নিজের পবিত্র মুখ লাগিয়ে পানি পান করেছিলেন। তিনি সেই মশকের মুখ কেটে নিজের কাছে রেখে দিয়েছিলেন। কেননা তাতে রাসুলের (সাঃ) পবিত্র ঠোঁটের স্পর্শ লেগেছিল।

তাবকাতে ইবনে সা'দে আছে, হজ্ব শেষে রাসূলে আকরাম (সাঃ) মিনায় পবিত্র মোচ কাটালেন, এ সময় হযরত উম্মে সুলাইম (রাঃ) স্বামী আবু তালহাকে (রাঃ) নাপিতের নিকট থেকে চুল চেয়ে নেয়ার কথা বললেন। তিনি নাপিতের নিকট থেকে চুল চেয়ে নিলেন। হযরত উম্মে সুলাইম (রাঃ) পবিত্র মোচ এক বোতলে খায়ের ও বরকতের জন্য নিজের নিকট রেখে দিয়েছিলেন।

এই প্রসঙ্গে ইবনে সা'দ (রঃ) আরো একটি ঘটনা বর্ণনা করেছেন। তা থেকে জানা যায়, প্রিয় নবী (সাঃ) হযরত উম্মে সুলাইমের (রাঃ) প্রতি কতখানি স্নেহপরায়ণ ছিলেন। তিনি লিখেছেন যে, হুজুর (সাঃ) হজ্বের জন্য মদীনা মুনাওয়ারাহ থেকে রওয়ানা হতে লাগলেন। এ সময় তিনি উম্মে সুলাইমকে (রাঃ) বললেনঃ "তুমি হজ্বে যাবে না?" তিনি আরজ করলেনঃ "হে আল্লাহর রাসূল। আমার স্বামীর নিকট মাত্র দু'টি সওয়ারী ছিল। তাতে তিনি পুত্রকে নিয়ে হজ্বে চলে গেছেন। বর্তমানে আমার নিকট কোন সওয়ারী নেই।"

হুজুর (সাঃ) তাঁকে আযওয়াজে মুতাহ্হিরাতের (রাঃ) সঙ্গে সওয়ার করিয়ে দিলেন এবং নিজের সাথে হজ্বে নিয়ে চললেন। পথিমধ্যে রাসূলের (সাঃ) গোলাম আনজিশাহ খুব দ্রুতগতিতে উট দৌড়ানো শুরু করলো। এ দেখে হুজুর (সাঃ) বললেনঃ "আনজিশাহ! আস্তে আস্তে চালাও। উটের ওপর আয়না আছে। আয়না।"

হযরত আবু তালহার (রাঃ) ঔরসে হযরত উম্মে সুলাইমের (রাঃ) এক পুত্র ছিল। তাঁর নাম ছিল আবু উমায়ের। সে অত্যন্ত প্রিয় শিশু ছিল। হুজুর (সাঃ) উম্মে

www.bjilibrary.com

সুলাইমের গৃহে তাশরীফ নিলে তার সঙ্গে আদরের সাথে কথা বলতেন। একদিন তিনি তাশরীফ নিলেন। এ সময় শিশু আবু উমায়েরের চেহারা বসে গিয়েছিল। তিনি উম্মে সুলাইমকে (রাঃ) জিজ্ঞাসা করলেন," কি ব্যাপার, আবু উমায়ের যেন আজ কিছুটা অসুস্থ?"

তিনি আরজ করলেনঃ "হে আল্লাহর রাসূল! যে পাখীর সঙ্গে আবু উমায়ের খেলা করতো সেই পাখীটা আজ মরে গেছে। এজন্য সে খুব দুশ্চিন্তাগ্রস্ত।

হুজুর (সাঃ) আবু উমায়েরকে কাছে ডাকলেন এবং মাথার ওপর স্নেহের হাত বুলিয়ে মুচকি হেসে জিজ্ঞাসা করলেনঃ "হে আবু ইমায়ের! তোমার পাখী কি কি করতো?"

আবু উমায়ের (রাঃ) জবাবে হেসে দিলো। অতঃপর সে খেলাধূলায় মত্ত হয়ে গেল। সেই সময় থেকে হুজুরের (সাঃ) এই বাক্য উদাহরণ হয়ে গিয়েছিল।

কিছুদিন পর আবু উমায়ের শৈশবকালেই মারা যায়। আবু তালাহা (রাঃ) সে সময় ঘরের বাইরে ছিলেন। হযরত উম্মে সুলাইম (রাঃ) প্রিয় পুত্রের ইন্তেকালে খুব ধৈর্য ধরলেন। চুপচাপ মাইয়্যেতের গোসল দিয়ে কাফন পরিয়ে একদিকে রেখে দিলেন। বাড়ীর ও অন্যান্য লোককে নিষেধ করলেন যে, আবু তালহা বাড়ী ফিরতেই যেন আবু উমায়েরের মৃত্যুর হৃদয়বিদারক খবর কেউ না দেয়। রাতে আবু তালহা (রাঃ) বাড়ী ফিরলেন। উম্মে সুলাইম (রাঃ) তাকে খাওয়ালেন। তিনি যখন ইতমিনানের সঙ্গে বিছানায় শুলেন তখন তাঁকে সম্বোধন করে বললেনঃ "যদি তোমাকে কোন কিছু ধার দেয়া হয়, অতঃপর তা ফিরিয়ে নেয়া হয় তাহলে তা কি তোমার নিকট অসহ্য মনে হবে?"

হযরত আবু তালহা (রাঃ) জবাব দিলেনঃ "অবশ্যই নয়।" তিনি বললেনঃ "তোমার পুত্রও আল্লাহর আমানত ছিল। আল্লাহ তাকে ফিরিয়ে নিয়েছেন। এখন তোমার ধৈর্য ধরা উচিত।"

আবু তালহা (রাঃ) ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন পড়লেন এবং তাঁকে বললেন, "তুমি আগে কেন বলোনি?"

তিনি বললেন, "যাতে তুমি ইতমিনানের সঙ্গে খাবার খেয়ে নিতে পারো।"

সকালে উঠে আবু তালহা (রাঃ) রাসূলে করিমের (সাঃ) খিদমতে হাজির হলেন এবং সকল ঘটনা বর্ণনা করলেন।

www.bjilibrary.com

হুজুর (সাঃ) উম্মে সুলাইমের ধৈর্য ও সন্তুষ্টির জন্য প্রশংসা করলেন এবং দোয়া করলেন। তিনি বললেন, হে আল্লাহ! আবু তালহা (রাঃ) এবং উম্মে সুলাইমকে (রাঃ) আবু উমায়েরের (রাঃ) বিনিময়ে আরেকটি সন্তান দিন।" এরপর আল্লাহ তায়ালা আবু তালহা (রাঃ) এবং উম্মে সুলাইমকে (রাঃ) আরো একটি পুত্র দিলেন। তার নাম রাখা হয়েছিল আব্দুল্লাহ। হুজুরের (সাঃ) নিকটই তাঁর প্রশিক্ষণ হয়েছিল এবং তাঁর মাধ্যমেই হযরত আবু তালহার (রাঃ) বংশধারা অব্যাহত ছিল।

একবার রহমতে আলম (সাঃ) হযরত উম্মে সুলাইমের গৃহে তাশরীফ নিলেন। তিনি হুজুরের (সাঃ) খিদমতে খেজুর ও মাখন পেশ করলেন। তিনি বললেন, "আমি রোযা রেখেছি।" কিছুক্ষণ পর হুজুর (সাঃ) নফল নামায পড়লেন এবং উম্মে সুলাইমের (রাঃ) পরিবারের জন্য দোয়া করলেন। হযরত উম্মে সুলাইম (রাঃ) আরজ করলেনঃ "হে আল্লাহর রাসূল! আপনার খাদেম এবং আমার পুত্র আনাসের প্রতি আমার ভালোবাসা রয়েছে। তার জন্য বিশেষভাবে দোয়া করুন।"

দয়ার নবী (সাঃ) উদ্বেলিত হয়ে উঠলেন। তিনি দোয়ার জন্য হাত উঠিয়ে হযরত আনাসের (রাঃ) জন্য এই দোয়া করলেন," হে আল্লাহ! তাকে সম্পদ দিন এবং দীর্ঘজীবী করুন।" এই দোয়ার আছরে হযরত আনাস (রাঃ) সকল আনসারের মধ্যে সবচেয়ে বেশী সম্পদশালী, দীর্ঘজীবী এবং অনেক সন্তান-সন্ততির মালিক হলেন।

একবার হযরত আবু তালহা (রাঃ) বাড়ী এসে হযরত উম্মে সুলাইমকে (রাঃ) বললেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) অভুক্ত রয়েছেন। কিছু খাবার পাঠিয়ে দাও। তিনি পুত্র আনাসকে (রাঃ) কিছু রুটি দিয়ে বললেন, এক্ষুণি গিয়ে হুজুরকে (সাঃ) খাবার খাইয়ে দাও। হযরত আনাস (রাঃ) যখন মসজিদে পৌছলেন তখন সেখানে হুজুরের (সাঃ) চার পাশে অনেক সাহাবার ভিড় ছিল। হুজুর (সাঃ) হযরত আনাসকে (রাঃ) জিজ্ঞাসা করলেন, "আবু তালহা তোমাকে পাঠিয়েছে?" আরজ করলেন, "নিঃসন্দেহে আল্লাহর রাসূল।" অতঃপরত জিজ্ঞাসা করলেনঃ "খাওয়ার জন্য?" তিনি বললেন, "জ্বী হাঁ।"

হুজুর (সাঃ) সকল সাহাবাকে (রাঃ) নিয়ে উঠে দাঁড়ালেন এবং হযরত উম্মে সুলাইমের (রাঃ) গৃহে তাশরীফ রাখলেন। হযরত আবু তালহা (রাঃ) চিন্তায় পড়ে গেলেন যে, এত মানুষের জন্য খাবার যথেষ্ট হবে না। হযরত উম্মে সুলাইমকে (রাঃ) জিজ্ঞেস করলেনঃ "সকলেই যাতে খাবার খেতে পারে সে ব্যাপারে কি করা যায়?" তিনি অত্যন্ত ইতমিনানের সঙ্গে জবাব দিলেনঃ " এ ব্যাপারে আল্লাহ এবং আল্লাহর

www.bjilibrary.com

রাসূল ভালো জানেন।" অতঃপর অল্প কিছু যে খাবার ছিল তা রাসূলে আকরাম (সাঃ) এবং সাহাবায়ে কিরামের (রাঃ) সামনে রেখে দিলেন। আল্লাহ তায়ালা তাতে এত বরকত দিলেন যে, সবাই পেট পুরে খাবার খেলেন।

সহিহ বুখারীতে আছে, পঞ্চম হিজরীতে রাসূলে করিম (সাঃ) হযরত যয়নব (রাঃ) বিনতে জাহাশকে নিকাহ করলেন। এ সময় হযরত উম্মে সুলাইম (রাঃ) মালিদাহ বানিয়ে এক বড় পাত্র ভরে হযরত আনাসের (রাঃ) মাধ্যমে পাঠালেন এবং এই হাদিয়া কবুল করার জন্য বললেন।

একবার এক ব্যক্তি অস্থির হয়ে প্রিয় নবীর (সাঃ) খিদমতে হাজির হয়ে খাবার চাইলো। হুজুর (সাঃ) আযওয়াজে মুতাহহিরাতকে (রাঃ) জিজ্ঞাসা করলেন, ঘরে কি খাবার কিছু আছে? সবদিক থেকে জবাব এলো, আজ সবাই অভুক্ত। তারপর হুজুর (সাঃ) সাহাবীদের দিকে তাকালেন এবং বললেন, "এমন কেউ কি আছে যে আল্লাহর এই বান্দাহকে মেহমান বানাবে?" হুজুরের (সাঃ) ইরশাদ শুনে হযরত আবু তালহা (রাঃ) উঠে দাঁড়ালেন এবং আরজ করলেন, "হে আল্লাহর রাসূল! তাকে আমি আমার মেহমান বানাবো।" এ কথা বলে তৎক্ষণাৎ তিনি বাড়ী এলেন এবং হযরত উম্মে সুলাইমকে (রাঃ) জিজ্ঞেস করলেন, "খাবার কিছু আছে কি?" তিনি বললেনঃ "বাচ্চাদের জন্য সামান্য খাবার তৈরী হয়েছে। এ ছাড়া খোদার কসম ঘরে কোন খাবার নেই।" হযরত আবু তালহা (রাঃ) বললেনঃ "কোন অসুবিধা নেই। বাচ্চাদেরকে ভুলিয়ে-ভালিয়ে শুইয়ে দাও। তারা ঘুমিয়ে পড়লে আমরা তাদের খাবার মেহমানের সামনে রেখে দেব। তুমি বাতি ঠিক করার বাহানা করে তা নিভিয়ে দেবে। অন্ধকারে মেহমান খাবার খেয়ে নেবে এবং আমরাও এমনি এমনি মুখ চালাতে থাকবো।" মোট কথা এইভাবে মেহমানকে খাবার খাইয়ে স্বামী-স্ত্রী উভয়ে এবং বাচ্চারা রাতে অভুক্ত রইলেন। সকালে হযরত আবু তালহা (রাঃ) হুজুরের (সাঃ) খিদমতে হাজির হলে হুজুরের (সাঃ) মুখে এই আয়াত ~~উচ্চারিত হচ্ছিল~~ ঃ

وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ -

"তারা নিজের ওপর অন্যদেরকে অগ্রাধিকার দেয় যদিও তারা গরীব।"

অতঃপর তিনি আবু তালহাকে (রাঃ) সম্বোধন করে বললেনঃ "রাতে মেহমানের সঙ্গে তোমাদের আচরণ আল্লাহ তায়ালা খুব পছন্দ করেছেন।"

www.bjilibrary.com

একবার রাসূলে আকরাম (সাঃ) হযরত আনাসকে (রাঃ) কোন বিশেষ কাজের জন্য কোথাও প্রেরণ করেছিলেন এবং নিজে একটি প্রাচীরের আড়ালে তার জন্য অপেক্ষা করছিলেন। হযরত আনাস (রাঃ) ফিরে এলেন। এ সময় হুজুর (সাঃ) স্বগৃহের দিকে চলে গেলেন। এবং হযরত আনাসকে (রাঃ) বাড়ী পাঠিয়ে দিলেন। কাজে ব্যস্ততার জন্য তাঁর অনেক দেরী হয়ে গিয়েছিল। উম্মে সুলাইম (রাঃ) জিজ্ঞেস করলেনঃ "আজ এত দেরী করলে কেন?" তিনি বললেন, "হুজুরের (সাঃ) এক কাজের জন্য গিয়েছিলাম।" তিনি জিজ্ঞেস করলেন, "কি কাজ ছিল?" তিনি জবাব দিলেন, "একটি গোপান কথা ছিল।" হযরত উম্মে সুলাইম (রাঃ) তাঁকে তাকিদ দিয়ে বললেন যে, এই গোপন কথা কাউকে বলো না। সুতরাং তিনি তা কারোর নিকট প্রকাশ করেননি।

হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, আমার মার (উম্মে সুলাইম) নিকট একটি বকরী ছিল। তিনি তার ঘি একটি কুপিতে জমা করেছিলেন। যখন এই কুপি ভরে গেল তখন তিনি তা নিজের পালিত কন্যার হাতে হুজুরের (সাঃ) খিদমতে এই বলে প্রেরণ করলেন যে, তিনি যেন তা দিয়ে সালুন তৈরী করেন। সেই বালিকাটি হুজুরের (সাঃ) খিদমতে হাজির হলে তিনি পরিবারের লোকদেরকে কুপি খালি করে তাকে তা ফিরিয়ে দিতে বললেন। বস্তুত সেই কুপি খালি করা হলো এবং তা তাকে ফেরত দেয়া হলো। সে যখন ফিরে এলো, তখন উম্মে সুলাইম (রাঃ) বাড়ী ছিলেন না। বালিকাটি কুপিটি খুঁটিতে ঝুলিয়ে রাখলো। উম্মে সুলাইম (রাঃ) বাড়ী ফিরে কুপি ভরা দেখলেন। তা থেকে ঘি পড়ে যাচ্ছিল। তিনি মেয়েটিকে বললেন, "বেটি। আমি তো তোমাকে তা হুজুরের (সাঃ) নিকট নিয়ে যেতে বলেছিলাম।" সে বললো, "আমি নিয়ে গিয়েছিলাম। আপনি যদি বিশ্বাস না করেন তাহলে স্বয়ং গিয়ে হুজুরের (সাঃ) নিকট জিজ্ঞাসা করে দেখুন।" হযরত উম্মে সুলাইম (রাঃ) মেয়েটিকে সঙ্গে নিয়ে হুজুরের (সাঃ) খিদমতে হাজির হলেন এবং আরজ করলেন, "হে আল্লাহর রাসূল। আমি তার হাতে আপনার নিকট একটি কুপি পাঠিয়েছিলাম। তাতে ঘি ছিল।"

হুজুর (সাঃ) বললেন, "সে এসেছিল এবং দিয়ে গিয়েছিল।" হযরত উম্মে সুলাইম (রাঃ) আরজ করলেন, "সেই সত্তার কসম। যিনি আপনাকে হকের সঙ্গে সৃষ্টি করেছেন। সেই কুপি ভরা এবং তা থেকে ফোটায় ফোটায় ঘি পড়ে যাচ্ছে।"

হুজুর (সাঃ) বললেনঃ "হে উম্মে সুলাইম। তুমি এতে আশ্চর্য কেন হয়েছ যে, আল্লাহ তোমাকে রিযক দিয়েছেন। যেমন তুমি তা নবীকে খেতে দিয়েছ, তা খাও এবং অন্যকেও খাওয়াও।"

www.bjilibrary.com

হযরত উম্মে সুলাইম (রাঃ) বলেন, আমি বাড়ী ফিরে এলাম এবং সেই ঘি আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে বন্টন করলাম। তার পরও এতো বাঁচলো যে, আমরা এক দুই মাস পর্যন্ত তা থেকে সালুনের কাজ নিলাম।

হযরত উম্মে সুলাইমের (রাঃ) ওফাতের সাল সম্পর্কে নেতৃস্থানীয় চরিতকাররা কিছু বলেননি। ধারণা করা হয় যে, তিনি সিদ্দিকে আকবারের (রাঃ) খিলাফতকালে ওফাত পান। তিনি দুই পুত্র রেখে যান। হযরত আনাস (রাঃ) ছিলেন প্রথম স্বামী মালেকের ঔরসে এবং হযরত আব্দুল্লাহ (রাঃ) ছিলেন হযরত আবু তালহার ঔরসে।

হযরত উম্মে সুলাইম (রাঃ) থেকে হযরত আনাস (রাঃ), আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস (রাঃ), যায়েদ (রাঃ) বিন ছাবিত এবং আমর (রাঃ) বিন আসিম কতিপয় হাদীসও বর্ণনা করেছেন। লোকজন প্রায়ই তাঁর নিকট মাসয়ালা জিজ্ঞাসা করতেন এবং নিজেদের সন্দেহ দূর করতেন। আল্লামা ইবনে আছির (রঃ) তাঁর সম্পর্কে লিখেছেনঃ "তিনি অন্যতম জ্ঞানী মহিলা ছিলেন।"

হযরত আনাস বলতেন, "আল্লাহ আমার মাকে জাযায়ে খায়ের দিন। তিনি অত্যন্ত সুন্দরভাবে আমার প্রতিপালন ও প্রশিক্ষণ দিয়েছিলেন।"

সহিহ মুসলিমে আছে, নবী করিম (সাঃ) একবার (উদাহরণ-স্বরূপ) বলেছিলেনঃ "আমি জান্নাতে গেলাম। সেখানে কিছু শব্দ শুনলাম। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, কে? লোকজন বললো, আনাসের মা গামিসাহ বিনতে মিলহান।"

রহমতে আলম (সাঃ) নিজেই যেন হযরত উম্মে সুলাইমকে (রাঃ) স্বয়ং জান্নাতেরসুসংবাদদিয়েছেন।

www.bjilibrary.com

হযরত জামিলাহ (রাঃ) বিনতে সা'দ আনসারিয়াহ

তিনি খাজরাজ গোত্রের হারেছ বংশোদ্ভূত ছিলেন। উম্মে সা'দ কুনিয়তেই তিনি মশহুর ছিলেন। কতিপয় রাওয়ায়েতে জানা যায়, উম্মে সা'দ ছাড়া উম্মুল উলাও তাঁর কুনিয়ত ছিল। নসবনামা হলোঃ

জামিলাহ (রাঃ) বিনতে সা'দ (রাঃ) বিন রাবি' বিন আমর বিন আবি যোহায়ের বিন মালিক বিন ইমরাউল কায়েস বিন মালিক আয়াজ বিন ছালাবাহ বিন কা'ব বিন খাজরাজ বিন হারিছ বিন খাজরাজ আকবার।

তাঁর পিতা হযরত সা'দ (রাঃ) বিন রাবি' আনসারী অন্যতম মর্যাদাসম্পন্ন সাহাবী হিসেবে পরিগণিত। তিনি নবীর (সাঃ) হিজরতের পূর্বে বাইয়াতে উকবায়ে উলা এবং বাইয়াতে উকবায়ে ছানিয়াতে অত্যন্ত উৎসাহ-উদ্দীপনার সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন। দ্বিতীয় হিজরীতে বদরের যুদ্ধে বীরত্ব প্রদর্শন করেন। অতঃপর ওহোদের যুদ্ধে অমিতবিক্রমে লড়াই করে শাহাদাত লাভ করেন। শেষ নিঃশ্বাসের পূর্বে তিনিই আনসারদেরকে এই পয়গাম দিয়েছিলেনঃ "আজ যদি রাসূলুল্লাহ (সাঃ) শহীদ হয়ে যান এবং তোমাদের মধ্যে একজনও জীবিত থাকে তাহলে আল্লাহর নিকট কখনই মুখ দেখাতে পার বেনা এবং তাঁর সামনে কোন ওযর কবুল হবে না। আমরা লাইলাতুল উকবাতে আল্লাহর রাসূলের ওপর ফিদা হওয়ার জন্য প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম।"

বুজর্গ ও সম্মানিত পিতার শাহাদাতের সময় হযরত জামিলাহ (রাঃ) খুবই অল্প বয়স্কা ছিলেন। তাঁর প্রতিপালন এবং প্রশিক্ষণের দায়িত্ব হযরত আবুবকর সিদ্দিক (রাঃ) নিজে গ্রহণ করেন। হযরত আবুবকরের (রাঃ) স্ত্রী হাবিবাহ (রাঃ) বিনতে খারেজাহ (রাঃ) হযরত সা'দ (রাঃ) বিন রাবি'র চাচাতো বোন ছিলেন। (এইদিক থেকে তিনি হযরত জামিলার (রাঃ) ফুফা হতেন) সিদ্দিকে আকবার (রাঃ) হযরত জামিলাকে (রাঃ) পিতার মত ভালোবাসতেন। একদিন শুয়ে হযরত জামিলাকে (রাঃ) বুকের ওপর বসিয়ে অত্যন্ত ভালোবাসার সঙ্গে তাকে চুমু

www.bjilibrary.com

দিচ্ছিলেন। ইত্যবসরে একজন সাহাবী দেখা করার জন্যে এলেন। তিনি এই দৃশ্য অবলোকন করে আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "হে আবুবকর! এই মেয়েটি কে?"

সিদ্দিকে আকবার (রাঃ) বললেন, "এ সেই ব্যক্তির কন্যা যাকে আল্লাহ তায়ালা অত্যন্ত উঁচু মর্যাদা দিয়েছিলেন। তিনি রাসূলের (সাঃ) জন্য নিজের জীবন কুরবান করে দিয়েছেন এবং কিয়ামতের দিন তিনি হুজুরের (সাঃ) নকীবদের মধ্যে পরিগণিতহবেন।"

হযরত উম্মে সা'দ জামিলাহ (রাঃ) অনেক জালিলুল কদর সাহাবী (রাঃ) ছাড়াও উম্মুল মুমিনিন হযরত আয়েশা সিদ্দিকাহ (রাঃ) থেকেও ফয়েজ হাসিল করেন এবং জ্ঞান ও ফজিলতের দিক দিয়ে অত্যন্ত উঁচু স্তরে পৌছে গিয়েছিলেন। হযরত আবুবকর সিদ্দিক (রাঃ) তাঁকে খুব সম্মান করতেন। একবার তাঁর শাসনামলে হযরত উম্মে সা'দ (রাঃ) তাঁর খিদমতে হাজির হলেন। এ সময় তিনি নিজের চাদর তাঁর জন্য বিছিয়ে দিলেন। তখন হযরত ওমর ফারুকও (রাঃ) সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "হে খলিফাতুর রাসূল! মহিলাটি কে?"

তিনি বললেন, ''সে এমন ব্যক্তির কন্যা যে আমাদের উভয়ের থেকে উত্তম ছিল।''

হযরত ওমর ফারুক (রাঃ) হয়রান হয়ে জিজ্ঞেস করলেনঃ ''তা কি করে?'' সিদ্দিকে আকবার (রাঃ) বললেনঃ ''তা এজন্য যে, তাঁর পিতা সা'দ (রাঃ) বিন রাবি' রাসূলের (সাঃ) সামনে জান্নাতুল ফিরদাউসের পথে যাত্রা করেন এবং আমি ও তুমি এখনো এই দুনিয়ায় বসে আছি।''

ঐতিহাসিকরা হযরত উম্মে সা'দের (রাঃ) ইলম ও ফজলের খুব প্রশংসা করেছেন এবং লিখেছেন যে, তিনি শুধু হাদীস বর্ণনাকারিনীই ছিলেন না বরং কুরআনের তাফসিরের গূঢ় রহস্য সম্পর্কেও পুরোপুরি ওয়াকিবহাল ছিলেন।

হযরত উম্মে সা'দের (রাঃ) বিয়ে হয়েছিল জালিলুল কদর সাহাবী হযরত যায়েদ (রাঃ) বিন ছাবিত আনসারীর সঙ্গে। হযরত খারেজাহ (রঃ) বিন যায়েদ বিন ছাবিত সাত ফকিহর অন্যতম ছিলেন। তিনি হযরত উম্মে সা'দের (রাঃ) গর্ভেই জন্মগ্রহণকরেছিলেন।

তিরমিজী শরীফে আছে, হুজুরের (সাঃ) এক সাহাবী হযরত দাউস (রাঃ) বিন হাসিন হযরত উম্মে সা'দের নিকট থেকে কুরআন শিক্ষা নিতেন। ইবনে আছির (রঃ) বর্ণনা করছেন যে, হযরত উম্মে সা'দ (রাঃ) কুরআনে করিমের কিছু অংশের

www.bjilibrary.com

হাফেজ ছিলেন এবং যথারীতি কুরআনের দারস দিতেন। হযরত উম্মে সা'দের ওফাত সাল জানা যায়নি।

হযরত খানসা (রাঃ) বিনতে হাযাম আনসারিয়াহ

আনসারের কোন বংশের ছিলেন। তিনি সাহাবী হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেন। সহিহ বুখারীতে তাঁর থেকে বর্ণিত আছে যে, আমার পুত্র আমার নিকাহ কোন এক ব্যক্তির সঙ্গে দিয়েছিলেন। তার আগে একবার আমার বিয়ে হয়েছিল। আমি সেই বিয়েতে খুশী ছিলাম না। হুজুরের (সাঃ) খিদমতে হাজির হলাম এবং নিজের অবস্থা বর্ণনা করলাম। হুজুর (সাঃ) সেই বিয়েকে অবৈধ এবং বাতিল ঘোষণা করলেন। তাঁর সম্পর্কে এরচেয়ে বেশী আর কিছু জানা যায়নি।

হযরত উম্মুল আলা' আনসারিয়াহ (রাঃ)

চরিতকাররা তাঁর নাম ও নসব সম্পর্কে ব্যাখ্যা করেননি। অবশ্য সহিহ বুখারীর এক মশহুর রাওয়ায়েতে প্রমাণিত হয় যে, তিনি আনসারের সাবিকিনা আউয়ালুনের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। এই রাওয়ায়েত ইমাম বুখারী (রঃ) মশহুর ফকিহ হযরত খারেজাহ (রঃ) বিন যায়েদ (রাঃ) বিন ছাবিত থেকে নকল করেছেন। তিনি বলেন, উম্মে আলা' (রাঃ) একজন আনসারী মহিলা ছিলেন। তিনি রাসুলের (সাঃ) নিকট বাইয়াত করেন। তিনি বলেন, হিজরতের পর লটারির মাধ্যমে আনসার-মুহাজির বন্টন হয়। এই বন্টনে আমাদের অংশে আসে হযরত ওসমান (রাঃ) বিন মাজউন। বস্তুত আমরা তাঁকে মেহমান হিসেবে নিজেদের ঘরে রাখলাম। ঘটনাক্রমে (বদরের যুদ্ধের পর) তিনি কঠিন রোগে আক্রান্ত হলেন এবং এই রোগেই মারা গেলেন। যখন তাঁকে কাফন পড়ানো হলো তখন রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তাশরীফ আনলেন। আমি (উম্মুল আলা') বললাম, আবুস সায়িব। (হযরত ওসমান বিন

www.bjilibrary.com

মাজউনের কুনিয়ত) তোমার ওপর আল্লাহর রহমত নাযিল হোক। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ তায়ালা তোমাকে সম্মানিত করেছেন। আমি আরজ করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমার মাতা-পিতা আপনার ওপর কুরবান হোক। আল্লাহ যদি তাঁকে সম্মানিত না করেন তাহলে আর কাকে করবেন? রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন, "ওসমান (রাঃ) ইয়াকিনের দরজা লাভ করেছিলেন এবং আমারও তাঁর পক্ষে মাগফিরাতের বড় আশা। কিন্তু খোদার কসম! আমি রাসূল হয়েও স্বয়ং নিজের ব্যাপারে একথা বলতে পারবো না যে আমার সঙ্গে কি ধরনের ব্যবহার করা হবে। এ কথা শুনে উম্মে আলা' (রাঃ) বললেন, খোদার কসম! আজকের পর আমি কারোর ব্যাপারে এ ধরনের সাক্ষ্য আর দেব না।

হযরত আবুল হাছিম মলিকের (রাঃ) স্ত্রী

আনসারের কোন গোত্রভুক্ত ছিলেন। তাঁর স্বামী হযরত আবুল হাছিম মালিক (রাঃ) আনসারী অন্যতম জালিলুল কদর সাহাবী ছিলেন।

জামে' তিরমিজীতে বর্ণিত আছে, একদিন প্রিয় নবী (সাঃ) হযরত আবুবকর সিদ্দিক (রাঃ) এবং হযরত ওমর ফারুকের (রাঃ) সঙ্গে হযরত আবুল হাছিমের (রাঃ) বাড়ী তাশরীফ নিলেন। সে সময় তাঁর নিকট খেজুরের বাগান এবং বকরীর পাল ছিল। কিন্তু কোন গোলাম অথবা খাদেম ছিল না এবং গৃহের সকল কাজ স্বয়ং আঞ্জাম দিতেন। হুজুর (সাঃ) তাঁর বাড়ী পৌছে তাঁকে ডাকলেন। এ সময় তাঁর স্ত্রী বললেন, আবুল হাছিম পানি ভরতে গেছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই তিনি মশকসহ এসে পৌছলেন। হুজুরকে (সাঃ) দেখে খুশীতে বাগবাগ হয়ে গেলেন। তাঁকে জড়িয়ে ধরে বার বার বলতে লাগলেন, আমার মাতা-পিতা আপনার ওপর কুরবান হোক। আপনি এই মিসকিনের ঘরে পা রেখেছেন! অতঃপর হুজুর (সাঃ) এবং তাঁর সঙ্গীদেরকে নিজের বাগানে নিয়ে গেলেন। বসার জন্য কিছু বিছিয়ে দিয়ে নিজে খেজুরের একটি কাঁদি কেটে নিয়ে এলেন। হুজুর (সাঃ) বললেন, পাকা খেজুরই কেটে আনতে। তিনি আরজ করলেন, আমার মাতা-পিতা আপনার ওপর কুরবান হোক। এতে পাকা এবং কাঁচা সবরকমই আছে। যা পছন্দ হয় তাই গ্রহণ করুন। খেজুর খাওয়ানোর পর অত্যন্ত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন পানি পান করালেন। হুজুর (সাঃ) বললেন, দেখ, আল্লাহ

www.bjilibrary.com

পাক কত নিয়ামত দান করেছেন। ছায়া, ভালো খেজুর, ঠান্ডা পানি। খোদার কসম! কিয়ামতের দিন এসবের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হবে। এরপর হযরত আবুল হাছিম (রাঃ) জিজ্ঞাসা করলেনঃ হে আল্লাহর রাসূল। আপনি কিছুক্ষণ এখানে অবস্থান করুন। আমি বাড়ী গিয়ে খাবার ব্যবস্থা করি। হুজুর (সাঃ) বললেন, দুগ্ধবতী বকরী জবেহ করো না। তিনি বকরীর একটি বাচ্চা জবেহ করালেন এবং তা ভুনে হুজুরের (সাঃ) খিদমতে আনলেন। তিনি খাবার পর জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার কোন গোলাম আছে? তিনি বললেন, না। হুজুর (সাঃ) বললেন, আমার নিকট যখন কয়েদী আসবে তখন তুমি এসো। ইত্যবসরে দু'জন কয়েদী রাসূলের (সাঃ) সামনে পেশ করা হলো। হুজুর (সাঃ) আবুল হাছিমকে (রাঃ) বললেন, এর মধ্যে একটি পছন্দ করে নাও। তিনি আরজ করলেন, হে আল্লাহর রাসূল। আপনি যাকে দেবেন তাকেই আমি গ্রহণ করবো। হুজুর (সাঃ) একজন কয়েদীকে হযরত আবুল হাছিমকে (রাঃ) দান করলেন এবং তার সঙ্গে ভালো আচরণ করার নির্দেশ দিলেন। তিনি গোলামকে সঙ্গে নিয়ে বাড়ী এলেন এবং স্ত্রীকে সকল ঘটনা বললেন। তিনি বললেন, যদি হুজুরের (সাঃ) নির্দেশ মানতে চাও তাহলে তাকে আযাদ করে দাও। তিনি তৎক্ষণাৎ তাকে আযাত করে দিলেন। হুজুর (সাঃ) এই খবর পেয়ে খুব খুশী হলেন এবং স্বামী-স্ত্রীর উভয়েরই প্রশংসা করলেন। তাঁর সম্পর্কে এর বেশী কিছু জানা যায়নি।

হযরত উম্মে মালিক (রাঃ) বিনতে উবাই

খাজরাজের হবলা বংশের সঙ্গে তিনি সম্পর্কযুক্ত ছিলেন। নসবনামা হলোঃ উম্মে মালিক বিনতে উবাই বিন হারিছ (আবি সুলুল) বিন উবায়েদ বিন মালিক বিন সালিম বিন গানাম বিন আওফ বিন খাজরাজ।

মুনাফিক সরদার আব্দুল্লাহ বিন উবাইয়ের সহোদরা ছিলেন। হযরত রাফে' বিন মালিক যারকীর সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়েছিল। তিনি খাজরাজ গোত্রের প্রথম মুসলমান ছিলেন। তাঁর ঔরসে হযরত রিফায়াহ (রাঃ) জন্মগ্রহণ করেন। তিনিও আনসারের সাবিকুনা আউয়ালুনের অন্যতম ছিলেন। উম্মে মালিকের স্বামী এবং পুত্র দু'জনই বাইয়াতে উকবাতে অংশগ্রহণের সুযোগ লাভ করেন। হযরত উম্মে মালিকও (রাঃ) নবীর (সাঃ) হিজরতের পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি অত্যন্ত দৃঢ়চেতা এবং

www.bjilibrary.com

সুন্দর স্বভাবের মুসলমান ছিলেন। বৈপিত্রেয় ভাই আব্দুল্লাহ বিন উবাই মুনাফিকদের নেতা ছিল। কিন্তু তিনি হক ও সত্যের ঝাণ্ডাবাহী ছিলেন।

বিনতে বাশির (রাঃ) বিন সা'দ

নাম ও কুনিয়ত জানা যায়নি। মশহুর সাহাবী হযরত বাশির (রাঃ) বিন সা'দ আনসারীর কন্যা এবং হযরত নুমান (রাঃ) বিন বাশিরের (রাঃ) সহোদরা ছিলেন। মার নাম ছিল উমরাতা (রাঃ) বিনতে রাওয়াহা। তিনি জালিলুল কদর সাহাবী মাওতা যুদ্ধের শহীদ হযরত আব্দুল্লাহ (রাঃ) বিন রাওয়াহার (রাসূলের (সাঃ) কবি) বোন ছিলেন।

খন্দকের যুদ্ধের সময়কার ঘটনা। একদিন হযরত উমরাতা (রাঃ) কন্যাকে কিছু খেজুর দিয়ে বললেন, পিতা ও মামু আব্দুল্লাহ বিন রাওয়াহার সকালের খাবারের জন্য নিয়ে যাও। তিনি এই খেজুর একটি কাপড়ের পুটলিতে করে নিয়ে যাচ্ছিলেন। এমন সময় রাস্তায় রাসূলে আকরামের (সাঃ) সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়ে গেল। হুজুর (সাঃ) তাঁকে বললেনঃ "বেটি! তোমার নিকট কি?"

তিনি বললেন, "হে আল্লাহর রাসূল। এ খেজুর। আমার মা পিতা ও মামুর সকালের নাস্তার জন্য পাঠিয়েছেন।" হুজুর (সাঃ) বললেন, এই খেজুর আমাকে দাও।" তিনি তা হুজুরের (সাঃ) হাতে দিলেন। খেজুরে হুজুরের (সাঃ) হাত ভরলো না। এ সত্ত্বেও তিনি একটি কাপড় বিছিয়ে তার ওপর খেজুর ছড়িয়ে দিতে বললেন। এরপর তিনি সাধারণভাবে ঘোষণা করিয়ে দিলেন যে, সকল খন্দক যোদ্ধা সকালের নাস্তার জন্য আসবেন। যখন সকল খন্দক যোদ্ধা এসে উপস্থিত হলেন তখন হুজুর (সাঃ) বললেন, "এই খেজুর খাও।" আল্লাহর কি কুদরত! তাতে এতো বরকত হলো যে, সবাই পেট পুরে খেলেন। কিন্তু খেজুর বেঁচেই গেল।

www.bjilibrary.com

হযরত খাইরাহ (রাঃ) বিনতে আবি হাদারদ আস

তিনি উম্মুদ দারদা কুনিয়তেই প্রসিদ্ধি লাভ করেন। জালিলুল কদর সাহাবী হযরত আবু হাদারদ আসলামীর কন্যা এবং হযরত আবু দারদা (রাঃ) আনসারীর স্ত্রী ছিলেন। দ্বিতীয় হিজরীতে স্বামীর সঙ্গে ইসলাম গ্রহণ করেন এবং হুজুরের (সাঃ) হাতে বাইয়াত হন। ঐতিহাসিকরা তাঁর জ্ঞান ও অন্তর্দৃষ্টি, ইবাদাত প্রিয়তা, সুন্দর চরিত্র, ইলম ও ফজল, দ্বীনের সমঝ এবং সঠিক রায়ের খুব প্রশংসা করেছেন। আদাবুল মুফরিদে আছে, এক ব্যক্তির স্ত্রী অসুস্থ ছিলো। সে হযরত উম্মুদ দারদার (রাঃ) নিকট এলো। তিনি তার পরিবারের অবস্থা জিজ্ঞেস করলে স্ত্রী অসুস্থ বলে সে জানালো। হযরত উম্মু দারদা তাকে বসিয়ে খাবার খাওয়ালেন। যতদিন পর্যন্ত তার স্ত্রী অসুস্থ ছিলো ততদিন তার অবস্থা জিজ্ঞেস করতেন এবং খাবার খাওয়াতেন।

একবার হযরত উম্মুদ দারদা (রাঃ) রাসুলের (সাঃ) একজন সাহাবীর অসুস্থতার খবর পেলেন। তিনি কালবিলম্ব না করে উটের ওপর সওয়ার হয়ে সেখানে পৌছলেন এবং তার সেবা-শুশ্রুষা করলেন।

একবার আব্দুল মালিক বিন মারওয়ান উমুবী রাত্রিকালে খাদিমকে ডাকলেন। সে আসতে দেরী করলো। এতে আব্দুল মালিক তাকে অভিসম্পাত দিলেন। হযরত উম্মুদ দারদা (রাঃ) তাঁর মহলে ছিলেন। সকালে আব্দুল মালিককে বললেন, তুমি রাতে তোমার খাদিমকে অভিসম্পাত দিয়েছ। অথচ রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, কিয়ামতের দিন অভিসম্পাত বর্ষণকারী সুপারিশকারী হতে পারবে না।

হযরত উম্মুদ দারদা (রাঃ) রাসূলে আকরাম (সাঃ) ও স্বামী হযরত আবু দারদার (রাঃ) নিকট থেকে কতিপয় হাদিস বর্ণনা করেছেন। হযরত ওসমান জুন্নুরাইনের (রাঃ) খিলাফতকালে তিনি হযরত আবু দারদার (রাঃ) সামনেই ইন্তেকাল করেন। এটা ছিল ৩০ হিজরীর ঘটনা। হযরত আবু দারদার (রাঃ) দ্বিতীয় স্ত্রীর কুনিয়তও উম্মুদ দারদা ছিল। তবে তিনি সাহাবিয়াহ ছিলেন না।

হযরত হাবিবাহ (রাঃ) বিনতে খারিজাহ (রাঃ) আনসারিয়াহ

খারাজ গোত্রের আগার বংশোদ্ভূত ছিলেন। নসবনামা হলোঃ হাবিবাহ (রাঃ) বিনতে খারিজাহ (রাঃ) বিন যায়েদ বিন আবি যুহায়ের বিন মালিক বিন ইমরুল কায়েস বিন মালিক আগার বিন ছা'লাবাহ বিন কা'ব বিন খাজরাজ বিন হারিছ বিন খাজরাজআকবার।

তাঁর পিতা হযরত খারেজাহ (রাঃ) বিন যায়েদ মহান সাহাবীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তিনি বাইয়াতে উকবায়ে কবিরাতে ও বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। ওহোদের যুদ্ধে বীরত্বের সঙ্গে লড়াই করতে করতে শহীদ হয়ে যান। নবীর (সাঃ) হিজরতের পর হযরত হাবিবাহ'র (রাঃ) নিকাহ হয়েছিল। তাঁর ঔরসেই কন্যা উম্মে কুলছুম জন্মগ্রহণ করেন। হযরত হাবিবাহ (রাঃ) মদীনা মুনাওয়ারার থেকে কিছুদূর 'সাখ' নামক স্থানে অবস্থান করতেন। হযরত আবুবকর সিদ্দিক (রাঃ) তাঁর সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্য সেখানে যেতেন। যেদিন রাসূলে করিম (সাঃ) ওফাত পান সেদিন হযরত আবুবকর সিদ্দিক (রাঃ) হুজুরের (সাঃ) নিকট থেকে অনুমতি নিয়ে হযরত হাবিবাহর (রাঃ) নিকট 'সাখ' গিয়েছিলেন। সেখানেই তিনি হুজুরের (সাঃ) ওফাতের হৃদয়বিদারক খবর পান এবং তৎক্ষণাৎ ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে মদীনা ফিরে আসেন।

হযরত হাবিবাহর (রাঃ) ব্যাপারে আর বেশী কিছু জানা যায়নি।

www.bjilibrary.com

হযরত উম্মে বুরদাহ খাওলাহ আনসারিয়াহ

কতিপয় রাওয়ায়েতে তাঁর পিতার নাম মানযার (রাঃ) বিন যায়েদ আনসারী এবং কতিপয় রাওয়ায়েতে যায়েদ আনসারী (রাঃ) হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। হযরত বারা' (রাঃ) বিন আওস আনসারীর সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়েছিল। এক বর্ণনায় আছে, তিনি হুজুরের (সাঃ) পুত্র ইবরাহিমকে (রাঃ) দুধ পান করিয়েছিলেন। এর বিনিময়ে হুজুর (সাঃ) তাঁকে একটি খেজুরের বাগানের একটি অংশ দান করেছিলেন। কিন্তু সহিহ বুখারীতে আছে, হযরত আনাসের (রাঃ) বর্ণনা অনুযায়ী হযরত ইবরাহিমের (রাঃ) দুধ পান করানোর সৌভাগ্য হযতর উম্মে সাইফের হয়নি। কাজী আয়াজ (রঃ) লিখেছেন যে, উম্মে সাইফ (রাঃ) এবং উম্মে বুরদাহ একই ব্যক্তি ছিলেন। কিন্তু আল্লামা শিবলী নুমানী (রঃ) সিরাতুন্নবীতে (সাঃ) লিখেছেন, কাজী আয়াজের ব্যাখ্যা শক্তিশালী নয়। কেননা উম্মে বুরদার স্বামী বারা' (রাঃ) বিন আওসের কুনিয়ত আবু সাইফ ছিল না।

তাঁর সম্পর্কে বিস্তারিত জানা যায়নি।

হযরত খাওলাহ (রাঃ) বিনতে কায়েস

তিনি মদীনার অধিবাসিনী এবং খাজরাজের বনু নাজ্জার বংশোদ্ভূত ছিলেন। জাহেলী যুগে তাঁর বিয়ে হয়েছিল রাসূলের (সাঃ) চাচা হামযাহ (রাঃ) বিন আব্দুল মুত্তালিবের সঙ্গে। এই দিক থেকে তিনি রাসূলের (সাঃ) চাচী ছিলেন। নবুয়ত প্রাপ্তির ৬ বছর পর হযরত হামযাহ (রাঃ) ইসলাম গ্রহণ করেন। ধারণা করা হয় যে, তিনিও তাঁর সঙ্গেই ঈমান এনেছিলেন এবং কয়েক বছর পর তাঁর সঙ্গেই হিজরত করে মদীনা চলে আসেন।

ওহোদের যুদ্ধে হযরত হামযার (রাঃ) শাহাদাতের পর তিনি হযরত নোমান (রাঃ) বিন আজলান আনসারীর সঙ্গে নিকাহর বন্ধনে আবদ্ধ হন এবং দীর্ঘদিন জীবিত

www.bjilibrary.com

ছিলেন। তিনি হুজুরকে (সাঃ) গভীরভাবে ভালোবাসতেন এবং শ্রদ্ধা করতেন। তিনিও তাঁর প্রতি আস্থাশীল ছিলেন। ইবনে মাজাহ (রঃ) হযরত আবু সাঈদ (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন, রাসূলে আকরাম (সাঃ) একবার এক আরব বেদূঈনের নিকট থেকে ঋণ নিয়েছিলেন। একদিন সে হুজুরের (সাঃ) কাছে এলো এবং অত্যন্ত কঠোরতার সঙ্গে ঋণ ফেরতদানের দাবী জানালো।

সাহাবায়ে কিরাম (রাঃ) তাকে খুব ডাটলেন। তাঁরা বললেন, তুমি জানো না যে, কার সঙ্গে কথা বলছো? মরু বেদূঈন জানালো, আমি তো আমার হক দাবী করছি। এতে হুজুর (সাঃ) সাহাবীদেরকে বললেন, এই ব্যক্তি নিজের দাবীতে সঠিক আছে। এজন্য তোমাদের উচিত ছিল তাকে সমর্থন করা। অতঃপর তিনি হযরত খাওলা (রাঃ) বিনতে কায়েসের নিকট পয়গাম প্রেরণ করে বললেন যে, যদি তোমার নিকট খেজুর থাকে তাহলে এই ব্যক্তির ঋণ আদায়ের জন্য আমাকে ধার দিও। যখন আমার নিকট খেজুর আসবে তখন তোমার ঋণ পরিশোধ করবো।

হযরত খাওলাহ (রাঃ) হুজুরের (সাঃ) পয়গাম পেয়ে নির্দ্বিধায় বললেন, "আমার মাতা-পিতা রাসূলের ওপর কুরবান হোক। হুজুরের (সাঃ) যত পরিমাণ খেজুর প্রয়োজন খুশীর সঙ্গে তা নিতে পারেন।" বস্তুত হুজুর (সাঃ) তাঁর নিকট থেকে প্রয়োজনীয় পরিমাণ খেজুর নিয়ে সেই বেদূঈনের ঋণ পরিশোধ করে দিলেন এবং তাকে খাবার খাওয়ালেন। যখন বিদায় হচ্ছিল তখন সে রাসূলকে (সাঃ) দোয়া দিচ্ছিলো।

স্বয়ং হযরত খাওলাহ (রাঃ) বিনতে কায়েস থেকে বর্ণিত আছে যে, "হুজুর (সাঃ) বনি সায়িদাহর কোন এক ব্যক্তির নিকট ৬০ ছা (পাঁচ মণ ১০ সের) খেজুর ধারতেন। সে তা ফেরত চাইলো। তিনি একজন আনসারীকে তাঁর পক্ষ থেকে এই ঋণ পরিশোধের নির্দেশ দিলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ নিজের খেজুর পেশ করলেন। কিন্তু সেই ব্যক্তি তা নিতে অস্বীকার করলো। কেননা যে খেজুর সে রাসূলকে (সাঃ) ঋণ দিয়েছিল তা থেকে তা ছিল নিম্নমানের। আনসারী জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি রাসূলের (সাঃ) নিকট ফিরে যাচ্ছো? সে বললো, হাঁ। রাসূল (সাঃ) থেকে বেশী আর কে হকপন্থী আছেন? হুজুর (সাঃ) একথা শুনে অশ্রুসিক্ত হয়ে উঠলেন এবং বললেন, সায়েদী ঠিকই বলেছে। আমার থেকে বেশী ইনসাফ করার হকদার আর কে থাকতে পারে৷ আল্লাহ সেই উম্মাতকে বাকী রাখেন না যাদের মধ্যে তার দুর্বলরা সবলদের নিকট থেকে নিজেদের অধিকার কোন জটিলতা ছাড়া আদায় করতে না পারে। অতঃপর তিনি আমাকে (হযরত খাওলা) বললেন, হে খাওলাহ, তুমি তাকে

www.bjilibrary.com

খাবার খাওয়াও এবং তার ঋণ আদায় কর। আমি হুজুরের (সাঃ) নির্দেশ পালন করলাম।"

এই সকল রাওয়ায়েত থেকে জানা যায় যে, হযরত খাওলাহ (রাঃ) বিনতে কায়েস অবস্থা সম্পন্ন মানুষ ছিলেন এবং হুজুর (সাঃ) কোন লৌকিকতা ছাড়া তাঁর নিকট থেকে ঋণ গ্রহণ করতেন।

হযরত খাওলার (রাঃ) গর্ভে হযরত হামযার (রাঃ) একটি পুত্র জন্মগ্রহণ করেছিল। তাঁর নাম ছিল আম্মারাহ। তাঁর নামানুসারেই হযরত হামযার (রাঃ) কুনিয়ত ছিল আবু আম্মারাহ। আম্মারাহ সন্তানহীন অবস্থায় মারা যান। এইভাবে হযরত হামযার (রাঃ) বংশধারা বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।

হযরত আনিসাহ (রাঃ) বিনতে আদি

তিনি আনসারের কোন কবিলাভুক্ত ছিলেন। সালমাহ বিন মালিকের সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়েছিল। তিনি ছিলেন বালি গোত্রভুক্ত। এই গোত্র আওস গোত্রে আমর বিন ওয়াহাবের মিত্র ছিল। তাঁর ঔরসে আব্দুল্লাহ (রাঃ) বিন সালমা জন্মগ্রহণ করেন। তিনি একজন প্রখ্যাত সাহাবী ছিলেন। আব্দুল্লাহ (রাঃ) নবীর (সাঃ) হিজরতের পর ইসলাম গ্রহণ করেন। কিয়াস করা হয় যে, হযরত আনিসাও (রাঃ) পুত্রের সঙ্গে ইসলাম গ্রহণের সৌভাগ্য অর্জন করেন।

হযরত আব্দুল্লাহ (রাঃ) বিন সালমা বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। অতঃপর ওহোদের যুদ্ধে রহমতে আলমের (সাঃ) সঙ্গী হন। এই যুদ্ধে তিনি বীরত্বের সঙ্গে লড়াই করে শাহাদাত লাভ করেন। যুদ্ধের পর রাসুলুল্লাহ (সাঃ) দুই দুই তিন তিন শহীদকে একত্রিত করে ওহোদের ময়দানেই দাফন করার নির্দেশ দেন। হযরত আনিসাহ (রাঃ) পুত্রের শাহাদাতের খবর পেয়ে হুজুরের (সাঃ) খিদমতে হাজির হয়ে আরজ করলেনঃ "হে আল্লাহর রাসূল! বাড়ীর পাশে শহীদ পুত্রের দাফন করার ইচ্ছা। এতে আমি কিছু শান্তি পাবো।"

প্রিয় নবী (সাঃ) হযরত আনিসার (রাঃ) আবেদন মঞ্জুর করলেন এবং হযরত আব্দুল্লাহ (রাঃ) বিন সালমাকে (বিশেষভাবে) মদীনায় দাফন করার অনুমতি দিলেন।

হযরত আনিসার (রাঃ) ব্যাপারে অতিরিক্ত আর কিছু জানা যায়নি।

www.bjilibrary.com

হযরত ফারিয়াহ (রাঃ) বিনতে আসয়াদ (রাঃ) বিন যারারাহ

খাজরাজ গোত্রের নাজ্জার বংশের সঙ্গে তিনি সংশ্লিষ্ট ছিলেন। নসবনামা হলোঃ ফারিয়াহ (রাঃ) বিনতে আসয়াদ (রাঃ) বিন যারারাহ বিন আদাম বিন উবায়েদ বিন ছা'লাবাহ বিন গানাম বিন মালিকাহ বিন নাজ্জার বিন ছা'লাবাহ বিন আমর বিন খাজরাজ।

তাঁর পিতা হযরত আবু উমামাহ আসয়াদ (রাঃ) অন্যতম মর্যাদাবান সাহাবী ছিলেন। অধিকাংশ রাওয়ায়েতেই তাঁর নাম আনসারের সাবিকিনা আউয়ালূনের তালিকায় প্রথমদিকে পরিদৃষ্ট হয়। তিনি প্রথম হিজরীর শওয়াল মাসে ওফাত পান এবং হযরত ফারিয়াহ (রাঃ) এবং এক অথবা দুটি অল্প বয়স্কা কন্যা রেখে যান। হযরত আসয়াদ (রাঃ) বিন যারারাহ ওফাতের পূর্বে নিজের কন্যাদের সম্পর্কে প্রিয় নবীকে (সাঃ) ওসিয়ত করেন। সুতরাং হুজুর (সাঃ) সব সময় তাঁর মেয়েদের কথা খেয়াল রেখেছিলেন। হাফিজ ইবনে হাজার (রঃ) "ইসাবাহ"তে লিখেছেন যে, হুজুর (সাঃ) এই মেয়েদেরকে মুক্তা সম্বলিত সোনার চুল পড়িয়েছিলেন।

আল্লামা ইবনে আছির (রঃ) বর্ণনা করেছেন, হযরত ফারিয়াহ (রাঃ) বালেগাহ হলে হুজুর (সাঃ) হযরত নাবিতের (রাঃ) সঙ্গে তাঁর বিয়ে দেন।

হযরত ফারিয়াহ (রাঃ) সম্পর্কিত আর কোন বিস্তারিত তথ্য জানা যায়নি।

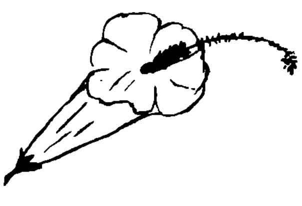

www.bjilibrary.com

হযরত উম্মে দাহদাহ (রাঃ)

তিনি মশহুর সাহাবী আবুদ দাহদাহ ছাবিত (রাঃ) বিন দাহদাহ আনসারীর (ওহোদের শহীদ) স্ত্রী ছিলেন। স্বামী-স্ত্রী উভয়েই ঈমান ও নিষ্ঠাপূর্ণ আমলের দিক থেকে নজিরবিহীন ছিলেন। হযরত আব্দুল্লাহ (রাঃ) বিন মাসউদ থেকে বর্ণিত আছে যে, যখন সুরায়ে আল হাদিদের মানজাল্লাজি য়ুকরিদুল্লাহা কারদান হাসানান ফায়ুদায়িফাহু লাহু ওয়া লাহু আজরুন কারিম (কে আছ যে আল্লাহকে উত্তম কর্জ বা ঋণ দেবে, যাতে আল্লাহ সেই ঋণ কয়েকগুণ বাড়িয়ে ফেরত দেবেন এবং এজন্য উত্তম প্রতিদান রয়েছে) নাযিল হলো তখন হযরত আবুদ দাহদাহ (রাঃ) রাসূলে আকরামের (সাঃ) খিদমতে হাজির হয়ে আরজ করলেনঃ "হে আল্লাহর রাসূল। আল্লাহ তায়ালা কি আমাদের নিকট ঋণ চান?" হুজুর (সাঃ) বললেন, "হাঁ আবুদ দাহদাহ।" হযরত আবুদ দাহদাহ (রাঃ) আরজ করলেন, "হে আল্লাহর রাসূল! আপনার পবিত্র হাত আমাকে দেখান।

হুজুর (সাঃ) নিজের পবিত্র হাত তাঁর দিকে এগিয়ে দিলেন। তিনি হুজুরের (সাঃ) মুবারক হাত নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে বললেনঃ "ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি নিজের বাগান আল্লাহকে ঋণ দিচ্ছি।"

হযরত আবুদ দাহদাহ (রাঃ) হক পথে যে বাগান ছাদকাহ করেছিলেন তাতে ৬শ' খেজুরের গাছ ছিল। এই বাগানে তাঁর বাড়ী ছিল এবং সেখানেই তাঁর সন্তান-সন্ততিরা বাস করতেন। হুজুরের (সাঃ) সঙ্গে এই কথা বলে তিনি সোজা বাড়ী পৌছলেন এবং স্ত্রীকে (উম্মে দাহদাহ) ডেকে বললেন, "দাহদাহর মা, বাইরে এসো। আমি এই বাগান আল্লাহকে ঋণ দিয়ে দিয়েছি।"

হযরত উম্মে দাহদাহ (রাঃ) বললেনঃ "আবুদ দাহদাহ! তুমি লাভজনক ব্যবসা করেছ" একথা বলে তিনি সকল মাল-সামান ও বাচ্চাদের নিয়ে বাগানের বাইরেচলে এলেন।

www.bjilibrary.com

হযরত আনাস (রাঃ) বিন মালিক থেকে বর্ণিত অপর এক হাদিসে এই ঘটনাই অন্যভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলের (সাঃ) খিদমতে আরজ করলেনঃ "হে আল্লাহর রাসূল! আমি আমার বাড়ীর প্রাচীর তুলতে চাই। মধ্যখানে অমুক ব্যক্তির খেজুরের গাছ পড়েছে। আপনি যদি তাকে এই বৃক্ষ আমাকে দিয়ে দিতে বলেন তাহলে আমি ভালোভাবে প্রাচীর তুলতে পারি।"

হুজুর (সাঃ) সেই ব্যক্তিকে বৃক্ষটি তাকে দিয়ে দিতে বললেন, এবং একথাও বললেন যে, এর বিনিময়ে আল্লাহ তোমাকে জান্নাতে খেজুর বৃক্ষ দান করবেন। সেই ব্যক্তি বৃক্ষদানে আপত্তি জানালেন। হযরত আবুদ দাহদাহ (রাঃ) একথা জানতে পেরে ঐ ব্যক্তির নিকট গেলেন এবং বললেন, তুমি তোমার খেজুর বৃক্ষ আমাকে দিয়ে দাও। তার বিনিময়ে আমার খেজুরের বাগান নিয়ে নাও। সে এই কথায় সম্মতি জানালো। এরপর আবুদ দাহদাহ (রাঃ) হুজুরের (সাঃ) খিদমতে হাজির হয়ে আরজ করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমি সেই ব্যক্তির নিকট থেকে আমার বাগানের বিনিময়ে খেজুর বৃক্ষটি কিনে নিয়েছি। এখন আমি তা আপনার নিকট হস্তান্তর করছি। আপনি তা সেই ব্যক্তিকে দিয়ে দিন। একথা শুনে হুজুর (সাঃ) খুব খুশী হলেন এবং বারবার বললেন, "আবুদ দাহদাহর জন্য জান্নাতে খেজুরের অনেক বড় বড় কাঁদি রয়েছে।" এরপর হযরত আবু দাহদাহ (রাঃ) স্ত্রীর নিকট গেলেন এবং তাঁকে বললেন, "হে উম্মে দাহদাহ! এই বাগান থেকে বের হও। আমি এই বাগান জান্নাতের খেজুরের বিনিময়ে বিক্রি করে ফেলেছি।" স্ত্রী বললেন, "এটাতো সর্বোত্তম বাণিজ্য।"

হযরত উম্মে দাহদাহ'র (রাঃ) বিস্তারিত অবস্থা জানা যায়নি। শুধু এতটুকুন জানা গেছে যে, হযরত আবুদ দাহদাহ (রাঃ) হুদাইবিয়ার সন্ধির পর ওফাত পেয়েছিলেন। মৃত্যুকালে তিনি কোন সন্তান রেখে যাননি। সম্ভবত তাঁর জীবদ্দশাতেই উম্মে দাহদাহও (রাঃ) ইন্তেকাল করেছিলেন। কেননা হুজুর (সাঃ) হযরত আবুদ দাহদাহ'র (রাঃ) সম্পত্তি তাঁর ভাগিনা হযরত আবু লুবাবাহ আনসারীকে (রাঃ) দিয়েছিলেন। (উসদুলগাব্বাহ–ইবনেআছির)।

www.bjilibrary.com

হযরত রুবায়্যি' (রাঃ) বিনতে নাজার

তিনি আনসারের বনু নাজ্জার বংশোদ্ভূত ছিলেন। নসবনামা হলোঃ রুবায়্যি' (রাঃ) বিনতে নাজার বিন জামজাম বিন যায়েদ বিন হারাম বিন জুনদুব বিন আমের বিন গানাম বিন আদি বিন নাজ্জার।

জালিলুল কদর সাহাবী হযরত আনাস (রাঃ) বিন নাজার (ওহোদের শহীদ) তাঁর সহোদর এবং খাদিমে রাসূল (সাঃ) হযরত আনাস (রাঃ) বিন মালিক তাঁর আপন ভ্রাতুষ্পুত্র ছিলেন।

স্ববংশের সুরাকাহ বিন হারিছের সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়েছিল। তাঁর ঔরসে পুত্র হারিছাহ (রাঃ) জন্মগ্রহণ করেছিলেন। নবীর (সাঃ) হিজরতের পূর্বেই সুরাকাহ মারা গিয়েছিল। সে ইসলাম গ্রহণ করতে পারেনি। অবশ্য হযরত রুবায়্যি' (রাঃ) এবং তাঁর পুত্র হারিছাহ (রাঃ) নবীর (সাঃ) হিজরতের কিছু পূর্বে অথবা হিজরতের অব্যবহিত পরে ইসলাম গ্রহণ করেন। হযরত রুবায়্যি' (রাঃ) অত্যন্ত আন্তরিকতার সঙ্গে ইয়াতিম পুত্রের প্রতিপালন করেন এবং তাঁর পিতার কমতি অনুভূত হতে দেননি। হারিছা (রাঃ) মায়ের অনুগত এবং খিদমতগুজার ছিলেন এবং মাও তাঁকে খুব ভালোবাসতেন। দ্বিতীয় হিজরীতে নবীয়ে আকরাম (সাঃ) বদরের যুদ্ধে রওয়ানা হলেন। তাঁর সঙ্গে হারিছাও (রাঃ) ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে চললেন। যুদ্ধের ময়দানে তিনি পানি পান করার জন্য দাঁড়িয়েছিলেন এমন সময় হিব্বান বিনুল আরকাহ নামক একজন মুশরিক তীর তাক করে তাঁর ওপর নিক্ষেপ করলো। তীর এসে বিদ্ধ হলো তাঁর গলায় এবং এই ব্যথায় তিনি শাহাদাতের পেয়ালা পান করে জান্নাতে প্রবেশ করলেন।

হযরত হারিছার (রাঃ) শাহাদাতের খবর শুনে হযরত রুবায়্যি' (রাঃ) শোকাভিভূত হয়ে পড়লেন। কিন্তু তিনি খুব ধৈর্য ধারণ করলেন। প্রিয় নবী (সাঃ) বদর প্রান্তর থেকে যখন মদীনা প্রত্যাবর্তন করলেন তখন তিনি তাঁর নিকট উপস্থিত হয়ে আরজ করলেন, "হে আল্লাহর রাসূল! হারিছা আমার অত্যন্ত অনুগত ও প্রিয় সন্তান ছিল। তার বিচ্ছিন্নতার দুঃখ আমার অন্তরে যে কি পরিমাণ, তা আপনি ভালোভাবেই

www.bjilibrary.com

অনুভব করতে পারেন। তার শোকে আমি চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে কাঁদতে চেয়েছিলাম। কিন্তু আপনার নিকট থেকে হারিছা (রাঃ) কেমন আছে তা জানা পর্যন্ত চুপ থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। যদি সে বেহেশতে থাকে তাহলে ধৈর্য ধারণ করবো। আর যদি সে জাহান্নামে থাকে তাহলে আল্লাহ দেখবে যে, তার শোকে আমি আমার অবস্থা কি করি।"

হুজুর (সাঃ) বললেন, "এ তুমি কি বলছো! হারিছাতো জান্নাতুল ফিরদাউসে রয়েছে।"

একথা শুনে হযরত রুবায়্যি' (রাঃ) খুশী হয়ে গেলেন। এরপর তিনি আরজ করলেন, "হে আল্লাহর রাসূল! আমি আর হারিছার জন্য কাঁদবো না।"

সহিহ বুখারীতে আছে, একবার হযরত রুবায়্যি'র (রাঃ) হাতে এক আনসারী মেয়ের দাঁত ভেঙ্গে গেল। তার পরিবারের লোকজন কিসাস দাবী করে বসলো। হুজুর (সাঃ) তাদের পক্ষে সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে বললেন, দাঁতের পরিবর্তে দাঁত এবং জীবনের পরিবর্তে জীবনই খোদার নির্দেশ। হযরত রুবায়্যি'র (রাঃ) ভাই হযরত আনাস (রাঃ) বিন নাজারও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি বোনের প্রতি ভালোবাসার আবেগে বললেন, "খোদার কসম! রুবায়্যি'র (রাঃ) দাঁত ভাঙ্গতে দেয়া হবে না।" হুজুর (সাঃ) বললেন, "ভাই, খোদার নির্দেশ তাই। হাঁ, বাদী যদি দিয়্যত গ্রহণ করে তাহলে কিসাস পরিবর্তিত হতে পারে।" খোদার কুদরত, আহত মেয়ের আত্মীয়রা দিয়্যত গ্রহণে সম্মত হলো এবং হযরত রুবায়্যি (রাঃ) কিসাস থেকে বেঁচে গেলেন। তখন হুজুর (সাঃ) বললেনঃ

"আল্লাহর এমন কতিপয় নেক বান্দাহ আছে, যদি তারা কোন বিষয়ে কসম খায় তাহলে আল্লাহ তাদের সেই কসম পূরণ করে দেন।

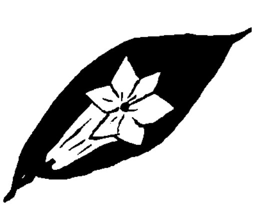

www.bjilibrary.com

হযরত বারিরাহ (রাঃ)

হযরত বারিরাহ (রাঃ) উম্মুল মুমিনিন হযরত আয়েশা সিদ্দিকাহ'র (রাঃ) আযাদকৃত দাসী ছিলেন। সকল ঐতিহাসিকই তাঁর ইসলাম গ্রহণ এবং সাহাবিয়া হওয়ার ব্যাপারে ঐকমত্য পোষণ করেন। বর্ণনা করা হয় যে, উম্মুল মুমিনিনের খিদমতে আসার পূর্বে যার বাঁদী ছিলেন সে তাঁর থেকে বাৎসরিক ৯ অথবা ৫ আওকিয়া সোনা আদায়ের পর আযাদ হওয়ার সিদ্ধান্ত দিয়েছিলো। কিন্তু এতো দীর্ঘদিন গোলামীতে থাকা তাঁর সহ্য হলো না। একদিন উম্মুল মুমিনিন আয়েশা সিদ্দিকাহ'র খিদমতে হাজির হয়ে আরজ করলেন, আমাকে সাহায্য করুন এবং আপনার দাসী বানিয়ে নিন। উম্মুল মুমিনিন (রাঃ) সকল সোনা একবারেই দিয়ে দেয়ার ওয়াদা করলেন। তাঁর মালিককে জিজ্ঞাসা করা হলে সে তাঁকে বিক্রি করতে রাজি হলো কিন্তু নিজের ওয়ারাছাত স্থায়ী রাখার ব্যাপারে পীড়াপীড়ি করলো। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) পর্যন্ত এ কথা পৌছলো। তিনি হযরত আয়েশা সিদ্দিকাহকে (রাঃ) বললেন, ওয়ারাছাত বা উত্তরাধিকারের হকতো তারই হয় যে কোন গোলাম (অথবা বাঁদী) কিনে আযাদ করে দেয়। এক রাওয়ায়েতে আছে, এ সময় হুজুর (সাঃ) লোকদেরকে একত্রিত করলেন এবং খোতবাহ দিলেন। তাতে হামদ ও ছানার পর বললেন, "কিছু মানুষ এমন শর্ত আরোপ করতে চায় যা আল্লাহর কিতাবে নেই। স্মরণ রেখো, যে শর্ত আল্লাহর কিতাবে নেই তা বাতিল। আল্লাহর ফায়সালা অত্যন্ত সঠিক এবং তাঁর শর্তও খুব মজবুত। প্রকৃতপক্ষে গোলামের ওয়ারাছাহ গোলাম আযাদকারীরই হয়ে থাকে।" বস্তুত হযরত আয়েশা সিদ্দিকাহ (রাঃ) হযরত বারিরাহকে (রাঃ) কিনে আযাদ করে দিলেন। কিন্তু তিনি উম্মুল মুমিনিনের খিদমতে থাকাই পছন্দ করলেন। হযরত আয়েশার (রাঃ) সান্নিধ্যে থাকার ফয়েজের সঙ্গে সঙ্গে তিনি নবীর (সাঃ) ফায়েজও লাভ করেন এবং ফজিলত ও কামালিয়াতের খনি হয়ে গেলেন। নেতৃস্থানীয় চরিতকাররা বলেছেন, বড় বড় সাহাবাসহ (রাঃ) সকল মুসলমানই হযরত বারিরাহকে সীমাহীন সম্মান ও শ্রদ্ধা করতেন।

মুসনাদে আবু দাউদে আছে, হযরত বারিরাহ'র (রাঃ) শাদী হযরত মুগিছের (রাঃ) সঙ্গে হয়েছিল। তিনি একজন হাবশী গোলাম ও রাসূলের (সাঃ) সাহাবী

www.bjilibrary.com

ছিলেন। কোন কারণে তাঁর প্রতি হযরত বারিরাহর (রাঃ) ঘৃণার উদ্রেক হয়েছিল। আযাদ হয়ে তাঁর থেকে বিচ্ছিন্ন হতে চাইলেন। হুজুর (সাঃ) একথা জানতে পেরে তাঁকে বিচ্ছিন্ন হওয়া থেকে বিরত রাখতে চাইলেন। হযরত বারিরাহ (রাঃ) আরজ করলেন, "হে আল্লাহর রাসুল। এটা কি আপনার নির্দেশ?" তিনি বললেন, না। এটা আমার সুপারিশ। হযরত বারিরাহ (রাঃ) মুগিছের (রাঃ) সঙ্গে থাকার ব্যাপারে আপত্তি জানালেন। এতে হুজুর (সাঃ) উভয়কে পৃথক হয়ে যাওয়ার নির্দেশ দিলেন এবং বারিরাহকে (রাঃ) একজন তালাকপ্রাপ্তা নারীর মত ইদ্দত পালনের হুকুম দিলেন। হযরত মুগিছ (রাঃ) বারিরাহকে (রাঃ) খুবই ভালোবাসতেন। এই বিচ্ছিন্নতায় তিনি এত মনোকষ্ট পেলেন যে, মদীনার গলিতে তাঁর পিছু পিছু কেঁদে কেঁদে ফিরতেন। একবার হুজুর (সাঃ) তাঁকে এই অবস্থায় দেখে হযরত আব্বাসকে (রাঃ) জিজ্ঞেস করলেনঃ "চাচাজান, মুগিছের মুহাব্বাত আর বারিরাহর (রাঃ) ঘৃণা আপনার নিকট আশ্চর্যের মনে হয় না?"

হযরত বারিরাহ (রাঃ) এতো গরীব ছিলেন যে, তাঁর ওপর সাদকাহর মাল হালাল ছিল। সুতরাং কিছু মানুষ তাঁকে সাদকাহ পাঠাতেন। সহিহ মুসলিমে আছে, সাদকাহ হিসেবে তিনি যা কিছু পেতেন তা তিনি আযওয়াজে মুতাহহিরাতকে হাদিয়া হিসেবেদিতেন।

এক রাওয়ায়েতে আছে, রাসূলে আকরাম (সাঃ) একবার ঘরে ফিরে দেখলেন যে, চুলার ওপর হাঁড়ি এবং তাতে গোশত পাকানো হচ্ছে। কিন্তু খাওয়ার সময় তাঁর সামনে গোশতের পরিবর্তে অন্য কিছু দেয়া হলো। তিনি এর কারণ জিজ্ঞেস করলেন। আযওয়াজে মুতাহহিরাত অথবা হযরত আয়েশা (রাঃ) তাঁকে বললেন, বারিরাহ (রাঃ) গোশত সাদকাহ হিসেবে পেয়েছিলেন এবং তা আমাদেরকে হাদিয়া হিসেবে দিয়েছেন। সাদকাহর গোশত আপনাকে দেয়া আমরা উচিত মনে করিনি। হুজুর (সাঃ) বললেন, এটা বারিরাহ'র (রাঃ) জন্য সাদকাহ এবং আমাদের জন্য হাদিয়া।

ইফকের ঘটনার (উম্মুল মুমিনিন হযরত আয়েশার (রাঃ) ওপর অপবাদ আরোপ) সময় হযরত বারিরাহ (রাঃ) যে শব্দে উম্মুল মুমিনিনের পবিত্রতার কথা ঘোষণা করেছিলেন তা চরিতগ্রন্থে এক আলোকময় অধ্যায় হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছে।

বলা হয় যে, প্রথমে তাঁকে এই অপবাদের ব্যাপারে ইঙ্গিতে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল। তিনি বুঝেছিলেন যে, পারিবারিক জীবনে হযরত আয়েশা সিদ্দিকাহ'র

www.bjilibrary.com

কর্মপদ্ধতি কেমন ছিল তাই জিজ্ঞাসা করা হয়েছে। তিনি বললেন, এমনিতে তো খারাব কিছু দেখি না। অবশ্য বয়স কম। ঘুমিয়ে পড়লে বকরী আটা খেয়ে যায়।

তারপর স্পষ্টভাবে সেই অপবাদের ব্যাপারে প্রশ্ন করা হলে তিনি নির্দ্বিধায় বললেন, "সুবহান আল্লাহ! খোদার কসম, সোনারু যেভাবে খাঁটি সোনা চিনতে পারে তেমনি আমি উম্মুল মুমিনিন আয়েশাকে (রাঃ) জানি। তিনি সম্পূর্ণ নির্দোষ।"

কতিপয় রাওয়ায়েতে আছে, এই প্রসঙ্গে তাঁর ওপর কঠোর আচরণও করা হয়। কিন্তু তিনি নিজের কথার ওপর অটল ছিলেন এবং তা থেকে একবিন্দুও সরে আসেননি। এমনকি স্বয়ং আল্লাহতায়ালা হযরত আয়েশা সিদ্দিকাহ'র (রাঃ) পবিত্রতার কথা ঘোষণা করেন।

হযরত বারিরাহ'র (রাঃ) ওফাতের সাল সম্পর্কে কোন চরিতকার কিছু লিখেননি। অবশ্য বিভিন্ন রাওয়ায়েত থেকে জানা যায় যে, তিনি রাসূলের (সাঃ) ইন্তেকালের (১১ হিজরী) পর দীর্ঘদিন জীবিত ছিলেন।

আল্লামা সুলায়মান নদভী (রঃ) "সিরাতে আয়েশায়" সহিহ বুখারীর উদ্ধৃতি দিয়ে লিখেছেন, হযরত আয়েশা সিদ্দিকাহ (রাঃ) বলেন, বারিরাহ'র (রাঃ) মাধ্যমে ইসলামের তিনটি হুকুম জানা গেছে।

১–বেলায়েতের (ওয়ারাছাত) অধিকার যারা আযাদ করবে তারাই পাবে।

২–গোলামী অবস্থায় যদি কোন গোলাম এবং দাসীর বিয়ে হয় ও স্ত্রী যদি স্বাধীন হয়ে যায় এবং স্বামী গোলাম অবস্থায় থাকে তাহলে স্ত্রীর সাবেক স্বামীর স্বামীত্ব কবুল করা না করার অধিকার রয়েছে।

৩–সাদকা প্রাপ্তির যোগ্য কোন ব্যক্তি যদি কিছু পায় এবং তা সে নিজের পক্ষ থেকে অযোগ্যদেরকে হাদিয়া হিসেবে পেশ করে তাহলে সেই অযোগ্যদের তা গ্রহণ করা জায়েজ অর্থাৎ তার মর্যাদা বদলে যাবে।

হযরত বারিরাহ (রাঃ) থেকে কয়েকটি হাদিসও বর্ণিত আছে। তাঁর অসংখ্য শিষ্য রয়েছে। তাঁর থেকে শুনে হাদিস বর্ণনাকারীদের মধ্যে উমাইয়া খলীফা আবদুল মালিক বিন মারওয়ানও ছিলেন। বলা হয়ে থাকে যে, খলিফা হওয়ার পূর্বে তিনি একবার হযরত বারিরাহ'র (রাঃ) খিদমতে হাজির হয়েছিলেন। এ সময় তিনি তাঁকে সম্বোধন করে খুব জোর দিয়ে বললেনঃ

www.bjilibrary.com

"আবদুল মালিক, ভালোভাবে শোনো। আমি তোমার মধ্যে এমন নিদর্শন দেখতে পাচ্ছি যাতে বুঝা যায় যে, আল্লাহতায়ালা কোন দিন তোমাকে শাসক বানাবেন। যদি তুমি শাসক হও তাহলে কতল, গারত এবং রক্ত প্রবাহ থেকে বেঁচে থাকবে। আমি এজন্য এটা বলছি যে, আমি স্বয়ং রাসূলকে (সাঃ) বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি কোন মুসলমানকে নাহক হত্যা করবে তাকে জান্নাতের দরজা থেকে ধাক্কা দিয়ে পিছনে হটিয়ে দেয়া হবে।"

হযরত বারিরাহ'র (রাঃ) চারিত্রিক গুণাবলীর মধ্যে ছিল রাসূল প্রেম, ধৈর্য, মুখাপেক্ষীহীনতা, যুহদ ও তাকওয়া, সত্যকথন এবং খোদার সৃষ্টির প্রতি কল্যাণ কামনা। প্রিয় নবীর (সাঃ) আহলি বাইত এবং অন্যদেরকে সীমাহীন শ্রদ্ধা করতেন। আল্লাহর ইবাদাতের প্রতি ছিল চরম আকর্ষণ। হুজুরের (সাঃ) হাদিস বর্ণনাকালে শ্রদ্ধায় চোখ বুজে আসতো।

হযরত উম্মে সুমবুলাহ (রাঃ)

তিবরানী (রঃ) এবং হাইছামী (রঃ) এক সাহাবিয়াহ হযরত উম্মে সুমবুলাহর (রাঃ) কথা উল্লেখ করেছেন। একবার তিনি কিছু হাদিয়া নিয়ে প্রিয় নবীর (সাঃ) খিদমতে হাজির হলেন। হুজুরের (সাঃ) আযওয়াজে মুতাহহিরাত (রাঃ) কোন কারণে এই হাদিয়া কবুল করতে অস্বীকৃতি জানালেন। হুজুর (সাঃ) আযওয়াজে মুতাহহিরাতকে তাঁর হাদিয়া কবুল করে নিতে বললেন। তাঁরা রাসূলের (সাঃ) ইরশাদ তামিল করলেন। রাসূলে করিম (সাঃ) এই হাদিয়ার বিনিময়ে হযরত উম্মে সুমবুলাহকে (রাঃ) একটি জঙ্গল জায়গীর হিসেবে দান করেন।

www.bjilibrary.com

হযরত কাইলাহ (রাঃ)

আল্লামা ইবনে সা'দ (রঃ) একজন সাহাবিয়াহ'র কথা সংক্ষিপ্ত আকারে উল্লেখ করেছেন। তিনি লিখেছেন যে, হযরত কাইলাহ (রাঃ) বিধবা হয়ে গেলে শিশু সন্তানদেরকে তাঁর চাচা নিজের অভিভাবকত্বে নেন। এমনিভাবে হযরত কাইলাহ (রাঃ) সন্তানদের ব্যাপারে চিন্তামুক্ত হয়ে গেলেন। অতঃপর তিনি একজন সাহাবীর সঙ্গে রাসূলের (সাঃ) নিকট উপস্থিত হলেন এবং আজীবন কাল রাসূলের (সাঃ) ইরশাদ ও শিক্ষা থেকে উপকৃত হন।

হযরত উম্মে ইসহাক (রাঃ)

হাফিজ ইবনে হাজার আসকালানী (রঃ) "ইসাবাহ"তে এবং আবু নঈম (রঃ) "দালায়েলে" এক সাহাবিয়াহ'র নাম উল্লেখ করেছেন। তাঁর নাম ছিল হযরত উম্মে ইসহাক (রাঃ)। তিনি হিজরতের পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। এ সত্ত্বেও তিনি নবীর (সাঃ) হিজরতের পর মক্কা থেকে মদীনায় হিজরত করেন। স্বয়ং তিনিই বর্ণনা করেন যে, তিনি তাঁর ভাইয়ের সঙ্গে মদীনায় হিজরত করেন। পথিমধ্যে তাঁর ভাই তাঁকে বলেন, "উম্মে ইসহাক! তুমি এখানে দাঁড়াও। আমি আমার খরচের অর্থ মক্কায় ভুলে রেখে এসেছি। ফিরে গিয়ে তা নিয়ে আসি।"

উম্মে ইসহাক বলেন, "আমি বললাম, আমি আমার মুশরিক স্বামীকে ভয় করি। সে তোমাকে অবশ্যই হত্যা করে ফেলবে।"

আমার ভাই বললো, "আল্লাহ চাইলে আমি তার খারাব তৎপরতা থেকে মাহফুজ থাকবো।"

www.bjilibrary.com

উম্মে ইসহাক বলেন, "আমি কয়েকদিন যাবত সেখানে অপেক্ষা করলাম। কিন্তু আমার ভাই ফিরে এলো না। একদিন এক ব্যক্তি সেখান দিয়ে যাচ্ছিলো। তাকে আমি চিনলাম। সে আমাকে জিজ্ঞাসা করলো, উম্মে ইসহাক! তুমি এখানে কেন বসে আছ? আমি বললাম, আমি আমার ভাইয়ের অপেক্ষায় আছি। সে কয়েকদিন হলো আমাকে এখানে বসিয়ে রেখে মক্কা গেছে।

সেই ব্যক্তি বললো, আফসোস! তোমার ভাইকে তোমার স্বামী হত্যা করেছে। এখন সে আর এই দুনিয়ায় নেই।

এরপর অনেক কষ্ট স্বীকার করে দীর্ঘ পথ সফর করে তিনি মদীনা পৌছেন এবং রাসূলের (সাঃ) খিদমতে হাজির হন। এ সময় তিনি ওজু করছিলেন। তিনি তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে কেঁদে কেঁদে আরজ করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমার ভাইকে হত্যা করা হয়েছে। হুজুর (সাঃ) আমার কথা শুনে এক আঁজলা পানি নিয়ে আমার মুখের ওপর ছিটিয়ে দিলেন।

হযরত উম্মে হাকিম (রাঃ) বলেন, এই ঘটনার পর হযরত উম্মে ইসহাক (রাঃ) এত প্রশান্তি পেলেন যে, বড় বড় মুসিবত আপতিত হলেও তিনি কাঁদতেন না।

হযরত উম্মুল মানযার (রাঃ) বিনতে কায়েস

তিনি আনসারের কোন বংশোদ্ভূত ছিলেন। রাসূলকে (সাঃ) অত্যন্ত ভালোবাসতেন এবং শ্রদ্ধা করতেন। হুজুরও (সাঃ) তাঁর প্রতি আস্থা রাখতেন। আল্লামা ইবনে সায়াদ (রঃ) বর্ণনা করেছেন, বনু কুরাইজার যুদ্ধে হযরত রাইহানাও (রাঃ) গ্রেফতার হয়ে এলেন। হুজুর (সাঃ) তাঁকে হযরত উম্মুল মানযার (রাঃ) বিনতে কায়েসের গৃহে রাখলেন। যখন হযরত রাইহানা (রাঃ) ইসলাম গ্রহণ করলেন তখন হুজুর (সাঃ) তাঁকে আযাদ করে নিকাহ্ করেন। অন্য রাওয়ায়েত অনুযায়ী তিনি (সাঃ) তাঁকে নিজের মালিকানায় রাখেন। যা হোক, এরপর তিনি হযরত উম্মুল মানযারের (রাঃ) গৃহ থেকে কায়েস বিন ফাহদের বাড়ী স্থানান্তর হয়ে যান।

হযরত উম্মুল মানযারের (রাঃ) বিস্তারিত তথ্য জানা যায়নি।

www.bjilibrary.com

হযরত হাওয়া (রাঃ) বিনতে ইয়াযিদ

মদীনার বাসিন্দা এবং আওসের বনু আব্দুল আশহাল বংশের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত ছিলেন। নসবনামা হলোঃ হাওয়া (রাঃ) বিনতে ইয়াযিদ বিন সিনান বিন কুবর বিন যাউরা' বিন আব্দুল আশহাল।

তাঁর বিয়ে হয়েছিল কায়েস বিন হাতিমের সঙ্গে। আল্লাহ পাক হযরত হাওয়াকে (রাঃ) অত্যন্ত সৎ স্বভাব দান করেছিলেন। নবীর হিজরতের পূর্বে বাইয়াতে উকবায়ে উলা এবং বাইয়াতে উকবায়ে ছানিয়ার মধ্যবর্তী সময়ে তাওহীদের দাওয়াত তাঁর কর্ণকুহরে প্রবেশ করে। তাওহীদের দাওয়াত শুনতেই তিনি নিশ্চিন্তায় ইসলাম গ্রহণ করেন। কিন্তু তাঁর স্বামী সে সময়ও শিরক ও কুফরীর অন্ধকার গলিতে ঘুরে ফিরছিলেন। হযরত হাওয়ার (রাঃ) ইসলাম গ্রহণে তিনি অগ্নিশর্মা হয়ে উঠলেন এবং তাঁকে বিভিন্নভাবে নির্যাতন করতে লাগলেন। নামায পড়তে চাইলে তাঁকে বাধা দিতেন। সিজদা করতে লাগলে শুইয়ে দিতেন। এমনকি শারীরিক নির্যাতনও চালাতেন। মদীনার কতিপয় ব্যক্তির মাধ্যমে হুজুর (সাঃ) হযরত হাওয়ার (রাঃ) এই মজলুমীর অবস্থা অবহিত হয়ে খুব দুঃখিত হলেন। ঘটনাক্রমে সেই যুগে কায়েস কোন প্রয়োজনে মক্কা এসেছিলেন। হুজুর (সাঃ) তাঁকে ইসলামের দাওয়াত দিলেন। তিনি দাওয়াত সম্পর্কে চিন্তা করতে চান বলে সময় চাইলেন। হুজুর (সাঃ) বললেন, অবশ্যই তুমি খুব ভালোভাবে চিন্তা-ভাবনা কর। কিন্তু ইসলাম গ্রহণের কারণে স্ত্রীর ওপর জুলুম করো না এবং তার সঙ্গে ভালো আচরণ করো।

হাওয়ার (রাঃ) ওপর আর নির্যাতন চালাবেন না বলে কায়েস প্রতিশ্রুতি দেন। মদীনা পৌঁছে তিনি প্রতিশ্রুতি পূরণ করেন এবং হাওয়ার (রাঃ) সঙ্গে ভালো আচরণ করতে লাগলেন। হুজুর (সাঃ) একথা শুনে কায়েসের ওয়াদা পূরণে আনন্দ প্রকাশ করেন। ধারণা করা হয় যে, পরে কায়েসও ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন।

হযরত হাওয়া (রাঃ) আনসার ইসলাম গ্রহণকারীদের মধ্যেকার অগ্রবর্তিনী হিসেবে পরিগণিত। তাঁর সম্পর্কে বিস্তারিত জানা যায়নি।

www.bjilibrary.com

হযরত খালিদাহ (রাঃ) বিনতে কায়েস

তিনি আনসারের সেই সকল মহিলার অন্যতম ছিলেন যাঁরা নবীর (সাঃ) হিজরতের পূর্বেই ইসলাম গ্রহণের সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন। তাঁর নসবনামা হলোঃ খালিদাহ (রাঃ) বিনতে কায়েস বিন ছ।বিত বিন খালিদ বিন আশজা'।

মশহুর সাহাবী হযরত বারা' (রাঃ) বিন মারুর আনসারীর সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়েছিল। তিনি খাজরাজের বনু সালমার সরদার ছিলেন। তাঁর ঔরসে এক পুত্র বিশ্‌র (রাঃ) এবং এক কন্যা সালাফাহ (রাঃ) জন্মগ্রহণ করেন। তাঁরা উভয়েই সাহাবী হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন। বিশ্‌র (রাঃ) বাইয়াতে উকবায়ে কবিরাতে পিতার সঙ্গে শরীক ছিলেন। পিতা পুত্র এই বাইয়াতের পূর্বেই ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। হযরত বারা' (রাঃ) বিন মারুর হিজরতে নবীর (সাঃ) শুধুমাত্র এক মাস পূর্বে ওফাত পান। রহমতে আলম (সাঃ) মদীনা পৌছে হযরত বিশরকে (রাঃ) পিতার স্থলে বনু সালমার সরদার বা নকীব নিয়োগ করেন। তিনি খায়বারের যুদ্ধে হুজুরের (সাঃ) সফর সঙ্গী ছিলেন । এই যুদ্ধকালেই হুজুরকে (সাঃ) বকরীর গোশতে বিষ দেয়া হয়েছিল। অন্যদের মত হযরত বিশ্‌রও (রাঃ) এই গোশত খেয়েছিলেন এবং বিষক্রিয়ায়মারাগিয়েছিলেন।

কথিত আছে যে, হুজুরের (সাঃ) মৃত্যুকালে হযরত খালিদাহ (রাঃ) সেবা-শুশ্রুষার জন্য আগমন করেন এবং হুজুরের (সাঃ) পবিত্র দেহের ওপর হাত রেখে আরজ করেন," হে আল্লাহর রাসুল। এত প্রচন্ড জ্বর আমি কাউকে দেখিনি।"

হুজুর (সাঃ) বললেন, "যেভাবে আমাদেরকে অন্যদের তুলনায় বেশী সওয়াব দেয়া হয় তেমনি কষ্টের প্রচন্ডতাও অন্যদের চেয়ে দ্বিগুণ।" অতঃপর জিজ্ঞেস করলেন," আমার অসুস্থতার ব্যাপারে লোকদের ধারণা কি?" তিনি আরজ করলেন," তাদের ধারণা রাসুল (সাঃ) জাতুল জুনুব।"

হুজুর (সাঃ) বললেন," হে আল্লাহ! সেই বালা থেকে আমাকে মাহফুজ রেখো। এতো সেই বিষের প্রভাব,যা আমি এবং তোমার পুত্র খায়বারে খেয়েছিলাম। সেই বিষ ভেতরে ভেতরে ক্রিয়াশীল রয়েছে।

www.bjilibrary.com

আল্লামা ইবনে সা'দ (রঃ) বলেন, একবার হযরত খালিদাহ (রাঃ) হুজুরের (সাঃ) নিকট জিজ্ঞাসা করলেন, "হে আল্লাহর রাসুল! মুরদাকেও কি চেনা যায়?" হুজুর (সাঃ) বললেন,"পবিত্র আত্মাতো বেহেশতে একটি সবুজ পাখীর মত। পাখী যদি গাছের সবুজ পাতার মধ্যে চেনা যায় তাহলে তাকেও চেনা যায়।

হযরত খালিদাহ (রাঃ) থেকে আরো কিছু হাদিসও বর্ণিত আছে। তাঁর কন্যা সালাফাহ (রাঃ) মশহুর সাহাবী হযরত আবু কাতাদার (রাঃ) স্ত্রী ছিলেন। এছাড়া হযরত খালিদাহ (রাঃ) সম্পর্কে আর কিছু জানা যায়নি।

হযরত কাবশাহ (রাঃ) বিনতে মায়ান আনসারিয়াহ

আনসারের কোন কবিলাভূক্ত ছিলেন। তাঁর বিয়ে হয়েছিল হযরত আবু কায়েস (রাঃ) বিন আসলাত আনসারীর সঙ্গে। তিনি ইন্তেকালের পর তাঁর (হযরত কাবশাহ'র) সতালো পুত্র কায়েস জাহেলিয়াতের রসম অনুযায়ী তাঁর নিকাহ'র ওয়ারিসের দাবী করে বসলো। হযরত কাবশাহ (রাঃ) রাসূলের (সাঃ) নিকট হাজির হয়ে আরজ করলেন, "হে আল্লাহর রাসূল ! আমার মরহুম স্বামীর আত্মীয়-স্বজনেরা আমার পিছু নিয়েছে। এই পরিস্থিতি থেকে আমাকে বাঁচান। যাতে আমি অন্য স্থানে নিকাহ করতে পারি।"

এই সময় সুরায়ে নিসার ১৯ নম্বর আয়াত নাযিল হলো। এই আয়াত নাযির হওয়ার পর রহমতে আলম (সাঃ) বিধবা মহিলাদেরকে পুরো স্বাধীনতা দিয়েছিলেন যে, তারা ইদ্দত পালনের পর যেখানে ইচ্ছা সেখানে নিকাহ করতে পারবে। হযরত কাবশাহ (রাঃ) সম্পর্কে আর বেশী কিছু জানা যায়নি ।

www.bjilibrary.com

হযরত উম্মে হিশাম (রাঃ) আনসারিয়াহ

জালিলুল কদর সাহাবী হযরত হারিছাহ (রাঃ) বিন নুমান আনসারীর কন্যা ছিলেন। সারওয়ারে আলমের (সাঃ) প্রতি তাঁর গভীর শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা ছিল। জুময়ার নামায বাকায়দাহ মসজিদে গিয়ে হুজুরের (সাঃ) ইকতিদাতে পড়তেন। সহিহ মুসলিমে তাঁর থেকে বর্ণিত আছে যে, আমি সূরায়ে কাফ ওয়াল কুরআনিল মাজিদ রাসূলের (সাঃ) মুখে শিখেছি। এই সুরা তিনি প্রতি জুমায়ায় মিম্বরে দাঁড়িয়ে খুতবাহতেপড়তেন।

হযরত আবূ হুমায়েদ সায়েদীর (রাঃ) স্ত্রী

আনসারের কোন কবিলার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত ছিলেন। তিনি ছিলেন মশহুর সাহাবী হযরত আবু হুমায়েদ সায়েদী আনসারীর (রাঃ) স্ত্রী। রহমতে আলমকে (সাঃ) তিনি অত্যন্ত গভীরভাবে শ্রদ্ধা করতেন এবং ইবাদাতের প্রতি ছিল প্রচন্ড আকর্ষণ। একবার হুজুরের (সাঃ) খিদমতে হাজির হয়ে আরজ করলেনঃ "হে আল্লাহর রাসূল! আমার মাতা-পিতা আপনার ওপর কুরবান। আমার অন্তর চায় যে, আপনার সঙ্গে নামায পড়ি।"

হুজুর (সাঃ) বললেন, "আমি জানি যে, তুমি আমার সঙ্গে নামায পড়া পছন্দ কর। কিন্তু তোমার নিজের বিশেষ কক্ষে নামায পড়া তোমার ঘরের অন্য কক্ষে নামায পড়া থেকে উত্তম এবং তোমার ঘরের কোন কক্ষে নামায পড়া তোমার বাড়ীর আঙ্গিনায় নামায পড়া থেকে উত্তম এবং তোমার বাড়ীর আঙ্গিনায় নামায পড়া তোমার কবিলা বা মহল্লার মসজিদে নামায পড়া থেকে উত্তম এবং তোমার মহল্লার মসজিদে নামায পড়া আমার মসজিদে নামায পড়া থেকে উত্তম।"

রাসুলে আকরামের (সাঃ) ইরশাদ শুনে তিনি ঘরের এক কোণায় নিজের জন্য নামাযের জায়গা বানালেন এবং আজীবন কাল সেখানে নামায পড়তেন। তাঁর ওফাতের বছর এবং অন্যান্য অবস্থা জানা যায়নি।

হযরত আযদাতা (রাঃ) বিনতে হারিছ

আরবের প্রখ্যাত চিকিৎসক হারিছ বিন কালদাহর কন্যা এবং জালিলুল কদর সাহাবী সাইয়েদেনা হযরত উতবাহ (রাঃ) বিন গাযওয়ানের স্ত্রী ছিলেন। তিনি স্বামীর সঙ্গে ইরাকের কয়েকটি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন।

তাবারী (রঃ) লিখেছেন, দজলা নদীর নিকটে মিসানবাসী ও মুসলমানদের মধ্যে রক্তাক্ত যুদ্ধ সংঘটিত হয়। ইসলামী সেনাবাহিনীর সেনাপতি হযরত মুগিরাহ (রাঃ) মহিলাদেরকে যুদ্ধের ময়দান থেকে অনেক পেছনে রেখে এসেছিলেন। যখন উভয় বাহিনীর মধ্যে প্রচন্ড যুদ্ধ চলছিল তখন আযদাতা (রাঃ) মহিলাদেরকে বললেন, এসময় যদি আমরা মুসলমানদেরকে সাহায্য করতাম তাহলে ভাল হতো। একথা বলে তিনি নিজের দোপাট্টা দিয়ে একটি বড় ঝান্ডা বানালেন। অন্য মহিলারাও স্বস্ব দোপাট্টা দিয়ে ছোট ছোট ঝান্ডা বানালেন। অতঃপর এই পতাকা উড়াতে উড়াতে যুদ্ধস্থানের নিকট পৌছলেন। মিসনবাসী মনে করলো, মুসলমানদের সাহায্যের জন্য তাজাদম সৈন্য পৌছে গেছে। তারা সাহসহারা হয়ে পড়লো এবং যুদ্ধের ময়দান থেকে পালিয়ে গেল।

হযরত উতবাহ (রাঃ) বিন গাযওয়ান ফুরাত শহরের লোকদের বিরুদ্ধে হামলা চালালেন। এসময় হযরত আযদাতাও (রাঃ) তাঁর সঙ্গে ছিলেন। তিনি বক্তৃতা দিয়ে লোকদেরকে উত্তেজিত করতেন।

কতিপয় রাওয়ায়েতে তাঁর নাম আরদাতা উল্লেখ করা হয়েছে।

www.bjilibrary.com

হযরত উম্মে আবান (রাঃ)

ওয়াকেদী বর্ণনা করেছেন, উম্মে আবান (রাঃ) উতবাহ বিন রাবিয়াহর (বদরের যুদ্ধে নিহত) কন্যা ছিলেন (একথা যদি ঠিক হয় তাহলে তিনি হযরত আবু সুফিয়ানের (রাঃ) স্ত্রী এবং আমীরে মাবিয়ার মাতা হিন্দ (রাঃ) বিনতে উতবাহর সহোদরা ছিলেন)। তিনি সিরিয়ার কয়েকটি যুদ্ধে নজিরবিহীন বাহাদুরী প্রদর্শন করেন। তাঁর বিয়ে হয়েছিল মশহুর সাহাবী হযরত আবান (রাঃ) বিন সাঈদ বিনুল আসের সঙ্গে।

দামেস্কের যুদ্ধে আবান (রাঃ) বিন সাঈদ দামেস্ক শাসকের হাতে শহীদ হন। হযরত উম্মে আবান (রাঃ) স্বামীর প্রতিশোধ নেয়ার দৃঢ় মনোভাব ব্যক্ত করলেন। বস্তুত তিনি শহীদ স্বামীর অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে যুদ্ধের ময়দানে পৌছে গেলেন এবং দীর্ঘক্ষণ রোমকদের মোকাবেলা করতে থাকলেন। রোমকরা শহরে প্রবেশ করে দরজা পুনরায় বন্ধ করে দিলো এবং প্রাচীরের মিনার থেকে মুসলমানদের ওপর তীর ও পাথর বর্ষণ শুরু করলো। এক মিনারে তাদের বড় পাদরী ক্রুশহাতে বিজয়ের জন্য পার্থনা করছিল। হযরত উম্মে আবান (রাঃ) অত্যন্ত পটু তীরন্দাজ ছিলেন। তিনি তাক করে এমনভাবে তীর নিক্ষেপ করলেন যে, পাদরীর হাত থেকে ক্রুশটি দুর্গের নীচে পড়ে গেল। মুসলমানরা দৌড়ে গিয়ে তা হাতে তুলে নিলেন। এতে রোমকরা উত্তেজিত হয়ে শহরের বড় দরজা খুলে দিল এবং বাইরে বেরিয়ে মুসলমানদের ওপর প্রচন্ড হামলা চালালো। উম্মে আবান (রাঃ) রোমকদের ওপর এমনভাবে তীর বর্ষণ শুরু করলেন যে, তারা হতচকিত হয়ে গেল। কিন্তু দামেস্কের শাসক তুমা কোনক্রমেই পিছু হটার নাম মাত্র নিল না। হযরত উম্মে আবান (রাঃ) তাক করে তার চোখে এমন তীর মারলেন যে, সে চিৎকার দিয়ে পিছনের দিকে পালিয়ে গেল।

হযরত উম্মে আবান (রাঃ) শাহুরা, ইন্তাকিয়া প্রভৃতি যুদ্ধেও এইরূপ আশ্চর্য ধরনের কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন।

www.bjilibrary.com

হযরত উম্মে মিসতাহ (রাঃ)

আসল নাম জানা যায়নি। মশহুর সাহাবী হযরত মিসতাহ (রাঃ) বিন উছাছাহর মা এবং হযরত আবুবকর সিদ্দিকের (রাঃ) কি ধরনের আত্মীয় ছিলেন তা ঐতিহাসিকরা বলেননি। কেউ কেউ লিখেছেন যে, তিনি তাঁর খালা ছিলেন এবং কেউ কেউ আবার বলেছেন যে, তিনি সিদ্দিকে আকবরের (রাঃ) খালাতো বোন ছিলেন।

হযরত উম্মে মিসতাহ (রাঃ) খুব প্রারম্ভেই ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি খুব দৃঢ়চেতা অটল মুমিনাহ ছিলেন। ইফকের ঘটনায় মুনাফিকরা যখন উম্মুল মুমিনিন হযরত আয়েশা সিদ্দিকাহর (রাঃ) ওপর অপবাদ আরোপ করে তখন কিছু সাদাসিধে মুসলমানও তাদের ধোঁকার শিকার হন। তাঁদের মধ্যে হযরত মিসতাহও (রাঃ) ছিলেন। বনু মুসতালিকের যুদ্ধ থেকে প্রত্যাবর্তন শেষে তিনি যখন এই ঘটনা নিজের মায়ের নিকট বললেন তখন তিনি খুব ক্রুদ্ধ হলেন এবং পুত্রকে গালাগালি দিলেন।

সেই যুগেই একরাতে হযরত উম্মে মিসতাহ (রাঃ) উম্মুল মুমিনিনের (রাঃ) সঙ্গে প্রকৃতির ডাকে সাড়া দেয়ার জন্য বাইরে যাচ্ছিলেন। রাস্তায় কিছুর সঙ্গে ধাক্কা লাগলো। তাঁর অন্তর পুত্রের কারণে বিষিয়ে ছিল। হঠাৎ করে মুখ দিয়ে পুত্রের জন্য বদ দোয়া বেরিয়ে গেল। উম্মুল মুমিনিন বললেন,"আম্মা আপনার পুত্র বদরী সাহাবী। আপনি তাঁকে বদ দোয়া দিচ্ছেন?"

উম্মে মিসতাহ বললেনঃ "খোদা তাকে ধ্বংস করুক। সে লোকদের মিথ্যা অপবাদে শরীক হয়েছে।" এরপর সমস্ত ঘটনা হযরত আয়েশা সিদ্দিকাহকে (রাঃ) শুনালেন। তিনি মুর্ছা গেলেন। আল্লাহ তায়ালা যখন তাঁর পবিত্রতার ঘোষণা দিলেন তখন হযরত আবুবকর সিদ্দিক (রাঃ) হযরত মিসতাহর (রাঃ) প্রতি খুব দুঃখিত হলেন। কেননা তিনি শুধু নিকটাত্মীয়ই ছিলেন না বরং সিদ্দিকে আকবার (রাঃ) তাঁকে আর্থিক সাহায্য দিতেন। এসত্ত্বেও তিনি মুনাফিকদের ধোঁকায় পড়ে যান। এই অসন্তুষ্টির কারণে হযরত সিদ্দিকে আকবার (রাঃ) তাঁর সাহায্য বন্ধ করে দেন। এতে আল্লাহর পক্ষ থেকে এই নির্দেশ নাযিল হয়ঃ

www.bjilibrary.com

"তোমাদের মধ্যে যারা সাহিবে ফজল ও বিত্তবান তারা আত্মীয়, মিসকিন এবং আল্লাহর পথে হিজরতকারীদের সাহায্য না দেয়ার যেন কসম না খায় এবং ক্ষমা করে দেয়া উচিত।" (সূরায়ে নূর)

এই নির্দেশ অবতীর্ণ হওয়ার পর হযরত আবুবকর সিদ্দিক (রাঃ) তাঁর সাহায্য পূনর্বহাল করেন। এসত্ত্বেও আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী হযরত মিসতাহর ওপর হদ জারি করেন। উম্মে মিসতাহ (রাঃ) যদি নিজের পুত্রের কথা চিন্তা করতেন তাহলে তিনি বাঁচতে পারতেন। কিন্তু তিনি সবধরনের পরিণতি থেকে বেপরওয়া হয়ে হক কথাবলেছিলেন।

হযরত হিন্দ (রাঃ) বিনতে আমর বিন হারাম আনসারিয়াহ

তিনি খাজরাজ গোত্রের শাখা বনু সালমার সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিলেন। নসবনামা হলোঃ হিন্দ (রাঃ) বিনতে আমর বিন হারাম বিন ছা'লাবাহ বিন হারাম বিন কা'ব বিন গানাম বিন সালমাহ বিন আলী বিন আসাদ বিন সারদাহ বিন ইয়াযিদ বিন জাশম বিন খাজরাজ।

সাইয়েদুল আনসার বা আনসারের নেতা হযরত আমর (রাঃ) বিন জামুহর সঙ্গে হযরত হিন্দের (রাঃ) বিয়ে হয়েছিল। তিনি আনসারের অন্যতম জালিলুল কদর সাহাবী ছিলেন। কিন্তু ইসলাম গ্রহণের ব্যাপারে হযরত হিন্দ (রাঃ) তাঁরচেয়ে অগ্রবর্তিনী ছিলেন। হযরত আমর (রাঃ) বিন জামুহ নবীর (সাঃ) হিজরতের পর (বদরের যুদ্ধের কিছুদিন আগে) ইসলাম গ্রহণ করেন। পুত্র হযরত মায়াজ (রাঃ) এবং স্ত্রী হযরত হিন্দ (রাঃ) নবীর (সাঃ) হিজরতের আগেই ঈমান আনেন। হযরত মায়াজ (রাঃ) বিন আমর বিন জামুহ বাইয়াতে উকবায়ে কবিরাহতে শরীক হওয়ার সৌভাগ্য লাভকরেন।

হযরত হিন্দ (রাঃ) অত্যন্ত দৃঢ়চেতা মুসলমান ছিলেন এবং তিনি প্রিয় নবীকে (সাঃ) গভীরভাবে শ্রদ্ধা করতেন। তৃতীয় হিজরীতে ওহোদের যুদ্ধের সময় তিনি ধৈর্য, অটলতা, ঈমানের আবেগ এবং রাসূল প্রেমের এমন আশ্চর্যজনক পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেন যা ইতিহাসে নজীরবিহীন। ওহোদের যুদ্ধে হযরত হিন্দের (রাঃ) স্বামী আমর

www.bjilibrary.com

(রাঃ) বিন জামুহ, পুত্র হযরত খাল্লাদ (রাঃ) বিন আমর এবং ভাই হযরত আব্দুল্লাহ (রাঃ) বিন আমর বিন হারাম তিনজনেই বীরবিক্রমে লড়াই করে শাহাদাত পান। হযরত হিন্দ (রাঃ) স্বামী, পুত্র ও ভাইয়ের শাহাদাতের খবর শুনে দুঃখ প্রকাশ ব্যতিরেকে লোকদেরকে জিজ্ঞেস করলেনঃ "আমাকে বল, রাসূলের (সাঃ) কি অবস্থা! খোদা নাখাস্তা, তাঁর তো কোন আঘাত লাগেনি?"

যখন লোকজন বললেন, খোদার ফজলে হুজুর (সাঃ) ভালো আছেন। একথা শুনে তাঁর চেহারা উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। আস্তে আস্তে যুদ্ধক্ষেত্রের দিকে রওয়ানা হলেন। রাসূলকে (সাঃ) দেখামাত্র আরজ করলেনঃ "আপনি ভাল থাকলে সব মুসিবতপানি।"

এক রাওয়ায়েতে আছে, হযরত হিন্দ (রাঃ) একটি উট সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন। তাতে স্বামী,পুত্র, ভাইয়ের লাশ তুলে মদীনার দিকে রওয়ানা দিলেন। পথিমধ্যে উম্মুল মুমিনিন হযরত আয়েশা সিদ্দিকাহর (রাঃ) সঙ্গে দেখা হলো। তিনি আরো কতিপয় মহিলাসহ হুজুরের (সাঃ) খবর নেয়ার জন্য ওহোদের ময়দানের দিকে আসছিলেন। সে সময় পর্যন্ত পর্দার আয়াত নাযিল হয়নি। উম্মুল মুমিনিন (রাঃ) হযরত হিন্দের (রাঃ) নিকট হুজুরের (সাঃ) খবর জিজ্ঞেস করলেন। তিনি বললেনঃ "আলহামদুল্লিলাহ! হুজুর (সাঃ) ভালো আছেন। এই লাশগুলো হলো আমার স্বামী, ভাই ও পুত্রের। তারা যুদ্ধে শাাহাদাত পেয়েছে।"

ইতিমধ্যে তাঁর উট মাটির ওপর বসে পড়লো। উঠার জন্য উটকে বহুবার হাঁকা হলো। কিন্তু মদীনার দিকে পা বাড়ালো না। উম্মুল মুমিনিন (রাঃ) বললেনঃ" বোঝা হয়তো বেশী হয়েছে।" হযরত হিন্দ (রাঃ) আরজ করলেন,"না উম্মুল মুমিনিন! তার ওপরতো এরচেয়েও বেশী বোঝা তোলা হয়।"

অবশেষে তিনি উটের মুখ ওহোদের দিকে করলেন। সঙ্গে সঙ্গে উট চলতে শুরু করলো। হযরত হিন্দ (রাঃ) তিন শহীদের লাশ হুজুরের (সাঃ) খিদমতে নিয়ে গেলেন। এ সময় তিনি অন্য শহীদদের লাশ দাফন করাচ্ছিলেন। তিনি হিন্দকে জিজ্ঞাসা করলেন,"তাদের মধ্যে কেউ কি বাড়ী থেকে রওয়ানা হওয়ার সময় কিছু বলেছিল?"

হযরত হিন্দ (রাঃ) আরজ করলেনঃ"হাঁ' হে আল্লাহর রাসুল! আমার স্বামী বাড়ী থেকে রওয়ানা হওয়ার সময় এই দোয়া করেছিলেন, "হে আল্লাহ! আমাকে শাহাদাতের সৌভাগ্য দিও এবং আমাকে নিরাশ পরিবার পরিজনের মধ্যে ফিরিয়ে এনোনা।"

www.bjilibrary.com

এরপর হুজুর (সাঃ) তিন শহীদকে ওহোদের গঞ্জে শহীদানে নিজের সামনে দাফন করালেন। হযরত হিন্দের (রাঃ) বিস্তারিত তথ্য চরিতগ্রন্থে পাওয়া যায়নি।

হযরত ফাতিমা (রাঃ) বিনতে আমর বিন হারাম আনসারিয়াহ

তিনি হযরত হিন্দ (রাঃ) বিনতে আমর বিন হারামের সহোদরা ছিলেন। তিনি ভাই হযরত আব্দুল্লাহ (রাঃ) বিন আমরকে খুব ভালোবাসতেন। তিনি ওহোদের যুদ্ধে শাহাদাত পান। কাফিররা অত্যন্ত নিষ্ঠুরভাবে তাঁর লাশ বিকৃত করে (নাক, কান ও ঠোঁট কেটে ফেলে)। হযরত ফাতিমা (রাঃ) ভ্রাতুষ্পুত্র হযরত যাবের (রাঃ) বিন আব্দুল্লাহর (রাঃ) সঙ্গে যুদ্ধের ময়দানে পৌছেন। ভাইয়ের লাশ দেখে তিনি চীৎকার দিয়ে উঠলেন। হুজুর (সাঃ) জিজ্ঞেস করলেন, এটা কার আওয়াজ ? লোকজন বললো,আব্দুল্লাহর (রাঃ) বোন। হযরত আব্দুল্লাহকে (রাঃ) দাফন করার জন্য নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। এ সময় হযরত ফাতিমা (রাঃ) কেঁদে যার যার হতে লাগলেন। হুজুর (সাঃ) বললেন। তুমি কাঁদো আর নাই কাঁদো। যতক্ষণ আব্দুল্লাহর জানাযাহ রাখা হবে ততক্ষণ ফেরেশতারা তার ওপর পাখার ছায়া বিস্তার করে রাখবে। এ কথা শুনে তিনি চুপ হয়ে গেলেন।

হযরত হাবতাহ (রাঃ)বিনতে মালিক আনসারিয়াহ

তিনি আওস গোত্রের আমর বিন আওফ বংশোদ্ভূত ছিলেন। তাঁর বিয়ে হয়েছিল বুজায়ের বিন মাবিয়া বাজালীর সঙ্গে। জাহেলী যুগে বুজায়ের মারা গিয়েছিল। হযরত হাবতাহ (রাঃ)ইসলামের যুগ পেয়েছিলেন এবং ইসলাম গ্রহণ ও সাহাবীয়াতের মর্যাদা লাভ করেছিলেন। বুজায়েরের ঔরসে পুত্র সায়াদ জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তিনিও মার সঙ্গে ঈমান আনেন এবং মা'র নামের নিসবতে সায়াদ (রাঃ) বিন হাবতা হিসাবে মশহুর হন। তিনি আনসারের অন্যতম মহান সাহাবী ছিলেন।

www.bjilibrary.com

হযরত রুবাব (রাঃ) বিনতে কা'ব আনসারিয়াহ্

আওসের আব্দুল আশহালের বংশোদ্ভূত ছিলেন। নসবনামা হলোঃ রুবাব (রাঃ) বিনতে কা'ব বিন আদি বিন আব্দুল আশহাল । ওহোদের শহীদ হযরত হাসিলুল ইয়ামানের (রাঃ) সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়েছিল। নবীর হিজরতের পূর্বে স্বামীর সঙ্গে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। জালিলুল কদর সাহাবী সাহিবুস সির হযরত হুজাইফা বিন হাসিলুল ইয়ামান (রাঃ) তাঁরই পুত্র ছিলেন।

হযরত রুবাব (রাঃ) প্রিয় নবীকে (সাঃ) অত্যন্ত ভক্তি-শ্রদ্ধা করতেন। পুত্র হযরত হুজাইফাহকে (রাঃ) যথা- নিয়মে হুজুরের (সাঃ) খিদমতের জন্য প্রেরণ করতেন। একবার হযরত হুজাইফাহ (রাঃ) কয়েকদিন হুজুরের (সাঃ) খিদমতে হাজির হতে পারেননি। হযরত রুবাব (রাঃ) একথা জানতে পেরে পুত্রকে রাসুলের (সাঃ) খিদমতে কবে থেকে অনুপস্থিত থাকছেন তা জিজ্ঞেস করলেন। তিনি মেয়াদের কথা উল্লেখ করলে খুব অসন্তুষ্ট হলেন এবং পুত্রকে ভর্ৎসনা করলেন। তিনি বললেন,ঠিক আছে এখনই যাচ্ছি। মাগরিবের নামায রাসুলের (সাঃ) সঙ্গে পড়বো এবং হুজুরকে (সাঃ) দিয়ে আমার এবং আপনার ক্ষমার জন্য দোয়া করাবো। একথা বলে রাসুলের (সাঃ) দরবারে হাজির হলেন এবং নামায পড়ে হুজুরের (সাঃ) পিছনে হাঁটা দিলেন। হুজুর (সাঃ) পিছনে ফিরে বললেন,"কে, হুজায়ফাহ? " তিনি আরজ করলেন," জী,হাঁ হে আল্লাহর রাসূল।"

হুজুর (সাঃ) বললেন," আল্লাহ তোমাকে ও তোমার মাতা উভয়কেই ক্ষমা করুন।"

হযরত কুররাতুল আইন (রাঃ) বিনতে উবাদাহ আনসারিয়াহ

জালিলুল কদর সাহাবী হযরত উবাদাহ (রাঃ) বিন ছামতের মা এবং উবাদাহ বিন ফাজলাহ বিন মালিক বিন আজলানের কন্যা ছিলেন। হযরত উবাদাহ (রাঃ) বিন ছামত আনসারের অন্যতম অগ্রবর্তী মুসলমান ছিলেন। তিনি উকবাহর তিনটি বাইয়াতেই শরীক ছিলেন বলে কতিপয় রাওয়ায়েতে উল্লেখ রয়েছে। আবার কেউ কেউ বলেছেন যে, তিনি বাইয়াতে উকবায়ে ছানিয়া (নবুয়াতের দ্বাদশ বছরে। এতে ১২ জন মুসলমান হয়েছিলেন) এবং বাইয়াতে উকবায়ে কবিরাতে (নবুয়তের ত্রয়োদশ বছরে) যোগ দেন। মক্কা থেকে মুসলমান হয়ে বাড়ী পৌছে সর্বপ্রথম মা হযরত কুররাতুল আইনকে (রাঃ) মুসলমান বানান। তিনিও হিজরতের পূর্বেই ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। এইদিক থেকে আনসারের সাবিকিনা আউয়ালুনের মধ্যে পরিগণিত হতেন।

হযরত উকবাহ (রাঃ) বিনতে মুহাম্মাদ আনসারিয়াহ

তিনি ছিলেন জালিলুল কদর সাহাবী হযরত ফুজালাহ (রাঃ) বিন উবায়েদ আনসারীর মা এবং মুহাম্মাদ বিন উকবাহ বিনুল জালাজের কন্যা। মদীনায় ইসলামের কিরণমালা পৌছতেই তিনি ও পুত্র ফুজালাহ (রাঃ) মুসলমান হয়ে যান এবং সাহাবীয়ার মর্যাদা লাভ করেন। তাঁর স্বামী উবায়েদ বিন নাফিজ আওসের খান্দান আমর বিন আওফের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত ছিলেন। কবিলার সরদার ও বাহাদুর ছিলেন। কাব্যতেও পারদর্শিতা রাখতেন। জাহেলী যুগেই ইন্তেকাল করেছিলেন। স্ত্রী ও পুত্র উভয়েই ইসলামের যুগ পেয়েছিলেন এবং হুজুরের (সাঃ) জীবন উৎসর্গকারীদের মধ্যেছিলেন।

www.bjilibrary.com

হযরত ফারিয়াহ (রাঃ) বিনতে খালিদ আনসারিয়াহ

খাজরাজ গোত্রের সায়েদাহ খান্দানের মানুষ ছিলেন। নসবনামা হলোঃ ফারিয়াহ (রাঃ) বিনতে খালিদ বিন খুনাইস বিন লাওজান বিন আবদুদ বিন যায়েদ বিন ছা'লাবাহ বিন খাজরাজ বিন কা'ব বিন সায়েদাহ।

তাঁর বিয়ে হয়েছিল ছাবিত বিন মানযারের সঙ্গে। তিনি বনু নাজ্জার গোত্রের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিত্ব ছিলেন। তাঁরই ঔরসে জন্মগ্রহণ করেছিলেন হযরত হাসসান (রাঃ)। তিনি রাসুলের (সাঃ) কবি উপাধিতে মশহুর ছিলেন এবং আরবের নামকরা কবি হিসেবে পরিগণিত। হযরত ফারিয়াহর (রাঃ) বার্ধক্যের কালে ইসলাম সূর্য উদিত হয়। সে সময় হযরত ফারিয়াহ (রাঃ) বিধবা ছিলেন। তিনি পুত্র হযরত হাসসান (রাঃ) বিন ছাবিতের সঙ্গে তৎক্ষণাৎ তাওহীদের দাওয়াত কবুল করেন এবং হুজুরের (সাঃ) নিকট বাইয়াত হন। সে সময় স্বয়ং হযরত হাসসানের (রাঃ) বয়স ৬০ বছর ছিল। হযরত হাসসান (রাঃ) নিজের এক কবিতায় হযরত ফারিয়াহর (রাঃ) পুত্র হওয়ার জন্য গৌরব প্রকাশ করেছিলেন।

হযরত উম্মুত তোফায়েল (রাঃ) আনসারিয়াহ

জালিলুল কদর সাহাবী সাইয়েদুল মুরসালিন হযরত উবাই (রাঃ) বিন কা'বের স্ত্রী ছিলেন। স্বামীর খিদমত গুজার এবং প্রিয় নবীর (সাঃ) অনুরক্ত ছিলেন। তাঁর থেকে কয়েকটি হাদিস বর্ণিত আছে। তাঁর পুত্র তোফায়েল (রাঃ) অল্প বয়স্ক সাহাবীদের অন্তর্ভূক্ত ছিলেন। আর তথ্য জানা যায়নি।

www.bjilibrary.com

হযরত সুহাইলাহ (রাঃ) বিনতে মাসউদ আনসারিয়াহ

তিনি ছিলেন মহান সাহাবী হযরত জাবের (রাঃ) বিন আব্দুল্লাহর স্ত্রী। আনসারের জাফর গোত্রের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ছিল । তাঁর প্রথম স্বামী ওহোদের যুদ্ধের আগেই মারা যান। হযরত জাবেরের (রাঃ) পিতা হযরত আব্দুল্লাহ (রাঃ) বিন আমর বিন হারাম মৃত্যুকালে হযরত জাবের (রাঃ) ছাড়া ৬টি (অন্য রাওয়ায়েত অনুযায়ী নয় অথবা দশ) কন্যা রেখে যান । তাদের দেখাশুনা এবং যথাযথ তত্ত্বাবধানের জন্য হযরত জাবের (রাঃ) সুহাইলাহ (রাঃ) বিনতে মাসউদকে বিয়ে করেন। হুজুর (সাঃ) একথা জানতে পেরে হযরত জাবেরকে (রাঃ) বললেন, "জাবের, তুমি একজন বিধবাকে বিয়ে করেছ। যদি কোন কুমারীকে বিয়ে করতে তাহলে সে তোমাকে নিয়ে আনন্দ করতো। তুমিও তাকে নিয়ে আন্দন করতে।" তিনি আরজ করলেন," হে আল্লাহর রাসুল। বোনগুলো ছিল অল্প বয়স্কা। এজন্য হুশিয়ার মহিলার প্রয়োজন ছিল। হুজুর (সাঃ) বললেন," তুমি ঠিক করেছ।"

রাসূলের (সাঃ) প্রতি হযরত সুহাইলাহর (রাঃ) গভীর ভক্তি শ্রদ্ধা ছিল। হযরত জাবের (রাঃ) কখনো হুজুরকে (সাঃ) দাওয়াত করলে তিনি খুব উৎসাহের সঙ্গে খাবার তৈরী করতেন। বিয়ের কিছু দিন পর হযরত জাবের (রাঃ) শহীদ পিতার ঋণ আদায়ের খুশীতে হুজুরকে (সাঃ) দাওয়াত দিলেন। হুজুর (সাঃ) হযরত জাবেরের (রাঃ) গৃহে তাশরীফ নিলেন। তিনি গোশত, খোরমা এবং পানি পেশ করলেন। তিনি (সাঃ) বললেন, সম্ভবত তুমি জানো যে, আমি খুব আনন্দের সঙ্গে গোশত খেয়ে থাকি।

খাওয়া শেষে হুজুর (সাঃ) রওয়ানা দিচ্ছিলেন তখন হযরত সুহাইলাহ (রাঃ) ভেতর থেকে আওয়াজ দিলেনঃ"ইয়া রাসুলাল্লাহ। আমার ওপর এবং আমার স্বামীর ওপর দরুদ পড়ুন।" তিনি (সাঃ) বললেন," আল্লাহুম্মা ছাল্লিআলাইহিম।"

খন্দকের যুদ্ধে হযরত জাবের (রাঃ) দেখলেন যে, তিনদিন যাবত রাসূলে করিম (সাঃ) অভুক্ত এবং পেটে পাথর বাঁধা। তিনি তড়পে উঠলেন এবং তৎক্ষণাৎ বাড়ী গিয়ে হযরত সুহাইলাহকে (রাঃ) বললেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) অভুক্ত আছেন।

কিছু থাকলে তা রান্না কর। এক ছা' যব ঘরে ছিল। হযরত সুহাইলাহ (রাঃ) কালবিলম্ব না করে তা পিষে আটা বানালেন এবং হযরত জাবের (রাঃ) বকরীর একটা বাচ্চা জবেহ করে গোশতের ডেকচিতে রেখে চুলায় উঠিয়ে দিলেন। অতঃপর তিনি হুজুরকে (সাঃ) আনার জন্য চললেন। সুহাইলাহ (রাঃ) অত্যন্ত লজ্জাশীলা এবং আত্মসম্মান বোধ সম্পন্ন ছিলেন। বললেনঃ "দুই– তিন জনের খাবার রয়েছে। হুজুরের (সাঃ) সঙ্গে বেশী লোক আনবেন না। তাতে আমাদের অসুবিধা হতে পারে।"

হযরত জাবের (রাঃ) হুজুরের (সাঃ) খিদমতে হাজির হয়ে চুপিসারে আরজ করলেনঃ "হে আল্লাহর রাসূল! আমরা আপনার জন্য খাবার ব্যবস্থা করেছি। আপনি কতিপয় লোক সঙ্গে নিয়ে চলুন।" হুজুর (সাঃ) তাঁর দাওয়াত কুবল করলেন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সাধারণ ঘোষণা দিয়ে দিলেন যে জাবের (রাঃ) সকল খন্দকবাসীকে দাওয়াতদিয়েছে।

হযরত জাবের (রাঃ) অত্যন্ত পেরেশান হয়ে পড়লেন। কিন্তু হুজুরের (সাঃ) প্রতি আদবের কারণে চুপ রইলেন। হুজুর (সাঃ) বললেন, চুলা থেকে ডেকচি নামাবে না এবং যতক্ষণ পর্যন্ত আমি না যাবো ততক্ষণ আটা পাকাবে না। অতঃপর তিনি সকল খন্দকবাসীকে সঙ্গে নিয়ে হযরত জাবেরের (রাঃ) গৃহে তাশরীফ নিলেন এবং খাবারে বরকতের জন্য দোয়া করলেন। এরপর হুজুর (সাঃ) এবং সকল সাহাবী আসুদাহ হয়ে খেলেন। এসত্ত্বেও খাবার বেঁচে গেল।

হুজুর (সাঃ) হযরত সুহাইলাহকে (রাঃ) বললেনঃ"এই খাবার তুমি খাও এবং লোকদের নিকট প্রেরণ করো। কেননা মানুষ অভুক্ত রয়েছে।"

মুসনাদে আহমদ বিন হাম্বলে (রঃ) রয়েছে, একবার হযরত জাবের (রাঃ) হুজুরের (সাঃ) খিদমতে উত্তম ধরনের শুকনো খেজুর পেশ করলেন। তিনি তা দেখে বললেন, আমি মনে করেছিলাম গোশত বুঝি। হযরত জাবের (রাঃ) তৎক্ষণাৎ বাড়ী গিয়ে স্ত্রীকে এ কথা বললেন। তিনি অবিলম্বে বকরী জবেহ করে গোশত রান্না করে দিলেন এবং হুজুরের (সাঃ) খিদমতে পেশ করলেন।

হযরত সুহাইলাহর (রাঃ) ব্যাপারে এরচেয়ে বেশী তথ্য ইতিহাস গ্রন্থে পাওয়া যায়না।

www.bjilibrary.com

হযরত মুলাইকাহ (রাঃ) বিনতে মালিক আনসারিয়াহ

খাজরাজের সম্ভ্রান্ত বংশ বনূ নাজ্জারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। নসবনামা হলোঃ মুলাইকাহ (রাঃ) বিনতে মালিক বিন আদি বিন যায়েদ বিন মানাত বিন আদি বিন আমর বিন মালিক বিন নাজ্জার।

তাঁর বিয়ে হয়েছিল মিলহান বিন খালিদ নাজ্জারীর সঙ্গে। তাঁর ঔরসে হযরত উম্মে সুলাইম (রাঃ) এবং হযরত উম্মে হারাম (রাঃ) জন্মগ্রহণ করেন। তাঁরা উভয়েই মহান মহিলা সাহাবী হিসেবে পরিগণিত। রাসূলের (সাঃ) খাদিম হযরত আনাস (রাঃ) বিন মালিক হযরত উম্মে সুলাইমের (রাঃ) পুত্র ছিলেন। এইদিক থেকে হযরত মুলাইকাহ (রাঃ) তাঁর নানী ছিলেন। ধারণা করা হয় যে, তিনি নবীর (সাঃ) হিজরতের কিছু পূর্বে কন্যাদের সঙ্গে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন।

সহিহ বুখারীতে আছে যে, একবার হযরত মুলাইকাহ (রাঃ) রাসূলে করিমকে (সাঃ) দাওয়াত দিলেন এবং স্বয়ং খাবার তৈরী করলেন। হুজুর (সাঃ) খাওয়া শেষে বললেনঃ ''এসো, আমি তোমাদের নামায পড়াই।''

ঘরে শুধুমাত্র একটি পুরাতন চাটাই ছিল। এর রং কালো হয়ে গিয়েছিল। হযরত আনাস (রাঃ) প্রথমে তা পানি দিয়ে ধুলেন এবং তা নামাযের জন্য বিছালেন। সাইয়েদুল মুরসালিন (সাঃ) ইমামতী করলেন। হযরত মুলাইকাহ (রাঃ), হযরত আনাস (রাঃ) এবং গোলাম ছেলেটি কাতার বেঁধে দাঁড়িয়ে গেলেন। হুজুর (সাঃ) দুই রাকায়াত নামায আদায় করলেন এবং ফিরে গেলেন।

তাঁর মৃত্যু সাল এবং বিস্তারিত তথ্য জানা যায়নি।

www.bjilibrary.com

হযরত উম্মে সাইফ (রাঃ) আনসারিয়াহ

নাম জানা যায়নি। কুনিয়তেই মশহুর হয়েছিলেন। সারওয়ারে আলমের (সাঃ) পুত্র হযরত ইবরাহিমের (রাঃ) দুধ মা ছিলেন। অষ্টম হিজরীতে তিনি মারিয়াহ কিবতিয়াহর (রাঃ) পেটে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর জন্মের পর আনসারের সকল মহিলাই ইবরাহিমের (রাঃ) দুধ পান করানোর খিদমত আঞ্জামের ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু হুজুর (সাঃ) এই খিদমতের জন্য হযরত উম্মে সাইফকে (রাঃ) নির্বাচিতকরেছিলেন।

মদীনা থেকে তিন-চার মাইল দূরে তিনি অবস্থান করতেন। হুজুর (সাঃ) হযরত ইবরাহিমকে (রাঃ) দেখার জন্য প্রায়ই পদযোগে হযরত উম্মে সাইফের (রাঃ) গৃহে তাশরীফ নিতেন। বাচ্চাকে দুধ মার হাত থেকে কোলে নিতেন। মুখে চুমু খেতেন। অতঃপর মদীনা ফিরে আসতেন। হযরত উম্মে সাইফের (রাঃ) স্বামী কামার ছিলেন। এজন্য তাঁর ঘর ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন থাকতো। কিন্তু হুজুর (সাঃ) অস্বাস্থ্যকর হওয়া সত্ত্বেও এই ধোঁয়া সহ্য করতেন। হযরত ইবরাহিম (রাঃ) হযরত উম্মে সাইফের (রাঃ) গৃহেই ওফাত পান। হুজুর (সাঃ) খবর পেয়ে হযরত আবদুর রহমান (রাঃ) বিন আওফকে সঙ্গে নিয়ে তাশরীফ আনলেন। এ সময় হযরত ইবরাহীমের (রাঃ) মুমূর্ষু অবস্থা। হুজুর (সাঃ) তাঁকে কোলে নিলেন এবং তাঁর চোখ দিয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়লো। হযরত আব্দুর রহমান (রাঃ) বিন আওফ আরজ করলেনঃ ''ইয়া রাসুলাল্লাহ! আপনার একি অবস্থা?'' তিনি বললেনঃ ''এটা স্নেহের ব্যাপার।''

হযরত আবদুর রহমান (রাঃ) পুনরায় একই কথা বললেন। ইরশাদ হলোঃ "চোখ অশ্রু বহায়। অন্তর বিষণ্ন। কিন্তু আমরা তাই বলবো, যা আমাদের রবের মর্জি। হে ইবরাহিম! আমরা তোমার বিচ্ছিন্নতায় অত্যন্ত শোকাহত।''

www.bjilibrary.com

হযরত ইবরাহিমের (রাঃ) বয়সের ব্যাপারে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। তাঁর সবচেয়ে কম বয়স দুই মাস ১০ দিন এবং বেশী এক বছর দশ মাস এবং ৬ দিন বলা হয়েছে। এই অনুসারেই তার দুধ পানের কাল নির্ধারণ করা যায়।

হযরত উম্মে সাইফের (রাঃ) সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য জানা যায়নি। অবশ্য তাঁর এই ফজিলতই যথেষ্ট যে, রহমতে আলমের (সাঃ) পুত্রের দুধ মা হওয়ার সৌভাগ্য তাঁর হয়েছিল এবং তাঁর গৃহে হুজুর (সাঃ) বার বার নিজের কদম মুবারক রেখেছিলেন।

হযরত উমরাহ (রাঃ) বিনতে মসউদ আনসারিয়াহ

খাজরাজ নেতা হযরত সায়াদ (রাঃ) বিন উবাদাহ'র মা ছিলেন। সম্ভবত নবীর (সাঃ) হিজরতের পূর্বে জালিলুল কদর পুত্রের প্রভাব ও তাবলীগে ইসলাম গ্রহণ করেন এবং সাহাবীয়াহ হওয়ার সৌভাগ্য পান। পঞ্চম হিজরীতে ওফাত পান। মুসনাদে আহমদ বিন হাম্বলে (রঃ) আছে যে, হযরত সায়াদ (রাঃ) বিন উবাদাহ মায়ের ইছালে ছওয়াবের জন্য পানি পানের ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। কতিপয় রাওয়ায়েতে তাঁর পিতার নাম সায়াদ বিন আমর বলেও উল্লেখ করা হয়েছে।

হযরত ফুকাইহাহ (রাঃ) বিনতে উবায়েদ আনসারিয়াহ

তিনি খাজরাজের সায়েদাহ বংশের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত ছিলেন। নসবনামা হলোঃ ফুকাইহাহ বিনতে উবায়েদ বিন ওয়ালিম বিন হারিছাহ বিন খারাম বিন খুজাইমাহ বিন ছা'লাবাহ বিন তুরাইফ বিন খাজরাজ বিন সায়েদাহ বিন কা'ব বিন খাজরাজ আকবার।

চাচাতো ভাই খাজরাজ নেতা হযরত সায়াদ (রাঃ) বিন উবাদাহ ওয়ালিমের সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়েছিল। নবীর (সাঃ) হিজরতের পূর্বে স্বামীর সঙ্গে ইসলাম গ্রহণ

www.bjilibrary.com

করেন। হযরত কায়েস (রাঃ) বিন সায়াদ (রাঃ) বিন উবাদাহ তাঁরই পেটে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি দানবীর হিসেবে বিখ্যাত ছিলেন।

হযরত কাবশাহ্ (রাঃ) বিনতে রাফে

জালিলুল কদর সাহাবী, আনসারের সিদ্দিক এবং আওস সরদার হযরত সায়াদ (রাঃ) বিন মায়াজের মা ছিলেন। পিতার নাম ছিল রাফে বিন উবায়েদ। খাদরাহ বংশোদ্ভূত ছিলেন। ঐতিহাসিক এবং চরিতকাররা তাঁর ইসলাম গ্রহণ সম্পর্কে ঐকমত্য প্রকাশ করেছেন। হিজরতে নববীর পূর্বেই তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। অত্যন্ত মর্যাদাশীল মহিলা ছিলেন। কাব্য ও কবিতা সম্পর্কেও তাঁর ব্যুৎপত্তি ছিল। উম্মুল মুমিনিন হযরত আয়েশা সিদ্দিকা'র (রাঃ) সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক ছিল। খন্দকের যুদ্ধে বনু হারিছার গর্তে তাঁদের পাশে বসেছিলেন। এমন সময় হযরত সায়াদ (রাঃ) বিন মায়াজ যুদ্ধগাথা পড়তে পড়তে তাঁর সামনে দিয়ে অতিক্রম করছিলেন। হযরত কাবশাহ (রাঃ) তাঁকে ডেকে বললেন, "দৌড়ে যাও। তুমি খুব দেরী করে ফেলেছ।" এই যুদ্ধে হযরত সায়াদ (রাঃ) মারাত্মকভাবে আহত হন। এজন্য কিছুদিন পর তিনি শাহাদাত পান। হযরত কাবশাহ (রাঃ) পুত্রের মৃত্যুতে খুব দুঃখ পান। তিনি তাঁর স্মরণে কেঁদে কেঁদে অনেক শোক গাথা পাঠ করেন। এইসব শোক গাথায় হযরত সায়াদের (রাঃ) ভূয়সী প্রশংসা করা হয়। হুজুর (সাঃ) এই কবিতা শুনে বলেনঃ

"যত ক্রন্দনরত মহিলা আছে তারা মিথ্যা বলে, কিন্তু উম্মে সায়াদ সত্য বলেন।"

হযরত কাবশাহ (রাঃ) হযরত সায়াদের (রাঃ) ওফাতের পর দীর্ঘদিন জীবিত ছিলেন।

www.bjilibrary.com

হযরত খালিদাহ (রাঃ) বিনতে হারিছ

জালিলুল কদর সাহাবী হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) বিন সালামের ফুফু ছিলেন। প্রিয় নবীর (সাঃ) হিজরতের পর মদীনায় আগমনকালে হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন সালাম নিজের বাগানে ছিলেন। তাঁর ফুফু খালিদাহ বিনতে হারিছও সেখানেই ছিলেন। জনৈক ব্যক্তি বাগানে গিয়ে হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) বিন সালামকে হুজুরের (সাঃ) শুভাগমনের খবর দিলেন। খবর পেয়ে তিনি আনন্দে আত্মহারা হয়ে পড়লেন এবং অযাচিতভাবে আল্লাহু আকবার বলে উঠলেন। তিনি তাওরাতের একজন বিরাট আলেম ছিলেন এবং তাতে নবীয়ে আখিরুজ্জামান বা শেষ নবীর (সাঃ) আলামত পড়ে তাঁর আশিক হয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর আনন্দ ও অস্থিরতা দেখে খালিদাহ (রা) হয়রান হয়ে বললেন, "হাছিন, (হযরত আবদুল্লাহ বিন সালামের আসল নাম) ঐ সাহেবের আগমনে তুমি এত আনন্দিত হয়েছ যে, সম্ভবত মূসা (আঃ) বিন ইমরান তাশরীফ আনলেও তুমি এত খুশী হতে না।"

হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন সালাম বললেন ঃ "ফুফুজান, খোদার কসম ! তিনিও মূসার (আ) ভাই এবং সেই দ্বীনের তাবলীগের জন্য দুনিয়ায় তাশরীফ এনেছেন, যে দ্বীনের মুবাল্লিগ ছিলেন হযরত মূসা (আঃ)।"

হযরত খালিদা (রা) জিজ্ঞাসা করলেন ঃ "ভ্রাতুষ্পুত্র ! সত্যি কি তিনি সেই নবী যাঁর ব্যাপারে তাওরাত ও অন্যান্য আসমানী সহিফাতে সুসংবাদ দেয়া হয়েছে ?" হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) বিন সালাম জবাব দিলেন ঃ "নিঃসন্দেহে তিনি সেই নবী।" হযরত খালিদাহ (রাঃ) বললেন ঃ "তাহলে তো আমাদের বড় সৌভাগ্য যে, তিনি আমাদের শহরে তাশরীফ এনেছেন।"

এ প্রশ্নত্তোরের পর হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) নবীর (সাঃ) নিকট রওয়ানা হলেন। হযরত খালিদাহও (রাঃ) তাঁর পেছনে পেছনে গেলেন এবং ইসলাম গ্রহণ করে ফিরে এলেন। অতপর নিজের গৃহে পৌঁছে পরিবারের সকলকে ইসলামের

www.bjilibrary.com

তালকিন দিলেন। বস্তুত বাড়ীর ছোট বড় সবাই ইসলাম গ্রহণ করলেন। কতিপয় রাওয়ায়েতে তাঁকে আব্দুল্লাহ (রাঃ) বিন সালামের চাচী বলা হয়েছে।

হযরত হাওয়া (রাঃ) বিনতে ইয়াযিদ (রাঃ)

তিনি আওসের আব্দুল আশহাল বংশোদ্ভুত এবং হযরত ইয়াযিদ (রাঃ) বিন সাকান আনসারীর কন্যা ছিলেন। তিনি মশহুর সাহাবিয়াহ হযরত আসমা (রাঃ) বিনতে ইয়াযিদ আনসারিয়ার সহোদরা ছিলেন। নসবনামা হলোঃ হওয়া (রাঃ) বিনতে ইয়াযিদ (রাঃ) বিন আসসাকান বিন রাফে' বিন ইমরাউল কায়েস বিন যায়েদ বিন আব্দুল আশহাল বিন জাশাম বিন হারিছ বিন খাজরাজ বিন আমর বিন মালিক বিন আওস।

নবীর (সাঃ) হিজরতের পর ইসলাম গ্রহণ করেন। অত্যন্ত দৃঢ়চেতা মুসলমান ছিলেন। তিনি বাইয়াতে রিদওয়ানে শরীক হওয়ার গৌরব পেয়েছিলেন।

হযরত উমরাতা (রাঃ) বিনতে রাওয়াহা

খাজরাজ গোত্রের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ছিল। নসবনামা হলোঃ উমরাতা বিনতে রাওয়াহা বিন ছা'লাবাহ বিন ইমরুল কায়েস বিন ওমর বিন ইমরুল কায়েসুল আকবার বিন মালিকুল আয়াজ বিন ছা'লাবাহ বিন কা'ব বিন খাজরাজ বিন হারিছ বিন খাজরাজ আকবার।

মশহুর সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ (রাঃ) বিন রাওয়াহার (রাসূলের কবি) সহোদরা ছিলেন। জালিলুল কদর সাহাবী হযরত বাশির (রাঃ) বিন সায়াদ আনসারীর সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়েছিল। পুত্র নোমান (রাঃ) বিন বাশিরও (রাঃ) মশহুর সাবাহী ছিলেন। হযরত উমরাতা (রাঃ) পুত্র নোমানকে (রাঃ) এত ভালোবাসতেন যে নিজের সকল সম্পত্তি তাকেই দিয়ে দিতে চেয়েছিলেন। সুতরাং স্বামী বাশিরকে (রাঃ) এ

www.bjilibrary.com

ব্যাপারে রাজি করিয়েছিলেন এবং সাক্ষ্যের জন্য রাসূলকে (সাঃ) নির্বাচন করেছিলেন। হযরত বাশির (রাঃ) বিন সায়াদ শিশু নোমানকে (রাঃ) সাথে নিয়ে হুজুরের (সাঃ) খিদমতে হাজির হয়ে আরজ করলেনঃ "হে আল্লাহর রাসূল! আপনি সাক্ষী থাকুন যে, আমি অমুক জমি (সম্পত্তি) এই পুত্রকে দিচ্ছি। হুজুর (সাঃ) বললেন, "তার অন্যান্য ভাইকেও অংশ দিয়েছ কি?" তিনি বললেন, "না।" ইরশাদ হলো, "তাহলে আমি জুলুমের ওপর সাক্ষ্য দিইনা।" এই কথায় তিনি চুপ হয়ে গৃহে ফিরে গেলেন এবং রাসূলের (সাঃ) নির্দেশের প্রতি মাথানত করে দিলেন।

প্রিয় নবী (সাঃ) হযরত উমারাতাহকে (রাঃ) অত্যন্ত স্নেহ করতেন। একবার তাঁর নিকট তায়েফ থেকে আঙ্গুর এলো। ঘটনাক্রমে হযরত নোমানও (রাঃ) সে সময় রাসূলের (সাঃ) নিকট উপস্থিত ছিলেন। সে সময় তাঁর বয়স ছিল ৬-৭ বছরের মত। হুজুর (সাঃ) তাঁকে দুটি ছরা দিয়ে বললেন, এক ছরা তোমার এবং অপরটি তোমার মা'র। নোমান দুই ছরাই রাস্তায় খেয়ে ফেললেন এবং মাকে এ কথা বললেনও না। কিছুদিন পর পুনরায় হুজুরের (সাঃ) খিদমতে হাজির হলে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, "নোমান!" সেই আঙ্গুর কি তোমার মাকে দিয়েছিলে?" তিনি বললেনঃ "না।" হুজুর (সাঃ) স্নেহে তাঁর কান মললেন এবং বললেন, "এই ধূর্ত।"

হযরত উম্মে রাফিদাহ (রাঃ)

কতিপয় রাওয়ায়েতে তাঁর নাম উম্মে রাফিদাহ এবং রাফিদাহ (রাঃ) হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। চিকিৎসা ও ক্ষত চিকিৎসায় পারদর্শিনী ছিলেন এবং আহতদের চিকিৎসা করতেন। আল্লামা ইবনে সায়াদ (রঃ) বর্ণনা করেছেন, তাঁর তাঁবুতে ক্ষত চিকিৎসার সরঞ্জাম ছিল। তিনি মসজিদে নববীর পাশে থাকতেন। এক রাওয়ায়েতে আছে যে, কোন কোন সময় হুজুর (সাঃ) তাঁকে মসজিদে নববীর মধ্যে তাঁবু খাটানোর অনুমতি দিয়েছিলেন। আওস সরদার হযরত সায়াদ (রাঃ) বিন মায়াজ খন্দকের যুদ্ধে আহত হলে হযরত উম্মে রাফিদাহই (রাঃ) তাঁকে চিকিৎসা করেন। তাঁর সম্পর্কে এইটুকুনই জানা গেছে।

www.bjilibrary.com

জালবিরের (রাঃ) স্ত্রী

নাম ও নসব সম্পর্কে কিছুই জানা যায়নি। শুধু এতটুকুনই জানা গেছে যে, তিনি আনসারিয়াহ ছিলেন এবং রাসূলে করিমের (সাঃ) একজন জীবন উৎসর্গকারী সাহাবী হযরত জালবির আনসারীর (রাঃ) স্ত্রী ছিলেন। এক আশ্চর্য ধরনের অবস্থায় তাঁর বিয়ে হয়েছিল হযরত জালবিরের (রাঃ) সঙ্গে। জালবিরের (রাঃ) চেহারা ভালো ছিল না এবং খর্বাকৃতির ছিলেন। এজন্য কেউ তাঁকে মেয়ে দিতে রাজি হতেন না। অবশেষে প্রিয় নবী (সাঃ) আনসারের এক খান্দানে তাঁর বিয়ে ঠিক করলেন। কন্যার মাতা-পিতা তাঁর সঙ্গে বিয়ে দেয়ার ব্যাপারে চিন্তায় পড়ে গেলেন। এ সময় ভাগ্যবতী কন্যা তাঁদের সামনে আল্লাহর এ নির্দেশ পেশ করলেনঃ "যখন আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল কোন ব্যাপারে সিদ্ধান্ত দেন তাহলে কোন মুসলমানের সে ব্যাপারে টু শব্দ করার সুযোগ নেই।" 'অতঃপর বললেন, "রাসূলের (সাঃ) যা মরজী আমারও তাই মরজী এবং আমি জালবিরের (রাঃ) সঙ্গে বিয়েতে সম্পূর্ণ রাজি আছি।"

রহমতে আলম (সাঃ) যখন এই খবর পেলেন তখন খুব খুশী হলেন এবং দোয়া করলেনঃ "হে আল্লাহ! এই মেয়ের ওপর কল্যাণের নদী বইয়ে দাও এবং তার জীবনদুঃখপূর্ণকরোনা।"

এরপর তিনি জালবিরের (রাঃ) নিকট বললেন, "আমি অমুক মেয়ের সঙ্গে তোমার বিয়ে ঠিক করেছি।" তিনি আরজ করলেন, 'হে আল্লাহর রাসূল। আমিতো খাটো মানুষ।" তিনি (সাঃ) বললেন, "না তুমি খোদার নিকট খাটো নও।" অতঃপর তিনি হযরত জালবিরের (রাঃ) বিয়ে সেই নেকবখত মেয়ের সঙ্গে পড়িয়ে দিলেন। কথিত আছে যে, হুজুরের (সাঃ) দোয়ার প্রভাবে তাঁর পারিবারিক জীবন খুব বরকতপূর্ণ হয়। হযরত জালবির (রাঃ) অত্যন্ত সচ্ছল মানুষ হন এবং সকল আনসারের মধ্যে তাঁর নেক স্ত্রীর মত মহিলা আর ছিল না।

www.bjilibrary.com

হযরত সালাফাহ বিনতে বারা' আনসারিয়াহ

খাজরাজের সালমাহ খান্দানের সঙ্গে তিনি সংশ্লিষ্ট ছিলেন। তিনি ছিলেন জালিলুল কদর সাহাবী হযরত বারা' (রাঃ) বিন মা'রুর আনসারিয়াহ'র কন্যা। হযরত আবু কাতাদাহ আনসারীর (রাঃ) সঙ্গে তাঁ বিয়ে হয়েছিল। তাঁর ঔরসে তিন পুত্র আব্দুল্লাহ, মা'বাদ এবং আবদুর রহমান জন্মগ্রহণ করেন। প্রিয় নবীকে (সাঃ) তিনি সীমাহীন শ্রদ্ধা করতেন। তাঁর পারিবারিক জীবন ছিল অত্যন্ত সুন্দর।

হযরত আনিসাহ (রাঃ) বিনতে আবি হারিছাহ

তিনি খাজরাজ গোত্রের আদি বিন নাজ্জার বংশোদ্ভূত ছিলেন। জাহেলী যুগে নু'মান আওসীর স্ত্রী ছিলেন। মৃত্যুর পর মালিক (রাঃ) বিন সিনান খুদরীর সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল। এটা নবীর (সাঃ) হিজরতের পূর্বেকার ঘটনা। বাইয়াতে উকবার পর মদীনার ঘরে ঘরে ইসলাম প্রসারিত হলে মালিক (রাঃ) বিন সিনান এবং আনিসাহ (রাঃ) উভয়েই মুসলমান হয়ে গেলেন। জালিলুল কদর সাহাবী হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বিন মালিক (রাঃ) বিন সিনান হযরত আনিসাহ'র গর্ভেই জন্মগ্রহণ করেন। হযরত মালিক (রাঃ) বিন সিনান ওহোদের যুদ্ধে বীরত্বের সঙ্গে লড়াই করে শাহাদাত প্রাপ্ত হন। বস্তুত তিনি কোন সম্পত্তি রেখে যাননি। হযরত আনিসাহ (রাঃ) এবং বারো বছর বয়স্ক পুত্র হযরত আবু সাঈদ অত্যন্ত দারিদ্রে নিপতিত হলেন।

হযরত আনিসাহ (রাঃ) একদিন আবু সাঈদকে (রাঃ) বললেন, "পুত্র, রাসূলের (সাঃ) খিদমতে যাও। তিনি আজ অমুক ব্যক্তিকে কিছু দিয়েছেন। তোমাকেও কিছু না কিছু অবশ্যই দেবেন।" তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "ঘরে কি কিছু আছে?" মা নেতিবাচক জবাব দিলেন। তখন সোজা রাসূলের (সাঃ) দরবারে গিয়ে

www.bjilibrary.com

হাজির হলেন। সে সময় হুজুর (সাঃ) খোতবাহ দিচ্ছিলেন। তিনি সে সময় বলছিলেন, "দারিদ্রে যে সবর করে আল্লাহ তাকে ধনী করে দেবেন।" হুজুরের (সাঃ) ইরশাদ শুনে হযরত আবু সাঈদ (রাঃ) মনে মনে বললেন, আমার নিকট তো একটি উটনী রয়েছে। এজন্য ভিক্ষুকের হাত বাড়িয়ে হুজুরকে (সাঃ) কষ্ট দেয়ার কি প্রয়োজন রয়েছে। এ কথা চিন্তা করে শূন্য হাতে মায়ের নিকট ফিরে এলেন। মাতা-পুত্রকে আল্লাহ পাক সবরের এই ফল দিলেন যে, কিছুদিনের মধ্যেই তাঁরা স্বচ্ছল এবং ধন-সম্পদে তাঁরা সকল আনসারের মধ্যে সেরা হয়ে গেলেন।

হযরত যয়নব (রাঃ) বিনতে আলী (রাঃ)

একাদশ হিজরীর রবিউল আউয়াল মাসে রহমতে আলমের (সাঃ) ইন্তেকালের সময় ঘনিয়ে এলে তিনি কলিজার টুকরা সাইয়েদাতুন নিসা ফাতিমাতুজ জোহরাকে তাঁর সন্তানদেরকে ডেকে আনতে বললেন। সাইয়েদাহ (রাঃ) নির্দেশ পালন করলেন এবং সকল সন্তানকে হুজুরের (সাঃ) নিকট নিয়ে গেলেন। শিশুরা প্রিয় নানাকে (সাঃ) বেচাইন দেখে কাঁদতে লাগলেন। তাঁদের মধ্যে ছ' বছরের একটি মেয়ে ছিল। তিনি এতো দুঃখ পেয়েছিলেন যে, হুজুরের (সাঃ) সিনা মুবারকের ওপর মাথা রেখে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলেন। প্রিয় নবী (সাঃ) শিশুটির কপালে চুমু দিলেন এবং স্নেহের হাত তাঁর মাথায় রেখে সান্ত্বনা দিলেন। এ সেই শিশু যে ৬ বছর পূর্বে শেরে খোদা হযরত আলী কাররামাল্লাহ এবং সাইয়েদাতুন নিসা ফাতিমাতুজ জোহরার ঘরে জন্মগ্রহণকালে রহমতে আলম (সাঃ) মদীনায় উপস্থিত ছিলেন না। তিন দিন পর তিনি তাশরীফ আনলে সোজা ফাতিমাতুজ জোহরার (রাঃ) ঘরে গিয়ে উপস্থিত হলেন এবং সেই শিশুটিকে কোলে নিয়ে দীর্ঘক্ষণ ধরে কাঁদলেন। অতঃপর পবিত্র মুখে খেজুর চিবোলেন ও লালা শিশুটির মুখে দিলেন। তারপর হুজুর (সাঃ) সেই শিশুর নাম "যয়নব" রাখার প্রস্তাব দিলেন এবং বললেন, "খাদিজার (রাঃ) সঙ্গে তার সাদৃশ্য রয়েছে।" ছ' বছর পর আজ সেই যয়নবই (রাঃ) প্রিয় নানার স্থায়ীভাবে বিচ্ছিন্নতার জন্য কাঁদছিলেন। ছ' বছরের নিষ্পাপ শিশুর জন্য এটা একটা হৃদয়বিদারক ব্যাপার ছিল। কিন্তু তিনি জানতেন না যে, ভবিষ্যৎ জীবনে তাঁর ওপর কিয়ামতের মত মুসিবত আপতিত হবে। যার কারণে তার কুনিয়তই হবে উম্মুল মাসায়েব। অর্থাৎ মুসিবতের মা। এ সেই যয়নব (রাঃ) যাঁকে যয়নবে (রাঃ) কুবরাও বলা হয়ে থাকে।

www.bjilibrary.com

ইসলামের ইতিহাসে তিনি একজন মর্যাদাবান ব্যক্তিত্ব হিসেবে পরিচিত। তাঁর ইলম ও ফজল, বুদ্ধিমত্তা, বাকপটুতা, বাগ্মিতা, সত্যকথন, আনুগত্য ও সন্তুষ্টি এবং ধৈর্য ও অটলতার কাহিনী ইতিহাসের পাতায় স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ রয়েছে।

সাইয়েদাহ যয়নবে কুবরা (রাঃ) যে পরিবারে চোখ খুলেছিলেন সেই পরিবার ছিল বিশ্বের সর্বোত্তম পরিবার। তাঁর নানা ছিলেন সাইয়েদুল আম্বিয়া ফখরে মওজুদাত রহমতে দো–আলম মুহাম্মদ মুস্তাফা (সাঃ), নানী ছিলেন ইসলামের প্রথম মহিলা উম্মুল মুমিনিন হযরত খাদিজাতুল কুবরা (রাঃ), পিতা হলেন আসাদুল্লাহ আল–গালিব বাবে ইলম সাইয়েদেনা হযরত আলী কাররামাল্লাহু ওয়াজহাহু। মাতা ছিলেন সাইয়েদাতুন নিসা খাতুনে জান্নাত হযরত ফাতিমাতুজ জোহরা বতুল। তাঁর ভাই হলেন জান্নাতের যুবকদের সরদার সাইয়েদেনা হাসান (রাঃ) এবং সাইয়েদেনা হোসাইন (রাঃ)। শহীদে কারবালা। চাচা ছিলেন মাহবুবে রাসূল সাইয়েদেনা জাফর তাইয়ার শহীদে মূতাহ। নির্ভরযোগ্য রাওয়ায়েত অনুযায়ী হযরত যয়নব (রাঃ) পঞ্চম হিজরীর জমাদিউল আউয়াল মাসে জন্মগ্রহণ করেন। সারওয়ারে আলম (সাঃ) স্বয়ং তাঁর নাম রেখেছিলেন যয়নব এবং নিজের মুখের পবিত্র লালা তাঁর মুখে দিয়েছিলেন। তাঁর কুনিয়ত উম্মুল হাসান অথবা উম্মে কুলছুম ছিল। কারবালার ঘটনার পর তাঁর কুনিয়ত "উম্মুল মাছায়েব" হিসেবেও মশহুর হয়। তাঁর কতিপয় মশহুর লকব দেয়া হলোঃ

নায়েবাতুজ জোহরা, শারিকাতুল হোসাইন, রাজিয়াহ বিল কদর ওয়াল কাজা, নামুসুল কুবরাহ, সিদ্দিকাতুস সোগরা, শুজায়াহ, ফাসিহাহ, বালিগাহ, যাহিদাহ, ফাজিলাহ, আলিমাহ, আবিদাহ, মাহবুবাতুল মুস্তাফা, আকিলাহ, কামিলাহ, মুছিকাহ, ওয়ালিয়াতুল্লাহ, কা'বাতুজ যিরায়া, আমিনাতুল্লাহ, কুররাতু আইনিল মুরতাজা এবং খাতুনে কারবালা।

হযরত যয়নবের (রাঃ) লালন–পালন এবং প্রশিক্ষণ শুরু হয় প্রিয় নবী (সাঃ), হায়দারে কাররার (রাঃ) এবং সাইয়েদাতুন নিসার তত্ত্বাবধানে। শৈশবকালে একদিন হযরত যয়নব (রাঃ) কুরআনে পাক তিলাওয়াত করছিলেন, এ সময় বেখেয়াল অবস্থায় মাথা থেকে উড়না পড়ে গিয়েছিল। সাইয়েদাতুন নিসা (রাঃ) তা দেখে তাঁর মাথার ওপর উড়না দিয়ে বললেন, "বেটি! আল্লাহর কালাম খালি মাথায় পড়তে নেই।"

www.bjilibrary.com

একদিন হযরত হোসাইন (রাঃ) এবং হযরত যয়নবের (রাঃ) মধ্যে মারামারি হয়ে গেল। সাইয়েদাতুন নিসা (রাঃ) তাঁদেরকে কালামে মজিদের আয়াত পড়ে শুনালেন এবং বললেনঃ

"হে বাচ্চারা ! মারামারিতে আল্লাহ্ তাআলা অসন্তুষ্ট হন।" উভয় শিশুই আল্লাহর ভয়ে কেঁপে উঠলেন এবং শপথ নিলেন যে, তাঁরা ভবিষ্যতে আর মারামারি করবেন না। সাইয়েদাহ ফাতিমাতুজ জোহরা (রাঃ) খুব খুশী হলেন এবং তাঁদেরকে বুকে তুলে নিলেন।

রাসূলে আকরামও (সাঃ) হযরত যয়নবকে (রাঃ) অত্যন্ত ভালোবাসতেন। হোসাইনের (রাঃ) মত তিনি হুজুরের (সাঃ) পিঠে কয়েকবার আরোহণ করেন। বিদায় হজ্জের জন্য প্রিয় নবী (সাঃ) মক্কা মুয়াজ্জামা তাশরীফ নিলেন। এ সময় হযরত যয়নবও (রাঃ) তাঁর সাথে ছিলেন। সে সময় তাঁর বয়স ছিল পাঁচ বছর। আর এটা ছিল তাঁর প্রথম সফর।

হুজুর (সাঃ) একাদশ হিজরীতে ওফাত পান। এ সময় তাঁর বয়স ছিল প্রায় ৬ বছর। ৬ মাস পর তিনি মায়ের স্নেহ ছায়া থেকেও বঞ্চিত হন। এসব দুর্ঘটনায় শিশু যয়নব (রাঃ) খুব মনোকষ্ট পান। আদরের নানা এবং সন্তান বৎসল মায়ের বিচ্ছিন্নতায় তিনি এবং তাঁর অন্যান্য ভাই-বোন সকলেই শোকের মূর্তি হয়ে গেলেন। সাইয়েদেনা হযরত আলী মুরতাজা (রাঃ) এ অবস্থায় শিশুদের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের দায়িত্ব স্বয়ং হাতে নেন এবং কিছুদিন পর তাঁদের তত্ত্বাবধানের জন্য উম্মুল বানিন বিনতে খাযাম কালাবিয়াকে নিকাহ করেন।

বাবে ইলম (জ্ঞানের দরজা) যদি স্বয়ং শিক্ষক হন তাহলে ছাত্রদের সৌভাগ্যের কি কোনো পরিসীমা থাকে। অল্প দিনের মধ্যেই সকল শিশুর মন-মস্তিষ্ক ইলম ও হিকমতের আগার পরিপূর্ণ হয়ে যায়। হযরত যয়নবও (রাঃ) জালিলুল কদর পিতার জ্ঞান এবং অন্যান্য গুণ থেকে বেশী বেশী উপকৃত হন। এমনকি যুহদ ও তাকওয়া, বুদ্ধি ও বিচক্ষণতা, সত্যকথন, ক্ষমা, ইবাদাত ও শববেদারীতে তিনি সাইয়েদাতুন নিসা ফাতিমাতুজ জোহরার (রাঃ) নমুনা ছিলেন। লম্বাদেহী এবং অনুরূপ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের অধিকারিণী ছিলেন। চেহারা মুবারকে নানার (সাঃ) জালালিয়াত এবং চলাফেরায় ও চাল-চলনে হায়দারী গাম্ভীর্য বিদ্যমান ছিল। সকল ঐতিহাসিকই ঐকমত্য প্রকাশ করে বলেছেন যে, ইলম ও ফজলে শুধু বনু হাশিমই নয় বরং সকল কোরেশের মধ্যেকার কোনো মেয়েই তাঁর সমকক্ষতার দাবী করতে পারে না।

www.bjilibrary.com

হযরত আলী কাররামাল্লাহু ওয়াজহাহু নজিরবিহীন বক্তা ছিলেন। তিনি খুতবাহ ও বক্তৃতায় বাকপটুত্বের নদী বইয়ে দিতেন। হযরত যয়নব (রাঃ) মহান পিতার বাগ্মিতা ও জোরদার বক্তৃতা দানের শক্তি উত্তরাধিকার সূত্রেই পেয়েছিলেন। তার বেনজীর বক্তৃতা ইতিহাসের পাতায় সংরক্ষিত রয়েছে। তা পড়ে কার অন্তর বিগলিত আর কার চোখ অশ্রুসিক্ত না হয়।

সাইয়েদাহ যয়নব (রাঃ) যখন বয়োপ্রাপ্তা হলেন তখন কুন্দাহ গোত্রের রঈস আশয়াছ বিন কায়েস তাঁর জন্য বিয়ের পয়গাম প্রেরণ করেন। হযরত আলী কাররামাল্লাহু ওয়াজহাহু বিভিন্ন কারণে এই পয়গাম প্রত্যাখ্যান করলেন। তারপর হায়দারে কাররারের (রাঃ) ভ্রাতুষ্পুত্র মাওতা যুদ্ধের শহীদ হযরত জাফর তাইয়ার বিন আবি তালিবের পুত্র আব্দুল্লাহ (রাঃ) শ্রদ্ধেয় চাচার খিদমতে হাজির হলেন এবং হযরত যয়নবের (রাঃ) সঙ্গে বিয়ের ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। হযরত জাফরের (রাঃ) শাহাদাতের পর প্রিয় নবী (সাঃ) স্বয়ং আব্দুল্লাহর লালন পালন ও প্রশিক্ষণ দিয়েছিলেন এবং হুজুরের (সাঃ) ইন্তেকালের পর হযরত আলী কাররামাল্লাহু ওয়াজহাহু তাঁর অভিভাবক ছিলেন। তিনি অত্যন্ত পূত চরিত্রের অধিকারী ছিলেন এবং সিরাত ও সুরতে কোরেশ যুবকদের মধ্যে বিশিষ্ট মর্যাদার অধিকারী ছিলেন। সাইয়েদেনা আলী মুরতাজা (রাঃ) তাঁর দরখাস্ত কবুল করে নিলেন। এরপর খান্দানের কতিপয় বুজর্গ ব্যক্তি হযরত আব্দুল্লাহ বিন জাফরকে (রাঃ) সঙ্গে নিয়ে মসজিদে আসলেন এবং হযরত আলী মুরতাজা (রাঃ) অত্যন্ত সাদা-সিধেভাবে কলিজার টুকরার বিয়ে হযরত আব্দুল্লাহর (রাঃ) সঙ্গে পড়িয়ে দিলেন। এই ঘটনা ঘটে হযরত ওমর ফারুকের (রাঃ) শাসনামলে। সে সময় বিভিন্ন মত অনুযায়ী হযরত যয়নবের (রাঃ) বয়স ছিল ১১ কিম্বা তের বছর। বিয়ের পর খান্দানের মহিলারা তাঁকে হযরত আব্দুল্লাহ (রাঃ) বিন জাফরের (রাঃ) বাড়ীতে স্বয়ং পৌছে দিয়ে এলেন। পরের দিন তিনি দাওয়াতে ওয়ালিমাহ করান। মোহরানার পরিমাণের ব্যাপারে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। কেউ কেউ ৪৮০ দিরহাম লিখেছেন। আবার কেউ কেউ বলেছেন ৪০ হাজারের কথা। হযরত আব্দুল্লাহ (রাঃ) বিন জাফর (রাঃ) সে সময় ব্যবসা করতেন এবং তাঁর আর্থিক অবস্থা খুব ভালো ছিল।

হযরত যয়নের (রাঃ) পারিবারিক জীবন অত্যন্ত সুন্দর ছিল। তিনি স্বামীর খুব খিদমতগুজার ছিলেন এবং আব্দুল্লাহও (রাঃ) তাঁর মনোতুষ্টির প্রশ্নে সামান্যতম ত্রুটিও করতেন না। যদিও বাড়ীতে দাসী ও খাদেম ছিল তবুও তিনি নিজের হাতেই কাজ-কাম করতেন। হযরত আব্দুল্লাহ (রাঃ) বিন জাফর (রাঃ) বলতেন, "যয়নব সর্বোত্তমগিন্নী।"

www.bjilibrary.com

হযরত আব্দুল্লাহ (রাঃ) অত্যন্ত প্রশস্ত হাত ও দানশীল ছিলেন। সাইয়েদাতুন নিসার (রাঃ) কন্যাও সেই একই রঙ্গে রঞ্জিত ছিলেন। কোন ভিক্ষুক অথবা অভাবগ্রস্ত তাঁর দরজায় এসে শূন্য হাতে ফিরে যাওয়াটা অসম্ভব ব্যাপার ছিল অথবা কারোর মুসিবত সম্পর্কে জানতে পেরে তার খবর না নেয়াটাও ছিল অসম্ভব। স্বামী-স্ত্রী এমন দানশীল ছিলেন যে, দান পাওয়ার অযোগ্যরাও তাঁদের নিকট দান পেয়েযেতেন।

একবার ইমাম হোসাইন (রাঃ) হযরত আব্দুল্লাহ বিন জাফরকে (রাঃ) বললেনঃ"হে চাচার পুত্র! তুমি বড় অপচয় কর এবং গায়ের মুঁসতাহিক ব্যক্তিদেরকেও নিজের আয়ে শরীক করে নাও।"

হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) জবাব দিলেন, "জানে বিরাদার। কি করবো। ভিক্ষুক দেখে অন্তর যে মানে না। আল্লাহ আমাকে এইজন্য সম্পদ দিয়েছেন যে, আমি মানুষের মধ্যে বন্টন করি।"

স্বামী গৃহের অঢেল সম্পদ হযরত যয়নবের (রাঃ) মেযাজে কোন পরিবর্তন সাধন করতে পারেনি। তিনি যথানিয়মে সাদা-সিধেভাবেই জীবন যাপন করতেন।

৩৭ হিজরীতে হযরত আলী কাররামাল্লাহ ওয়াজহাহু নিজের শাসনামলে কুফাকে অবস্থানস্থল বানালেন। এ সময় হযরত যয়নব (রাঃ) এবং হযরত আব্দুল্লাহ বিন জাফরও (রাঃ) মদীনা থেকে কুফা চলে এলেন। হযরত যয়নব (রাঃ) সেখানে অত্যন্ত দ্রুত শিক্ষা প্রদান, ওয়াজ ও হেদায়েতের কাজে মশগুল হয়ে পড়লেন। কুফার মহিলারা প্রায়ই সাইয়েদাহ যয়নবের (রাঃ) খিদমতে হাজির হতেন। তাঁরা শুধু তাঁর নিকট থেকে ওয়াজ নসিহতই শুনতেন না বরং কুরআনে করিমের অর্থও জিজ্ঞেস করতেন। একবার সাইয়েদাহ যয়নব (রাঃ) কতিপয় মহিলার সামনে সূরায়ে কা-হা-ইয়া-য়া-ছা-এর তাফসির করছিলেন। হযরত আলী কাররামাল্লাহ ওয়াজহাহু সেখানে তাশরীফ নিলেন এবং অত্যন্ত অনুসন্ধিৎসার সঙ্গে লখতে জিগরের বক্তব্য শুনতে লাগলেন। যখন তাঁর বক্তৃতা শেষ হলো তখন আমীরুল মুমিনিন অত্যন্ত খুশী হয়ে বললেনঃ "জানে পিদার। আমি তোমার বর্ণনা শুনেছি। আল্লাহর কালামের মর্মার্থ এত সুন্দরভাবে বর্ণনা করতে পারো জেনে খুব আনন্দিত হয়েছি।"

শিগগিরই হযরত যয়নবের (রাঃ) জ্ঞান ও ফজিলতের খ্যাতি দূর-দূরান্ত পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়লো। এটা তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠতম অধ্যায় ছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয়, সুখ ও শান্তির এই অধ্যায় খুব সংক্ষিপ্তকাল ছিল। ৪০ হিজরীর ১৭ই রমযানুল মুবারক হযরত আলী কাররামাল্লাহু ওয়াজহাহু কুফার মসজিদে রাব্বুল ইজ্জতের

www.bjilibrary.com

দরবারে সিজদাবনত ছিলেন। এমন সময় হতভাগা খারেজী আব্দুর রহমান বিন মালজাম তাঁর ওপর হত্যামূলক হামলা চালালো এবং নিজের বিষমাখা তরবারী দিয়ে আমীরুল মুমিনিনকে মারাত্মকভাবে আহত করলো। ইবনে মালজামকে মুসলমানরা গ্রেফতার করলেন।

হযরত যয়নজ (রাঃ) তাকে দেখে ক্রোধে অস্থির হয়ে পড়লেন এবং সম্বোধন করে বললেন ঃ "হে খোদার দুশমন। তুই আমিরুল মুমিনিনকে আহত করেছিস?

ইবনে মালজাম বললো,"আমিরুল মুমিনিনকে নয়, তোমার পিতাকে।"

হযরত যয়নব (রাঃ) বললেনঃ "ইনশাআল্লাহ তাঁর কিছুই হবে না।"

ইবনে মালজাম অত্যন্ত বেহায়ার মত জবাব দিলোঃ"তাহলে তুমি উহ, আহ কেন করছ? খোদার কসম, আমি কয়েকদিন যাবত নিজের তরবারীতে বিষ মিশিয়েছি।"

এই বিষমাখা তলোয়ারের আঘাতে আমীরুল মুমিনিন হযরত আলী কাররামাল্লাহু ওয়াজহাহু ৪০ হিজরীর ২১শে রমযানুল মুবারকে শাহাদাতের পিয়ালা পান করে জান্নাতে পৌছে গেলেন। মহান মর্যাদা এবং ইলম ও ফজিলতের খনি সদৃশ পিতার শাহাদাতে হযরত যয়নবের (রাঃ) ওপর শোক ও দুঃখের পাহাড় ভেঙ্গে পড়লো। কিন্তু তখনো তাঁর ভাগ্যে আরো বড় বড় দুঃখ লিখা ছিলো। ৪৯ অথবা ৫০ হিজরীতে তাঁকে বুজর্গ ভাই হযরত ইমাম হাসানের (রাঃ) শাহাদাতের দুঃখ সইতে হয়। সে সময় তিনি স্বামী ও সন্তানসহ মদীনায় অবস্থান করছিলেন।

৬০ হিজরীতে সাইয়েদেনা হযরত ইমাম হোসাইন (রাঃ) কুফাবাসীদের আমন্ত্রণে নিজের পরিবার পরিজন ও জীবন উৎসর্গকারীদের সমন্বয়ে গঠিত একটি ছোট দল সঙ্গে নিয়ে মক্কা থেকে কুফা রওয়ানা হন। হযরত যয়নবও (রাঃ)দুটি শিশু সন্তান নিয়ে এই দলে শামিল হন। হযরত আব্দুল্লাহ (রাঃ)বিন জাফর (রাঃ) যদিও নিজে এই কাফেলায় শরীক হতে পারেননি, কিন্তু তিনি হযরত যয়নব (রাঃ) এবং নিজের সন্তানদেরকে ইমাম হোসাইনের (রাঃ) সঙ্গে যাওয়ার অনুমতি প্রদান করেন। ৬১ হিজরীর ১০ই মুহাররাম কারবালা প্রান্তরে এক হৃদয়বিদারক ঘটনা সংঘটিত হলো। এই ঘটনা হযরত যয়নবের (রাঃ) চোখের সামনে তাঁর শিশু সন্তান, ভ্রাতুষ্পুত্র, ভাই এবং তাঁর কতিপয় সাথী সিরীয় বাহিনীর বিরুদ্ধে বীরত্বের সঙ্গে লড়াই করে এক এক করে শহীদ হয়ে গেলেন। এই সময় সাইয়েদাহ যয়নব (রাঃ) যে সাহস, বীরত্ব এবং ধৈর্য ও অটলতার পরিচয় দিয়েছেন ইতিহাসে নজিরবিহীন ঘটনা হিসেবে তা লিপিবদ্ধ রয়েছে।

www.bjilibrary.com

কথিত আছে যে, ৯ এবং ১০ মুহাররামের মধ্যবর্তী রাতে হযরত ইমাম হোসাইনের (রাঃ) তরবারী পরিষ্কার করা হচ্ছিল। তিনি এসময় কতিপয় শিক্ষণীয় কবিতা আবৃত্তি করেন। হযরত যয়নব (রাঃ) নিকটেই ছিলেন। কবিতা শুনে তিনি মূর্ছা গেলেন এবং মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল ঃ

"হায়, আফসোস! আজ যদি আমি জীবিত না থাকতাম! হায়, আমার নানা, আমার মা, আমার পিতা এবং ভাই হাসান সকলেই আমাকে বিচ্ছিন্নতার দাগ দিয়ে গেছেন। হে ভাই! আল্লাহর পর আমাদের সহায় আপনিই। আপনাকে ছাড়া আমরা কিভাবে জীবিত থাকবো?"

ইমাম হোসাইন (রাঃ) বললেন, "যয়নব সবর কর।"

হযরত যয়নব (রাঃ) কাঁদতে কাঁদতে আরজ করলেন, "আপনার পরিবর্তে আমি নিজের জীবন দিতে চাই।"

ইমাম হোসাইন (রাঃ) প্রিয় বোনের অন্তর নিংড়ানো কথা শুনে অশ্রুসজল হয়ে উঠলেন। কিন্তু মুমিনের শানে বললেনঃ

"বোন আমার! ধৈর্য ধর। খোদার থেকে সান্ত্বনা লাভ কর। খোদার জাত ছাড়া সকল সৃষ্টিই ধ্বংস হবে। আমাদের জন্য আমাদের নানাই আদর্শ। তাঁর উত্তম আদর্শকেই তুমি অনুসরণ করবে। হে বোন! খোদার কসম, আমি যদি হক পথে শেষ হয়ে যাই তাহলে আমার মাতমে বুক চাপড়িয়োনা, মুখ ক্ষত-বিক্ষত করোনা এবং চীৎকার করে ক্রন্দন করোনা।"

১০ই মুহাররাম যখন আহলে বাইতের সকল জীবন উৎসর্গকারী এক এক করে শহীদ হয়ে গেলেন তখন আহলে বাইতের যুবকদের পালা এলো। হযরত আলী আকবার বিন হোসাইন (রাঃ) বীরত্ব প্রদর্শন করে শহীদ হয়ে গেলে হযরত যয়নব (রাঃ) "হে ভাইয়ের পুত্র" বলে তাঁবুর বাইরে দৌড়ে গেলেন। এই ভ্রাতুষ্পুত্রকে তিনি অত্যন্ত আদর যত্নে লালন-পালন করেছিলেন। রক্তাক্ত লাশের সঙ্গে তিনি মিশে গেলেন। হযরত হোসাইন (রাঃ) তাঁকে সেখান থেকে তুলে তাঁবুর মধ্যে প্রেরণ করলেন এবং যুবক পুত্রের লাশ উঠিয়ে তাঁবুর সামনে নিয়ে এলেন।

আলী আকবারের (রাঃ) পর আব্দুল্লাহ বিন মুসলিম বিন আকিল (রাঃ), আহমদ বিন হাসান (রাঃ), আবু- বকর আব্দুল্লাহ বিন হাসান (রাঃ), জাফর আকিল (রাঃ), ওমর বিন আলী (রাঃ), ওসমান বিন আলী (রাঃ) এবং অন্যান্য যুবক (৭ ব্যক্তি ছাড়া) এক এক করে অত্যন্ত বাহাদুরীর সঙ্গে লড়াই করতে করতে শহীদ হয়ে

www.bjilibrary.com

গেলেন। এক্ষণে হযরত যয়নব (রাঃ) যুবক পুত্র আওন (রাঃ) এবং মুহাম্মাদকে (রাঃ) যুদ্ধের ময়দানে প্রেরণের জন্য সাইয়েদেনা হোসাইনের (রাঃ) নিকট অনুমতি চাইলেন। তিনি অনুমতি দানে চিন্তা করতে লাগলেন। কিন্তু হযরত যয়নব (রাঃ) এত পীড়াপীড়ি করলেন যে, অনিচ্ছা সত্ত্বেও তিনি তাঁদেরকে যুদ্ধের ময়দানে প্রেরণে বাধ্য হলেন। যয়নবের (রাঃ) দুই পুত্র প্রচন্ড বাহাদুরীর সঙ্গে লড়াই করতে লাগলেন। অবশেষে সিরীয়রা তাঁদেরকে আয়ত্তে এনে তরবারী এবং বর্শার আঘাতে জর্জরিত করে ফেললো। আর এমনিভাবে দুই যুবক শাহাদাতের পিয়ালা পান করে জান্নাতবাসী হয়ে গেলেন। দুঃখিনী যয়নব (রাঃ) এবং মজলুম মামুর (রাঃ) দিল ও অন্তরের টুকরা উড়ে গেলেন কিন্তু তাঁরা আসমানের দিকে তাকিয়ে চুপ মেরে গেলেন।

আওন ও মুহাম্মাদের (রাঃ) শাহাদাতের পর নবী পরিবারের অবশিষ্ট যুবকরাও এক এক করে শহীদ হয়ে গেলেন। আব্বাস বিন আলী (রাঃ) প্রথমেই শহীদ হয়েছিলেন। এখন সাইয়েদেনা হোসাইন (রাঃ) শুধু একা রয়ে গেলেন। যয়নুল আবেদীন আলী (রাঃ) বিন হোসাইন (রাঃ) অসুস্থ ছিলেন এবং যুদ্ধ করার যোগ্য ছিলেননা। তাঁকে আল্লাহ এবং যয়নবের (রাঃ) নিকট সোপর্দ করলেন এবং সবাইকে খোদা হাফেজ বলে রাসুলের নাতি (রাঃ) শেষ সফরে রওয়ানা হয়ে গেলেন। তিনি পিপাসার্ত ছিলেন। নিজের কলিজার টুকরাদের এবং জীবন উৎসর্গকারীদের শাহাদাতে তাঁর অন্তর ছিল ছিন্নভিন্ন। কিন্তু তিনিতো ছিলেন হায়দারে কাররারের পুত্র। কিয়ামতের মত হামলা করে বসলেন। তাতে দুশমনের ব্যূহ ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। যেদিকে এগুতেন সেদিকেই শত্রু নিশ্চিহ্ন হয়ে যেত। সিরীয়রা বার বার হামলা করছিলো। কিন্তু যেই হোসাইনের (রাঃ) তরবারী চমকে উঠতো তখনই তারা পালিয়ে যেতো। ইমাম হোসাইনের (রাঃ) সওয়ার আঘাতে আঘাতে ক্ষত-বিক্ষত হয়ে গেল। এসত্ত্বেও একা একা কেউ তাঁর ওপর হামলা করতে সাহস পায়নি। চারদিক থেকে তীর, তলোয়ার, খঞ্জর ও বর্শার বৃষ্টি হচ্ছিল। হাছিন বিন নুমায়ের একটি বর্শা নিক্ষেপ করলো। এই বর্শা এসে লাগলো হযরত হোসাইনের (রাঃ) গলায়। পবিত্র মুখ দিয়ে রক্তের ফোয়ারা ছুটলো। তিনি আঁজলা ভরে রক্ত নিয়ে আসমানের দিকে নিক্ষেপ করলেন এবং বললেনঃ

"হে আল্লাহ। তোমার হাবিবের (সাঃ) নাতীর সঙ্গে যা কিছু করা হচ্ছে সে ব্যাপারে তোমার নিকটই ফরিয়াদ করছি।"

হযরত যয়নব (রাঃ) দূর থেকে প্রিয় ভাইকে রক্ত কুলি করতে দেখে অস্থির হয়ে পড়লেন এবং দৌড়িয়ে যুদ্ধ ক্ষেত্রের নিকটে একটি টিলার ওপর দাঁড়িয়ে গেলেন। সেখান থেকেই সিরীয় বাহিনীর সেনাপতি আমর বিন সা'দকে ডেকে

www.bjilibrary.com

বললেনঃ "হে আমর বিন সা'দ। কি ধরনের কিয়ামত যে, আবু আব্দুল্লাহকে কতল করা হচ্ছে আর তুমি তা দেখছো!"

ক্ষমতার মোহ আমর বিন সা'দের চোখে পর্দা লটকে রেখেছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও সে হুজুরের (সাঃ) মামাতো ভাইয়ের (হযরত সা'দ (রাঃ) বিন আবি ওকাস) পুত্র ছিল। লজ্জায় কাঁদতে লাগলো এবং হযরত যয়নবের (রাঃ) দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলো। কিন্তু সিরীয়দেরকে লড়াই থেকে ফিরানো এখন তার সাধ্যাতীত ব্যাপার ছিল। জুলুম থেকে ফিরানো তার বিধিলিপি ছিলনা। সাইয়েদেনা হোসাইন (রাঃ) হযরত যয়নবের (রাঃ) সামনে বীরত্বের সঙ্গে লড়াই করতে করতে শহীদ হয়ে গেলেন। তাঁর শাহাদাতের পরও পাথরের মত কঠিন সিরীয়দের অন্তর ঠান্ডা হলোনা। তারা কারবালার শহীদদের পবিত্র দেহকে ঘোড়ার পায়ে পিষ্ট করলো। সাইয়েদাতুন নিসার (রাঃ) পুত্রের পবিত্র মাথা বর্শার মাথায় চড়ালো। অতঃপর আহলে বাইতের তাঁবুর দিকে যাত্রা করলো। এক হতভাগা চাইলো যে, হযরত যয়নুল আবেদীনকেও (রাঃ) (অসুস্থ ছিলেন) শহীদ করে ফেলবে। কিন্তু হযরত যয়নব (রাঃ) তাদের সামনে দাঁড়িয়ে গেলেন এবং বললেনঃ "খোদার কসম! আমি যতক্ষণ জীবিত আছি, এই রোগীকে কেউ হত্যা করতে পারবেনা।"তাঁর দৃঢ়তা দেখে সেই হতভাগা আর সামনে এগুতেসাহসপেলোনা।

৬১ হিজরীর ১২ই মুহাররাম হোসাইনী কাফেলার জীবিত কিছু মহিলা, শিশু ও অসুস্থ আবেদকে সিরীয় সৈন্যরা গ্রেফতার করে কুফার দিকে নিয়ে চললো। শহীদদের লাশ তখনো কারবালার ময়দানে কাফন ও দাফন ছাড়াই পড়ে ছিল। যখন এই মজলুম কাফেলা তাঁদের পাশ দিয়ে অতিক্রম করছিলো তখন কাফেলার লোকজন দুঃখে অস্থির হয়ে উঠলেন। এসময় হযরত যয়নবের (রাঃ) দুঃখপূর্ণ আবেগ এই কয়েকটি বাক্যে প্রকাশ পেলঃ

"হে মুহাম্মাদ মুস্তাফা! আসুন, দেখুন। আপনার হোসাইনের (রাঃ) রক্তে রঞ্জিত লাশ পাথরের ময়দানে পড়ে রয়েছে। তাঁর দেহ ছিন্নভিন্ন করা হয়েছে, আপনার পরিবারের মেয়েরা রশিতে বাঁধা অবস্থায় রয়েছে, আপনার বংশধরদের হত্যা করে গরম বালুর ওপর বিছিয়ে দেয়া হয়েছে এবং তার ওপর মাটি উড়ছে। হে আমার নানা! এরা আপনার সন্তান-সন্ততি। তাদেরকে হাঁকিয়ে ফেরা হচ্ছে। হোসাইনকে (রাঃ) একটু দেখুন, তাঁর মাথা কেটে নেয়া হয়েছে। তাঁর পাগড়ী এবং চাদর ছিনিয়ে নেয়া হয়েছে।" যয়নব কুবরার (রাঃ) শোক গাথা শুনে শত্রু-বন্ধু সবাই কাঁদতো।

www.bjilibrary.com

যখন হকের কয়েদীদের প্রত্যাবর্তনকারী কাফেলা কূফায় প্রবেশ করলো তখন কূফার হাজার হাজার মানুষ তাঁদেরকে দেখার জন্য একত্রিত হলো। তাদের অনেকের চোখে অশ্রু ছিল। বিশ্বাসঘাতক কুফাদের ভিড় দেখে শেরে খোদার কন্যা নিজেকে আয়ত্তে রাখতে পারলেননা। তাদেরকে সম্বোধন করে বললেনঃ

"হে লোকেরা। দৃষ্টি নীচু কর। এরা মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহর (সাঃ) লুন্ঠিত সন্তান--সন্ততি।" এরপর তিনি কূফাবাসীর সামনে এক শিক্ষণীয় খুতবা দিলেন। মনে হচ্ছিল যে, স্বয়ং হায়দারে কাররার বক্তৃতা দিচ্ছেন। আল্লাহর হামদ ও ছানা বর্ণনার পর তিনি বললেনঃ

"হে কূফাবাসী। হে ধোঁকাবাজেরা। হে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গকারীরা। খোদা তোমাদের চোখকে চিরকালের জন্য কাঁদাক। তোমাদের উদাহরণ সেইসব মহিলাদের সঙ্গে দেয়া যায় যারা স্বয়ং সূতা কাটে এবং তা ছিন্নভিন্ন করে ফেলে। তোমরা স্বয়ং আমার ভাইয়ের সঙ্গে বাইয়াতের সম্পর্ক জুড়েছ এবং তোমরাই তা ছিন্ন করেছ। তোমাদের প্রকৃতিতে রয়েছে মিথ্যা ও দাগাবাজি, তোষামোদী এবং বিশ্বাসঘাতকতা তোমাদের স্বভাবজাত ব্যাপার। তোমরা যা কিছু আগে প্রেরণ করেছ তা খুব খারাব। তোমরা খাইরুল বাশারের (সাঃ) নাতীকে হত্যা করেছ। তিনি জান্নাতের যুবকদের সরদার। খোদার গজব তোমাদের জন্য অপেক্ষা করছে।

হে কূফাবাসী। তোমরা এক বিরাট পাপের কাজ করেছ। যা তোমাদের মুখের বিকৃতি ঘটাতে পারে এবং মুসিবতে নিক্ষেপ করতে পারে। স্মরণ রেখো, তোমাদের রবনাফরমানদের খোঁজেআছেন।"

এই বক্তৃতা শুনে কূফাবাসী এতো লজ্জিত হলো যে, তাদের অনেকেই কাঁদতে কাঁদতে অস্থির হয়ে পড়লো।

পরের দিন কূফার গবর্নর উবায়েদুল্লাহ বিন যিয়াদ দরবার বসালো এবং আহলে বাইতের বন্দীদেরকে তার সামনে পেশ করা হলো। হযরত যয়নব (রাঃ) অত্যন্ত ক্লান্ত অবস্থায় ছিলেন। ইবনে যিয়াদ জিজ্ঞাসা করলো, এই মহিলা কে?

একজন বললো, তিনি যয়নব (রাঃ) বিনতে আলী (রাঃ)।

ইবনে যিয়াদ বললো, খোদার শোকর। তিনি তোমাদের অসম্মানিত করেছেন।

www.bjilibrary.com

হযরত যয়নব (রাঃ) অত্যন্ত নির্ভীক চিত্তে বললেনঃ "খোদার শোকর। তিনি নিজের রাসূলের (সাঃ) মাধ্যমে আমাদেরকে ইজ্জত দান করেছেন। ইনশাআল্লাহ ফাসিক অসম্মানিত হবে এবং মিথ্যা প্রতিপন্ন হবে। "

ইবনে যিয়াদ বললো, তুমি দেখেছ যে, তোমার ভাই এবং তার সঙ্গীদের কি হাশর হয়েছে?

হযরত যয়নব বললেন, আল্লাহতায়ালা তাঁকে শাহাদাতের মর্যাদায় অভিষিক্ত করেছেন। শিগগিরই তিনি এবং তুমি হাশরের ময়দানে একত্রিত হবে। সে সময় তুমি টের পাবে কার হাশর কি হয়।

ইবনে যিয়াদ চীৎকার করে বললো, বনি হাশিমের সবচেয়ে বিদ্রোহী ব্যক্তির হত্যায় আমার অন্তর ঠান্ডা হয়েছে।

ইবনে যিয়াদের এধরনের আনন্দ প্রকাশে হযরত যয়নব (রাঃ) খুব দুঃখিত হলেন। তাঁর অন্তর কারবালার ঘটনায় এমনিতেই দীর্ণ–বিদীর্ণ হয়েছিল। তার কথায় তিনি কেঁদে দিলেন এবং বললেনঃ–"খোদার কসম। তুমি আমাদেরকে ঘরের বাইরে বের করেছ,আমাদের প্রৌঢ়দের হত্যা করেছ, আমাদের ডাল কেটেছ, আমাদের শিকড় উপড়ে ফেলেছ। এতে যদি তোমার অন্তর ঠান্ডা হওয়ার হয় তাহলে তা হয়েছে।"

ইবনে যিয়াদ কোন উত্তর দিতে পারলোনা। তার নজর পড়লো হযরত যয়নুল আবেদীনের (রাঃ) ওপর। জিজ্ঞেস করলোঃ "ছেলে, তুমি কে?" তিনি জবাব দিলেন,"আলী বিন হোসাইন।" ইবনে যিয়াদ আমর বিন সা'দকে জিজ্ঞাসা করলো,"একে হত্যা করোনি কেন?" সে বললো,"অসুস্থ।" ইবনে যিয়াদ বললো,"তাকে আমার সামনে হত্যা করো।" হযরত যয়নব (রাঃ) এই নির্দেশ শুনে কেঁপে উঠলেন। তিনি বললেনঃ "হে ইবনে যিয়াদ। এখনো কি তুই আমাদের খুন পান করে তৃপ্ত হসনি। অসুস্থ মুসিবতজাদাহ শিশুকেও হত্যা করবি। যদি তাকে হত্যা করতে হয় তাহলে তার সঙ্গে আমাকেও মেরে ফেল। " একথা বলেই তিনি হযরত যয়নুল আবেদীনের (রাঃ) সঙ্গে মিশে গেলেন। ইবনে যিয়াদের মনে অন্য ধারণার উদয় হলো এবং এই ছেলেটিকে মহিলাদের সঙ্গে থাকার নির্দেশ দিলো। কয়েকদিন পর ইবনে যিয়াদ শহীদদের মাথা এবং আহলে বাইতের বন্দীদেরকে সৈন্যের পাহারায় ইয়াযিদের নিকট দামেস্কে প্রেরণ করলো।

www.bjilibrary.com

দীর্ঘ সফরের কষ্ট স্বীকার করে আহলে বাইতের বন্দীরা দামেস্ক পৌঁছলেন। তিন– চার দিন পর তাঁদেরকে ইয়াযিদের দরবারে পেশ করা হলো। একজন লাল রংয়ের সিরীয় ফাতিমা (রাঃ) বিনতে হোসাইনের (রাঃ) দিকে ইঙ্গিত করে বললোঃ

"আমীরুল মুমিনিন! মেয়েটিকে আমাকে দিয়ে দিন।" হযরত যয়নব (রাঃ) কেঁপে উঠে বললেন, "খোদার কসম! এই মেয়ে তুমি পেতে পারনা। ইয়াযিদও এই মেয়ে পেতে পারে না। যতক্ষণ পর্যন্ত সে আল্লাহর দ্বীন ত্যাগ করার ঘোষণা না দেয়। পয়গম্বরের (সাঃ) বংশের কাউকে তুমি অথবা তোমার বাদশাহ কখনই দাসী বানাতেপোরেনা।"

সিরিয়টি দ্বিতীয়বার একই প্রশ্ন করলো। কিন্তু ইয়াযিদ তাতে বাধা দিলো।

ইমাম হোসাইনের (রাঃ) পবিত্র মাথা যখন ইয়াযিদের সামনে পেশ করা হলো তখন আহলে বাইতের মহিলারা ক্রন্দন করতে লাগলেন। হযরত যয়নব (রাঃ) পবিত্র মাথার প্রতি সম্বোধন করে বললেনঃ

"হে হোসাইন! হে মুহাম্মাদ মুস্তাফার দিলবন্দ! রাসূলের (সাঃ) পিঠে সওয়ারকারী! ফাতিমাতুজ জোহরার কলিজার টুকরা! জান্নাতের যুবকদের সরদার!"

ইয়াযিদ জিজ্ঞেস করলো," এই মহিলা কে?"

তাকে বলা হলো, হোসাইনের (রাঃ) ছোট বোন যয়নব (রাঃ)। ইয়াযিদ হযরত যয়নবকে (রাঃ) সম্বোধন করে বললোঃ"তোমার ভাই কি বলতো না যে আমি ইয়াযিদ থেকে উত্তম এবং আমার পিতা ইয়াযিদের পিতা থেকে উত্তম?"

হযরত যয়নব (রাঃ) খুব সাহসিকতার সঙ্গে জবাব দিলেনঃ "অবশ্যই আমার ভাই সত্য কথা বলতেন।"

ইয়াযিদ বললোঃ" আমার বয়সের কসম! হোসাইনের নানা(সাঃ) আমার দাদার চেয়ে উত্তম ছিলেন। হোসাইনের মা আমার মা থেকে উত্তম ছিলেন। রইলো আমার পিতা এবং হোসাইনের পিতা। এটাতো সাবারই জানা যে খোদা কার পক্ষে সিদ্ধান্তদিয়েদিয়েছেন।"

এই কথার ওপর হযরত যয়নব (রাঃ) ইয়াযিদ ও তার দরবারের লোকদেরকে সম্বোধন করে এক হৃদয়–স্পর্শী বক্তৃতা করলেন। হামদ ও ছানা বর্ণনার পর তিনি বললেনঃ

www.bjilibrary.com

"হে ইয়াযিদ! পৃথিবীর ঘূর্ণন ও মুসিবতের পাহাড়ের কারণে আমি আজ তোমাকে সম্বোধন করতে বাধ্য হয়েছি। মনে রেখ রাব্বুল ইজ্জত আমাদেরকে বেশীদিন পর্যন্ত এই অবস্থায় রাখবেন না। আমাদের উদ্দেশ্যকে ব্যর্থ করবেন না। তুমি আমাদের ক্ষতি করোনি। নিজেকেই ক্ষতিগ্রস্ত করেছ। হায়! তোমার লোকজন রাসূলের(সাঃ) পিঠের সওয়ার এবং তাঁর ভাইদের, সন্তানদের এবং সঙ্গীদেরকে অত্যন্ত নির্দয়ভাবে হত্যা করেছে। তারা পর্দানশীন আহলে বাইতকে অমর্যাদা করেছে। হায়! তুমি যদি সে সময় কারবালার শহীদানকে দেখতে তাহলে নিজের সকল সম্পদ ও মর্যাদার পরিবর্তে তাঁদের পাশে দাঁড়ানোকেই পছন্দ করতে। আমরা খুব শিগগিরই নানার (সাঃ) খিদমতে হাজির হয়ে তোমার হাতের দুঃখের কথা বর্ণনা করবো। আর এই ফরিয়াদ সেই স্থানে করবো যেখানে আওলাদে রাসূল (সাঃ) এবং তাঁর সঙ্গীরা একত্রিত হবে। তাঁদের চেহারার খুন এবং শরীরের মাটি পরিষ্কার করা হবে। সেখানে জালেমদের থেকে প্রতিশোধ নেয়া হবে। হোসাইন(রাঃ) এবং তাঁর সঙ্গীরা মারা যাননি। স্রষ্টার নিকট জীবিত রয়েছেন এবং তাই তাঁদের জন্য যথেষ্ট। সেই প্রকৃত আদিল বা ইনসাফকারী নবীর (সাঃ) আওলাদ এবং তাঁর সঙ্গীদের হত্যাকারীদের নিকট থেকে অবশ্যই প্রতিশোধ নেবেন। সেই আমাদের আশার স্থল এবং তাঁর নিকটেই আমরা ফরিয়াদ করি।"

হায়দারে কাররারের (রাঃ) কন্যার গর্জন শুনে ইয়াযিদ এবং তার দরবারীরা মূর্ছা যাওয়ার মত অবস্থায় উপনীত হলো। ইয়াযিদ ভীত হয়ে পড়লো যে, লোকজন কোথাও রাসূলের (সাঃ) বংশের সমর্থনে তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ না করে বসে। সে আহলে বাইতের মহিলাদেরকে নিজের বিশেষ হেরেমে অবস্থান করতে দিলো এবং যতদূর সম্ভব তাঁদের মন জোগানোর চেষ্টা করলো। কিছুদিন পর সে হযরত নুমান বিন বশির আনসারীর (রাঃ) তত্ত্বাবধানে আহলে বাইতের কাফেলাকে মদীনা মুনাওয়ারা রওয়ানা করে দিলো। কাফেলা যখন রওয়ানা হলো তখন হযরত যয়নব (রাঃ) বললেনঃ" উটের হাওদাজের ওপর কালো চাদর দিয়ে দাও। যাতে যারা দেখবে তারা বুঝতে পারে যে, এটা সাইয়েদাতুন নিসার (রাঃ) ক্ষত-বিক্ষত অন্তরের সন্তান।"

হযরত নোমান বিন বশির (রাঃ) যতদূর সম্ভব এই মুসিবতজাদাহ মুসাফিরদেরকে সাহায্য করলেন এবং রাস্তায় তাঁদের কোন কষ্ট হতে দিলেন না। এই কাফেলা যখন কারবালা পৌছলো তখন সেখানে বুজর্গ সাহাবী হযরত জাবের বিন আব্দুল্লাহ আনসারী (রাঃ) এবং বনু হাশিমের কতিপয় ব্যক্তি মদীনা থেকে এসে উপস্থিত হয়েছিলেন। তাঁদেরকে দেখে হযরত যয়নব (রাঃ) দুঃখে বলে উঠলেনঃ

www.bjilibrary.com

"হে বনি হাশিম! তোমাদের চাঁদ ডুবে গেছে। হে আমার নানার সাহাবী! তোমরা যে শিশুকে কখনো রাসুলের (সাঃ) পবিত্র পিঠের ওপর সওয়ার করিয়েছিলে তাঁর পবিত্র দেহ ঘোড়ার খুর দিয়ে দলিত মথিত করা হয়েছে।"

এরপর কাঁদতে কাঁদতে মূর্ছা গেলেন। এ সময় উপস্থিত অন্যরাও কাঁদতে লাগলেন। কাফেলা যখন মদীনা পৌছলো তখন সূর্য ঢলে পড়েছে। খায়বার বিজয়ীর (রাঃ) কন্যা যয়নব (রাঃ) ও ফাতিমা (রাঃ) হযরত নোমানের (রাঃ) সুন্দর আচরণের বিনিময়ে হাতের চুরি খুলে পেশ করলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের কিছু না থাকার কারণে তাঁর খিদমতের মূল্য দিতে পারছেননা বলে ক্ষমা চাইলেন। নোমান (রাঃ) অশ্রুসজল নেত্রে বললেনঃ

"হে বানাতে রাসূল! খোদার কসম, আমি যা কিছু করেছি তা শুধু আল্লাহ এবং তাঁর রাসুলের (সাঃ) জন্য করেছি। এই চুরি নিয়ে আমি আমার সওয়াব নষ্ট করবোনা। খোদার ওয়াস্তে তা আপনার নিকটই রাখুন।"

সমগ্র মদীনা সেদিন শোকাচ্ছন্ন হয়ে রইলো। হাজার হাজার মানুষ কাঁদতে কাঁদতে মুসিবতজাদাহ মুসাফিরদের এগিয়ে নিল। হযরত যয়নব (রাঃ) নবীর (সাঃ) রওজায় হাজির হলে মুখ দিয়ে এই কথা বেরিয়ে গেল ঃ

"হে আমার প্রিয় নানাজান! আমি আপনার ফরজন্দ এবং আমার ভাই হোসাইনের (রাঃ) শাহাদাতের খবর নিয়ে এসেছি। আপনার সন্তানদেরকে রশিতে বেঁধে কুফা ও দামেশকের গলিতে ঘোরানো হয়েছে।"

এ সময় নবীর (সাঃ) রওজার নিকটে উপস্থিত সকল মানুষ হযরত যয়নবের (রাঃ) কথা শুনে কাঁদতে লাগলেন। অতঃপর তিনি বুজর্গ মা সাইয়েদাতুন নিসা ফাতিমাতুজ জোহরার (রাঃ) মাজারে গেলেন এবং এমনভাবে কাঁদতে লাগলেন যে পাথরের অন্তরও যেন পানি হয়ে যেতে লাগলো। এরপর তিনি খান্দানের অন্যান্য লোকদের সঙ্গে মিলিত হলেন। তাঁদেরকে দুঃখের কাহিনী শুনালেন এবং সকলকে সবরের তালকিন দিলেন।

সীমাহীন মুসিবতে হযরত যয়নবের (রাঃ) অন্তর ও কলিজা ভেঙ্গে খান খান হয়ে গিয়েছিল। এক রাওয়ায়েতে অনুযায়ী তিনি ৬২ হিজরীতে মদীনা মুনাওয়ারাতেই ইন্তিকাল করেন। আর এমনিভাবে আহলে বাইতের অভিভাবক, কারবালার শহীদদের স্মারক এবং দুশমনকে আল্লাহর আজাব সম্পর্কে ভীতি প্রদর্শনকারী,

www.bjilibrary.com

নজিরবিহীন খোতবাদানকারিনী নিজের প্রিয় ও মজলুম ভাইয়ের সঙ্গে জান্নাতুল ফিরদাউসে গিয়ে মিলিত হলেন।

অন্য এক রাওয়াত অনুযায়ী হযরত যয়নব (রাঃ) স্বামী হযরত আব্দুল্লাহ বিন জাফরের (রাঃ) সঙ্গে সিরিয়া চলে যান। দামেস্কের নিকট হযরত আব্দুল্লাহর (রাঃ) কিছু জমি ছিল। সেখানে পৌছার পর অসুস্থ হয়ে পড়লেন এবং সেখানেই ইন্তিকাল করেন।

অন্য আরেক রাওয়ায়েত অনুযায়ী হযরত যয়নব (রাঃ) মদীনা পৌছে শাহীদানে কারবালার দুঃখ মুসিবতের কথা অত্যন্ত দরদ ভরা ভাষায় লোকদের শুনাতেন। তাঁর বক্তৃতায় মানুষেরা খুব প্রভাবিত হতো এবং তাদের মধ্যে আওলাদে রাসুলের (সাঃ) সহযোগিতার আবেগ সৃষ্টি হতো। মদীনার গবর্নর এই অবস্থার খবর ইয়াযিদকে দিলো। সে যয়নবকে (রাঃ) অন্য শহরে পাঠিয়ে দেয়ার নির্দেশ দিল। হযরত যয়নব (রাঃ) প্রথমে যেতে রাজি হননি। অতঃপর কতিপয় শুভাকাংখীর বুঝানোর পর সম্মত হলেন এবং হযরত সাকিনা (রাঃ) ও ফাতিমা (রাঃ) (বোনাতে হোসাইন) এবং কিছু মহিলা আত্মীয়কে সঙ্গে নিয়ে মিসর গমন করেন। সেখানকার গবর্নর হযরত মাসলামাহ (রাঃ) বিন মুখাল্লাদ আনসারী (রাঃ) তাঁকে খুব শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শন করলেন এবং নিজের আবাসস্থলেই রাখলেন। প্রায় এক বছর পর ৬৩ হিজরীতে হযরত যয়নব (রাঃ) সেখানেই নশ্বর জগত থেকে অবিনশ্বর জগতের দিকে যাত্রা করলেন। মদীনায় হযরত যয়নবের (রাঃ) কবরের কোন নিশানা নেই। অবশ্য দামেস্ক এবং কায়রো উভয় স্থানেই তাঁর মাজার রয়েছে।

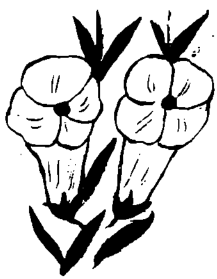

www.bjilibrary.com

হযরত সানজারাহ (রাঃ) বিনতে তামিম

কোরেশের কোন বংশের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত ছিলেন। নবীর (সাঃ) হিজরতের পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করেন। মদীনায় হিজরতের অনুমতি প্রাপ্তির পর তিনিও অন্যান্য মুহাজিরের সঙ্গে মক্কা থেকে মদীনা হিজরত করেন এবং অবশিষ্ট জীবন সেখানেই কাটান।

হযরত আরনাব (রাঃ) আনসারিয়াহ

কতিপয় রাওয়ায়েত থেকে জানা যায় যে, প্রিয় নবী (সাঃ) বিয়ে-শাদী এবং আনন্দ-উৎসবে আনসার মেয়েদেরকে গীত গাওয়ার অনুমতি দিতেন। এক আনসারী সাহাবীয়াহ হযরত আরনাব (রাঃ) অনেক গীত জানতেন। হুজুর (সাঃ) তাঁকে আনসারের কিছু বিয়েতে গীত গাওয়ার অনুমতি দিয়েছিলেন। হাফিজ ইবনে হাজার (রঃ) "আল-ইসাবাহতে" হযরত আরনাবের (রাঃ) কথা উল্লেখ করেছেন।

বিবি কুররাতুনা (রাঃ)

কতিপয় রাওয়ায়েতে তাঁর নাম ফুররাতুনা অথবা ফুরতনীও উল্লেখ করা হয়েছে। মক্কার মশহুর ইসলামের শত্রু কবি আব্দুল্লাহ বিন খাতালের বাঁদী ছিলেন। সে তাঁকে দিয়ে প্রিয় নবী (সাঃ) ও সাহাবায়ে কিরামের (রাঃ) গালি সম্বলিত কবিতা

www.bjilibrary.com

মুখস্ত করিয়ে রেখেছিলো। খরতাল দিয়ে তিনি তা গাইতেন। মক্কা বিজয়ের সময় হুজুর (সাঃ) তাঁকে হত্যার যোগ্য বলে ঘোষণা করলেন। কিন্তু তিনি নিখোঁজ হয়ে গেলেন। একদিন একাকী রহমতে আলমের (সাঃ) খিদমতে হাজির হয়ে নিজের অতীত জীবন সম্পর্কে লজ্জা প্রকাশ এবং সঙ্গে সঙ্গে ইসলাম গ্রহণ করলেন। হুজুর (সাঃ) তাঁকে ক্ষমা করে দিলেন। তারপর তিনি এক মুমিনা মহিলা হিসেবে জীবন কাটান। সাইয়েদেনা হযরত ওসমান জুন্নুরাইনের (রাঃ) খিলাফতকাল পর্যন্ত তিনি জীবিত ছিলেন।

বিবি সাররাহ (রাঃ)

কেউ কেউ তাঁর নাম সায়েরাও লিখেছেন। আবু আমর বিন সাইফি বিন হাশিমের (রাসূলের (সাঃ) দাদা) বাঁদী ছিলেন। গান-বাদ্য এবং শোক-গাথা গাওয়াই তাঁর পেশা ছিল। কবি ইবনে খাতাল (বনু তামিম বিন গালিব বংশোদ্ভূত) রাসূলে করিম (সাঃ) এবং সাহাবায়ে কিরামকে (রাঃ) গালি দিয়ে তা তাঁকে মুখস্ত করিয়ে দিত এবং তিনি তা মুশরিকদের নিকট গেয়ে পুরস্কার ইত্যাদি গ্রহণ করতেন। মক্কা বিজয়ের কিছুদিন আগে মক্কা থেকে মদীনা এলেন এবং রহমতে আলমের (সাঃ) খিদমতে হাজির হলেন। এসময় তাঁর ও রাসূলের (সাঃ) মধ্যে এই কথোপকথন হয়েছিলঃ

রাসূলে আকরাম (সাঃ)ঃ তুই কি ইসলাম গ্রহণ করতে এসেছিস?

সাররাহঃনা।

রাসূল (সাঃ)ঃ তাহলে কিজন্য এসেছিস?

সাররাহঃ হুজুর আমার মালিক ও প্রভুর সন্তান।

রাসূল (সাঃ)ঃ পরিষ্কার করে বল।

সাররাহঃ আমি দারিদ্রতার পিঞ্জরে আবদ্ধ হয়ে পড়েছি।

রাসূল (সাঃ)ঃ মাকানা ফি গিনায়িকা মা য়ুগনিকা।

www.bjilibrary.com

সাররাহঃ যখন থেকে আমার কতিপয় মেহেরবান সরদার বদরের যুদ্ধে নিহত হয় তখন থেকে কোরেশরা গান–বাদ্যে আন্তরিকতা ছেড়ে দিয়েছে।

রাসুল (সাঃ)ঃ এখন তোর উদ্দেশ্য কি?

সাররাহঃ আত্মীয়তা এবং নগদ ও বস্তুগত সাহায্য।

প্রিয় নবীর (সাঃ) তাঁর ওপর রহম এসে গেল এবং তিনি সাহাবায়ে কিরামকে (রাঃ) তাঁকে সাহায্য করার উৎসাহ দিলেন। সাহাবায়ে কিরাম (রাঃ) কাপড় এবং নগদ আকারে যথেষ্ট সাহায্যের ব্যবস্থা করে দিলেন এবং পাথেয় ও সওয়ারীও বন্দোবস্ত করে দিলেন। সাররাহ যখন মক্কা রওয়ানা হতে লাগলেন তখন হযরত হাতিব (রাঃ)বিন আবি বালিতায়াহ তাঁকে দশ দিনার এবং সঙ্গে একটি চিঠি কোরেশের কতিপয় নেতার নামে দিলেন। এই চিঠিতে খুব শিগগিরই মুসলমানদের মক্কার ওপর চড়াও হওয়ার খবর দেয়া হয়েছিল এবং তাদেরকে তাঁর পরিবার পরিজনকে হেফাজতের কথা বলেছিলেন। (হুজুর (সাঃ) ওহীর মাধ্যমে এই চিঠির কথা জানতে পারেন। বস্তুত তিনি (সাঃ) কোরেশদেরকে নিজের ইচ্ছার কথা জানাতে চাননি। প্রিয় নবী (সাঃ) হযরত আলী (রাঃ), হযরত যোবায়ের (রাঃ) বিনুল আওয়াম এবং হযরত মিকদাদ (রাঃ) বিনুল আসওয়াদকে সাররাহ'র পিছু ধাওয়া করার নির্দেশ দিলেন। তিনি আরো বললেন, খাখের বাগান নামক স্থানে তাকে পাওয়া যাবে। তাঁর নিকট থেকে এই চিঠি ছিনিয়ে নিয়ে ফিরে আসতে হবে। তাঁরা হুজুরের (সাঃ) নির্দেশ অনুযায়ী সাররাকে খাখ বাগান নামক স্থানে পৌছে তাঁকে পাকড়াও করলেন এবং তাঁর কাছে চিঠিটি চাইলেন, তিনি প্রথমে অস্বীকার করেন। কিন্তু যখন নাঙ্গা তরবারী মাথার ওপর চকমক করতে দেখলেন তখন চুলের বিনির মধ্যে থেকে চিঠি বের করে হযরত আলী মুরতাজার (রাঃ) হাওয়ালা করে দিলেন।

রহমতে আলম (সাঃ) যখন মক্কা বিজয় করেন তখন সাররাহ সেই কয়েকজনের অন্যতম ছিলেন যাদেরকে হত্যা করা রাসুলে আকরাম (সাঃ) ওয়াজিব করে দিয়েছিলেন। তিনি নিখোঁজ হয়ে যান। কিছুদিন পর কারোর সুপারিশে হুজুর (সাঃ) তাঁর মৃত্যুদন্ড বাতিল করে দেন এবং তিনি এই দয়ায় প্রভাবিত হয়ে ইসলাম গ্রহণকরেন।

আল্লামা ইবনে আছির (রঃ) লিখেছেন, তিনি মক্কা বিজয়ের সময় হযরত আলীর (রাঃ) হাতে নিহত হন। কিন্তু ইবনে হিশাম, আবুল ফাতাহ ফতুহুদ্দীন মুহাম্মাদ এবং অন্যান্য চরিতকাররা বিশ্লেষণ করে লিখেছেন, সাররাহ মক্কা বিজয়ের পর নিরাপত্তা পেয়ে মুসলমান হন। আর এই বক্তব্যই সঠিক।

www.bjilibrary.com

বিবি সাররাহ (রাঃ) ওমর ফারুকের (রাঃ) শাসনামলে কোন সওয়ারের ঘোড়ার আঘাত পান এবং তাতেই ওফাত পান।

হযরত সাফানাহ (রাঃ) বিনতে হাতেম

আরবের মশহুর দাতা হাতেম তাই'র কন্যা ছিলেন। নসবনামা হলোঃ সাফানা (রাঃ) বিনতে হাতেম বিন আব্দুল্লাহ বিন সাদ বিন হাশরাজ বিন ইমরুল কায়েস বিন আদি বিন রবিয়াহ বিন জারদিল বিন ছায়াল বিন আমর ইয়াগুছ বিন তাই।

তাই গোত্রের আবাদ ছিল ইয়েমেনে। আর হাতেম তাই ছিলেন সেই গোত্রের সরদার। তিনি নিজের গোত্রসহ খৃষ্টান ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। প্রিয় নবীর (সাঃ) নবুয়ত প্রাপ্তির কয়েকবছর পূর্বে হাতেম তাই মারা যান। তাঁর মৃত্যুর পর গোত্রের নেতৃত্ব লাভ করেন তাঁর পুত্র আদি। নবম হিজরীতে হুজুর (সাঃ) হযরত আলীর (রাঃ) নেতৃত্বে একটি ছোট বাহিনী বনু তাইতে প্রেরণ করলেন। এই বাহিনীর আগমন সংবাদ শুনে আদি নিজের পরিবার-পরিজন- সহ সিরিয়া চলে গেলেন এবং সেখানকার জোশিয়াহ নামক বস্তিতে বসবাস শুরু করলেন। বাড়ী থেকে রওয়ানার সময় তাড়াহুড়োর কারনে আদির বোন সাফানাহ বাদ পড়ে যান। ফলে তিনি ইসলামী বাহিনীর হাতে বন্দী হন। এই বাহিনী মদীনা ফিরে বন্দীদেরকে হুজুরের (সাঃ) খিদমতে পেশ করলেন। এ সময় সাফানাহ অগ্রসর হয়ে আরজ করলেনঃ

"হে কোরেশ সরদার! আমি বন্ধু-বান্ধবহীন এবং সহায়হীন। আমার ওপর রহম করুন। পিতার স্নেহের ছায়া আমার ওপর থেকে উঠে গেছে এবং আমাকে একাকী ফেলে ভাই পালিয়ে গেছে। আমার পিতা বনু তাইয়ের সরদার ছিলেন। তিনি ক্ষুধার্তদেরকে খাবার খাওয়াতেন, এতিমদের অভিভাবকত্ব করতেন, অভাবগ্রস্তদের অভাব পূরণ করতেন, মজলুমদের সাহায্য করতেন এবং জালিমদের মূলোৎপাটন করে ছাড়তেন। আমি সেই হাতেম তাইর কন্যা, যিনি কখনো কোন ভিক্ষুককে খালি হাতে যেতে দিতেননা। আপনি ভালো মনে করলে আমাকে স্বাধীন করে দিতে পারেন।

হুজুর (সাঃ) সাফানার কথা শুনে বললেনঃ "হে মহিলা! তোমার পিতার যে গুণাবলী তুমি বর্ণনা করেছ তাতো মুসলমানের গুণাবলী। যদি তোমার পিতা জীবিত

www.bjilibrary.com

থাকতেন তাহলে আমরা তাঁর সঙ্গে ভালো আচরণ করতাম।" এরপর তিনি সাহবায়ে কিরামকে (রাঃ) নির্দেশ দিলেনঃ"এই মহিলাকে ছেড়ে দাও। সে একজন সভ্রান্ত ও উত্তম চরিত্রের পিতার কন্যা। কোন সভ্রান্ত মানুষ অপমানিত হলে এবং কোন বিত্তবান মানুষ অভাবগ্রস্ত হলে তার প্রতি দয়া করো।"

সাহাবায়ে কিরাম (রাঃ) তৎক্ষণাৎ সাফানাকে ছেড়ে দিলেন। কিন্তু তিনি একই স্থানে দাঁড়িয়ে রইলেন। হুজুর (সাঃ) জিজ্ঞেস করলেনঃ"কি, এখন কি কথা?" সাফানাহ আরজ করলেনঃ "হে মুহাম্মাদ (সাঃ), আমি যে পিতার কন্যা তিনি কওমকে মুসিবতে রেখে নিজে সুখের নিদ্রা যাওয়া মোটেই সহ্য করতেননা। যেখানে আপনি আমার ওপর দয়া করেছেন, সেখানে আমার সাথীদের ওপরও রহম করুন। আল্লাহ আপনাকে সওয়াব দেবেন।"

হুজুর (সাঃ) সাফানাহর নিবেদনে খুব প্রভাবিত হলেন এবং তাই গোত্রের সকল কয়েদীকে মুক্ত করে দেয়ার নির্দেশ দিলেন। তাতে সাফানাহ'র মুখ দিয়ে অযাচিতভাবে বেরিয়ে গেলঃ "আল্লাহ আপনার নেকীকে সেই ব্যক্তি পর্যন্ত পৌছাক যে তার হকদার। আল্লাহ আপনাকে যেন কোন খারাব লোকের মুখাপেক্ষী না করেন এবং কোন উদার কওমের নিকট থেকে কোন নিয়ামত ছিনিয়ে নেয়া হলে তা যেন আপনার মাধ্যমে ফিরিয়ে দেন।"

অন্য এক রাওয়ায়েতে আছে, সাফানাহ যখন প্রথমবার হুজুরের (সাঃ) নিকট নিজের মুক্তির আবেদন জানিয়েছিলেন তখন অন্য কথার সঙ্গে এই কথাও বলেছিলেন যে, আমাকে যিনি মুক্ত করাবেন তিনি নেই। এজন্য আপনি নিজেই আমার ওপর ইহসান করুন। আল্লাহ আপনার ওপর ইহসান করবেন।

হুজুর (সাঃ) জিজ্ঞাসা করলেনঃ "কে মুক্ত করাবেন?"

তিনি জবাব দিলেনঃ" আদি বিন হাতেম। আমি তার সহোদরা।"

হুজুর (সাঃ) বললেনঃ সেই আদি বিন হাতেম যে খোদা ও রাসূল থেকে পালিয়ে গেছে?"

সাফানাহ ইতিবাচক জবাব দিলেন। এসময় হুজুর (সাঃ) কোন সিদ্ধান্ত ছাড়াই চলে গেলেন। দ্বিতীয় দিনও সাফানাহ ও হুজুরের (সাঃ) মধ্যে একই ধরনের কথা-বার্তা হলো কিন্তু তিনি কোন সিদ্ধান্ত দিলেননা। তৃতীয় দিন সাফানাহ পুনরায় একই দরখাস্ত করলেন। এবার হযরত আলীও (রাঃ) তাঁকে সুপারিশ করলেন। রহমতে আলম (সাঃ) এবার দরখাস্ত কবুল করলেন এবং সাফানাহকে মুক্ত করার নির্দেশ

www.bjilibrary.com

দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে বললেন, বর্তমানে দেশে ফেরার জন্য তাড়াহুড়ো করোনা। ইয়েমেন গমনকারী কোন বিশ্বস্ত লোক পাওয়া গেলে আমাকে খবর দিও।"

কিছুদিন পর ইয়েমেনের বিল্লি অথবা কাজায়াহ গোত্রের একটি প্রতিনিধি দল মদীনায় এলো। সাফানাহ হুজুরের (সাঃ) নিকট এই প্রতিনিধি দল ফেরত যাওয়ার সময় তাদের সঙ্গে ফিরে যাওয়ার আবেদন জানালেন। সুতরাং হুজুর (সাঃ) সাফানাহর মর্যাদা অনুযায়ী সওয়ারী, লিবাস ও পথ খরচের ব্যবস্থা করে তাঁকে সেই কাফেলার সঙ্গে রওয়ানা করে দিলেন।

সাফানাহ জানতেন যে, আদি বিন হাতেম দেশ থেকে পালিয়ে জোশিয়াতে বসবাস করছে। হুজুরের (সাঃ) নিকট থেকে বিদায় নিয়ে তিনি সোজা জোশিয়া পৌঁছলেন। ভাই-বোনের মুলাকাত কিভাবে হলো তার বর্ণনা হযরত আদি (রাঃ) বিন হাতেমের ভাষাতেই শুনুনঃ

"জোশিয়ায় একদিন আমাদের গৃহের সামনে একটি মাদী উট এসে থামলো। হাওদাজের ওপর একজন নিকাব আবৃত মহিলা বসেছিলেন। আমার সন্দেহ হলো যে, আমার বোন মনে হয়। কিন্তু আবার চিন্তা করলাম যে, তাকেতো মুসলমানরা গ্রেফতার করে নিয়ে গেছে। সে এইভাবে শানদার অবস্থায় কি করে আসতে পারে। ঠিক সেই সময় হাওদাজের পরদাহ উঠলো। সঙ্গে সঙ্গে আমার কানে এলোঃ জালিম, আত্মীয়তার সম্পর্ক বিচ্ছিন্নকারী। তোমার ওপর থুথু নিক্ষেপ করি। নিজের পরিবার-পরিজন নিয়ে এসেছ। আর আমাকে বান্ধবহীন এবং অসহায় রেখে এসেছ?"

সহোদরার কথা শুনে আমি খুব লজ্জিত হলাম। নিজের ভুল স্বীকার করলাম এবং ক্ষমা চাইলাম। সে চুপ মেরে গেল। অতঃপর সওয়ারী থেকে নেমে যখন কিছুক্ষণ আরাম করলো তখন আমি জিজ্ঞাসা করলাম, তুমিতো হুশিয়ার এবং বুদ্ধিমতী। সাহিবে কোরেশের সঙ্গে মুলাকাত করে তুমি কি রায় কায়েম করেছ? বোনটি জবাব দিল, "যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তুমি তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করো। যদি তিনি নবী হন তাহলে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য অগ্রগামী হওয়া মর্যাদা ও সৌভাগ্যের ব্যাপার। আর যদি তিনি বাদশাহও হন তাহলেও ইয়েমেনের কেউই তাঁর কিছু করতে পারবে না এবং আগুয়ান হয়ে একজন বাদশাহর সঙ্গে সাক্ষাৎ করাতে তোমার মান-মর্যাদা বৃদ্ধি পেতে পারে।"

সাফানাহর পরামর্শ অনুযায়ী হযরত আদি (রাঃ) মদীনা পৌঁছে রাসূলের (সাঃ) নিকট গিয়ে উপস্থিত হলেন এবং ইসলাম গ্রহণ করেন। তারপর সাফানাহও (রাঃ) ইসলাম গ্রহণ করে ভাগ্যবতী হওয়ার গৌরব অর্জন করেন।

তাঁর ওফাতের সাল এবং জীবনের অন্যান্য তথ্য জানা যায়নি।

www.bjilibrary.com

হযরত উমামাহ (রাঃ) বিনতে আবিল আছ (রাঃ)

হযরত উমামাহ (রাঃ) ছিলেন রহমতে আলমের (সাঃ) নাতনী। তাঁর মাতা হলেন হযরত যয়নব (রাঃ) বিনতে রাসূলুল্লাহ (সাঃ)। পিতার নাম আবুল আছ (রাঃ) বিন রবি' (বিন আব্দুল উজ্জা বিন আবদি শামস বিন আবদি মান্নাফ বিন কুসাই)। তিনি ছিলেন উম্মুল মুমিনিন হযরত খাদিজাতুল কুবরার (রাঃ) আপন ভাগিনেয়।

সারওয়ারে আলম (সাঃ) হযরত উমামাহকে (রাঃ) খুব স্নেহ করতেন। একবার হাবশার বাদশাহ নাজ্জাশী একটি আংটি হুজুরের (সাঃ) খিদমতে তোহফা হিসেবে প্রেরণ করেন। হুজুর (সাঃ) বললেনঃ "এই আংটি আমি তাকে দেব যে আমার সবচেয়ে বেশীপ্রিয়।"

যাঁরা একথা শুনলেন তাঁদের ধারণা জন্মালো যে, হযরত আয়েশাই (রাঃ) এই আংটি পাবেন। কিন্তু হুজুর (সাঃ) হযরত উমামাহকে (রাঃ) ডাকলেন এবং তাঁর হাতে আংটি পরিয়ে দিলেন। কেননা তিনি তখন অল্প বয়স্কা ছিলেন। কতিপয় রাওয়ায়েতে আংটির পরিবর্তে স্বর্ণের হারের কথা উল্লেখ আছে। এই হার কেউ উপঢৌকন হিসেবে পাঠিয়েছিলো। হুজুর (সাঃ) হযরত উমামাহকে (রাঃ) ডেকে এই হার তাঁর গলায় পরিয়েদিলেন।

সহিহ বুখারীতে আছে, রাসুলে আকরাম (সাঃ) হযরত উমামাহকে (রাঃ) এতো ভালোবাসতেন যে, কোন কোন সময় তাঁকে সঙ্গে করে মসজিদে নিয়ে যেতেন। একদিন তিনি তাঁকে কাঁধে নিয়ে মসজিদে উপস্থিত হয়েছিলেন। স্নেহাধিক্যে কাঁধ থেকে না নামিয়ে তেমনি নামায পড়তে শুরু করলেন। যখন রুকুতে যেতেন তখন শিশু উমামাহকে আস্তে নামিয়ে দিতেন। যখন দাঁড়াতেন তখন পুনরায় কাঁধে বসিয়ে দিতেন। এমনিভাবে পুরো নামায আদায় করলেন।

অষ্টম হিজরীতে হযরত যয়নব (রাঃ) ওফাত পান। এসময় হযরত উমামাহ (রাঃ) নানার (সাঃ) অভিভাবকত্বে আসেন। হুজুরের (সাঃ) ইন্তেকালের (১১ হিজরী) সময় হযরত উমামাহ (রাঃ) বয়োপ্রাপ্তা হয়েছিলেন। কিছুদিন পর হযরত ফাতিমাতুজ

www.bjilibrary.com

জোহরা (রাঃ) ওফাত পেলে হযরত আলী কাররামাল্লাহ ওয়াজহাহু হযরত উমামাহকে (রাঃ) নিকাহ করেন। ৪০ হিজরীতে আলী কাররামাল্লাহ ওয়াজহাহু শাহাদাত পেলে তাঁর ওসিয়ত অনুযায়ী মুগিরাহ বিন নওফিল (রাঃ) (বিন হারিছ বিন আব্দুল মুত্তালিব) হযরত ইমাম হাসানের (রাঃ) নিকট থেকে অনুমতি নিয়ে হযরত উমামাহর (রাঃ) সঙ্গে নিকাহ পড়িয়ে নেন। ইবনে সা'দ বর্ণনা করেছেন, আমীরে মাবিয়াও (রাঃ) হযরত উমামাহকে (রাঃ) নিকাহ করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু হযরত উমামাহ (রাঃ) মুগিরাহকেই (রাঃ) বিয়ে করতে চেয়েছিলেন। এজন্য আমীরে মাবিয়ার (রাঃ) পয়গাম পাওয়ার পর তিনি স্বয়ং মুগিরাহকে খবর দেন। তিনি তৎক্ষণাৎ ইমাম হাসানের (রাঃ) নিকট গেলেন এবং তাঁর অনুমতিক্রমে অবিলম্বে হযরত উমামাহ'র সঙ্গে নিকাহ পড়িয়ে নিলেন (সে সময় তাঁর ইদ্দত পুরো হয়েছিল)।

এক রাওয়ায়েতে আছে, মুগিরাহ বিন নাওফেলের (রাঃ) ঔরসে একটি ছেলে জন্মগ্রহণ করেছিল। তাঁর নাম ছিল ইয়াহিয়া। কিন্তু কতিপয় চরিতকার লিখেছেন, হযরত উমামাহ'র কোন সন্তান হয়নি।

হযরত উমামাহ (রাঃ) মুগিরাহ বিন নওফেলের (রাঃ) জীবদ্দশাতেই তাঁর গৃহে ওফাত পান। ওফাতের সাল এবং বিস্তারিত তথ্য জানা যায়নি।

হযরত উম্মুল হাছিম (রাঃ)

নেতৃস্থানীয় চরিতকাররা তাঁর নাম ও নসব সম্পর্কে কিছু উল্লেখ করেননি। শুধুমাত্র কুনিয়তের কথাই বলেছেন। হাফিজ ইবনে হাজার (রঃ) "ইসাবাহতে" লিখেছেন যে, তিনি রহমতে আলমের (সাঃ) সাহাবীয়াহ ছিলেন এবং মরসিয়া বর্ণনাতে পারদর্শিনী ছিলেন। কথিত আছে যে, হযরত উমামাহ (রাঃ) বিনতে আবুল আছ যখন বিধবা হলেন তখন উম্মুল হাছিম (রাঃ) একটি কবিতা পড়েন।

হযরত আলী কাররামাল্লাহ ওয়াজাহাহুর শাহাদাতের সময় অন্যান্য কবিদের মত হযরত উম্মুল হাছিমও একটি কবিতা শুনান। তাঁর সম্পর্কে বিস্তারিত আর কিছু জানাযায়নি।

www.bjilibrary.com

একজন অনুগত সাহাবিয়াহ (রাঃ)

তাঁর নাম জানা যায়নি। এক রাওয়ায়েতে আছে, তিনি আনসারের কোন গোত্রের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত ছিলেন এবং কতিপয় বর্ণনায় বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি হাবশিয়াহ ছিলেন। মদীনায় স্থায়ীভাবে বাস করতেন। দুর্ভাগ্যবশত তিনি মৃগী রোগে আক্রান্ত ছিলেন। যখন মৃগীতে আক্রান্ত হতেন তখন সতরহীন হয়ে যেতেন। একবার প্রিয় নবীর (সঃ) খিদমতে হাজির হয়ে আরজ করলেনঃ

"ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি মৃগী রোগী। যখন তাতে আক্রান্ত হই তখন বেসতর হয়ে যাই। আমার জন্য দোয়া করুন।"

হুজুর (সাঃ) বললেনঃ "তুমি যদি সবর কর তাহলে আল্লাহ তোমাকে জান্নাতে স্থান দেবেন। আর যদি তুমি চাও তাহলে আমি তোমার সুস্বাস্থ্যের জন্য দোয়া করি।"

তিনি আরজ করলেনঃ "হে আল্লাহর রাসূল! আমি সবর করবো এবং তা করতে করতেই আল্লাহর নিকট পৌঁছে যাবো। তবে, এজন্য দোয়া করুন যাতে আমি বেসতরী থেকে রক্ষা পাই।"

বস্তুত হুজুর (সাঃ) দোয়া করলেন এবং তারপর মৃগীতে আক্রান্ত হলে আর সতরহীন হতেন না। এটা সহিহ মুসলিমের রাওয়ায়েত। মুসনাদে আহমাদে (রঃ) হযরত আতা (রঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, আমাকে হযরত আব্দুল্লাহ (রাঃ) বিন আব্বাস (রাঃ) বললেন, আমি কি তোমাকে একজন জান্নাতী মহিলাকে দেখাবো? আমি বললাম, অবশ্যই দেখান। তিনি (একজন মহিলার দিকে ইশারা করে) বললেন, তিনি এই কালো রংয়ের মহিলা। তিনি একবার রাসূলের (সাঃ) খিদমতে এসেছিলেন। তারপর ওপরের রাওয়ায়েত বর্ণিত হয়।

সহিহ বুখারীতে হযরত আতা (রাঃ) থেকে বর্ণিত ঐ রাওয়ায়েতে এতটুকুন যোগ করা হয়েছেঃ উম্মে যাফর (রাঃ) সেই মহিলাকে দেখেছিলেন। তাঁর রং কালো এবং দীর্ঘদেহী ছিলেন। তিনি কা'বার গিলাফের সঙ্গে মিশে ছিলেন।

www.bjilibrary.com

মুসনাদে বাযারে (রঃ) আছে, যখন এই মহিলা হুজুরের (সাঃ) খিদমতে হাজির হয়ে নিজের অবস্থা বর্ণনা করলেন তখন তিনি বললেনঃ "তুমি যদি সবর কর, তাহলে সেই সবরের বদৌলতে কিয়ামতের দিন তুমি এমনভাবে উত্থিত হবে যে তোমার ওপর গুনাহর কোন বোঝা থাকবে না এবং তোমার কোন হিসাবও নেয়া হবেনা।" এই কথায় তিনি সবর অবলম্বন করলেন। অবশ্য হুজুরের (সাঃ) নিকট দরখাস্ত করলেন যে, তিনি যেন আল্লাহর নিকট রোগে আক্রমণের সময় বেসতর না হওয়ার জন্য দোয়া করেন।" হুজুর (সাঃ) তাঁর আনুগত্য ও সন্তুষ্টির জন্য খুশী হলেন এবং তাঁর সতরহীন হওয়া থেকে মাহফুজ থাকার জন্য দোয়া করলেন।

হযরত আযযাহ (রাঃ) বিনতে আবু সুফিয়ান (রাঃ)

কোরেশের বনু উমাইয়াহ বংশের মানুষ ছিলেন। নসবনামা হলোঃ আযযাহ বিনতে আবু সুফিয়ান ছাখার বিন হারব বিন উমাইয়াহ বিন আবদি শামস বিন আবদি মান্নাফ। উম্মুল মুমিনিন হযরত উম্মে হাবিবাহ (রাঃ) এবং আমীরে মাবিয়ার (রাঃ) সহোদরাছিলেন।

চরিতকাররা তাঁর ইসলাম গ্রহণের কাল সম্পর্কে কিছু লিখেননি। তা সত্ত্বেও তাঁর ইসলাম গ্রহণ সম্পর্কে সকলেই ঐকমত্য পোষণ করেন।

এক রাওয়ায়েতে আছে যে, একবার উম্মুল মুমিনিন হযরত উম্মে হাবিবাহ (রাঃ) প্রিয় নবীর (সাঃ) খিদমতে আরজ করলেনঃ "হে আল্লাহর রাসুল! আমার ইচ্ছা হলো যে, আপনি আমার বোন আযযাহকেও স্ত্রীর মর্যাদা দিয়ে বাধিত করবেন।" (সম্ভবত সে সময় হযরত উম্মে হাবিবাহর (রাঃ) জানা ছিলনা যে, আল্লাহ পাক দুই বোনকে এক বিয়েতে একত্রিত করা নিষিদ্ধ করে দিয়েছেন।)

হুজুর (সাঃ) বললেনঃ "তোমার বোন তোমার সতীন হোক এটা কি তুমি চাও?"

হযরত উম্মে হাবিবাহ (রাঃ) আরজ করলেনঃ "হে আল্লাহর রাসুল! আমি একাইতো আপনার স্ত্রী নই। হুজুরের (সাঃ) আরো স্ত্রী রয়েছেন। আমার মন চায় যে, আমার বোনও হুজুরের (সাঃ) স্ত্রী হোক।"

www.bjilibrary.com

হুজুর (সাঃ) বললেনঃ "এটা জায়েয নয়।"

অন্য এক রাওয়ায়েতে হুজুরের (সাঃ) সঙ্গে এই শব্দগুলো সংশ্লিষ্ট রয়েছেঃ "আযযাহ (রাঃ) আমার শ্যালিকা এবং বিবির জীবদ্দশায় তাঁর বোনের সঙ্গে নিকাহ জায়েযনয়।"

হযরত উম্মে হাবিবাহ (রাঃ) আরজ করলেন, আমরা শুনেছি যে, আপনি আবু সালমাহর (রাঃ) কন্যাকে বিয়ে করার ইচ্ছা রাখেন।

হুজুর (সাঃ) তাজ্জব হয়ে বললেন, "আবু সালমাহ'র (রাঃ) কন্যার সঙ্গে?" হযরত উম্মে হাবিবাহ (রাঃ) বললেন, "জ্বী, হাঁ।" হুজুর (সাঃ) বললেনঃ "সে যদি আমার পালিতা নাও হতো তাহলেও আমার জন্য হালাল ছিলনা। সেতো আমার দুধ ভাতিজী। কেননা আমি এবং তার পিতা আবু সালমাহ (রাঃ) ছুয়াইবার (রাঃ) দুধ পান করেছি।

হযরত আযযাহর (রাঃ) অতিরিক্ত তথ্য আর পাওয়া যায়নি।

২৫

হযরত যয়নব (রাঃ) বিনতে আওয়াম

কোরেশের বনু আসাদ বিন আব্দুল উজ্জার বংশোদ্ভূত ছিলেন। নসবনামা হলোঃ যয়নব (রাঃ) বিনতে আওয়াম বিন খুয়ায়েলদ বিন আসাদ বিন আব্দুল উজ্জা বিন কুসাই।

হাওয়ারীয়ে রাসুল (সাঃ) হযরত যোবায়ের (রাঃ) বিনুল আওয়াম তাঁর সহোদর ছিলেন এবং উম্মুল মুমিনিন হযরত খাদিজাতুল কুবরা (রাঃ) ফুফু ছিলেন।

সহোদর হযরত যোবায়েরের (রাঃ) সাথে মুসলমান হয়েছিলেন। কথিত আছে যে, তিনি কাব্যে প্রত্যুৎপন্নমতিতা রাখতেন। উষ্ট্রের যুদ্ধে হযরত যোবায়ের (রাঃ) শাহাদাত পেলে তিনি এক শক্তিশালী মরসিয়া বলেছিলেন। তাঁর সম্পর্কে বিস্তারিত আর কিছু জানা যায়নি।

www.bjilibrary.com

হযরত আয্যাহ (রাঃ) বিনতে গায়েল

চরিতকাররা তাঁর হসব-নসব সর্ম্পকে কিছু বলেননি। তিবরানী (রঃ) তাঁর থেকে বর্ণনা করেছেন যে, আমি রাসূলের (সাঃ) খিদমতে হাজির হলে তিনি এই সকল ব্যাপারে আমার নিকট থেকে বাইয়াত নেনঃ

"যিনা করবেনা, চুরি করবেনা এবং সন্তানকে জীবিত মাটিতে পুঁতে ফেলবেনা। তা প্রকাশ্যে হোক অথবা অপ্রকাশ্যে।"

আয্যাহ (রাঃ) বলেন, প্রকাশ্যে জীবিত মাটিতে পুঁতে ফেলার কথাতো আমি বুঝে ফেললাম কিন্তু অপ্রকাশ্যে জীবিত পুঁতে ফেলার কথা আমার বুঝে এলোনা। আমি হুজুরকে (সাঃ) তার অর্থ জিজ্ঞেস করলামনা। আবার হুজুরও (সাঃ) তা বিশ্লেষণ করলেননা। কিন্তু আমি তার অর্থ এই বুঝলাম যে, সন্তানকে কোনভাবেই খারাব করোনা। (অর্থাৎ তার লালন- পালন এবং তত্ত্বাবধান ভালোভাবে করো) এবং জেনে-শুনে বাচ্চার ক্ষতি করোনা।

হযরত আয্যাহ (রাঃ) সর্ম্পকে এতটুকু তথ্যই জানা গেছে।

হযরত উমাইমাহ (রাঃ) বিনতে রাকিকাহ

তাঁর হসব-নসব জানা যায়নি। হযরত আব্দুল্লাহ (রাঃ) বিন আমর (রাঃ) বিনুল আছ থেকে বর্ণিত আছে, উমাইমাহ (রাঃ) বিনতে রাকিকাহ রাসূলের খিদমতে বাইয়াত গ্রহণের জন্য উপস্থিত হলেন এবং আরজ করলেন, "হে আল্লাহর রাসূল। আমি আপনার নিকট এই সকল কথার বাইয়াত করছি যে, আল্লাহর সঙ্গে কাউকে শরীক করবোনা, নিজের সন্তানদেরকে হত্যা করবো না, বদকাজ করবোনা, চুরি করবোনা, কারোর ওপর মিথ্যা অপবাদ আরোপ করবোনা এবং কোন ভালো কাজে আপনার নাফরমানী করবোনা।"

www.bjilibrary.com

হুজুর (সাঃ) বললেন, এটাও বলো যে, যতটুকুন আমি পারবো এবং শক্তিতে কুলায়। আমি বললাম, আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল আমাদের থেকে বেশী আমাদের নফসের ওপর দয়াশীল। অতঃপর আমি আরজ করলাম, "হে আল্লাহর রাসূল! হাত বাড়ান, আমি বাইয়াত করি।"

হুজুর (সাঃ) বললেন, আমি মহিলাদের সঙ্গে হাত মিলাইনা।" আমার বক্তব্য শত মহিলার জন্য যেভাবে যথেষ্ট তেমনি এক মহিলার জন্যও যথেষ্ট।

হযরত আমেনাহ (রাঃ) বিনতে রাকিশ

কোরেশের কোন গোত্রের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। নবুয়তের প্রথম যুগে ইসলাম গ্রহণ করেন। যখন মদীনা হিজরতের অনুমতি হলো তখন তিনি ভাই ইয়াযিদ (রাঃ) বিন রাকিশ এবং সাঈদ (রাঃ) বিন রাকিশের সঙ্গে হিজরত করে মদীনা গমন করেন এবং সেখানেই সারা জীবন কাটিয়ে দেন। তাঁর সম্পর্কে আর কিছু জানা যায়নি।

হযরত সালমা (রাঃ) বিনতে যারে' বিন উরয়াহ

আল্লামা ওয়াকেদী তাঁকে সাহাবিয়াহ হিসেবে পরিগণিত করেছেন এবং লিখেছেন যে, তিনি কাফেরদের বিরুদ্ধে কয়েকটি যুদ্ধে অংশ নেন ও আহতদের চিকিৎসা এবং অসুস্থদের সেবা-শুশ্রুষার খিদমত আঞ্জাম দেন। ১৬ হিজরীতে শাহওয়ারের যুদ্ধে অংশ নেন এবং এমন বীরত্বের সঙ্গে লড়াই করেন যে, কাফেরদের মুখ ফিরে যায়।

www.bjilibrary.com

হযরত সাবিয়াহ আসলামিয়াহ (রাঃ)

হারিছ আসলামির কন্যা ছিলেন। মশহুর সাহাবী হযরত সাঈদ (রাঃ) বিন খাওলার সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়েছিল। তিনি প্রথম ইসলাম গ্রহণকারীদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন। প্রথমে হাবশা এবং পরে মদীনা হিজরত করার সৌভাগ্য লাভ করেন। বদর, ওহোদ, আহযাব এবং হুদায়বিয়াতে রাসুলের (সাঃ) সঙ্গে গিয়েছিলেন। বিদায় হজ্বে হুজুরের (সাঃ) সঙ্গে মক্কা এসে কিছুদিন অসুস্থ থেকে ইন্তিকাল করেন। মক্কায় তাঁর মৃত্যুতে হুজুর (সাঃ) খুব দুঃখিত হলেন। কেননা তিনি মুহাজিরদের মক্কায় মৃত্যু পছন্দ করতেন না। তাঁর মৃত্যুর দু'দিন পর হযরত সাবিয়াহ'র গর্ভে একটি সন্তান জন্মগ্রহণ করে। কিছু দিন পর সে মারা যায়। হযরত সাবিয়াহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, আমি যখন নিফাস থেকে পাক হলাম তখন সাজ-গোজ করলাম। আবুস সানাবল (রাঃ) বিন বা'কাক (যিনি কবিলায়ে আবদুদ দারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন) আমার গৃহে আসলো এবং বললো, মনে হয় যেন তুমি দ্বিতীয় বিয়ের ইচ্ছা পোষণ কর। আল্লাহর কসম। চার মাস দশ দিন অতিবাহিত না হওয়া পর্যন্ত তুমি নিকাহ করতে পারোনা। একথা শুনে আমি রাসুলের খিদমতে হাজির হলাম এবং এব্যাপারে তাঁর নিকট শরয়ী হুকুম জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, শিশু ভূমিষ্ঠ হওয়ার সাথে সাথে তোমার ইদ্দত পুরো হয়ে গেছে।

হযরত উম্মে হাছিন (রাঃ)

ইমাম মুসলিম (রঃ) হযরত উম্মে হাছিনকে (রাঃ) মহিলা সাহাবীদের মধ্যে পরিগণিত করেছেন এবং তাঁর থেকে বর্ণনা করেছেন যে, আমি উসামাহ (রাঃ) ও বেলালকে (রাঃ) দেখলাম। তাঁদের মধ্যে একজন (বেলাল) রাসুলের (সাঃ) উটনীর রশি ধরে রয়েছেন এবং অন্যজন (উসামাহ) তাঁর মাথার ওপর কাপড় ধরে রেখেছেন। এ সময় তিনি (সাঃ) জুমরায়ে উকবাহর ওপর পাথর মারছিলেন।

www.bjilibrary.com

হযরত সালামাহ (রাঃ) বিনতে হুর

ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (রঃ), ইমাম আবু দাউদ (রঃ) এবং ইমাম ইবনে মাজাহ তাঁকে সাহাবীয়াহ বলেছেন ও তাঁর থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, কিয়ামতের অন্যতম আলামত হলো মানুষ ইমামতি করতে চাইবেনা এবং কাউকে নামায পড়ানে ওয়ালী পাওয়া যাবেনা।

হযরত য়ুসাইরাহ (রাঃ) বিনতে সাফওয়ান

অন্যতম মুহাজির সাহাবিয়াহ ছিলেন। তিনি ১১টি হাদিস বর্ণনা করেছেন। তাসবিহর কালমাহ আঙ্গুলে গোনার মশহুর রাওয়ায়েত তাঁর থেকেই বর্ণিত। তিনি বলেন যে, রাসুলুল্লাহ (সাঃ) আমাদেরকে বলেছেন, সুবহান আল্লাহ ও লাইলাহা ইল্লাল্লাহ এবং সুবহানাল মালিকুল কুদ্দুস অথবা সুবুহুন কুদ্দুসুন রাব্বানা ওয়া রাব্বিল মালায়িকাতি ওয়াররুহ পড়া আবশ্যক মনে করো এবং নিজের আঙ্গুলে গোনো। কেননা আঙ্গুলকে জিজ্ঞাসা করা হবে, ও এই জবাব দেবে। তাতে গাফলতি করোনা। নচেত আল্লাহর রহমত তোমাদেরকে ভুলিয়ে দেয়া হবে। (তিরমিজী ও আবু দাউদ)।

বিনতে আব্দুল্লাহ (রাঃ) বিন ছাবিত

নাম অজ্ঞাত। হযরত আবুর রাবি' আবদুল্লাহ (রাঃ) বিন ছাবিত আনসারির কন্যা ও সাহাবিয়াহ ছিলেন। মুসনাদে আবু দাউদে বর্ণিত আছে যে, হযরত আব্দুল্লাহ (রাঃ) বিন ছাবিত অসুস্থ হয়ে পড়লে প্রিয় নবী (সাঃ) তাঁর সেবা-শুশ্রূষার জন্য

www.bjilibrary.com

তাশরীফ আনলেন। তিনি অজ্ঞান ছিলেন। হুজুর (সাঃ) ডাকলেন। কিন্তু তিনি কোন জবাব দিলেন না। হুজুর (সাঃ) বললেন, "আফসোস, আবুর রাবি'। এখন তোমার ওপর আর আমাদের কোন কর্তৃত্ব নেই।" একথা শুনে বাড়ীর মহিলাদের মধ্যে কান্নাকাটির রোল পড়ে গেল। লোকজন তাতে বাধা দিল। এতে রাসূল (সাঃ) বললেন, "এখন কাঁদতে দাও। হাঁ, মৃত্যুর পর কাঁদা উচিত নয়।" হযরত আবদুল্লাহর (রাঃ) কন্যা আরজ করলেন, "হে আল্লাহর রাসূল! আমি তাঁর শাহাদাতের আশা করেছিলাম। কেননা, তিনি জিহাদের সম্পূর্ণ প্রস্তুতি নিয়েছিলেন। হুজুর (সাঃ) বললেন, "সে নিয়তের সওয়াব পেয়েছে।" তাঁর সম্পর্কে আর কিছু জানা যায়নি।

বনু তামিমের একজন সাহাবিয়াহ

আরবে একটি স্থান আছে। স্থানটির নাম দাহনা। রাসূলের যুগে তার একদিকে বনু তামিমের আবাস ছিল। অন্যদিকে বকর বিন ওয়ায়েলের গোত্র বসবাস করতো। একবার বকর বিন ওয়ায়েলের হারিছ বিন হাসান রাসূলের (সাঃ) নিকট দাহনা বকর বিন ওয়ায়েলকে দেয়ার জন্য আবেদন জানালেন। হুজুর (সাঃ) ফরমান লিখার নির্দেশ দিলেন। ঘটনাক্রমে সে সময় সেখানে বনু তামিমের এক মহিলাও উপস্থিত ছিলেন। হুজুর (সাঃ) তাঁর দিকে দৃষ্টি ফেললে তিনি এই আরজ করলেনঃ "হে আল্লাহর রাসূল। বকর বিন ওয়ায়েল যে জমি দখল করতে চায় তা উট এবং বকরীর চারণভূমি এবং তার পাশেই বনু তামিমের মহিলারা বাস করে।"

সরওয়ারে আলম (সাঃ) বললেনঃ "বেচারী ঠিকই বলেছে। ফরমান লিখোনা। এক মুসলমান অপর মুসলমানের ভাই। এক পুকুর এবং এক চারণভূমি থেকে সকলেই নির্বিশেষে উপকৃত হতে পারে।"

www.bjilibrary.com

মরু প্রান্তরের এক সাহাবিয়াহ

রহমতে আলম (সাঃ) একবার এক যুদ্ধ থেকে প্রত্যাবর্তন করছিলেন। পথিমধ্যে একটি তাঁবু পেলেন। সেখানে কিছু মানুষ বসেছিলেন। হুজুর (সাঃ) তাঁদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কারা? তারা আরজ করলো, "আমরা মুসলমান।" কিছু দূরে এক মহিলা চুলোয় জ্বাল দিচ্ছিলেন এবং তাঁর শিশু পুত্র নিকটেই বসেছিল। আগুন জ্বলে উঠলে সেই মহিলা শিশুকে কোলে নিয়ে হুজুরের (সাঃ) পবিত্র খিদমতে হাজির হয়ে আরজ করলেনঃ

হে আল্লাহর রাসূল! একজন মা নিজের শিশুকে যেমন ভালোবাসে, আল্লাহ কি তাঁর বান্দাহদের ওপর তার থেকে বেশী মেহেরবান নন,?"

হুজুর (সাঃ) বললেন, "হাঁ, অবশ্যই।"

তিনি বললেন, "কোন মা'তো নিজের শিশুকে আগুনে নিক্ষেপ করা সহ্য করতে পারেনা।" (একথার অর্থ ছিল, যদি কোন মা নিজের শিশুকে আগুনে নিক্ষেপ করতে না পারে তাহলে আল্লাহ তায়ালা নিজের বান্দাহদেরকে জাহান্নামের আগুনে কেমন করে নিক্ষেপ করবেন!)

মহিলার এই কথা শুনে প্রিয়নবী (সাঃ) কাঁদতে লাগলেন। অতঃপর মাথা তুলে বললেনঃ "আল্লাহ শুধু বিদ্রোহী এবং যে তাঁর একত্ববাদ বিশ্বাস করেনা তাকেই শাস্তিদেবেন।"

অন্য এক রাওয়ায়েতে ঘটনা এভাবে বর্ণনা করা হয়েছেঃ যখন আগুনের হল্কা উঠতো তখন মহিলাটি শিশুকে একদিকে হটিয়ে নিতেন। তিনি প্রথমে হুজুরকে (সাঃ) দেখেছিলেননা। তাসত্ত্বেও ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। তিনি হুজুরের (সাঃ) খিদমতে হাজির হলেন এবং আরজ করলেনঃ আপনিই রাসুলুল্লাহ?" হুজুর (সাঃ) বললেনঃ"আমিই।"

তিনি বললেনঃ "আমার মাতা-পিতা আপনার ওপর কুরবান হোক। খোদা কি আরহামুর রাহেমীন নন?" হুজুর (সাঃ) বললেন, "অবশ্যই"। তিনি আরজ করলেন,

www.bjilibrary.com

"মাতা-পিতার নিজের শিশুর ওপর যতখানি ভালোবাসা থাকে সেই তুলনায় খোদা কি নিজের বান্দাহর ওপর বেশী মেহেরবান নন?" হুজুর (সাঃ) বললেন, "অবশ্যই।"

তিনি বললেন, "একজন মা তো নিজের শিশুকে আগুনে নিক্ষেপ করতে পারে না (আল্লাহতো আরহামুর রাহিমীন। তিনি নিজের বান্দাহদেরকে কিভাবে আগুনে নিক্ষেপ করবেন")?

রহমতে আলম (সাঃ) নিজের পবিত্র মাথা ঝুঁকিয়ে নিলেন এবং তিনি অশ্রুসিক্ত হয়ে উঠলেন। অতঃপর মাথা তুলে বললেনঃ "আল্লাহ নিজের কোন বান্দাহকে শাস্তি দেবেন না। কিন্তু শুধুমাত্র আল্লাহর সঙ্গে যে বিদ্রোহ করে এবং যে লাইলাহা ইল্লাল্লাহ বলতে প্রস্তুত নয় তাকেই শাস্তি দেবেন।

হযরত কাতিলাহ আবদারিয়াহ (রাঃ) বিনতে নাজার বিন হারিছ

ইসলামের শত্রু নাজার বিন হারিছের কন্যা ছিলেন। নাজার কোরেশের বনু আব্দুদার গোত্রের মানুষ এবং মক্কার অন্যতম মুশরিক নেতা ছিলো। হযরত কাতিলাহকে (রাঃ) আল্লাহ তায়ালা ইসলাম গ্রহণের তাওফিক দিয়েছিলেন এবং তিনি একজন সাহাবিয়াহ হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন। তিনি কাব্য সাহিত্যেরও অনুরাগী ছিলেন। বদরের যুদ্ধের পর প্রিয় নবীর (সাঃ) নির্দেশে হযরত আলী কাররামাল্লাহু ওয়াজহাহু নাজার বিন হারিছকে হত্যা করেন। কাতিলা যখন পিতার হত্যার কথা জানতে পেলেন তখন পিতার শোকে এক হৃদয়স্পর্শী মরসিয়া রচনা করেন। যখন এই মরসিয়া রহমতে আলমকে (সাঃ) শুনানো হয় তখন তিনি এত কেঁদেছিলেন যে, তাঁর দাড়ি মুবারক অশ্রুসিক্ত হয়ে গিয়েছিল। কতিপয় রাওয়ায়েতে আছে যে, হুজুর (সাঃ) তখন বলেছিলেন, "যদি এই কবিতা এর আগে আমার কানে পৌঁছতো তাহলে আমি নাজারকে হত্যা করাতাম না।"

হযরত কাতিলাহর (রাঃ) সম্পর্কে অতিরিক্ত তথ্য জানা যায়নি।

www.bjilibrary.com

আফিরাহ (রাঃ) বিনতে গিফার হিমাইরী

আল্লামা ওয়াজেদী (রঃ) তাঁকে মহিলা সাহাবীদের দলে শরীক করেছেন এবং লিখেছেন যে, তিনি কয়েকটি যুদ্ধে অংশ নেন। হযরত ওমর ফারুকের (রাঃ) শাসনামলে শাহুরা যুদ্ধে (১৪ হিজরী) এবং ইয়ারমুকের যুদ্ধে (১৫ হিঃ)) তিনি অত্যন্ত বীরত্বের সঙ্গে রোমকদের বিরুদ্ধে লড়াই করেন।

নায়াম (রাঃ) বিনতে কানাছ

কতিপয় চরিতগ্রন্থে তাঁর কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এ থেকে জানা যায় যে, তিনি সাহাবিয়াহ ছিলেন এবং কবিতার প্রতি খুব ঝোঁক ছিল। ওয়াকেদী (রঃ) লিখেছেন, তিনি কাফেরদের বিরুদ্ধে সংঘটিত কয়েকটি যুদ্ধে অংশ নেন এবং ইয়ারমুকের যুদ্ধে অন্যান্য মহিলার সঙ্গে মিলে তিনি রোমকদের বিরুদ্ধে এমন বীরত্বের সঙ্গে লড়াই করেন যে, তারা মুখ ফিরিয়ে নিতে বাধ্য হয়। আল্লাহ তাঁকে ব্যবস্থাপনার যোগ্যতাও দান করেছিলেন। বস্তুত কয়েকবার ইসলামী বাহিনীর রসদের ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব তাঁকে দেয়া হয়।

www.bjilibrary.com

হযরত মায়াজাহ (রাঃ) গিফারিয়াহ

তিনি "বনু গিফার" গোত্রের মানুষ এবং সাহাবিয়াহ ছিলেন। কয়েকটি যুদ্ধে অংশ নেন। আহতদের সেবা ও চিকিৎসার দায়িত্ব পালন করেন। বলা হয়ে থাকে, চিকিৎসায় তাঁর বিশেষ দক্ষতা ছিল।

হযরত লুবনা (রাঃ) বিনতে সাওয়ার

আল্লামা ওয়াকেদী (রঃ) তাঁকে সাহাবিয়াহ হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন এবং লিখেছেন যে, তিনি ইসলামের শত্রুদের বিরুদ্ধে কয়েকটি যুদ্ধে অংশ নেন এবং আহতদের সেবার দায়িত্ব পালন করেন। শাহ্‌রা যুদ্ধে তিনি পুরুষদের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে অত্যন্ত বাহাদুরীর সাথে লড়াই করেন এবং কয়েকজন রোমককে হত্যা করেন।

হযরত কায়িবাহ (রাঃ) বিনতে সায়াদ

আরবের বনু আসলাম গোত্রের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত ছিলেন। তিনি সাহাবিয়াহ হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন। অন্যান্য মহিলার সঙ্গে খায়বারের যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন। তিনি তীর উঠিয়ে আনতেন এবং মুজাহিদদেরকে ছাতু গুলিয়ে পান করাতেন।

www.bjilibrary.com

খাছ্য়াম গোত্রের একজন সাহাবিয়াহ

প্রিয়নবী (সাঃ) দশম হিজরীতে বিদায় হজ্বের জন্য মক্কা মুয়াজ্জমাতে তাশরীফ নেন। কুরবানীর দিন মুযদালিফাহ থেকে মিনা আসার সময় হুজুর (সাঃ) চাচাতো ভাই হযরত ফজল (রাঃ) বিন আব্বাসকে (রাঃ) নিজের সওয়ারীর পেছনে বসালেন। পথিমধ্যে খাছয়াম গোত্রের একজন মহিলা নবীর (সাঃ) খিদমতে হাজির হয়ে আরজ করলেনঃ

"হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহর তরফ থেকে বান্দাহর জিম্মায় হজ্ব ফরজ। এই ফরজ আমার পিতার ওপর এমন অবস্থায় আরোপিত হয়েছে যে, তিনি বার্ধক্যে পৌঁছে গেছেন এবং সওয়ারীর ওপর আরোহণ তাঁর জন্য এখন অসম্ভব। এজন্য তাঁর পক্ষে হজ্ব করা সম্ভব নয়। আমি কি তাঁর পক্ষ থেকে হজ্ব এবং উমরাহ করতে পারি'?"

ইরশাদ হলোঃ "হাঁ, নিজের পিতার পক্ষ থেকে হজ্ব ও উমরাহ করো।"

একজন বিদেশী সাহাবিয়াহ

মুসনাদে আবু দাউদে সাইয়েদেনা হযরত আবু হুরায়রাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, এক ব্যক্তি এক কৃষ্ণ বর্ণের দাসী নিয়ে রাসুলের (সাঃ) খিদমতে হাজির হয়ে আরজ করলেনঃ "হে আল্লাহর রাসূল! আমার ওপর একজন মুমিন গোলাম আযাদ করা ওয়াজিব হয়ে পড়েছে। আমি কি এই বাঁদীকে আযাদ করতে পারি?"

হুজুর (সাঃ) সেই বাঁদীকে জিজ্ঞেস করলেনঃ "আল্লাহ কোথায়?" তিনি আঙ্গুল দিয়ে আকাশের দিকে ইঙ্গিত করলেন। অতঃপর হুজুর (সাঃ) জিজ্ঞেস

www.bjilibrary.com

করলেনঃ "আমি কে?" তিনি প্রথমে তাঁর দিকে এবং তারপর আকাশের দিকে ইশারাহ করলেন। যার মাধ্যমে এটা পরিষ্কার হচ্ছিলো যে তিনি আল্লাহর রাসূল।

এতে হুজুর (রাঃ) তাঁকে আনয়নকারীকে সম্বোধন করে বললেন, "তাঁকে আযাদ করে দাও। সে মুমিনাহ।"

হযরত আফরা (রাঃ) বিনতে উবায়েদ আনসারিয়াহ

হযরত আফরা আনসারিয়াহ (রাঃ) খাজরাজের সম্ভ্রান্ত শাখা বনূ নাজ্জারভূক্ত ছিলেন। নসবনামা হলোঃ আফরা বিনতে ওবায়েদ বিন ছালাবাহ বিন উবায়েদ বিন ছালাবাহ বিন গানাম বিন মালিক বিন নাজ্জার। হারিছ বিন রিফায়াহর সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়েছিল। তাঁর ঔরসে তিন পুত্র মায়াজ (রাঃ), মুয়াব্বিজ (রাঃ) এবং আওফ (রাঃ) জন্মগ্রহণ করেন।

এই তিন পুত্র রাসূলের (সাঃ) অত্যন্ত মুখলিস এবং জাননিসার সাহাবা ছিলেন। বদরের যুদ্ধে প্রথমে এই ভ্রাতৃত্রয় উতবাহ, শাইবাহ এবং ওয়ালিদ বিন উতবাহর মুকাবিলার জন্য বের হলেন কিন্তু হুজুর (সাঃ) তাঁদেরকে ফিরিয়ে আনলেন। এরপর ময়দানে যুদ্ধের সময় হযরত মায়াজ (রাঃ) এবং মুয়াব্বিজ (রাঃ) আবু জেহেলের ওপর হামলা করলেন। এই হামলায় সে গুরুতরভাবে আহত হলো। এই তিন ভাই মায়ের নামের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হয়ে আফরা'র পুত্র হিসেবে মশহুর হন।

আল্লামা যারকানী (রঃ) শরহে মাওয়াহিবে হাফিজ ইবনে হাজারের (রঃ) উদ্ধৃতি দিয়ে লিখেছেন, হারিছ বিন রিফায়াহ হিজরতে নববীর অনেক আগেই মারা গিয়েছিল। তারপর হযরত আফরা (রাঃ) আবি বাকির অথবা বাকির বিন আবদি ইয়ালিল লাইছিকে নিকাহ করেছিলেন। তাঁর ঔরসে চার পুত্র আয়াস (রাঃ), আমের (রাঃ), খালিদ (রাঃ) ও আকিল (রাঃ) জন্ম গ্রহণ করেন। এই চারজনই প্রথম মুসলমানদের অন্তর্ভূক্ত। বদরের যুদ্ধে এই চারভাই বৈপিত্রেয় তিন ভাই মায়াজ (রাঃ), মুয়াব্বিজ (রাঃ) ও আওফের (রাঃ) সঙ্গে অংশ নিয়েছিলেন। এই ভাগ্যবতী মহিলার (হযরত আফরা)) সাত পুত্র বদরের যুদ্ধে যোগ দিয়েছিলেন। হযরত আফরার এই মর্যাদা বা সম্মান অন্য কোন মহিলা পাননি।

www.bjilibrary.com

যারকানীর (রঃ) রাওয়ায়েতের বিশুদ্ধতার প্রশ্নে আস্থার সঙ্গে আমরা কিছু বলতে পারি না। কেননা সাধারণ রাওয়ায়েতে একথা ধারাবাহিকতার সাথে বর্ণনা করা হয়েছে যে, বদরের যুদ্ধে হযরত মায়াজ (রাঃ) ও হযরত মুয়াব্বিজ (রাঃ) নওজোয়ান ছিলেন। যদি যারকানীর রাওয়ায়েত হুবহু সঠিক বলে মেনে নেয়া হয়, তাহলে তাঁরা নওজোয়ান নয় বরং অর্ধ বয়স্ক হিসেবে বিবেচিত হবেন। আরেক হতে পারে যে, হযরত আফরা (রাঃ) প্রথমে আবি বকরকে (অথবা বাকির) বিয়ে করেছিলেন এবং তাঁর ওফাতের পর হারিছ বিন রিফায়াহর সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল (আল্লাহই এ ব্যাপারে ভালো জানেন।))।

হযরত আফরা' (রাঃ) সংক্রান্ত আর কোন তথ্য জানা যায়নি।

হযরত উম্মে সিনান (রাঃ)

মশহুর সাহাবী হযরত আবু সিনান (রাঃ) বিন মিহসানের স্ত্রী ছিলেন। নাম ও নসব জানা যায়নি। তাঁর পুত্র হযরত সিনানও (রাঃ) হুজুরের (সাঃ) অত্যন্ত মুখলিস সাহাবীছিলেন।

সহিহ বুখারীতে আছে, প্রিয় নবী (সাঃ) বিদায় হজ্ব থেকে মদীনা ফিরে এসে উম্মে সিনানকে (রাঃ) জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি আমাদের সঙ্গে হজ্বে কেন যাওনি?" তিনি আরজ করলেন, "হে আল্লাহর রাসূল! আমার নিকট সওয়ারী ছিল না।" হুজুর (সাঃ) বললেন, "রমযানে ওমরাহ করে নিও। রমযানের ওমরাহ হজ্বের সমান।" অন্য আরেক রাওয়ায়েতে হুজুরের (সাঃ) সঙ্গে এই শব্দসমূহ সংশ্লিষ্ট রয়েছেঃ "রমযানে ওমরাহ করা আমার সঙ্গে হজ্ব করার সমান।"

হাফিজ ইবনে আব্দুল বার (রঃ) "ইকদুল ফরিদে" এক সাহাবিয়াহ উম্মে সিনান (রাঃ) বিনতে জাশমাহ বিন খারশাহ মাজহাজীর কথা উল্লেখ করেছেন। বলা হয়েছে যে, তিনি সিফফিনের যুদ্ধে হযরত আলীর (রাঃ) সমর্থক ছিলেন। জানা যায়নি যে, এই উম্মে সিনান আবু সিনানের (রাঃ) বিধবা ছিলেন, না অন্য কোন সাহাবিয়াহ ছিলেন।

www.bjilibrary.com

একজন নামহীন সাহাবিয়াহ (রাঃ)

সহিহ বুখারীতে বর্ণিত আছে, রাসূলে আকরাম (সাঃ) একবার কোথাও গমন করছিলেন। পথিমধ্যে তিনি দেখলেন যে, জনৈকা মহিলা এক কবরের পাশে বসে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে কাঁদছেন। তিনি (সাঃ) দাঁড়িয়ে গেলেন এবং তাঁকে সম্বোধন করে বললেন, "সবর করো, সবর করো।" মহিলাটি তাঁকে চিনতেন না। তিক্ত স্বরে বললেন, "যাও, যাও। আমার কি হচ্ছে তার তুমি কি বুঝবে!"

হুজুর (সাঃ) চুপচাপ সামনের দিকে অগ্রসর হলেন। লোকজন মহিলাকে বললেন, তিনিতো রাসূল (সাঃ) ছিলেন। তুমি তাঁকে চেনোনি? একথা শুনে তিনি চুপ হয়ে গেলেন। কান্নাকাটিও ভুলে গেলেন। এবং দৌড়ে হুজুরের (সাঃ) খিদমতে গেলেন এবং আরজ করলেনঃ

"হে আল্লাহর রাসূল! আমার মাতা-পিতা আপনার ওপর কুরবান হোক। আমি হুজুরকে (সাঃ) চিনতাম না। এজন্য আমি বেআদবী করে ফেলেছি। আল্লাহর ওয়াস্তে আমাকে ক্ষমা করে দিন।"

হুজুর (সাঃ) অত্যন্ত নরমীর সঙ্গে বললেনঃ "সবর সেই বিশ্বস্ত বস্তু যা ঠিক মুসিবতের সময়ই করতে হয়।"

হযরত মায়াজাহ (রাঃ) বিনতে আবদুল্লাহ

নাম মায়াজাহ (রাঃ)। মদীনা মুনাওয়ারাহ'র বাসিন্দা ছিলেন। নসবনামা হলোঃ মায়াজাহ (রাঃ) বিনতে আব্দুল্লাহ বিন জারিরুন্দ দারির বিন উমাইয়াহ বিন হাদারাহ বিন হারিছ বিন খাজরাজ।

মুনাফিক সরদার আব্দুল্লাহ বিন উবাই বিন সুলুলের দাসী ছিলেন। আল্লাহ তায়ালা তাঁকে সুন্দর স্বভাব দান করেছিলেন। সারওয়ারে আলম (সাঃ) মদীনায় তাশরীফ আনার পর তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন এবং তাঁর বাইয়াতের সৌভাগ্য লাভ করেন। আব্দুল্লাহ বিন উবাই তাঁর ওপর বিভিন্ন ধরনের নির্যাতন চালাতো এবং খারাব

www.bjilibrary.com

কাজে বাধ্য করতো। কিন্তু তিনি পবিত্র জীবন যাপনে অটল ছিলেন। অবশেষে কুরআনে করিমের এই আয়াত নাযিল হলোঃ "এবং নিজের যেসব দাসী পবিত্র থাকতে চায় তাদেরকে দুনিয়ার সাময়িক স্বার্থে হারাম কাজে বাধ্য করো না।"

এই আয়াত নাযিলের পর তিনি আব্দুল্লাহ বিন উবাইয়ের নির্যাতনের পাঞ্জা থেকে মুক্তি পেলেন।

তাঁর প্রথম বিয়ে হয়েছিল সাহাল (রাঃ) বিন কুরজার সঙ্গে। তাঁর ঔরসে আব্দুল্লাহ নামক এক পুত্র এবং উম্মে সাঈদ নামের এক কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। সাহালের ইন্তেকালের (অথবা তাঁর তালাক দানের) পর হামির বিন আদি তাঁকে নিকাহ করেন। তাঁর ঔরসে হারিছ ও আদী এবং উম্মে সাঈদ জন্মগ্রহণ করেন। হামির বিন আদি কোন কারণে তালাক দিলে আমের বিন আদির সঙ্গে বিয়ে হয়। তাঁর ঔরসে উম্মে হাবিব জন্ম নেন।

হাফিজ ইবনে আব্দুল বার (রঃ) লিখেছেন, তিনি একজন জ্ঞানী মহিলা ছিলেন। তাঁর সম্পর্কে আর বিস্তারিত কিছু জানা যায়নি।

হযরত মিসকিয়াহ (রাঃ) ও হযরত উমাইমাহ (রাঃ)

এই দু'জনও মুনাফিক সরদার আব্দুল্লাহ বিন উবাইয়ের বাঁদী ছিলেন এবং সে তাঁদেরকে খারাব কাজে বাধ্য করতো। হিজরতে নববীর পর দু'জনই ইসলাম গ্রহণ করেন এবং আব্দুল্লাহর নির্দেশ মানতে অস্বীকার করেন। আব্দুল্লাহ অগ্নিশর্মা হয়ে উভয়ের ওপর বিভিন্ন ধরনের নির্যাতন চালায়। হযরত আবুবকর সিদ্দিক (রাঃ) জুলুমের খবর শুনে তাঁদেরকে নিজের মহিলাখানায় লুকিয়ে রাখলেন। তাতে আব্দুল্লাহ তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠলো এবং সিদ্দিকে আকবারকে (রাঃ) বললো, আপনি আমার দাসীদেরকে উত্তেজিত ও আশ্রয় দিতে পারেন না। সিদ্দিকে আকবার (রাঃ) তার কথা শুনলেন না। সে সময় সংশ্লিষ্ট বিষয়ে কুরআনে পাকের আয়াতটি নাযিল হলো এবং হযরত মিসকিয়াহ (রাঃ) এবং উমাইমাহ (রাঃ) ইসলামের বদৌলতে আব্দুল্লাহর নির্যাতনের পাঞ্জা থেকে মুক্ত হয়ে গেলেন।

চরিতকাররা উভয়ের সাহাবিয়াহ হওয়া সম্পর্কে ঐকমত্য পোষণ করেছেন।

www.bjilibrary.com

হযরত সালমা আনসারিয়াহ (রাঃ)

আনসারের বনু আদি গোত্রের বনু নাজ্জার বংশোদ্ভূত ছিলেন এবং আবু দাউদের (রঃ) কথা অনুযায়ী দূরতম সম্পর্কের পরিপ্রেক্ষিতে তিনি হুজুরের খালা হতেন। তিনি হুজুরের (সাঃ) সঙ্গে দুই কিবলামুখী হয়ে (বাইতুল মাকদাস এবং বাইতুল্লাহ) নামায পড়েছিলেন। তিনি বলেন, আমি আনসারের কতিপয় মহিলার সঙ্গে রাসূলের (সাঃ) খিদমতে হাজির হয়ে এইসব শর্তে বাইয়াত করিঃ (১) আমরা খোদার সঙ্গে কাউকে শরীক করবো না (২) চুরি করবো না (৩) বদ কাজ করবো না (৪) নিজের সন্তানকে হত্যা করবো না (৫) এমন কোন অপবাদ আরোপ করবো না যা নিজের হাত–পা বেঁধে ফেলে (অর্থাৎ অন্যের সন্তানকে নিজের আপন পুত্র বলা) (৬) কোন ভালো কাজে হুজুরের (সাঃ) নাফরমানী না করা (৭) নিজের স্বামীর সঙ্গে কপটতা না করা।

বাইয়াতের পর আমরা ফিরে এলাম। এ সময় আমি একজন মহিলাকে হুজুরের (সাঃ) খিদমতে ফিরে গিয়ে স্বামীর সঙ্গে কপটতা না করার অর্থ জিজ্ঞেস করার কথা বললাম।

সুতরাং সে ফিরে গিয়ে হুজুরের (সাঃ) নিকট একথা জিজ্ঞেস করলো। তিনি বললেন, তার অর্থ হলো স্বামীর সম্পদ অন্য কাউকে দেয়া। হযরত সালমার (রাঃ) বিস্তারিত তথ্য পাওয়া যায়নি।

হযরত সাওদাহ (রাঃ)

উম্মুল মুমিনিন হযরত সাওদাহ (রাঃ) বিনতে যামায়াহ ছাড়া মক্কায় সাওদা নাম্মী অন্য আরেকজন মহিলা ছিলেন। তিনিও নবীর (সাঃ) হিজরতের পূর্বে ইসলাম গ্রহণ ও সাহাবীয়াহ হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন। তাঁর স্বামী মারা গিয়েছিলেন এবং তিনি বিধবার জীবন কাটাচ্ছিলেন।

www.bjilibrary.com

এববার প্রিয় নবী (সাঃ) তাঁকে নিকাহ করার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। তিনি আবজ করলেন ঃ "ইয়া রাসূলাল্লাহ। আপনি দুনিয়ায় আমার নিকট সবচেয়ে বেশী প্রিয়। কিন্তু আমার ৫টি সন্তান রয়েছে। তারা আপনার মাথার কাছে চীৎকার এবং কান্নাকাটি করুক তা আমি পছন্দ করি না।"

হুজুর (সাঃ) তাঁর কথা পছন্দ ও প্রশংসা করলেন এবং তাঁর সঙ্গে নিকাহ করার ইচ্ছা পরিত্যাগ করলেন।

হযরত খুজাইয়াহ (রাঃ)

হযরত খুজাইয়াহ (রাঃ) মক্কার উপকণ্ঠের মরুপ্রান্তরে বসবাসকারিনী একজন বেদুঈন মহিলা ছিলেন। আল্লাহ তায়ালা তাঁকে অত্যন্ত নেক স্বভাব দান করেছিলেন। নবীর (সাঃ) নবুয়ত প্রাপ্তির প্রাথমিক যুগে তাঁর কানে যেই হকের দাওয়াতের আহ্বান এলো তখনই তিনি তা গ্রহণ করেন। প্রখ্যাত গবেষক ডাঃ মুহাম্মদ হামিদুল্লাহ নিজের পুস্তক "রাসূলের (সাঃ) রাজনৈতিক জীবন"-এ মুহাম্মদ বিন হাবিবুল বুগদাদীর পুস্তক "আল-মুহাব্বার"-এর উদ্ধৃতি দিয়ে লিখেছেন যে, এই মহিলা মুসলমান হওয়ার পর কোরেশ মহিলাদের মধ্যে তাবলীগ শুরু করেন। বস্তুত তিনি প্রকৃতপক্ষে কোরেশ ছিলেন না। বরং মরু বেদুঈন ছিলেন। এজন্য তাঁরা তাঁকে শহর থেকে বহিষ্কার করাই যথেষ্ট মনে করলো। সুতরাং তাঁকে একটি কাফেলার নিকট সোপর্দ করা হলো এবং বন্দী অবস্থায় তাঁর কবিলায় পৌছে দেয়ার কথা বলা হলো। কাফেলাওয়ালারা তাঁকে একটি উটের খালি পিঠের উপর রশি দিয়ে বাঁধলো।

হযরত খুজাইয়াহ (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, তারা আমাকে একবারও খাবার ও পানি দিলো না। বরং মনযিলে নামলে হাত পা বেঁধে রৌদ্রে নিক্ষেপ করতো। তিনদিন তিনরাত এই অবস্থায় অতিবাহিত হওয়ার পর আমার অবস্থা সঙ্গীন হয়ে পড়লো এবং আমার আর কোন হুঁশ ছিলো না। একরাতে আমি বেহুঁশ অবস্থায় পড়েছিলাম। এ সময় হঠাৎ করে এমনি এমনি অদৃশ্যভাবে কোন বস্তু আমার মুখে লাগলো। আমি তা পানি মনে করলাম এবং বাস্তবেও তা পানি ছিল। আমি আসূদাহ হয়ে পানি পান করলাম এবং আমার জ্ঞান ফিরে এলো। সকালে লোকজন ঘুম থেকে উঠে আমাকে পরিবর্তিত ও ভালো অবস্থায় পেয়ে মনে করলো যে, সম্ভবত রাতে আমি বন্ধনমুক্ত

www.bjilibrary.com

হয়ে কাফেলার পানি চুরি করে পান করেছি। কিন্তু আমার হাতের বন্ধন খোলা ছিল না এবং মশকের মুখও বাঁধা ছিল। যখন তারা নিশ্চিত হলো যে কোন চুরি হয়নি বরং আল্লাহর ফজিলত এবং অদৃশ্য সাহায্য ঘটেছে তখন তারা খুব প্রভাবিত হলো ও তওবাহ করে সকলেই মুসলমান হয়ে গেলো।

হযরত খুজাইয়াহ (রাঃ) প্রিয় নবীকে (সাঃ) খুব শ্রদ্ধা করতেন। এই ভিত্তিতে "ইনওয়াহাবাত নাফসাহা লিননাবিয়্যি" তাঁর শানে নাযিল হয়।

বিনতে খাব্বাব (রাঃ) বিন আরাত

তিনি জালিলুল কদর সাহাবী হযরত খাব্বাব (রাঃ) বিনুল আরাতের কন্যা এবং সাহাবীয়াহ ছিলেন। ইবনে সায়াদ (রঃ) তাঁর থেকে এই রাওয়ায়েত নকল করেছেন যে, আমার পিতাকে (হযরত খাব্বাব (রাঃ) বিন আরাত) কোন যুদ্ধে বাইরে যেতে হয়েছিল। বাড়ী থেকে রওয়ানা হওয়ার সময় তিনি আমার নিকট একটি বকরী রেখে গিয়েছিলেন এবং বলে গিয়েছিলেন যে, তুমি যখন বকরীর দুধ দোহন করতে চাও তখন তা আসহাবে সুফফার নিকট নিয়ে যাবে। সুতরাং আমি আসহাবে সুফফার নিকট বকরী নিয়ে গেলাম। তখন সেখানে রাসূলে আকরাম (সাঃ) উপস্থিত ছিলেন। তিনি বকরী ধরলেন এবং দড়ি দিয়ে পা বেঁধে দিলেন। অতঃপর তিনি আমাকে বললেন, তোমাদের সবচেয়ে বড় পাত্র আমার নিকট নিয়ে এসো। আমি বাড়ী গিয়ে আমাদের আটা গোলার সবচেয়ে বড় পাত্র নিয়ে এলাম। হুজুর (সাঃ) দুধ দোহন করলেন এবং পাত্র ভরে গেল। তিনি বললেন, পাত্রটি নিয়ে যাও। নিজেও পান করবে এবং প্রতিবেশীদেরকেও পান করাবে। যখন তুমি এই বকরীর দুধ দোহন করতে চাইবে তখন তা আমার নিকট নিয়ে আসবে। অতএব আমি সকাল-সন্ধ্যা এই বকরী তাঁর (সাঃ) নিকট নিয়ে যেতাম এবং তিনি দুধ দুইয়ে দিতেন। প্রচুর পরিমাণ দুধ আমাদেরকে আসূদাহ করে দিল। আমার পিতা যখন ফিরে এলেন এবং সেই বকরীর দুধ দোহন করলেন তখন আগের পরিমাণ দুধ হলো। আমার মা তাঁকে বললেন, আপনিতো বকরীটিকে খারাব করে ফেলেছেন। তিনি বললেন, কি ব্যাপার! মা বললেন, বকরীটিতো বিরাট পাত্র ভরে দুধ দিত। পিতা জিজ্ঞাসা করলেন, কে দোহন করতো? আমার মা বললেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ)! আমার পিতা বললেন, আমাকে

www.bjilibrary.com

হুজুরের (সাঃ) সমান মনে করছো। খোদার কসম, তাঁর (সাঃ) পবিত্র হাত আমার হাত থেকে অনেক বরকতওয়ালা।

হযরত খাব্বাব (রাঃ) ইবনুল আরাতের কন্যার বিস্তারিত তথ্য জানা যায়নি।

হযরত কারিরাহ (রাঃ) এবং হযরত গাফিলাহ (রাঃ)

হযরত কারিরাহ (রাঃ) বিনতে হারিছ উনওয়ারিয়াহ এবং হযরত গাফিলাহ (রাঃ) বিনতে উবায়েদ বিনুল হারিছ উভয়ই মুহাজির সাহাবিয়াহ ছিলেন। প্রথম জন শেষ জনের মা। হযরত গাফিলাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, আমি এবং আমার মা রাসূলের (সাঃ) খিদমতে হাজির হলেন এবং বাইয়াত করলেন। হুজুর (সাঃ) সে সময় এক প্রস্তরাবৃত ময়দানে একটি তাঁবুতে অবস্থান করছিলেন। তিনি আমাদের নিকট থেকে এই বাইয়াত নিলেন যে, আমরা আল্লাহর সঙ্গে কাউকে শরীক করবো না। উপরন্তু সুরায়ে মুমতাহিনার শেষ রুকুতে বর্ণিত বিষয়সমূহের ওপরও বাইয়াত নিলেন। আমরা এইসব কথার ইকরার করলাম এবং নিজেদের হাত বাইয়াত করার জন্য এগিয়ে দিলাম। তিনি বললেন, আমি মহিলাদের হাত স্পর্শ করি না। তারপর তিনি আমাদের মাগফিরাতের দোয়া করলেন। এই ছিল আমরা মহিলাদের বাইয়াত।

হযরত কারিরাহ (রাঃ) এবং হযরত গাফিলাহ'র অতিরিক্ত আর কিছু জানা যায়নি।

হযরত জাযামাহ (রাঃ) বিনতে জান্দাল

হিজরতে নববীর কয়েক বছর পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করেন। সারওয়ারে আলম (সাঃ) মুসলমানদেরকে যখন মদীনায় হিজরতের অনুমতি দিলেন তখন তিনিও অন্যান্য সাহাবা এবং মহিলা সাহাবিয়াহর সঙ্গে হিজরত করে মদীনা চলে যান এবং সারাজীবন সেখানেই কাটান।

www.bjilibrary.com

হযরত ফাতিমা (রাঃ) বিনতে উতবাহ

মক্কার প্রখ্যাত মুশরিক সরদার উতবাহ বিন রবিয়াহ'র কন্যা ছিলেন। মক্কা বিজয়ের সময় ইসলাম গ্রহণ করেন। সহোদরা হিন্দ (রাঃ) বিনতে উতবাহ'র সঙ্গে হুজুরের (সাঃ) খিদমতে হাজির হয়ে ইসলাম গ্রহণ করেন এবং বাইয়াত নেন।

উম্মুল মুমিনিন হযরত আয়েশা সিদ্দিকাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, সুরায়ে মুমতাহিনাতে বর্ণিত আয়াতের বিষয়সমূহের ওপর ফাতিমা (রাঃ) বিনতে উতবাহ হুজুরের (সাঃ) নিকট বাইয়াত করেন। তাঁর এক গোলাম আবুস সায়িব খাব্বাবও (রাঃ) সাহাবী ছিলেন। তিনি ফাতিমা (রাঃ) বিনতে উতবাহ'র গোলাম খাব্বাব হিসেবে পরিচিত।

এক মরুচারী সাহাবিয়াহ (রাঃ)

রহমতে আলম (সাঃ) একবার জীবন উৎসর্গকারীদের এক বিরাট দলসহ সফরে ছিলেন। সফরকালে তিনি এমন এক এলাকা দিয়ে অতিক্রম করেন যেখানে দূর–দূরান্ত পর্যন্ত পানির নাম–নিশানাও ছিল না। দলের সদস্যরা পিপাসার অভিযোগ করলে হুজুর (সাঃ) হযরত আলী মুরতাজা এবং হযরত ইমরান (রাঃ) বিন হাছিনকে বললেনঃ "তোমরা উভয় এদিক–ওদিক ঘুরে ফিরে পানির সন্ধান কর।" দু'জনই নির্দেশ মুতাবিক পানির সন্ধানে বের হলেন। কিছুদূর গিয়ে তাঁরা একজন বেদুঈন মহিলাকে দেখতে পেলেন। তিনি উটে সওয়ার ছিলেন এবং পানির দুই মশকে পালটকে রেখেছিলেন। হযরত আলী (রাঃ) এবং হযরত ইমরান (রাঃ) তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, "পানি কোথা থেকে আনছো?"

তিনি জবাব দিলেন, "পানি এখান থেকে অনেক দূরে। পানি বোঝাই করে এখানে পৌঁছতে আমার আট প্রহর লেগে গেছে।"

www.bjilibrary.com

দু'জন বললেন, "তুমি আমাদের সঙ্গে চলো।"

মহিলাটি জিজ্ঞেস করলেন, "কোথায় যাবো?"

তাঁরা বললেন, "রাসূলের (সাঃ) নিকটে।"

তিনি বললেন, "সেই ব্যক্তি, যাকে লোকজন বেদ্বীন (মায়াজ আল্লাহ) বলে থাকে?"

তাঁরা বললেন, "হাঁ, মুশরিকরা তাঁকে এই রকমই মনে করে।" (আসতাগফিরুল্লাহ)।

এরপর তাঁরা দু'জন মহিলাকে সঙ্গে নিয়ে হুজুরের (সাঃ) খিদমতে পৌছলেন। তিনি মহিলাকে বললেন, "যদি অনুমতি দাও তাহলে তোমার মশক থেকে সামান্য পানিনিই।"

তিনি বললেন, "নিন। তবে, অল্প করে নেবেন। আমি অনেক দূর থেকে এই পানি এনেছি এবং এ পর্যন্ত পৌছতে অনেক কষ্ট করেছি।"

হুজুর (সাঃ) প্রথমে মশকের ওপরের মুখ খুলে পাত্রে সামান্য পানি নিয়ে তা বন্ধ করে দিলেন। অতঃপর নীচের দিক থেকে মুখ খুলে কিছু পানি বের করলেন এবং নির্দেশ দিলেন যে, সকলে সেখানে গিয়ে যেন নিজেরা পানি পান করে এবং জানোয়ারকেও পান করায়। সুতরাং সকল সাহাবী নিজেরাও আসুদাহ হয়ে পানি পান করলেন এবং সওয়ারীদেরকেও ভাল করে পান করালেন। আল্লাহ তায়ালা এই পানিতে এত বরকত দিলেন যে, অনেক সংখ্যক মানুষ এবং পশু তৃষ্ণা মিটিয়ে পানি পান করার পরও উভয় মশকই পূর্বের থেকে বেশী ভরা বলে মনে হচ্ছিল। মহিলা এই দৃশ্য দেখে হতভম্ব হয়ে গেলেন।

এক্ষণে হুজুর (সাঃ) সেই মহিলার জন্য কিছু খাবার আনার নির্দেশ দিলেন। সাহাবায়ে কিরাম (রাঃ) তৎক্ষণাৎ অনেক খাবার একত্রিত করলেন এবং হুজুরের (সাঃ) নির্দেশ মুতাবেক একটি কাপড়ে বেঁধে মহিলার উটের ওপর রেখে দিলেন। অতঃপর হুজুর (সাঃ) মহিলাকে বললেন, "তুমি এখন যাও এবং এইসব খাবার নিজের পরিবার পরিজনকে খাইও।"

যখন তিনি রওয়ানা হলেন তখন আরো ইরশাদ হলো, "দেখ, তোমার মশক পানি দিয়ে যথাযথভাবেই পূর্ণ রয়েছে। সৈন্যরা যে পানি পান করেছে তা তাদেরকে

www.bjilibrary.com

আল্লাহই পান করিয়েছেন। সেই মহিলা পৌছলে সবাই জিজ্ঞেস করলো, "তুমি নিয়ম বহির্ভূতভাবে পানি আনতে এত বিলম্ব করেল কেন?"

তিনি বললেন, "পথে আমার সঙ্গে দু'ব্যক্তির সাক্ষাৎ হয়। তাঁরা আমাকে সেই ব্যক্তির কাছে নিয়ে গিয়েছিল যাঁকে লোকজন বেদ্বীন বলে। তিনি মশকের মুখ খুলে পশু সমেত নিজের সকল সৈন্যকে পানি পান করান। কিন্তু আমার পানিতে কোন কমতি হয়নি। খোদার কসম। দুনিয়ায় সেই ব্যক্তির চেয়ে বড় কোন যাদুকর (মায়াজ আল্লাহ) নেই এবং তিনি আল্লাহর রাসূলও হতে পারেন।"

যদিও প্রিয় নবী (সাঃ) মরুচারী মহিলাটিকে তাঁর পানির বিনিময় দিয়ে দিয়েছিলেন। এ সত্ত্বেও সাহাবায়ে কিরামের (রাঃ) ওপর ইহসানের এই প্রভাব পড়েছিল যে, কখনো যদি সেই এলাকার মুশরিকদের সঙ্গে যুদ্ধ হতো তখন সেই মহিলার কবিলাকে ছেড়ে দিতেন। তিনি সাহাবাদের (রাঃ) এই ব্যবহারে এতই প্রভাবিত হন যে, একবার তিনি নিজের গোত্রের সকলকে একত্রিত করে বললেন, "তোমরা দেখেছ যে, এরা আমাদের সঙ্গে কত অনুগ্রহপূর্ণ ব্যবহার করে থাকে। এটা শুধু এই কারণে যে, আমি একবার তাঁদেরকে সামান্য পানি পান করিয়েছিলাম। তাঁদের এই ইহসান স্মরণ থেকে এটাই প্রমাণিত হয় যে, তাঁরা ভালো মানুষ এবং তাঁদের সরদার খোদার সত্য রাসূল। আমাকে যদি তোমরা মানো তাহলে আমরা সকলেই তাঁদের মধ্যে শামিল হয়ে যেতে পারি এবং তাঁদের রাসূলের ওপর ঈমান আনতেপারি।"

গোত্রের সকলেই তাঁর কথায় সম্মতি দিলেন এবং সকলে ইসলাম গ্রহণ করলেন।

www.bjilibrary.com

হযরত উম্মে রা'লাহ (রাঃ) কাশিরিয়াহ

কতিপয় রাওয়ায়েতে তাঁর বাগ্মিতা ও বাকপটুতার কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। কথিত আছে যে, হযরত আসমা (রাঃ) আনসারিয়াহর মত যখন তিনি বাইয়াতের জন্য প্রিয় নবীর (সাঃ) খিদমতে হাজির হলেন তখন ব্যাখ্যা চেয়ে বললেন, "হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের পুরুষরা তো আল্লাহর পথে জিহাদের মর্যাদা লাভ করে থাকে। কিন্তু আমরা মহিলাদেরকে সাধারণত ঘরে রেখে যাওয়া হয়। আমরাও কি পুরুষদের মত নেক কাজে কিছু অংশ নেয়ার আশা করতে পারি?"

হুজুর (সাঃ) বললেন, "হে আরবের মহিলারা! তোমরা যদি আল্লাহর স্মরণ থেকে গাফিল না হও তাহলে না- মুহাররামকে দেখবে না এবং না-মুহাররামকে নিজের আওয়াজ শুনাবে না। তাহলে তোমরা অবশ্যই সওয়াব পাবে।"

এক রাওয়ায়েতে আছে যে, প্রিয় নবীর (সাঃ) ওফাতের পর তিনি হযরত হোসাইনকে (রাঃ) কোলে নিয়ে মদীনার অলি-গলিতে ঘুরে বেড়াতেন।

হযরত উম্মে রা'লাহর (রাঃ) ওফাতের সাল এবং অন্যান্য তথ্য পাওয়া যায়নি।

সমাপ্ত

www.bjilibrary.com

تذکارِ صحابیات

طالب الہاشمی